অর্জুন সমগ্র ৩

সমরেশ মজুমদার

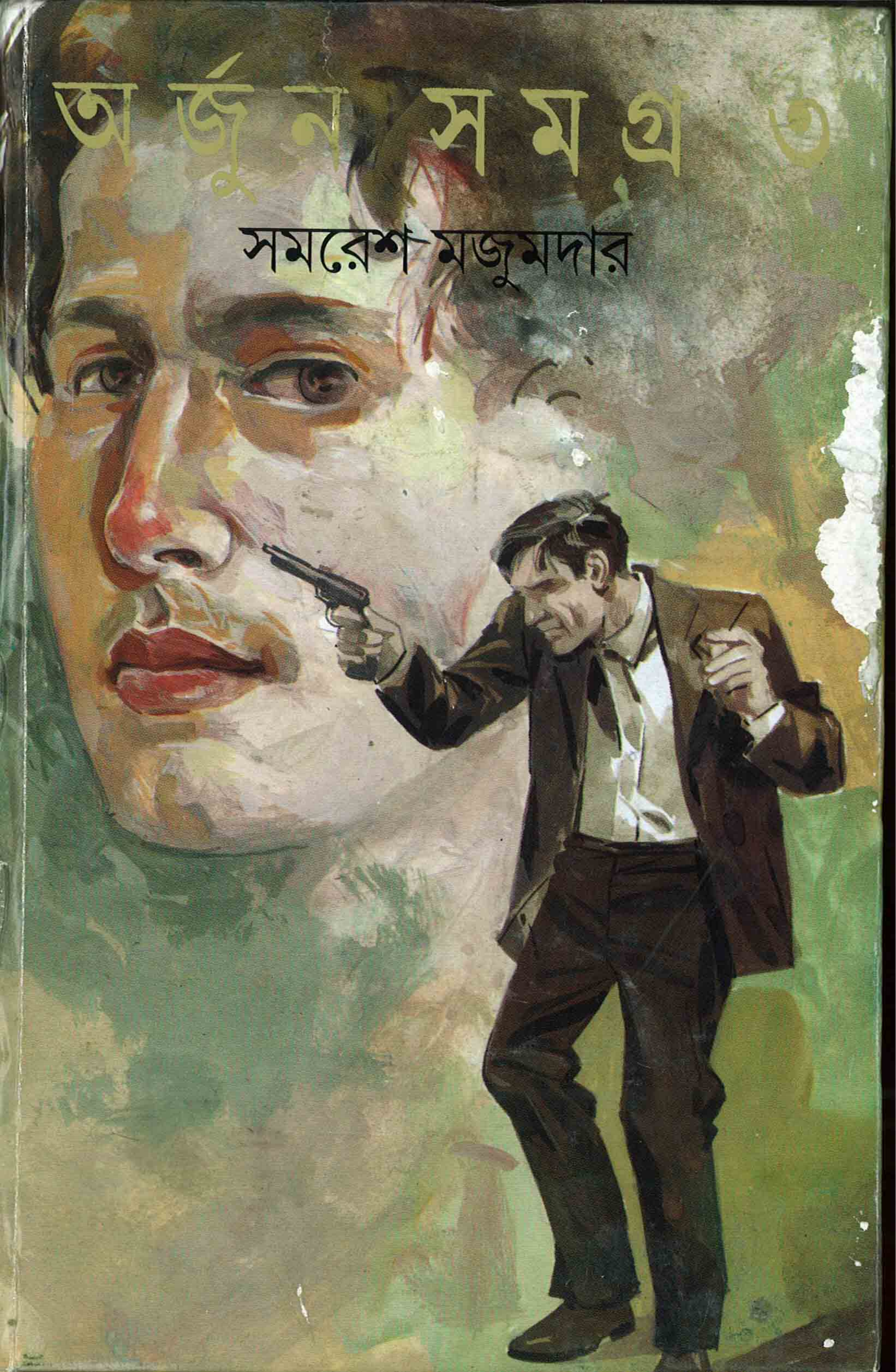

অর্জুন সমগ্র ৩

সমরেশ মজুমদার

pathagar.net

আনন্দ

সূচিপত্র

হিসেবে ভুল ছিল ৭
লবণহ্রদ লণ্ডভণ্ড ৭১
দিনদুপুরেই রাতদুপুর ১৩৯
ইয়েতির আত্মীয় ২৬১
একমুখী রুদ্রাক্ষ ৩২৩
ড্রাকুলার সন্ধানে অর্জুন ৩৯৭

গ্রন্থ-পরিচয় ৫০৭

pathagar.net

হিসেবে ভুল ছিল

ক'দিন থেকে দিনরাত বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে রয়েছে। দিনটাকে দিন বলে চেনা যাচ্ছে না। রাতটা হয়ে উঠেছে আরও রহস্যময়। ডুয়ার্সে এই সময় একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই। তখন কাজকর্ম মাথায় ওঠে। গাছের পাতাগুলোও আওয়াজ করতে-করতে একসময় নেতিয়ে পড়ে। তবু এই বৃষ্টি মাথায় করে অর্জুন আজ সকাল দশটা নাগাদ অমল সোমের বাড়িতে এসেছিল। "কাঁহাতক আর বাড়িতে বসে থাকা যায়," এই বলে বর্ষাতি আর গামবুট পরে বেরিয়েছিল। থানার পাশ দিয়ে করলা নদীর পাশ ধরে আসার সময় দেখল রাস্তা আর নদী এক হয়ে গেছে। অল্পের জন্যে গামবুটের মধ্যে জল ঢোকেনি। হাবু দরজা খুলে দিয়েছিল। অমল সোম তাঁর ঘরে চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে কিছু দেখছিলেন। টেবিল ল্যাম্প সেই সকালবেলাতেই জ্বালিয়েছেন বাইরে রোদ নেই বলে। পেছন না ফিরে বলেছিলেন, "তুমি এসে ভালই করলে। মাকে একটা টেলিফোন করে দাও। আজ দুপুরে এখানে হাবুর খিচুড়ি খেয়ে নেবে।"

হাবুর হাতের রান্না মোটেই ভাল নয়। গায়ে শক্তি এবং কানে না শুনতে পাওয়া, কথা না বলতে পারা মানুষ যতটা ভাল রান্না করতে পারে হাবু ঠিক ততটাই পারে। গামবুট, বর্ষাতি খুলে বেশ কিছুক্ষণ অর্জুন ঘরে বসে ছিল। অমল সোম সেই যে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন, আর কোনওদিকে খেয়াল নেই।

সূর্য নেই বলেই বাইরে আলো নেই, ঘরেও স্যাঁতসেঁতে ছায়া। এইরকম সময়ে বিছানায় চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়তে খুব ভাল লাগে। অর্জুনের মনে পড়ে, একসময় নীহার গুপ্তের কিরীটি রায় পড়তে খুব ভাল লাগত। তারপর শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ। কিন্তু এদের ভাবভঙ্গি বেশ বয়স্ক-বয়স্ক। ফেলুদা এসে সব্বাইকে সরিয়ে দিল। তার কাছাকাছি কাকাবাবু একটু পাল্লা দিয়েছে ঠিকই, তবে ফেলুদা একাই একশো। অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে যদি ফেলুদার মতো হতে পারত! ফেলুদা কীরকম বেনারস থেকে রাজস্থানে কেস নিয়ে যেত। যেহেতু সে জলপাইগুড়িতে পড়ে আছে তাই ডুয়ার্সের বাইরে কেউ তাকে সমস্যা সমাধানের জন্যে ডাকে না।

দুপুরে হাবু খাবার দিল। খিচুড়ি, বেগুনভাজা আর ডিমভাজা। এ-বাড়িতে আসার পর অমল সোম আর কথা বলার সময় পাননি। এখন খেতে এসে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক। বুঝলে, দারুণ ব্যাপার।"

অর্জুনের মনে হচ্ছিল হাবু খিচুড়িতে বেশি নুন দিয়েছে। এই বস্তুকে অমল সোম কী করে দারুণ বলছেন তা তিনিই জানেন।

পুরো থালা শেষ করে মুখ ধুয়ে একটা লবঙ্গ জিভে চালান করে অমল সোম ডাকলেন, "ঘরে এসো, কথা আছে।"

অর্জুন অনুসরণ করল। চেয়ারে বসে অমল সোম বললেন, "সেই যে গল্প আছে না! একটা বারো বছরের ছেলে সবে জন্মানো বাছুরকে কোলে নিয়ে রোজ খেলা করত। একদিনও সে খেলা বন্ধ করেনি। ছেলেটির যখন তেরো বছর বয়স তখন গোরুটা বেশ বড়সড়। কোনও মানুষ সেই গোরুটাকে কোলে তুলতে পারত না, কিন্তু ওই বালক স্বচ্ছন্দে তুলে নিত। গল্পটাকে বিশ্বাস করো?"

অর্জুন বুঝতে পারছিল অমল সোম নেহাতই ভূমিকা করছেন। কিন্তু উত্তরটা কী হবে? রোজ যে গোরুটাকে তোলে সে তো প্রতিদিনই বাড়তি ওজনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য অনেক মাকে বলতে শোনা যায়, "না বাবা, তোকে আর কোলে তুলতে পারব না। আমার গায়ে জোর নেই।" ছেলের আবদার রাখতে না-পারা সেই মা-ও তো কোলে তুলতে অভ্যস্ত ছিলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, একটা বড়সড় গোরুর ওজন কয়েক মন হবে। যা তোলা কোনও মানুষের পক্ষে অসম্ভব। ছেলেটি কিছুদিনের মধ্যেই খেলাটা বন্ধ করতে বাধ্য হবে।"

এইসময় বাইরে একটা গাড়ির আওয়াজ হল। গাড়িটা বাড়ির সামনেই এসে থামল। অমল সোম বিরক্ত হলেন, "হুটহাট লোকজন চলে আসে। যেন আমরা দেখা করার জন্যে হাঁ করে বসে আছি। তুমি লোকটাকে এই প্রশ্ন করে দ্যাখো তো কী উত্তর দেয়।"

অর্জুন উঠল। কারণ ততক্ষণে আগন্তুক বেল বাজিয়েছে।

দরজা খুলতেই বর্ষাতি ফেল্ট হ্যাট পরা যে মানুষটিকে সে দেখতে পেল, সে পুরোদস্তুর সাহেব। গাড়ি থেকে নেমে বারান্দা পর্যন্ত আসতেই ভিজে গেছে এবং তার জন্যে বেশ লজ্জিত মনে হল।

ইংরেজিতে বলল, "আমি খুব লজ্জিত বারান্দাটা ভিজিয়ে দিলাম বলে। কিন্তু আমি কি মিস্টার সোমের দেখা পেতে পারি?"

"আপনি কোত্থেকে আসছেন?"

"জয়ন্তী পাহাড়ের কাছেই আমি থাকি। মিস্টার সোমকে আমি চিঠি লিখেছিলাম।"

"আপনি আজকে যে আসছেন তা কি উনি জানেন?"

"ওয়েল, আমি তারিখ বলতে পারিনি।"

"আপনার নামটা!"

"ডেরেক মুরহেড।"

"আপনি কি ভারতীয়?"

"ওঃ, ইয়েস। আমি ভারতবর্ষের নাগরিক। কেন বলুন তো?"

"আপনার নাম এবং চেহারা ভারতীয়দের মতো নয়, তাই।"

"ভারতীয়দের চেহারা কি সবার একরকম?" ডেরেক হাসল।

অর্জুন লোকটাকে ভাল করে দেখল। বছর চল্লিশেক বয়স। দূরে বৃষ্টিতে যে জিপটা ভিজছে তার দাম বেশি নয়। এই লোকটি যে আসছে তা অমল সোম জানতেন। তবু বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

"মিস্টার সোম কি আপনাকে এখন আসতে বলেছিলেন?"

ডেরেক মাথা নাড়ল, "না। কয়েকদিন আগে ওঁকে আমি খাম পাঠাই। উনি যেদিন আসতে বলবেন সেদিন চলে আসব বলে জানাই। কিন্তু পর পর এমন কিছু ঘটনা ঘটল যে, আজ এমন ওয়েদারেও আমি চলে আসতে বাধ্য হলাম।"

ডেরেককে বাইরের ঘরে বসতে বলল অর্জুন। বর্ষাতি বারান্দায় খুলে রেখে ডেরেক ভেতরে এল। অর্জুন দেখল লোকটার স্বাস্থ্য বেশ ভাল। একে ভারতীয় বলে ভাবতে তার অসুবিধে হচ্ছিল। জানলা খোলা যাবে না বৃষ্টির জন্যে, আলো জ্বালতে হল। এবং তখনই অমল সোম ঘরে ঢুকলেন, "ডেরেক মুরহেড?"

"ইয়েস সার। আপনি মিস্টার সোম?"

"হ্যাঁ। আর এই ইয়ং ম্যানটির নাম অর্জুন।"

ডেরেক দু'জনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বলল, "মিস্টার সোম, এভাবে না জানিয়ে চলে আসার জন্যে আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

"ছবিগুলো কে তুলেছে?"

"আমার কাকা। উনি বেশ বৃদ্ধ। একমাত্র নেশা ছবি তোলা। নিজের ডার্করুম আছে। সারাক্ষণ ক্যামেরা নিয়ে পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান।"

"ছবিগুলো কবে তোলা হয়েছে?"

"গত এক বছরে। আমি ছবির পেছনে এক দুই করে নম্বর লিখে দিয়েছি।"

"আমার এখানে আসতে তোমার কতটা সময় লাগল?"

"সাত ঘণ্টা। বৃষ্টির জন্যে আমি অবশ্য স্পিড বাড়াতে পারিনি।"

"তার মানে এখনই রওনা হলে তুমি রাত ন'টার আগে ফিরতে পারবে না।"

"সেইরকমই মনে হচ্ছে। কিন্তু সার...।"

"হবে। ইন ফ্যাক্ট তোমার পাঠানো ছবিগুলো নিয়েই আমি সারা সকাল বসে ছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত। খিচুড়ি খাবে?"

"অনেক ধন্যবাদ সার। আমরা বাড়ির বাইরের খাবার খাই না। সঙ্গে যা এনেছিলাম তাই দিয়ে লাঞ্চ শেষ করেছি।" ডেরেক জানাল।

"সে কী! তোমাকে যদি বেশ কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়—।"

"নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি যাব না। আমাদের গ্রামের কেউই যাবে না। দীর্ঘকাল ধরে আমরা এই ট্রাডিশন মেনে চলছি। এবার কাজের কথায় আসা যাক। সার, আমরা আপনার সাহায্য চাইছি। গ্রামের সমস্ত মানুষ এখন আতঙ্কের মধ্যে বাস করছে।"

"দ্যাখো ডেরেক, ডুয়ার্সে এতকাল বাস করেও আমি জানতাম না পাহাড়ে এমন একটা গ্রাম রয়েছে। কোনও জার্নাল বা বইয়ে খবরটা ছাপা হয়েছে বলে শুনিনি। তাই তোমার চিঠি পেয়ে অবাকই হয়েছিলাম। হ্যাঁ, আমার কথা তুমি জানলে কী করে?"

"একটা ইংরেজি পত্রিকা থেকে। আপনাকে নিয়ে লেখা একটা আর্টিকেল ছাপা হয়েছিল।"

"আচ্ছা। এখন তোমাদের সমস্যাটা কী?"

"বছরখানেক ধরে আমাদের গ্রামে মাঝে-মাঝেই অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে! পাহাড়ে অদ্ভুত আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। রাত বলে কেউ তখন সেখানে যেতে সাহস পায় না। দিনের বেলায় গিয়ে দেখা যায় অনেকটা জায়গা পুড়ে ছাই হয়ে আছে। কিন্তু সেগুলো যে আগুনে পুড়েছে তা আমাদের মনে হয়নি। গাছ বা ঘাস পুড়েছে প্রচণ্ড উত্তাপে। ইদানীং এই ঘটনা ঘন-ঘন ঘটছিল। যেহেতু আলোটাকে দেখা যেত গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে, তাই আমাদের কোনও সমস্যা তৈরি করেনি। লোকাল থানা মাইলপাঁচেক দূরে, পাহাড়ের নীচে। তাদের খবরটা জানিয়েছিলাম, কিন্তু কেন জানি না পুলিশ আমল দেয়নি। কয়েকদিন হল, অদ্ভুত চারজন মানুষ গ্রামে আসছে। প্রথমবার কথা বলতে গিয়ে বোঝা গেল ওরা হিন্দি বা ইংরেজি জানে না। গতকাল এসেছিল একজন দোভাষীকে নিয়ে। ওরা আগামী রবিবার আবার আসবে এবং তখন গ্রামের যত দু'বছরের শিশু রয়েছে তাদের দেখতে চায়। ওরা বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আমাদের কোনও আপত্তি শুনবে না। আপনাকে যে ছবিগুলো পাঠিয়েছি তাতে পোড়া গাছপালার সঙ্গে ওই লোকগুলোও আছে। আমরা ভয় পাচ্ছি ওই রহস্যময় আলোর সঙ্গে এই অজানা আগন্তুকদের কোনও সম্পর্ক রয়েছে।" ডেরেক একটানা বলে থামল।

"ইন্টারেস্টিং ডেরেক। আমি ছবিগুলো ভাল করে দেখেছি। ওগুলো নিয়ে আমি পরে কথা বলব। কিন্তু তোমরা কি থানায় ডায়েরি করেছ? কিছু লোক যদি ভয় দেখিয়ে কাজ করাতে চায় তা হলে পুলিশ তোমাদের প্রোটেকশন দিতে বাধ্য।" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"না। মনে হয়েছে আপনার সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।"

"পুলিশের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক কীরকম?"

ডেরেক মাথা নাড়ল, "আমি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কখনওই পুলিশকে আমাদের গ্রামে ঢুকতে দেখিনি। আজ অবধি গ্রামে এমন কোনও অপরাধ কেউ করেনি যাতে পুলিশের উপস্থিতি প্রয়োজন। এ থেকে ভেবে নিতে পারেন সম্পর্ক

কীরকম?”

“হুম। লোকগুলোর ছবি দেখে মনে হয়েছে ওরা মধ্য এশিয়ার মানুষ। আচ্ছা, তোমার কাকাকে ওরা ছবি তুলতে দিতে আপত্তি করেনি?”

“কাকা একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছবি তুলেছিলেন।”

“ও।” অমল সোম ভেতরে চলে গেলেন। অর্জুন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। তার মাথায় অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে ছটফট করছে। কিন্তু অমল সোম যখন কথা বলছেন তখন তার কথা বলা অশোভন বলেই চুপ করে ছিল সে।

অমল সোম ফিরে এলেন দুটো ফোটোগ্রাফ নিয়ে। প্রথমটা সামনে ধরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “মনে হয় এখানেই আলো জ্বলেছিল। গাছপালা পুড়ে গেছে। কিন্তু এই জিনিসটি কী? রংটা যে কখনও সাদা ছিল তা বোঝা যাচ্ছে।”

অমল সোম ছবিটা সামনে ধরতেই ওরা দেখতে পেল পোড়া জঙ্গলের একাংশ। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে প্রায় ছাই হয়ে। একটু জোরে বাতাস বইলেই পড়ে যাবে। অমল সোম যে জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখালেন সেখানে একটা আধপোড়া মস্ত গাছ যার পেটের মধ্যে বিশাল ডিমের আকারের কোনও বস্তু রয়েছে, ওপরের রং কখনও সাদা ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

ডেরেক খুঁজে দেখল। তারপর মাথা নাড়ল, “এরকম কিছুর অস্তিত্ব ওখানে আছে বলে মনে করতে পারছি না। হয়তো ওখানে আলো এমনভাবে পড়েছিল যে, ছবিতে ডিমের আকৃতি বলে মনে হচ্ছে।”

দ্বিতীয় ছবিতে যে-ক’জন মানুষের ছবি তাদের মুখ-চোখ বেশ শান্ত। অতিরিক্ত মাত্রায় শান্ত বলেই মনে হচ্ছে। অমল সোম যখন বলেছেন লোকগুলো মধ্য এশিয়ার, তখন ও নিয়ে তর্ক করার কোনও মানে হয় না। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “এই চারজনের মধ্যে কে তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছে?”

ডেরেক খুব দ্রুত লোকটিকে দেখিয়ে দিল। অর্জুন দেখল লোকটি দলের সবচেয়ে রোগা, খাটো। নেতা হওয়ার মতো শরীর ওর নয়। অমল সোম ছবিগুলো ফেরত নিলেন, “ডেরেক, আমাকে আরও ভাবতে হবে। কিন্তু তার আগে বলো তুমি ঠিক কী চাও?”

ডেরেক বলল, ‘মিস্টার সোম, আমরা খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। আমাদের গ্রামে গেলেই আপনি সেটা বুঝতে পারবেন। এই ঝুট ঝামেলা থেকে আপনি আমাদের রক্ষা পেতে সাহায্য করুন। আমরা সাধ্যমতো আপনাকে পারিশ্রমিক দেব।”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “সে তো নিশ্চয়ই, বিনা পারিশ্রমিকে আমরা কেন সময় নষ্ট করব! কী বলো অর্জুন?”

অর্জুন জবাব দিল না। অমল সোম টাকা রোজগার করার জন্যে সমস্যার সমাধান করেন এ-কথা আজ জলপাইগুড়ির একটা রিকশাওলাও বিশ্বাস করবে না।

“তা হলে?” ডেরেক সোজা হয়ে বসল।

"ডেরেক মুরহেড?"

"ইয়েস সার।"

"আমাকে আর একটু ভাবতে দাও। তবে সেইসঙ্গে আমার কিছু ডাটা দরকার। এইজন্যে আমি অর্জুনকে তোমার সঙ্গে পাঠাতে চাই। নিজেদের গ্রাম তোমরা যে চোখে দেখবে, অর্জুন নিশ্চয়ই সেটা দেখবে না। ও ফিরে আসবে শনিবারের মধ্যে। তেমন বুঝলে আমি রবিবারের সকালেই তোমাদের ওখানে পৌঁছে যাব। তুমি যদি অর্জুনের যাওয়া-আসা এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারো।"

"শিওর। এতে কোনও প্রবলেম নেই।"

ডেরেককে বসতে বলে অমল সোম অর্জুনকে ইশারা করলেন অনুসরণ করতে। ভেতরের ঘরে ঢুকে অমল সোম বললেন, "তোমার যেতে আপত্তি নেই তো?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনি কিছু বললে আমি কখনও আপত্তি করেছি? তা ছাড়া যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে গেলে নতুন অভিজ্ঞতা হবে।"

"গুড। শোনো, ওখানে গিয়ে চোখ-কান খোলা রাখবে। কোনও ইমোশনাল ব্যাপারকে প্রশ্রয় দেবে না। তোমার সঙ্গে অস্ত্র আছে?"

"হ্যাঁ। ওটা সঙ্গে রাখা অভ্যেস হয়ে গেছে।"

"যদি তুমি থাকতে-থাকতে আলোটা ওখানে জ্বলে ওঠে, তা হলে অস্ত্রটা ব্যবহার করবে।" অমল সোম তাঁর টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে ড্রয়ার থেকে একটা হাতঘড়ি বের করলেন, "তোমার ঘড়িটা খুলে রাখো এখানে। এটা পরে নাও।"

অর্জুন ঘড়িটা নিল। একটু ভারী। নানান রকম চাবি ঘড়ির চারপাশে।

অমল সোম চাবিগুলোর ব্যবহার বুঝিয়ে দিলেন।

জলপাইগুড়ির হাসপাতালের সামনে তখন বেশ জল জমে গেছে। ডেরেকের পাশে বসে জলে ভাসা শহর দেখতে-দেখতে ওরা বাইপাসে এসে পড়ল। ডেরেক জিপ চালাচ্ছে বেশ গম্ভীর মুখে। অর্জুনের মনে হল ডাস্টিন হফম্যানের সঙ্গে ডেরেকের চেহারার খুব মিল আছে। একসময় ডুয়ার্স, দার্জিলিং এবং অসমের চা-বাগানগুলোর ম্যানেজার হয়ে সাহেবরা এ -দেশে ছিল। স্বাধীনতার পর তারা যে যার নিজের দিশে ফিরে গিয়েছে। এখন মাঝে-মাঝে টুরিস্ট ছাড়া সাহেব ডুয়ার্সে দেখা যায় না।

বৃষ্টিটা আবার জোরালো হল। সামনের রাস্তা দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। ডেরেক বাধ্য হল রাস্তা থেকে সরে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাতে। এঞ্জিন বন্ধ করে বলল, "এক্সকিউজ মি।" সে পকেট থেকে একটা বাক্স বের করে ঢাকনা খুলল। বাক্সের মধ্যে হাতে পাকানো সিগারেট। ঠোঁটে একটা তুলে দিয়ে দেশলাই জ্বালল সে। ডেরেককে সিগারেট খেতে দেখে অর্জুনের লোভ হচ্ছিল খুব। কিন্তু ডেরেক

তাকে অফার করছে না দেখে সে চুপ করে রইল। এই সিগারেটের গন্ধটা একদম অচেনা। মিষ্টি-মিষ্টি ঘোর লাগায়।

ডেরেক বলল, "আমি একটু অভদ্রতা করলাম। কিন্তু এই সিগারেট আপনার ভাল লাগবে না বলে আমি অফার করলাম না।"

"কী করে বুঝলেন?"

"এর তামাক আমরা গ্রামে তৈরি করি। সতেরোশো আশি সালে আমার পূর্বপুরুষরা যখন ইংল্যান্ড থেকে এসেছিলেন তখন তাঁরা এইরকম সিগারেট খেতেন। নেশার ব্যাপারে আমরা সেই অরিজিন্যালিটি আজও বজায় রেখেছি। আজকের সিগারেটের তুলনায় এর স্বাদ খুব কড়া।" ডেরেক হাসল।

"সতেরোশো আশি সালের ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না।!"

"ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। সতেরোশো আশি সালে তিরিশজনের একটা দলকে ভারতবর্ষে পাঠানো হয়। এই তিরিশজনের মধ্যে বাইশজন পুরুষ-মহিলার ইংল্যান্ডে কোনও না-কোনও অপরাধে যাবজ্জীবন জেলে থাকার কথা ছিল। তখন যাবজ্জীবন জেল মানে বারো বছর নয়, সমস্ত জীবনই থাকতে হত। কিন্তু জেলখানায় সম্ভবত স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না বলে ওঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হল নতুন পাওয়া কলোনিতে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তারা এঁদের উপদ্রব ভাবলেন। ভেবে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিলেন কলকাতা থেকে অনেক দূরে, এই পাহাড়ে।"

"তারপর?"

"তারপরের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। তখনও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পাহাড়ে দখল নেয়নি। শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং-দার্জিলিঙের নামকরণ হয়নি। পাহাড় ছিল সিকিমের রাজা আর লেপচাদের অধীনে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা ছিল সীমায়িত। তাই ওই তিরিশজন যখন পাহাড়ের এমন একটা জায়গায় বসতি স্থাপন করল যার আবহাওয়ার সঙ্গে ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার মিল আছে, তখন এদেশিরা অথবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আদৌ বিরক্ত হল না।"

"তারপর?"

"আপনি গল্প খুঁজছেন?"

"না। আমি আপনার ইতিহাস জানতে চাইছি।"

ডেরেক হাসল, "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরে ইংল্যান্ডের কুইন ভিক্টোরিয়া যে তাঁদের অপরাধীর বাইরে কিছু ভাবেন না, তা ওঁরা বুঝে গিয়েছিলেন। এতদূরে পাহাড়ে প্রায়-চেনা প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে সম্ভবত ওঁদের অভিমান প্রকট হয়েছিল। কিছুকাল পরে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ ব্রিটিশদের দখলে গেল, তখনও ওঁরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আলাদা হয়ে থেকে গেলেন। ওই তিরিশজনের পরিবার একটু-একটু করে বড় হয়ে একটা গ্রামের চেহারা নিয়ে নিল। গ্রামে চার্চ হল, স্কুল হল, খামার তৈরি হল। ক্রমশ আমার পূর্বপুরুষরা আত্মনির্ভর হলেন। কিন্তু কখনওই তাঁরা ভারতবর্ষকে শাসন করা ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মেলালেন না।

হয়তো ওরা তাঁদের একসময় অপরাধী মনে করত, এটা তাঁরা ভুলতে পারেননি। কিন্তু মজার কথা কী জানেন, এই এলাকার আদিবাসী পাহাড়িদের সঙ্গেও তাঁদের সম্পর্ক তৈরি হল না। ভারতবর্ষের পাহাড়ে আমরা আমাদের নিজস্বতা নিয়ে বছরের পর বছর একদম আলাদা হয়ে বেঁচে আছি।" এক নিশ্বাসে ডেরেক কথাগুলো বলে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখন আপনাদের গ্রামের মানুষের সংখ্যা কত?"

"সাড়ে সাতশো।"

"এই সাড়ে সাতশো মানুষ চুপচাপ পাহাড়ে কীভাবে থাকছে?"

"চুপচাপ থাকবে কেন? প্রত্যেকেই কাজকর্ম করছে। চাষবাস ছাড়াও আমাদের গ্রামের মূল আয় এক্সপোর্ট থেকে। প্রত্যেক বছর প্রচুর বিদেশি মুদ্রা রোজগার করি আমরা।"

"কীরকম?" অর্জুন অবাক হয়ে গিয়েছিল।

"হস্তশিল্প বোঝেন? নানা ধরনের হস্তশিল্প, যা আমাদের পূর্বপুরুষের কেউ-কেউ ইংল্যান্ডে থাকাকালীন শিখেছিল তারই ভারতীয় চেহারা বিদেশে ব্যাপক চাহিদা তৈরি করেছে।"

"তা হলে আর-পাঁচটা পাহাড়ি গ্রামের তুলনায় আপনাদের অবস্থা বেশ ভাল।"

"তা বলতে পারেন।"

"আপনারা কি শুধু ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলেন?"

হেসে ফেলল ডেরেক, "তা কি সম্ভব? আমরা নেপালি এবং হিন্দিও বলি। না বললে কোনও কাজকর্মই করা যাবে না।"

বৃষ্টি একটু কমে আসতেই ডেরেক জিপ চালু করল। অর্জুন চুপচাপ ভাবছিল। এত বছর এদেশে থেকেও ডেরেকরা কতখানি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে তা ওদের গ্রামে না গেলে বোঝা যাবে না। কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ধরনের। এরকম একটা ঘটনার কথা সে এর আগে কখনও শোনেনি। এমন তো নয় যে, ওরা নিজেদের গ্রামের বাইরে যায় না। সভ্য মানুষের সঙ্গে মেশে না। এই যে ডেরেক জিপ চালাচ্ছে, নিশ্চয়ই ওর লাইসেন্স আছে। জিপ কিনতে হয়েছে বাইরে থেকে। এক্সপোর্ট করে যখন, তখন এক্সপোর্ট লাইসেন্স রয়েছে। তা হলে? তিরিশজনের একটা দল দুশো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে জাহাজে চেপে এদেশে এসে পাহাড়ে বসতি করেছিল, যাদের সংখ্যা এখন সাড়ে সাতশো, তারা তো ইংরেজই। অথচ এদের কথা বইয়ে দূরের কথা, খবরের কাগজে বের হয় না।

মাঝখানে একবার পেট্রল নিতে জিপ থামিয়েছিল ডেরেক। তখন বাক্স খুলে খাবার এগিয়ে দিয়েছিল। পিঠেজাতীয় জিনিস। অর্জুন অমল সোমের বাড়ি থেকে খিচুড়ি খেয়ে বেরিয়েছিল বলে খেতে চায়নি আর। ডেরেক খেল। তারপর ফ্লাস্ক থেকে কফি। কালো কফি। স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কফিটা চমৎকার লাগল অর্জুনের।

শেষ পর্যন্ত সমতল থেকে পাহাড়ে উঠতে লাগল গাড়ি। মেঘ থাকায় আজ সন্ধে নেমে পড়েছে বেশ আগেই। ডেরেক হেডলাইট জ্বেলে দিয়েছে। পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে ধাক্কা খেতে-খেতে আলো তাদের পথ দেখাচ্ছে। ক্রমশ তিস্তার গর্জন কানে এল। অনেক নীচ দিয়ে তিস্তা বয়ে যাচ্ছে। এবার পিচের পথ ছেড়ে কাঁচা মাটির পথ ধরল জিপ। বৃষ্টিতে ভেজা বলেই ডেরেক খুব সন্তর্পণে চালাচ্ছিল। রাস্তা খারাপ বলেই বেশি সময় লাগছে। চারপাশে জঙ্গল এবং তাদের চেহারা অন্ধকারে ভয়ঙ্কর। বৃষ্টির মধ্যেই ঝিঁঝি আওয়াজ করে চলেছে সমানে। ডুয়ার্স-দার্জিলিঙের রাস্তাঘাট অর্জুন চেনে। এই অন্ধকারে জিপের আলোয় সে চিনতে চেষ্টা করছিল কোন পথে যাচ্ছে। কিন্তু কাঁচা মাটির পথ ধরার পর থেকেই তার সবকিছু গুলিয়ে গেল। আধঘণ্টা চলার পর সে আবিষ্কার করল কাঁচা রাস্তা শেষ হয়ে আবার পিচের রাস্তা শুরু হয়েছে। খুব মসৃণ রাস্তায় বৃষ্টির জল টুপটাপ পড়ে চলেছে। রাস্তাটা বাঁক নিচ্ছে ঘন-ঘন। হঠাৎ ডেরেক বলল, "এই রাস্তা আমরাই বানিয়েছি।"

"আপনারা মানে গ্রামের লোকেরা?"

"হ্যাঁ। পুরো পথটায় পিচ ফেলা হয়নি, কারণ অনুমতি পাওয়া যায়নি।"

হাওয়া বইছে খুব। অর্জুন বাইরে হাত বের করে দেখল জলের ফোঁটা পড়ছে না। ডেরেক বলল, "আমরা এসে গেছি। আপনাকে বেশ কষ্ট দিলাম।"

অর্জুন উত্তর দিল না। তার সামনে শুধুই পাহাড়ের আড়াল। কোথায় যে এলাম তা বোধগম্য হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ গাড়িটা বাঁক নিতেই চমৎকার দৃশ্য চোখে পড়ল। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে হিরের মতো আলো জ্বলছে থোকা-থোকা। ঘরবাড়ির আদল দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে। ডেরেক গাড়ি থামাল। বলল, "ওই হল আমাদের গ্রাম।"

পাহাড়ি রাস্তার অভিজ্ঞতা থেকে অর্জুন বুঝতে পারছিল এখনও সিকি মাইল পথ ভাঙতে হবে গ্রামে পৌঁছতে গেলে। পাহাড়ের আড়ালে এমন একটা জনপদের কথা সে জানত না, সাধারণ মানুষও জানে বলে মনে হয় না। ডেরেক বলল, "উত্তরদিকের ওই যে পাহাড়, গ্রাম থেকে দূরত্ব খুবই অল্প, আগুন জ্বলে ওঠে ওখানেই।"

অর্জুন দেখল ডেরেকের দেখানো জায়গাটা নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। ওদিকে কোনও ঘরবাড়ি আছে বলে মনে হয় না।

গাড়ি গ্রামে ঢুকল। এখন বেশ রাত হয়ে গেছে। রাস্তা পরিষ্কার এবং লোকজন নেই। ইংরেজিতে 'পাব' লেখা একটা সাইনবোর্ড লাগানো বাড়ি থেকে হইহই চিৎকার ভেসে এল। ডেরেক তাকে নিয়ে এসে যেখানে থামল সেটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির গায়ে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে ভিলেজ সেন্টার। গাড়ি থামতেই তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বাইরে বেরিয়ে এলেন। সবচেয়ে প্রবীণ টেকোমাথা মানুষটা এগিয়ে এসে বললেন, "কী খবর ডেরেক?"

ডেরেক অর্জুনকে ইশারা করে গাড়ি থেকে নামল, "কোনও চিন্তা নেই আঙ্কল। আমি মিস্টার সোমের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি দু'দিন পরে আসবেন। তার আগে ওঁর সহকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন তদন্তের জন্যে। ওঁর নাম অর্জুন, ইনি আমাদের গ্রামের চেয়ারম্যান মিস্টার জোন্স, ইনি ডেপুটি মিস্টার স্মিথ আর ইনি ট্রেজারার মিসেস বেনসন।"

তিনটে বাড়ানো হাতের সঙ্গে হাত মেলাল অর্জুন। মিসেস বেনসন বলে উঠলেন, "আরে, এ যে দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষ। ও কী তদন্ত করবে!"

ডেরেক বলল, "মিস্টার সোম ওর ওপর আস্থা রাখেন।"

অর্জুনকে ওরা বেশ সমীহ করেই ভেতরে নিয়ে গেল। একতলাটা অফিসঘর। দোতলায় গেস্ট হাউস। দীর্ঘ পথ গাড়িতে আসা এবং রাত হয়ে যাওয়ার কারণে অর্জুনকে বিশ্রাম নিতে বলা হল। দোতলার যে ঘরটি ওকে বরাদ্দ করা হল সেটি সুন্দর করে সাজানো। ওঁরা চলে গেলে অর্জুন বাথরুমে ঢুকল। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু এখানে যা ঠাণ্ডা তাতে গরম জলের দরকার। ব্যাপারটা ভাবামাত্র দরজায় শব্দ হল। অর্জুন ফিরে গিয়ে সেটা খুলতে একটা বেঁটে সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। সাহেব কথা বলতে চেষ্টা করছে কিন্তু শব্দ পিছলে যাচ্ছে। সাহেবের হাতে একটা মুখ ঢাকা দেওয়া বালতি। এই প্রথম কোনও সাহেবকে সে তোতলাতে দেখল। চারবারের চেষ্টায় সাহেব বলল, "গরম জল।"

অর্জুন সেটা সাগ্রহে নিতে চাইলেও সাহেব বালতিটা হস্তান্তর করল না। ঘরে ঢুকে বাথরুমে বালতি রেখে হাসল, "আ-আ-আমার নাম পল।"

"অনেক ধন্যবাদ মিস্টার পল। গরম জলের খুব দরকার ছিল।"

কথাটা শুনে লোকটা দু'বার মাথা নামাল এবং তুলল। তারপর বলল, "আ-আ-আমি এ-এই সে-সেন্টারের কেয়ারটেকার। ডিনার আনব?"

অর্জুন মাথা নাড়তেই একগাল হেসে পল বেরিয়ে গেল। এমন পবিত্র হাসি হাসতে অনেকদিন কাউকে দেখেনি অর্জুন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে ও জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সমস্ত গ্রামটা এখন শব্দহীন। রাস্তায় মানুষ নেই। এখানকার সবাই সাহেব? ভাবা যায়! পশ্চিমবাংলার এক পাহাড়ে সাদা চামড়ার মানুষ নিজেদের মতো করে বেঁচে আছে। খারাপ ভাবে যে বেঁচে নেই তা গ্রামের চেহারা এবং গেস্ট হাউসের ঘরদোর দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ডেরেক বলল, "এটা গ্রাম। পশ্চিমবাংলার গ্রামের যে চেহারা তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। বড়জোর জামশেদপুরের টেলকোর সঙ্গে কিছুটা মেলে।" দুশো বছরের ওপর ভারতবর্ষের মূল জনজীবনের সঙ্গে না মিশে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এরা কীভাবে নিজেদের উন্নত করেছে তা নিয়ে যে-কেউ গবেষণা করতে পারেন। এরা কি ভোট দেয়? রাজনীতি করে? এখানে কি কেউ অপরাধ করে না? হাজারটা প্রশ্ন মাথায় কামড়াতে লাগল।

দরজায় শব্দ হল। পল ডিনার নিয়ে ঢুকল। ট্রে-র ওপর প্লেটে রুটি, সবজি, দুধ এবং ডিমের ওমলেট। পল বলল, "এখানে আমরা রাত্রে অ্যানিম্যাল প্রোটিন খাই না। তবু তোমার জন্যে ওমলেট করে দিলাম। কাল দুপুরে ভাল খাওয়াব।"

কথাগুলো পল অনেকবার হোঁচট খেতে খেতে বলল। অর্জুনের মনে হল, পল যদি কম কথা বলে তা হলে ওর কষ্ট কম হয়। সে খেতে বসে গেল। খিদেও পেয়েছিল খুব। সবজিতে মশলা নেই বললেই চলে। সেদ্ধ করে নুন গোলমরিচ ছড়িয়েছে। একদম স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। সামনে দাঁড়িয়ে পল সমানে কথা বলার চেষ্টা করছিল। "এই গ্রামে তো সবকিছু পাওয়া যায় না। প্রতি সপ্তাহে শিলিগুড়ি থেকে আনাতে হয় জিনিসপত্র। কিন্তু ওই যে আগুনটা আর তার সঙ্গে দুর্ভাগ্যের মতো উড়ে আসা লোকগুলো, ওরা আসার পর থেকেই এখানে কারও মনে একটুও শান্তি নেই।" খেতে-খেতে অর্জুন হা-হুতাশ শুনছিল।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ট্রে তুলে নিয়ে গুডনাইট বলে পল বেরিয়ে গেল। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল বোল্টন শহরের কথা। ইংল্যান্ডের ব্ল্যাকপুলে গিয়ে সে ওই ছোট্ট শহরটাকে দেখেছিল। ছবির মতো চুপচাপ, শান্ত। ডেরেকদের এই গ্রামের সঙ্গে বোল্টনের খুব মিল আছে। দুশো বছর আগে ইংল্যান্ড থেকে আসা তিরিশজন মানুষ তাদের নিজেদের আদলে যে বাসস্থান তৈরি করেছে তাতে তো ব্রিটিশ ছাপ থাকবেই। কিন্তু এতটা মিল কল্পনা করাও যায় না।

শুয়ে পড়ার আগে অর্জুনের মনে হল, একটু হাঁটাহাঁটি করলে কীরকম হয়! যদিও রাত এখন অনেক, কিন্তু খাওয়াদাওয়ার পর দীর্ঘযাত্রার ক্লান্তিটা চলে গিয়েছে। অর্জুন জ্যাকেটটা গায়ে চড়িয়ে নিল। বেশ ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে এখানে। দরজা ভেজিয়ে ও নীচে নেমে এল। এর মধ্যে ভিলেজ সেন্টারের সব আলো নিভে গেছে। সম্ভবত পল তার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরে গেছে। মূল দরজাটার গায়ে হাত দিয়ে অর্জুন বুঝতে পারল ওটা বাইরে থেকে বন্ধ করা হয়েছে। হয়তো যাওয়ার সময় পল তালাচাবি দিয়ে গিয়েছে।

ফিরে আসছিল অর্জুন। যদিও বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার তবু রাতের নিজস্ব আলো জানলা চুঁইয়ে সেটাকে কিঞ্চিৎ ফিকে করেছে। তার মানে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, আকাশ পরিষ্কার। সে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানলায় কোনও শিক বা গ্রিল নেই। পাল্লা দুটো খুলতে অসুবিধে হল না। মাটি থেকে বেশি উঁচুতে নয় জানলাটা। একটু ইতস্তত করেও অর্জুন জানলা দিয়ে নীচে নেমে দাঁড়াল। বাইরে থেকে পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিতেই বুঝল এখানে ঠাণ্ডা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে।

নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল সে। আকাশে এখন লক্ষ তারা। খানিকটা দূর থেকেই পাহাড়ের গায়ে অবশ্য জঙ্গলের জমাট অন্ধকারে সেই তারাদের কোনও প্রতিফলন নেই। হিমালয়ের বুকের ভেতরে বাটির মতো এই লোকালয়, যার সঙ্গে ভারতবর্ষের কোনও মিল নেই। বাড়িঘর ছিমছাম, ছাড়া-ছাড়া এবং এদেশি ধাঁচের

নয়। ফেলে আসা দেশের স্মৃতি যে এরা ভোলেনি সেটা স্পষ্ট। রাস্তায় মানুষ নেই। এখানে কি চুরিচামারি হয় না? বাইরে থেকে অভাবী মানুষ যদি এখানে চুরি করতে আসে, তার জন্যে পাহারাদার থাকবে না? অর্জুন একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনেই পাহাড়ের পাঁচিল। দু'পাশে রাস্তাটা চলে গেছে। হঠাৎ তার কানে শব্দ বাজল। কে বা কারা কথা বলছে। একজনের গলা বেশ উত্তেজিত।

প্রথমে সে কাউকে দেখতে পেল না। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই দু'জন মানুষকে সে আবছা দেখতে পেল। এত রাত্রে স্থানীয় মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কী কথা বলছে তা শোনার লোভ সামলাতে পারল না সে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে সে যতটা পারল এগিয়ে গেল। এবার কথা স্পষ্ট হল। ইংরেজিতে কথা বলছে ওরা। কিন্তু এই ইংরেজি একটু অন্যরকম। ক্রিয়াপদের ব্যবহার নেই বললেই হয়। উত্তেজিত লোকটি বলছিল, "আমার জীবনের একমাত্র সাধ, ইংল্যান্ডে গিয়ে নিজের গ্রাম দেখার। এই সাধ কোনওদিন মিটবে না, কারণ প্লেনের টিকিটের ভাড়া আমি জোগাড় করতে পারব না। কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে হাত মেলাও তা হলে আমরা দু'জনেই চলে যেতে পারি। ওদের কাছে এক লক্ষ টাকা চাইলেই পাওয়া যাবে।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "না জন। এটা বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কীসের বিশ্বাসঘাতকতা? নিজের পিতৃভূমি-মাতৃভূমি দেখতে চাওয়া বিশ্বাসঘাতকতা?"

"না, তা নয়। কিন্তু আমাদের এই কমিউনিটির ক্ষতি করে আমি কোথাও যেতে চাই না। ওই লোকগুলো যে বাচ্চাটাকে চাইবে তাকে চুরি করে ওদের হাতে তুলে দিতে হবে। একবার ভাবো তো সেই বাচ্চার বাবা-মায়ের কী অবস্থা হবে?"

"অনেক বাচ্চা জন্মানোর পর মারা যায়। সেইরকম ভেবে নেবে।"

"না, না। তুমি খুব নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছ। তারপর যখন তুমি ইংল্যান্ডে যাবে তখন সবাই জানতে চাইবে কোত্থেকে টাকা পেলে? কী জবাব দেবে?"

"আমরা কাউকে জবাব দেব না। টাকাটা হাতে নিয়েই এখান থেকে উধাও হয়ে যাব।"

"তার চেয়ে জন, তুমি মিস্টার জোন্সের সঙ্গে কথা বলো। আমি শুনেছি আমাদের এক্সপোর্টের ব্যাপারে একজনকে বিদেশে পাঠানোর কথা হচ্ছে। তুমি সেই দায়িত্ব চাও।"

"খেপেছ? জোন্সবুড়ো আমাকে কেন পাঠাবে? ওর নিজের লোক ডেরেক যাবে। যাকগে, আমি একজন সঙ্গী চেয়েছিলাম বলেই তোমাকে বললাম। কিন্তু এ-নিয়ে গল্প কোরো না। তা হলে সেটা আমার সঙ্গে বেইমানি করা হবে।"

"কিন্তু ওরা কি তোমাকে টাকা দেবে বলেছে?"

"নইলে এত কথা বলছি কেন?"

"কবে বলল? কীভাবে কথা হল?"

"সেদিন ওরা চলে যাওয়ার পরই আমি পিছু নিয়েছিলাম। শর্টকাট পথ ধরে গিয়ে দেখা করেছিলাম। রবিবারে যখন আসবে তখন আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দেবে কোন বাচ্চাকে ওরা চায়।"

"ওরা কেন আমাদের বাচ্চা চাইছে?"

"আমি জানি না। কিন্তু তোমার সঙ্গে এত রাত্রে আলাদা কথা বললাম, এটা যেন কেউ না জানতে পারে। তুমি আবার ভেবে দ্যাখো। সারাজীবন এখানে পড়ে থাকার চেয়ে ইংল্যান্ডে গিয়ে থাকা তো স্বর্গে যাওয়ার সমান।"

"আমাদের ওরা থাকতে দেবে কেন?"

"কারণ আমরা ব্রিটিশ। আমাদের অধিকার আছে। আচ্ছা, গুডনাইট।" লোকটা, যার নাম জন, দ্রুত হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের সঙ্গে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অর্জুনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় সে একবারও লক্ষ করল না। দ্বিতীয় লোকটা নেমে গেল নীচের রাস্তা দিয়ে। অর্জুন বুঝল ওরা নিজেদের বাড়িতে বসে কথা বলল না, কারণ আত্মীয়স্বজনকেও শোনাতে চায় না। ওর খুব শীত করছিল। ধীরে-ধীরে ফিরে এসে জানলা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। নরম বিছানায় লেপের তলায় শরীর ঢুকিয়ে ওর মনে হল, বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজে বের করতে না পারলে বিদেশিরা কখনওই জিততে পারে না। আর এই রাস্তাটা ইংরেজরাই দেখিয়েছে।

এত সকালে যে ওঁরা দেখা করতে আসবেন আন্দাজ করতে পারেনি অর্জুন। পলের মুখে খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নীচে এসে দেখল মিস্টার জোন্স, মিস্টার স্মিথ এবং মিসেস বেনসন বসে আছেন। ওকে দেখামাত্র ওঁরা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "গুড মর্নিং।"

অর্জুন হাসল, "গুড মর্নিং।"

মিস্টার জোন্স বললেন, "বসুন মিস্টার অর্জুন। রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ।"

মিসেস বেনসন বললেন, "আমরা খুব দুঃখিত, কালকের ডিনার আপনার ভাল লাগেনি বলে। আমি আশা করছি পল আজ থেকে সজাগ থাকবে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না, না। ডিনার ঠিকই ছিল।"

মিস্টার স্মিথ বললেন, "তা হলে আমরা ব্রেকফাস্ট খেতে-খেতে কথা বলি?"

মিসেস বেনসন মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ। পল এখনই নিয়ে আসছে। চলুন, ও-ঘরে যাওয়া যাক।"

ওঁদের অনুসরণ করে পাশের ঘরে ঢুকল অর্জুন। গোটা আটেক চেয়ারের মধ্যখানে একটা সুন্দর খাওয়ার টেবিল। টেবিলের পায়ার বদলে গাছের গুঁড়ি সুন্দরভাবে কেটে বসানো হয়েছে। পল এল ট্রে নিয়ে। হাসিমুখে বলল, "গুড মর্নিং

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, "মর্নিং।"

খেতে-খেতে মিস্টার জোন্স বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই ডেরেকের কাছে আমাদের সমস্যার কথা জানতে পেরেছেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত। মিস্টার সোম যখন আপনাকে পাঠিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই আমরা ভরসা করতে পারি।"

অর্জুন বলল, "যতটুকু শুনেছি আপনাদের সমস্যা তৈরি করেছে হঠাৎ-আসা কিছু বিদেশি। কিন্তু কেউ এসে আপনাদের দু' বছরের শিশুকে দেখতে চাইলেই আপনারা তাকে দেখাতে বাধ্য নন। তারা যদি ভয় দেখায়, আপনারা স্বচ্ছন্দে পুলিশের সাহায্য নিতে পারেন। আপনারা যদি চান আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে পারি।"

মিস্টার জোন্স বললেন, "আমরা মনে করি পুলিশ এখন কোনও সাহায্য করবে না। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তারা সাধারণত সক্রিয় হয়। ডেরেক নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছে, আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে পাহাড়ের জঙ্গলে মাঝে-মাঝে আগুন জ্বলে ওঠে। পরদিন গিয়ে শুধু ছাই ছাড়া আমরা কিছু দেখতে পাইনি। পুলিশকে ঘটনাটা জানানো সত্ত্বেও কোনও কাজ হয়নি।"

"জঙ্গলে যে কারণে আগুন জ্বলে, প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলছি।"

"না। দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হলে, গাছপালা শুকিয়ে গেলে যে আগুন জ্বলে, তা আমরা জানি। কিন্তু বৃষ্টিভেজা গাছগাছালিতে বাইরে থেকে আগুন না লাগালে কোনও কাজ হয় না। আর তা ছাড়া, এই আগুন ওপর থেকে নীচে নেমে আসে। পুলিশ বলেছে তারা সন্ধান করবে। কিন্তু তাও বছরখানেক হয়ে গেল।" মিস্টার স্মিথ বললেন।

খাওয়া শেষ হল। চা এল। অর্জুন লক্ষ করল চায়ের কাপ কাঠের তৈরি। মসৃণ সুদৃশ্য এই কাপ সে কখনও ব্যবহার করেনি।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বেরিয়ে এসে ওরা দেখল ডেরেক অপেক্ষা করছে। সুপ্রভাত-পর্ব শেষ করার পর ডেরেক বলল, "আপনি যদি কোথাও যেতে চান তা হলে গাড়ি তৈরি।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "গাড়ির দরকার নেই। মিসেস বেনসন, আপনি আমাকে বলতে পারবেন নিশ্চয়ই, এখানে দু' বছরের কাছাকাছি বয়সের কত শিশু রয়েছে?"

মিসেস বেনসন বললেন, "ঠিক এগারোজন। এর মধ্যে তিনজন মেয়ে।"

"ওরা কি মেয়েদেরও দেখতে চেয়েছে?"

মিস্টার জোন্স মাথা নাড়লেন, "আমরা ঠিক বুঝতে পারিনি। শিশু বললে ছেলেমেয়ে আলাদা করা যায় না।"

"আমি এই এগারোজনকে দেখতে পারি?"

মিসেস বেনসন মাথা নাড়লেন, "পারেন। তবে ওইসব বাচ্চার বাবা-মা খুব ভয় পেয়ে গেছে। তারা কিছুতেই বাচ্চাদের বাইরে বের করতে চাইছে না। আমরা

বুঝিয়ে বলব যে, আপনি আমাদের বন্ধু, উপকার করতে এসেছেন। যদি আজ লাঞ্চের পর ব্যবস্থা করি?"

"ঠিক আছে। ডেরেক, চলুন, একটু চারপাশ ঘুরে আসি।"

ডেরেক উঠে দাঁড়াল। অর্জুন মিস্টার জোন্সকে বলল, "একটা কথা ভাবতে অবাক লাগছে, এত বছর ধরে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে আপনারা কী করে এখানে আছেন?"

"এজন্য আমাদের পূর্বপুরুষদের অনেক লড়াই করতে হয়েছে। যাঁরা প্রথম এসেছিলেন তাঁদের রাগ, অপমানবোধ তখনকার ইংরেজদের বিরুদ্ধে এত প্রবল ছিল যে, এই লড়াই করতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। এত বছর পরে আমরা নিজেদের অবশ্যই ব্রিটিশ বলি না, কিন্তু ইংরেজ ভাবতে অসুবিধে হয় না। তবে আর কতদিন এই স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে পারব জানি না।"

"আচ্ছা, যদি আপনাদের কেউ ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে চায়?"

"অসম্ভব! এ-কথা কেউ স্বপ্নেও ভাববে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যে-ইংল্যান্ড আমাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে সেখানে ভুলেও আমরা পা রাখব না। এই প্রতিজ্ঞার কথা এখানকার প্রতিটি মানুষ জানে।" মিস্টার জোন্স দৃঢ় গলায় জানালেন।

ডেরেকের সঙ্গে বেরিয়ে এল অর্জুন। এখন রাস্তায় লোকজন চলাচল করছে। সবাই অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। অর্জুন লক্ষ করল পথের দু'পাশে কোনও দোকানপাট নেই। প্রশ্ন করতেই ডেরেক বলল, "ভিলেজ কমিটি এই গ্রামের চারপাশে চারটে দোকান করেছে, যেখানে নিত্যব্যবহার্য সমস্ত জিনিস পাওয়া যায়। শিলিগুড়ি থেকে জিনিসগুলো নিয়ে এসে নামমাত্র লাভে বিক্রি করা হয়। লাভের টাকা কমিটি গ্রামের উপকারেই খরচ করে। এখানে কেউ ব্যক্তিগত ব্যবসা করে না।"

"তা হলে মানুষ টাকাপয়সা পায় কী করে?"

ডেরেক অবাক হল, "কেন? প্রতিটি পরিবার যে যেমন শ্রম দিচ্ছে তেমন অর্থ কমিটির কাছ থেকে পেয়ে যায়। তা ছাড়া মুরগি, ডিম, শূকর থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত কমিটির মাধ্যমে বাইরে বিক্রি করা হয়। সেই বিক্রির টাকা আমরা পাই।"

অর্জুনের মনে হল এইরকম সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন পৃথিবীর কিছু মানবদরদী দেখেছিলেন, যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে ধনী-দরিদ্র বলে কিছু নেই?"

"দরিদ্র কেউ নেই, তবে উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত আছে।"

"কীরকম?"

"যারা কম পরিশ্রম করে, একটু অলস, তাদের রোজগার কম। এ ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীভেদ এখানে নেই।" ওরা চার্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ

এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ক্যামেরায় ছবি তুলতে দেখল অর্জুন। ভদ্রলোক তারই ছবি তুলছেন। ডেরেক হাত নাড়ল। ছবি তুলে বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে কাছে এগিয়ে এলেন।

ডেরেক বলল, "ইনি আমার কাকা। ছবি তোলা ওঁর শখ। এঁর তোলা ছবি মিস্টার সোমের কাছে আপনি দেখেছেন। এঁর নাম অর্জুন।"

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, "শুনেছি, শুনেছি।"

বয়স হয়ে গেলে কোনও-কোনও মানুষের চেহারা বেশ সুন্দর হয়ে ওঠে। এই মানুষটি সেই ধরনের। মুখে শিশুদের মতো সারল্য আছে, যদিও পাকা গোঁফজোড়া খুবই মজাদার। ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন, "তা হলে তুমিও আমাকে আঙ্কল বলো।"

করমর্দন করে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কি আমি বিরক্ত করতে পারি?"

"বিরক্ত বলছ কেন? যদি প্রয়োজন হয় স্বচ্ছন্দে বলতে পারো। এতদিন আমাদের এখানে বাইরের লোকজন তেমন আসত না। কিছু পাহাড়ি আদিবাসী, ওদের কথা আলাদা। তা তুমি এসেছ আমাদের উপকারের জন্যে। তোমাকে তাই বন্ধু ভাবা যেতে পারে।"

"আপনার তোলা একটি ছবিতে দেখেছি চারপাশে পুড়ে যাওয়া গাছপালার মধ্যে একটি বিশাল ডিমের আকৃতির কিছু রয়েছে, যার রং কখনও সাদা ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওই বস্তুটি দেখা যেতে পারে?"

ভদ্রলোক খুব অবাক হলেন, "আমার তোলা ছবিতে দেখেছ?"

ডেরেক উত্তর দিল, "হ্যাঁ আঙ্কল। আমাকে মিস্টার সোম দেখিয়েছেন।"

"অদ্ভুত! আমি তো মনেই করতে পারছি না। আমার সঙ্গে এসো তোমরা। বাড়িতে ওই ছবির কপি আছে ; দেখে বলব।" ভদ্রলোক এমনভাবে হাঁটতে লাগলেন, যেন পৃথিবীতে ওই একটাই বড় সমস্যা রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে ডেরেক বলল, "দেখলেন তো, উনি ফোটোগ্রাফির ব্যাপারে কীরকম পাগল মানুষ।"

আঙ্কল একা থাকেন। পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট বাড়িটির সামনে ফুলের বাগান আছে। ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে গেলে ডেরেক বলল, "ওঁর ছেলেমেয়ে নেই। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকেই ছবি তোলার শখ বেড়ে গেছে। বাড়িতেই ডার্করুম বানিয়ে নিয়েছেন। বাইরে থেকে ফিল্ম আনিয়ে দেওয়া হয় ওঁকে। ফিল্মের যা দাম বেড়ে গেছে তাতে আমরা চিন্তায় পড়ে গেছি।"

"কেন?"

"এই বয়সে ওঁর পক্ষে তো পরিশ্রম করা সম্ভব নয়। ওঁর জমিতে ভিলেজ কমিটি থেকে চাষ করানো হয়। ফলে ওঁর দেখাশোনার দায়িত্ব কমিটিই নিয়েছে। আর কমিটির পক্ষে ওঁকে বলা সম্ভব নয় ছবি কম তুলুন।" ডেরেকের কথা শেষ

হতে-না-হতেই বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন হন্তদন্ত হয়ে। তাঁর হাতে বেশ কিছু ছবির প্রিন্ট।

"দ্যাখো তো, এর মধ্যে আমি তো তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

ওরা দেখল। না, সেই ছবিটি নেই। ডেরেক জিজ্ঞেস করল, "আগুনে পুড়ে যাওয়ার যেসব ছবি আপনি প্রিন্ট করেছিলেন তার কিছু কি অন্য কোথাও রেখেছেন?"

"নো। প্রতিটি বিষয়ের জন্যে আমি আলাদা বাক্স ব্যবহার করি। ছবিটা কীরকম ছিল আর-একবার বলো তো?" বৃদ্ধকে চিন্তিত দেখাল।

অর্জুন বলল, "ওই ছবিতে গাছগুলো পুড়ে গেলেও দাঁড়িয়ে আছে কোনওমতে। কিন্তু একটা আধপোড়া মস্ত গাছের পেটের মধ্যে বিশাল ডিমের আকারে কোনও বস্তু রয়েছে বলে বোঝা যাচ্ছিল। ছবিটা আপনারই তোলা।"

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, "ওইরকম কোনও ছবি আমার কাছে নেই। অথচ প্রতিটি ছবি আমি দুটো করে প্রিন্ট করেছিলাম। এবার মনে পড়ছে ছবিটার কথা। কিন্তু প্রিন্টটা যদি-বা হারিয়ে যায় নেগেটিভ তো থাকবে। সেটাও পাচ্ছি না।"

"কেউ নিয়ে যায়নি তো?"

"কী বলছ তুমি? এখানে কেউ কারও অনুমতি না নিয়ে ভেতরে ঢোকে না। তা ছাড়া একটা পোড়া গাছের ছবি আর নেগেটিভে কার উৎসাহ হবে?"

ডেরেক বলল, "আঙ্কল, আমরা কি অর্জুনকে নিয়ে ওই জায়গায় যেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। চলো।"

গ্রামের মানুষজন, যারা রাস্তায় ছিল, তারা ওদের যাওয়া দেখল। গ্রাম ছেড়ে জঙ্গলে পথ ধরে পাহাড়ে উঠতে লাগল ওরা। বৃদ্ধ হাঁটছেন ধীরে ধীরে কিন্তু তাঁর পাহাড় ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিল না। অনেকটা ওপরে ওঠার পর অর্জুন নীচের দিকে তাকিয়ে গ্রামটাকে দেখতে পেল। এমন সুন্দর ছবি শুধু বিদেশের সিনেমায় দেখা যায়।

প্রায় চল্লিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা সবাই যখন একটু ক্লান্ত তখন সেই পোড়া জায়গাটা এসে গেল। বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ কী! এরকম তো ছিল না!"

একটা ভলিবল কোর্টের মতো জায়গা জুড়ে ছাই কাদা-কাদা হয়ে আছে বৃষ্টির জল পড়ায়। কোনও পুড়ে যাওয়া গাছ দাঁড়িয়ে নেই। সেই আধপোড়া গাছটাকে কেউ কেটে একেবারে ছোট করে দেওয়া হয়েছে। তার ভেতরে ডিমের আকারে যে বস্তু ছিল তার কোনও হদিস এখানে নেই।

ওরা তিনজন জায়গাটাকে ঘুরে-ঘুরে দেখল। অর্জুনের মনে হল আগুনে পুড়ে গেলে এবং তারপর বৃষ্টির জল পড়লে যে অবস্থা হয় তাই হয়েছে। গাছের সঙ্গে গাছের ঘর্ষণ লাগলে যে আগুন জ্বলে, তা এখন হওয়ার সুযোগ নেই। কারণ প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে আর গাছগুলোও স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে। কোনও মানুষই ইচ্ছে করে আগুন জ্বালিয়েছে। আর এত দূরে পাহাড়ের গাছগাছালিতে আগুন জ্বালানোর

একমাত্র উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা। এই মতলব যাদের, তাদের সঙ্গে মধ্য এশিয়া থেকে আসা মানুষদের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা কে জানে!

বৃদ্ধ এরই মধ্যে জায়গাটার ছবি তুলেছিলেন। অর্জুন লক্ষ করল কাদা হয়ে যাওয়া ছাইয়ে কোনও মানুষের পায়ের দাগ নেই। অর্থাৎ কেউ এখানে পা ফেলেনি। যে গাছটাকে মুড়িয়ে কাটা হয়েছে তার কাছাকাছি তো দাগ থাকা উচিত। গাছটা নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক কারণে কাটা পড়েনি। বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ করার পর পাথরের গায়ে ঘষটানোর চিহ্ন নজরে পড়ল অর্জুনের। যেখানে চিহ্নটা, সেখানে কাদা হয়ে যাওয়া ছাই লেগে রয়েছে। সে চিহ্নটার কাছে পৌঁছে এ-পাশে ও-পাশে তাকাতে লাগল। এই সময় ডেরেক তাকে ডাকল।

জায়গাটা দেখে রেখে অর্জুন ফিরে এল। বৃদ্ধ বললেন, "আমি এবার নিশ্চিত এখানকার ছবি তুলে নিয়ে যাওয়ার পর কেউ বা কারা অবশ্যই এখানে এসেছিল। আমি যেমনটি দেখে গিয়েছি তার সঙ্গে কোনও মিল নেই এখন।"

"আপনাদের গ্রামের কোনও-কোনও মানুষই হয়তো কৌতূহলে এখানে এসেছিল।"

"না। তেমন হলে তারা ফিরে গিয়ে বলত।" বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন।

"আপনি কি বলতে চাইছেন আপনাদের সবাই বিশ্বস্ত?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কী বলতে চাইছেন?" ডেরেকের মুখ শক্ত হয়ে গেল।

"পৃথিবীর সর্বত্রই বিশ্বাসঘাতকেরা বাস করে।"

দ্রুত মাথা নাড়ল ডেরেক, "অর্জুন। আপনি খুব ভুল করছেন। কয়েকশো বছর ধরে আমরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখে এখানে বাস করছি। আপনার অভিজ্ঞতা অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু আমাদের একতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা মানে আমাদের অপমান করা। এই কথাটা ভবিষ্যতে মনে রাখবেন।"

"খুব ভাল লাগল শুনে। তবু আমি যেটা বলেছি সেটা মিথ্যে নয়।"

"আপনার কাছে কোনও প্রমাণ আছে?" বলেই ডেরেক হাত নাড়ল, "গতকাল এখানে আসার আগে আপনি আমাদের অস্তিত্ব জানতেনই না। এখানে আসার পর চার-পাঁচজনের বাইরে কারও সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। অথচ আপনি আমাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক আবিষ্কার করে ফেললেন। এই যদি আপনার তদন্তের চেহারা হয়, তা হলে বুঝব মিস্টার সোম আপনাকে পাঠিয়ে ভুল করেছেন।"

"ডেরেক, আমার জায়গায় মিস্টার সোম থাকলে একই কথা বলতেন।"

উত্তেজিত হয়ে ডেরেক কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বৃদ্ধ বাধা দিলেন, "আহা, অকারণে ও কেন এ-ধরনের কথা বলতে যাবে? ওর কারণগুলো আগে শোনো।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ আঙ্কল, কারণ নিশ্চয়ই আছে। তবে সেটা এখনই আমি

বলতে চাই না। কে জানে, হয়তো সেটা বললে বিশ্বাসঘাতকেরা সাবধান হয়ে যেতে পারে।”

ডেরেক চিৎকার করল, “মাই গড। আপনি আমাদেরও সন্দেহ করছেন?”

“অপরাধীকে খুঁজে বের করার আগে কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নন মিস্টার ডেরেক।”

বৃদ্ধ বললেন, “ঠিক, ঠিক কথা। চলো গ্রামে ফেরা যাক।”

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর নীচের হলঘরে শিশুদের নিয়ে মায়েরা জড়ো হলেন। তাদের বাবা এবং অন্যরা খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। এগারোটি শিশুকে একসঙ্গে দেখলে আলাদা ছবি তৈরি হয়। দুই বা দুইয়ের কাছাকাছি বলে প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দ। নিজেদের মধ্যে যে হল্লা জুড়েছে, তা তাদের মায়েরা সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন। মিসেস বেনসন বললেন, “এই এগারোজনের কথাই বলেছিলাম।”

অর্জুন প্রতিটি বাচ্চাকে খুঁটিয়ে দেখছিল। স্বাভাবিক হইচই করা শিশু। কেউ একটু বেশি দুরন্ত এই যা! একটি বাচ্চা অবশ্য বেশি চুপচাপ। গম্ভীর মুখে অন্যদের দুষ্টুমি দেখছিল। অর্জুন ওর কাছে গেল। হাঁটু মুড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নাম কী?” প্রশ্নটি অবশ্যই ইংরেজিতে।

শিশুটি অর্জুনকে দেখল। ঠোঁট টিপল। কিন্তু কোনও উত্তর দিল না।

তার মা বোঝাতে লাগলেন, “কথা বলো। নাম জিজ্ঞেস করলে উত্তর দিতে হয়।”

শিশুটির কানে সেসব ঢুকল না।

অর্জুন হেসে বলল, “মনে হচ্ছে ও কথা বলতে পারে না। তাই না?”

শিশু মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল। তার মা চিৎকার করে উঠলেন, “ওরে দুষ্টু, কী পাজি রে তুই! বাড়িতে বকবক করে আমার মাথাখারাপ করে দিস, আর এখন বেশ বলে দিলি কথা বলতে পারছিস না।”

এসব সত্ত্বেও শিশুটির মুখে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না।

মিস্টার জোন্স এসে দাঁড়ালেন পাশে। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “আমি কি এইসব মা-বাবার সঙ্গে একটা কথা বলতে পারি?”

“অবশ্যই। সেই কারণেই এখানে ওঁরা এসেছেন।”

অর্জুন তাকাল, “ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা, আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। গত কয়েকদিন ধরে আপনারা যে উদ্বেগের মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন সে-কথা আমি জেনেছি। হ্যাঁ, উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। বিদেশিরা কেন উদ্দেশ্যে এখানে এসেছে, আপনাদের শিশুদের কেন তারা দেখতে চাইছে, তা আমি এখনও জানি না। তাই আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। আমি মিস্টার জোন্সকে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই এগারোটি শিশু এবং তাদের মায়েদের

এই ভিলেজ সেন্টার হলে আগামী কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা করেন। জানি, এইভাবে নিজের বাড়ি ছেড়ে এখানে থাকতে আপনাদের অসুবিধে হবে। কিন্তু যদি আপনারা মানিয়ে নেন কয়েকদিনের জন্যে, তা হলে নিরাপদ থাকবেন। বন্যায় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষ প্রয়োজনে বাসস্থান ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নেয়, এ-ও তেমনই।"

সঙ্গে-সঙ্গে গুনগুনানি শুরু হয়ে গেল। অর্জুনের প্রস্তাব মায়েদের যে পছন্দ হচ্ছে না—তা স্পষ্ট। কেউ নিজের বাড়ির স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে এখানে চলে আসতে চাইছেন না। কিন্তু মিসেস বেনসন ওঁদের বোঝাতে লাগলেন। স্বামীরাও আলোচনায় যোগ দিলেন। শেষপর্যন্ত ঠিক হল, দিনসাতেক তাঁরা, অর্থাৎ শিশুদের নিয়ে মায়েরা এখানে থাকবেন। আর সেই সময় স্বামীরা পালা করে দিনরাত এই ভিলেজ সেন্টার পাহারা দেবেন।

মিস্টার জোন্সের কাছে বিদায় নিয়ে অর্জুন নিজের ঘরে উঠে এল। কাল রাত্রে সে ভাল করে দেখেনি, আজ জানলাটা নজরে এল। বেশ বড় জানলা। অনেকটা পাহাড় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সে জানলার কাছে সরে এসে পাল্লা খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল। অর্জুন দেখল জানলায় কোনও গ্রিল বা শিক নেই। কাঠও তেমন মজবুত নয়। বুদ্ধিমান আগন্তুকের কোনও অসুবিধে হবে না বাইরে থেকে এ-ঘরে ঢুকতে। মিস্টার জোন্সকে বলতে হবে মায়েরা যে ঘরে শিশুদের নিয়ে থাকবেন, সেটার জানলা পরীক্ষা করতে।

অর্জুন তার ডায়েরি বের করল। এখানে আসার পর যা-যা দেখেছে এবং শুনেছে তা পরপর লিখল। লেখার পর তার মনে হল, বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায় এনে একটু ঝুঁকি নেওয়া হয়েছে। যারা ওদের দেখতে চায়, তারা এখানে এলেই দেখতে পাবে একসঙ্গে। নইলে বাড়ি-বাড়ি ঘুরে খুঁজতে হত। বাইরের লোকের পক্ষে জানান না দিয়ে সেটা সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রামের লোক বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার পক্ষে খুবই সহজ কাজটা। আসলে বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে শিশুদের বাঁচাবার জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া। মুশকিল হল, ডেরেক ভাবতেই পারছে না এই গ্রামে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

এই সময় পল ঢুকল চা নিয়ে, "গুড আফ-আফ-আফটারনুন।"

"গুড আফটারনুন। আমি দুঃখিত, তোমার চাপ বাড়িয়ে দিলাম।"

পল হাসল, "না, না। চাপ কীসের! মিসেস বেন-বেন-বেনসন আরও দু'জনকে দিয়েছেন আমাকে সাহায্য করার জন্যে। কেমন লাগছে এখানে?"

"ভাল। খুব ভাল জায়গা। তোমরাও খুব ভাল।" চায়ের কাপ হাতে নিয়ে অর্জুন জানলায় গেল। নীচে রাস্তার একাংশ দেখা যাচ্ছে। দু'-একজন মানুষ যাতায়াত করছে। হঠাৎই অর্জুনের নজর পড়ল লোকটির ওপর। তার চিনতে ভুল হয়নি। গত রাতের দ্বিতীয় লোকটি। সে দ্রুত হাত নেড়ে পলকে ডাকল। পল কাছে আসতেই সে জিজ্ঞেস করল, "ওকে চেনো তুমি? কী নাম ওর?"

"ওঃ। ও হল এ-এ-এ-এড। আমাদের জামা-প্যান্ট সেলাই করে দেয়।"

"লোকটাকে দেখলে খুব ভাল মনে হয়?"

"মিস্টার জো-জো-জোন্স ওর ব্যাপারটা ভাল জানেন।"

চা খাওয়া হয়ে গেলে একটা পুলওভার আর মাফলার জড়িয়ে নীচে নামল অর্জুন। জিনিসপত্র নিয়ে মায়েদের আসা শুরু হয়েছে তখন। মিস্টার স্মিথ আর ডেরেক তাঁদের থাকার ব্যবস্থা তদারকি করছেন। ডেরেক তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, "আমি বুঝতে পারছি না অর্জুন, এটা আপনি কেন করলেন! এর ফলে আতঙ্ক আরও বাড়বে।"

"আতঙ্কিত মানুষেরা বেশি সজাগ হয়, তাই না?"

"আমি একমত নই।" মিস্টার জোন্স বললেন, "আপনাকে যখন ডেকে এনেছি তখন আপনার ওপর ভরসা রাখতেই হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা মিস্টার সোমকে চেয়েছিলাম, তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন।" ডেরেক গম্ভীর মুখে বলল।

"তা হলে আপনি আমার ফেরার ব্যবস্থা করে দিন।"

ডেরেক শক্ত মুখে বলল, "আমি যে সেটা করতে পারি না তা আপনি ভাল করে জানেন।"

"আপনি কি এখানে খুবই ব্যস্ত?"

"কেন?"

"একটু যদি আমায় সঙ্গ দিতেন?"

ডেরেক ফিরে গিয়ে, বোধ হয়, মিস্টার স্মিথের অনুমতি নিয়ে এল।

রাস্তায় বেরিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের জামাপ্যান্ট নিশ্চয়ই বাইরে থেকে কেনেন না। এখানে কি ফ্যাক্টরি আছে?"

"হ্যাঁ, আছে। ছ'জন কর্মী রোজ সেই কাজটা করে থাকেন।"

"আমি সেই ফ্যাক্টরিতে যেতে চাই।"

ডেরেক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"এমনি, ধরে নিন শুধুই কৌতূহল।"

ডেরেক কাঁধ নাচাল। পুরোটা পথ ওরা কেউ কথা বলল না। একতলা, বিশাল হলঘরের মতো একটা বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ডেরেক বলল, "এর কথা বলছিলাম।"

প্রথমেই একটা অফিসঘর গোছের। সেখানে একটি তরুণ খাতায় কিছু লিখছিল। ডেরেক বলল, "গ্রামের যারই জামাপ্যান্ট দরকার হয় এখানে এসে অর্ডার দেয়। প্রত্যেকের মাপ এখানে লেখা আছে। কারও মাপ পালটে গেলে নতুন করে মাপ দিতে হয়। প্যান্ট-শার্টের কাপড়ও এখানেই পছন্দ করে খদ্দেররা। মেয়েদের পোশাকের কারখানা আলাদা, আপনি কি সেখানেও যেতে চান?"

"আগে এই জায়গাটা দেখি।"

ডেরেক ছেলেটিকে বলতেই সে ওদের ভেতরে নিয়ে গেল। এলাহি ব্যবস্থা।

লম্বা টেবিলের ওপর সেলাইয়ের মেশিন রাখা আছে। তিনজন কর্মী এখনও কাজ করে চলেছেন। জোরালো আলো জ্বলছে। এই গ্রামের সমস্ত পুরুষের পোশাক সরবরাহ করতে এদের সারা বছরই কাজ করতে হয়।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি বলছিলেন ছ'জন কর্মী এখানে কাজ করেন?"

"হ্যাঁ।"

"এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে কে আছেন?"

"এড-এডওয়ার্ড!" ডেরেক ঘুরে দাঁড়িয়ে তরুণকে জিজ্ঞেস করল, "এড কোথায়?"

তরুণ জবাব দিল, "একটু আগে উনি বাড়ি চলে গেছেন।"

ডেরেক বলল, "আপনার যা জানার এদের কাছ থেকে জানতে পারেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে, চলুন।"

বাইরে বেরিয়ে এসে ডেরেক প্রশ্ন করল, "আমি বুঝতে পারছি না আপনার তদন্তের সঙ্গে আমাদের পোশাক তৈরির কারখানার কী সম্পর্ক থাকতে পারে?"

অর্জুন হাসল, "এমন তো হতে পারে আপনাদের শার্ট-প্যান্টের স্টাইল আমার এত ভাল লেগেছে যে, আপত্তি না থাকলে আমার জন্যে বানিয়ে নিতে চাই।"

ডেরেক মাথা নাড়ল, "আপনাকে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

তখন সন্ধে নামছিল। হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার এডওয়ার্ডের সেলাইয়ের হাত খুব ভাল, তাই না?"

"উঁহুঁ। এড ভাল কাটার। ও কেটে দেয়, সেলাই করে অন্যরা।"

"উনি এটা শিখলেন কী করে?"

"ওঁর বাবার কাছ থেকে।"

"মানুষটা কীরকম?"

"কেন বলুন তো?"

"এত ভাল কাজ জানেন অথচ এই গ্রামেই পড়ে আছেন। শিলিগুড়ি তো কোন ছার, কলকাতায় গেলে বড়-বড় দোকান ওঁকে লুফে নেবে।"

"আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমরা এই গ্রামের বাইরে যেতে ভালবাসি না। তবে এড একটু রগচটা মানুষ। ভিলেজ কমিটি ওকে একবার শাস্তি দেওয়ার কথা ভেবেছিল। ওর স্ত্রী ক্ষমা করে দেওয়ায় ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছে।"

"কী ব্যাপার?"

"স্ত্রীকে অযথা মারধোর করত। পান থেকে চুন খসলেই ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। স্ত্রী ওর কাছ থেকে চলে যেতে চায় বলে ভিলেজ কমিটির কাছে আবেদন করায় ও মারধোর করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত ভদ্রমহিলাই ক্ষমা করে দেন।"

"উনি কি এখন এডের সঙ্গেই আছেন?"

"না। ওরা আলাদা হয়ে গিয়েছে।"

"যদি ওর স্ত্রী ক্ষমা না করতেন তা হলে কী শাস্তি হত?"

"অপরাধের গুরুত্ব বুঝে। যেমন, প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় এমন কাজ ওকে কোনও পারিশ্রমিক ছাড়াই করতে হত পাঁচ বছর ধরে।"

"যদি এড সেটা মেনে না নেয়?"

"না নিয়ে উপায় নেই।"

"যদি এখান থেকে পালিয়ে যায়?"

"আজ পর্যন্ত তেমন ঘটনা ঘটেনি।"

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল, "ডেরেক, আজ পর্যন্ত তেমন ঘটনা ঘটেনি বলে আপনারা যদি ভেবে থাকেন কখনও ঘটবে না, তা হলে খুব ভুল করবেন। এই এড লোকটিকে দেখার ইচ্ছে হচ্ছে। ওর বাড়িতে যাওয়া যেতে পারে?"

ডেরেক মাথা নাড়ল। হাঁটতে-হাঁটতে বলল, "আমার মনে হচ্ছে আপনি তদন্ত করতে এসে অকারণে সময় নষ্ট করছেন। প্রায় একদিন হয়ে গেল কিন্তু আপনার কাজ একটুও এগোয়নি।"

অর্জুন হাসল, কিছু বলল না।

এডওয়ার্ডের বাড়িটির গায়ে অযত্নের ছাপ স্পষ্ট। রাস্তা থেকে নেমে বন্ধ দরজায় শব্দ করল ডেরেক। দ্বিতীয়বারে দরজা খুলল এড। চোখ-মুখে অবাক হওয়া স্পষ্ট।

"কী ব্যাপার ডেরেক?"

"ইনি অর্জুন, আমাদের অতিথি। আপনার কারখানায় গিয়েছিলেন। আমাদের জামাপ্যান্ট দেখে ওঁর খুব ইচ্ছে হয়েছে নিজের জন্যে কিছু তৈরির।" ডেরেক বলল।

এড বলল, "অনেক ধন্যবাদ আপনার ইচ্ছের জন্যে। তবে আমরা বাইরের লোকের জন্যে কিছু তৈরি করি না। অবশ্য ভিলেজ কমিটি যদি আদেশ দেয় তা হলে আপত্তি নেই।"

অর্জুন লক্ষ করল এড তাদের ভেতরে যেতে বলছে না। সে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আপনার পূর্বপুরুষরা কি একই কাজ করতেন?"

"হ্যাঁ। আমি যতদূর জানি ওঁরা একই প্রফেশনে ছিলেন।"

"ইংল্যান্ডে কোথায় আপনার বাড়ি ছিল?"

ডেরেক বাধা দিল, "সরি অর্জুন। আমরা ওই ইতিহাস মনে করতে চাই না।"

"তাই? কিন্তু এড, যদি আপনি সুযোগ পান ইংল্যান্ডে যাওয়ার, তা হলে কী করবেন?"

এড বলল, "আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

"এই ধরুন, আপনারা এখন এক্সপোর্ট করছেন। ধরা যাক, ভিলেজ কমিটি ঠিক করল এক্সপোর্টের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে আপনাকে ইউরোপে পাঠাবে। যাবেন?"

pathagar.net

"কমিটি আমাকে পাঠাবে না।"

"কেন?"

"কারণ ওই ব্যাপারটা আমি বুঝি না।"

"বেশ। হঠাৎ আপনি এক লক্ষ টাকা পেয়ে গেলেন। তখন কি যাবেন?"

"না। আমার পূর্বপুরুষেরা ঠিক করেছিলেন ও-দেশে তাঁরা ফিরে যাবেন না। সেই সিদ্ধান্ত আমাকে মেনে নিতে হবে।"

"কিন্তু আপনাদের পূর্বপুরুষদের অনেক সিদ্ধান্ত ভুল ছিল এটা প্রমাণিত হয়েছে।"

"আগে তাঁদের ভুলটা আমার ক্ষেত্রে প্রমাণিত হোক।"

"ও। আপনি তো একাই থাকেন। রাত্রে কী করেন?"

"বাড়িতেই থাকি।"

"গত রাত্রে কোথায় ছিলেন?"

"গত রাত্রে? ও, আমার এক বন্ধু খুব ধরেছিল তাই ওর সঙ্গে একটু পাবে গিয়েছিলাম।"

"পাব?"

"আমাদের এখানে পানীয় খাওয়ার একটা দোকান আছে। সবাই আড্ডা মারে সেখানে।"

"ও। আপনার বন্ধুর নাম কী?"

"চার্লস।"

"খাটাখাটুনির পর একটু আড্ডা মারা ভাল। আজ বের হবেন না?"

"না। আজ বাড়িতেই থাকব।"

"অনেক ধন্যবাদ। দেখুন যদি ভিলেজ কমিটি অনুমতি দেয় তা হলে আপনার তৈরি শার্ট-প্যান্ট নিয়ে যেতে পারব। আচ্ছা, ও দুটো তৈরি হতে কীরকম সময় লাগবে?"

"ঘণ্টাচারেক বড়জোর।" এড হাসল।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা ফিরে আসছিল। খানিকটা আসার পর নিরিবিলি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল অর্জুন, "ডেরেক, এই চার্লসকে আপনি কীরকম চেনেন? ওর সম্পর্কে সব তথ্য জানেন?"

"আমাদের গ্রামটা এত ছোট, সবাই সবার সম্পর্কে মোটামুটি জানে। চার্লসকে নিয়ে আপনি চিন্তিত হলেন কেন?"

"ওর সঙ্গে আমার আলাপ হওয়া দরকার।"

"দেখুন অর্জুন, হাতের সব আঙুল যেমন সমান হয় না, এই গ্রামের সব মানুষ তেমনই এক ধাতে গড়া নয়। চার্লস একটু কুটিল প্রকৃতির মানুষ। কারও ভাল সে সহ্য করে না। সবসময় মনে করে লোকে তাকে মর্যাদা দিচ্ছে না। এই ধরনের মানুষ নিজে যেমন সুখী হয় না তেমনই অন্যকেও সুখী করতে চায় না।" ডেরেক

বলল।

"স্বাভাবিক।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"কিন্তু পাহাড়ের আগুন অথবা বিদেশিদের সঙ্গে চার্লসের কোনও সম্পর্ক নেই।"

"তা তো হবেই। কারণ উনি তো কখনওই এই গ্রামের বাইরে যাননি, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"ডেরেক, আপনি এবার আপনার কাজে যেতে পারেন। আমি একটু একা ঘুরতে চাই। ডিনারের আগেই আমি ভিলেজ সেন্টারে ফিরে যাব।" অর্জুন বলল।

ডেরেক তাকাল। তারপর লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল।

দু' পকেটে হাত পুরে অর্জুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। গোটা পাঁচেক বাচ্চা ছেলে হইচই করতে-করতে ওপর থেকে নেমে আসছে। ওরা তাকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেল। ছেলেগুলোর হাতে বই। স্কুলের পড়ুয়া ওরা, সন্দেহ নেই। অর্জুন হেসে উঁচু গলায় বলল, "হ্যালো।"

পাঁচজনেই ঠোঁট নাড়ল, কিন্তু শব্দ শোনা গেল না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা সবাই কোন ক্লাসে পড়ো?"

পাঁচজন পরস্পরের দিকে তাকাল। শেষপর্যন্ত একজন বলল, "আমরা গ্রামার পড়ি, এসে লিখি এবং প্রাথমিক অঙ্ক করি।"

ছেলেটি বলামাত্র বাকিরা হইহই করে আগের মতো ছুটে নীচে নেমে গেল অর্জুনের পাশ দিয়ে। অর্জুনের ভাল লাগল। অর্থাৎ, এখানে ওয়ান টু করে ক্লাস সিস্টেম নেই। কিন্তু এই যে গ্রামার ওরা পড়ছে, পাচ্ছে কোথায়?

অর্জুন দেখল সন্ধে হয়ে গিয়েছে। ঝুপঝাপ করে নামছে অন্ধকার আর গ্রামের লাইট পোস্টের আলোগুলো জ্বলে উঠছে পরপর। সে পেছন ফিরল। হাঁটতে-হাঁটতে এডওয়ার্ডের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ও দাঁড়িয়ে গেল। এডওয়ার্ডের বাড়ির দরজা বন্ধ, যেমনটি আগে ছিল। লোকটা বলেছে আজ রাত্রে সে বাড়িতেই থাকবে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে নীচে নেমে এল। বাড়িটার গায়ে দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ রয়েছে, পাশাপাশি। সে গাছ দুটোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। চট করে বাইরে থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। অর্জুনের বিশ্বাস, আজ এডওয়ার্ডের কাছে সেই চার্লস লোকটা অবশ্যই আসবে। চার্লস কী বলে তা শোনা দরকার।

কিছুক্ষণ ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে থাকার পর অর্জুনের মনে হল, ঘরের ভেতরে কথা বললে সে বাইরে থেকে কিছুই শুনতে পাবে না। বাড়িটার ভেতরে আলো জ্বলছে, কিন্তু এডওয়ার্ড কোথায় আছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। সে ইউক্যালিপটাসের আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল। বাড়িটার পেছনে লম্বা কাঠের বারান্দা রয়েছে। অর্জুন সেই বারান্দায় উঠল। এদিকের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ।

কোনওভাবেই সেটা খোলা যাচ্ছে না।

এই সময় বাইরের দরজায় শব্দ হল। অর্জুন শুনতে পেল এডওয়ার্ড চিৎকার করল, "কে?" যে এসেছে সে জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বার শব্দ করল। অর্জুন বারান্দা থেকে নেমে বাড়িটার পাশ দিয়ে এগোল। ইতিমধ্যে দরজা খুলেছে এডওয়ার্ড।

"আরে তুমি! কী ব্যাপার?"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

"এসো। ভেতরে এসো।" বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হল। জানলার আলোয় ছায়া পড়ল। অর্জুন বুঝল ওরা পাশের ঘরে এসে বসল। আগন্তুক বলল, "এড, তুমি কি ইংল্যান্ডে যেতে চাও?"

"আবার এ-কথা কেন?" এড জিজ্ঞেস করল।

"তোমাকে মনঃস্থির করতে হবে। কারণ বাইরে থেকে কেউ একজন এসেছে যার কথামতো গ্রামের সমস্ত দু' বছরের বাচ্চাদের ওরা ভিলেজ সেন্টারে নিয়ে গিয়েছে। এতে অবশ্য আমাদের সুবিধে হল। তুমি আর আমি যদি হাত মেলাই তা হলে বাচ্চাটাকে পেতে অসুবিধে হবে না।"

এডের গলা শুনতে পেল অর্জুন, "চার্লস, তোমাকে আমি গতকালই বলেছি ও-ব্যাপারে আমার কোনও উৎসাহ নেই। তা হলে আবার এসব কথা কেন?"

চার্লস উত্তেজিত হল, "অদ্ভুত মানুষ তুমি! কোন আশায় এখানে পড়ে আছ, অ্যাঁ? তোমার সংসার বলে কিছু নেই। এ-গ্রামের মানুষদের জামাপ্যান্ট পরাতে-পরাতে একসময় মরে যেতে হবে। তোমার যা হাত, তাতে লন্ডনের যে-কোনও বড় দরজির দোকান তোমাকে লুফে নেবে। পায়ের ওপর পা তুলে বাকি জীবন থাকতে পারবে তুমি।"

এড তবু আপত্তি করল, "না ভাই, আমার ঠিক সাহস হচ্ছে না।"

"তার মানে তুমি আমার যাওয়া বন্ধ করতে চাও?"

"না তো! তুমি তোমার প্ল্যানমতো এগিয়ে যাও।"

"আমার প্ল্যানমতো এগোতে গেলে তোমাকে সঙ্গে রাখা দরকার।"

"কেন?"

"সব কিছু ম্যানেজ করে আমি না হয় ইংল্যান্ডে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে আমি কী করব? আমি যা কাজ করি তা ওখানে মূল্যহীন। বেকার হয়ে তো থাকা যাবে না। খাব কী? তুমি থাকলে আমরা একটা দরজির দোকান খুলতে পারি। কাজ শিখে নিয়ে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। বুঝতে পারছ?"

"পারছি। কিন্তু ধরা পড়লে কী দুর্দশা হবে ভেবে দেখেছ?"

"কী আর হবে? এরা আমাদের তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে। জোন্সবুড়ো নিশ্চয়ই থানা-পুলিশ করবে না। বাইরের যে ছোকরাকে ওরা ডেকে এনেছে সে তো পুলিশ নয়।"

"চার্লস।"

"হ্যাঁ।"

"সেই ছোকরা আমার কাছে এসেছিল।"

"তোমার কাছে? কখন?"

"তুমি আসার একটু আগে। ডেরেক নিয়ে এসেছিল ওকে।"

"সে কী! তোমার কাছে কেন এল?"

"জানি না। বলল তো পোশাক করাতে চায় কিন্তু ওর কথাবার্তা অন্যরকম।"

"কী বলেছে তোমাকে?"

"গত রাত্রে আমি কোথায় ছিলাম, কার সঙ্গে ছিলাম, এইসব জিজ্ঞেস করছিল।"

"তাই নাকি? কী বললে?"

"বললাম, পাবে আড্ডা মারতে গিয়েছিলাম। তারপর তোমার সঙ্গে বেরিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। আমাকে কেন এসব জিজ্ঞেস করল?"

"হয়তো, এমনি, কৌতূহলে। কিন্তু তুমি আমার নাম বলে দিলে?"

"আহা, আমরা তো একসঙ্গে পাব থেকে বেরিয়েছিলাম। কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই আমাদের দেখেছে। খোঁজ করলে জানবে আমি মিথ্যে বলিনি।"

"বুঝতে পেরেছি। ওই ছোকরা এসেছিল বলে তুমি ভয় পেয়ে গেছ। আরে এত নার্ভাস হলে চলে? আমার কথা মন দিয়ে শোনো। আগামী রবিবার ওরা যখন আমাদের গ্রামে আসবে তখন আমরা ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকব। বুঝতে পারছি এরা বাচ্চাদের সামনে বের করবে না। সেরকম হলে আমি পাকদণ্ডী দিয়ে ফেরার পথে ওদের সঙ্গে দেখা করব। ঠিক কোন বাচ্চাটাকে ওরা চায় জেনে নেব। এর মধ্যে তুমি পলের সঙ্গে ভাব জমাও।"

"পল!"

"হ্যাঁ। তোতলাটার সঙ্গে তোমার তো সম্পর্ক ভাল। মিসেস বেনসনের মেয়ের সঙ্গে ও বন্ধুত্ব করতে চায়, যেটা ভদ্রমহিলা একদম পছন্দ করেন না। মেয়েটিও পলকে অপছন্দ করে। তুমি এই বিষয়ে সহানুভূতি দেখাও, যাতে পল তোমাকে নিজের লোক মনে করে। আর ওকে হাত করতে পারলে ভিলেজ সেন্টারের যে-কোনও বাচ্চাকে বের করে আনতে অসুবিধে হবে না।"

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। কোনওমতে নিজেকে আড়ালে নিয়ে গেল অর্জুন। বড়-বড় পা ফেলে চলে গেল চার্লস। এড দরজাটা বন্ধ করে দিল।

এগারোটা বাচ্চা কিছুতেই ঘুমোতে চাইছে না। তাদের মায়েরা খুবই বিব্রত। বড় হলঘরে এগারোটি সুন্দর বিছানা করা হয়েছে। এরই মধ্যে নীচের ঘরে বাচ্চাদের বাবারা পাহারা দিতে চলে এসেছেন পালা করে। বাড়িতে ঢোকার সময় তাঁরা অর্জুনকে যাচাই করে দরজা খুলেছেন। নিজের ঘরে ঢোকার সময় অর্জুন

শুনতে পেল, হলঘর থেকে গান ভেসে আসছে। কোনও এক মা ইংরেজিতে ঘুমপাড়ানি গান গাইছেন। পৃথিবীর সমস্ত শিশুদের জন্যে তাদের মায়েরা মোটামুটি একই সুরে গান গেয়ে থাকেন।

ডিনার নিয়ে এল পল। ভাবগতিক দেখে মনে হল, সে খুবই ব্যস্ত। বলল, "আজকালকার বা-বা-বাচ্চারা ঘুমোতে চা-চা-চায় না কেন বলো তো?"

অর্জুন খাওয়া শুরু করল, "আমি জানি না।"

পল চলে যাচ্ছিল, অর্জুন তাকে ডাকল, "তোমার কি খুব জরুরি কাজ আছে?"

"তা নেই, তবে, মিসেস বেনসনের মেয়ে এ-এ-এলি তো এসব কাজ কখনও করেনি।"

"ওহো, এলি বুঝি তোমাকে সাহায্য করছে?"

"হ্যাঁ। কি-কি-কিন্তু তুমি কি ওকে চেনো?"

"একটুও না। তবে তুমি যে ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাও এবং মিসেস বেনসন সেটা পছন্দ করেন না, তা জানি। কী, ঠিক তো?"

পল অবাক হয়ে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"আচ্ছা পল, কেউ যদি তোমাকে প্রস্তাব দেয় ওই বন্ধুত্বটা করিয়ে দেবে কিন্তু তার বদলে ও যা বলবে তাই করতে হবে, তা হলে তুমি কি রাজি হবে?"

"কী করতে হবে?"

"এই ধরো, মাঝরাত্রে ভিলেজ সেন্টারে ঢোকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে, অথবা এগারোটা বাচ্চার একটাকে গোপনে বের করে তার হাতে তুলে দিতে হবে।"

"নো। নেভার।" প্রায় চিৎকার করে উঠল পল, "যে এই কথা বলতে আসবে তা-তা-তাকে মেরে ফেলব আমি।"

অর্জুন বলল, "শুনে খুব খুশি হলাম পল। তোমার খুব ভাল হবে।"

পল দাঁড়াল না। ঝড়ের মতো চলে গেল ঘর ছেড়ে।

আজকের রাতের আকাশ পরিষ্কার। ফলে ঠাণ্ডা পড়েছে জাঁকিয়ে। রাতের খাওয়া শেষ করে নীচে নেমে এল অর্জুন। চারটে চেয়ারে চারজন পুরুষ বসে গল্প করছিল। বাচ্চাদের বাবারা পালা করে পাহারা দিচ্ছেন, এঁরা প্রথম দল। অর্জুনকে দেখামাত্র চারজন উঠে দাঁড়ালেন।

অর্জুন বলল, "আমি আপনাদের কয়েকদিন কষ্ট দিচ্ছি বলে দুঃখিত।"

ওঁরা মাথা নেড়ে না বলে হাসলেন। অর্জুন ওঁদের অনুমতি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

আজ সত্যি ছবির মতো দেখাচ্ছে গ্রামটাকে। রাস্তায় অবশ্য লোকজন নেই। হয়তো আগন্তুকদের কারণে যে ভীতি ছড়িয়েছে তা বড়দেরও আক্রমণ করেছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আজ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল অর্জুন। হাঁটতে-হাঁটতে অনেকটা আসার পর সে বাড়িটাকে চিনতে পারল। ডেরেকের কাকার বাড়ি।

বাড়িটা এখন অন্ধকার। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ওঁর তোলা ছবির বাক্স থেকে নেগেটিভ এবং বিশেষ একটা ছবি চুরি গেল কী করে?

অর্জুন দাঁড়াল না। হাঁটতে-হাঁটতে সে পাহাড়ে উঠতে লাগল। চাঁদের আলো থাকায় পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সে পোড়া জায়গাটায় পৌঁছে গেল। একটু খুঁজতেই সেই পাথরটা পেয়ে গেল, যার গায়ে ঘষটানো দাগ আর কাদার চিহ্ন রয়েছে। দাগটা গিয়েছে ওপর থেকে নিচু পর্যন্ত। অর্থাৎ কোনও ভারী বস্তু ওই পাথরে ধাক্কা খেয়ে নীচে পড়েছে অথবা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু নীচে গভীর খাদ এবং জঙ্গল। অর্জুন খানিকটা নেমে দেখল গাছ থেকে উঠে আসা একটা বড় গাছের ডাল ভেঙে ঝুলছে। অর্থাৎ ভারী বস্তুটি ওখান দিয়েই নীচে পড়েছে।

এখন এই রাত্রে নীচে নামা অসম্ভব! এই জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নিশ্চয়ই রয়েছে। তা ছাড়া নামার রাস্তা করে নেওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। কিন্তু ছবিতে যেটাকে বিশাল ডিমের মতো মনে হচ্ছিল এবং যেটি অদৃশ্য হয়েছে সেটি যদি ওই ভারী বস্তু হয় তা হলে কে সেটাকে সরাল? তার কী স্বার্থ! ঘষটানোর দাগটা দেখে বোঝা যায় প্রচুর শক্তি না থাকলে ওই বস্তুটিকে গাছ থেকে তুলে নিয়ে এসে ওখান দিয়ে ফেলা যেত না।

হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল ঘড়িটার কথা। আসার আগে অমলদা এটার ক্রিয়াকর্ম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে ঘড়ির ঢাকনাটাকে খুলে বোতাম টিপতেই সরু টর্চের আলোর মতো একটা উজ্জ্বল রেখা বেরিয়ে এল। খাদের দিকে সেটা ধরতে রেখাটা নীচে নেমে যেতে লাগল। যত নামছে তত স্পষ্ট হচ্ছে জায়গাটা। যেসব গাছের ডালপাতা ওর যাওয়ার পথে পড়ছিল সেগুলো মুহূর্তেই শুকনো হয়ে সরে যাচ্ছিল দু'পাশে। ওই আলোর রেখা পাথর অথবা মাটি ছাড়া যে-কোনও শক্ত বস্তুকে ভেদ করতে সক্ষম। ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে অর্জুন রেখাটাকে নিয়ে যেতে পারল সেই ডিমের আকারের বস্তুটির গায়ে। স্পর্শ লাগতেই মনে হল শক্ত বস্তুটির একাংশে চিড় ধরল। আর তখনই মাথার ওপরে গুম-গুম শব্দ বাজল। অর্জুন দ্রুত চাবি ঘুরিয়ে আলোর রেখা নিভিয়ে দিয়ে পাহাড়ের খাঁজে সরে এল। আর এই তাড়াহুড়োতে ঘড়ির ঢাকনাটা বন্ধ করতে ভুলে গেল সে।

আওয়াজটা যে কোনও যন্ত্রের, তা বোঝা যাচ্ছে। একসময় আওয়াজটা থেমে গেল। এই গভীর জঙ্গলে ডেরেকদের গ্রাম থেকে কেউ এত রাত্রে নিশ্চয়ই কোনও যন্ত্র নিয়ে বেড়াতে আসবে না। আর তখনই চারপাশ আলোকিত হয়ে গেল। কাছাকাছি কোথাও আগুন জ্বলছে। পুড়ে যাচ্ছে গাছপালা। শব্দ হচ্ছে পোড়ার। হঠাৎই অর্জুন ওদের দেখতে পেল। তরতর করে নেমে আসছে চারটে মূর্তি। আকৃতি বেশ ছোট। এখন আগুনের কল্যাণে চারপাশ দিনের মতো স্পষ্ট কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের মুখ-চোখ ভাল করে দেখতে পেল না সে। অতি দ্রুত ওরা নেমে গেল খাদের মধ্যে। যেন ওই পথ ওদের খুব চেনা।

অর্জুন একবার ভাবল ওদের অনুসরণ করবে। কিন্তু সেটা একটু দুঃসাহসিক হয়ে যাবে। বরং অপেক্ষা করাই ভাল। ওদের উঠে আসতে হবে এই পথ দিয়ে। তারপরই মনে হল ওপরে গিয়ে দেখলে কেমন হয়? এই লোকগুলোর আসার সঙ্গে শব্দটার যোগাযোগ আছে। অর্জুন সন্তর্পণে বেরিয়ে এল। সঙ্গে-সঙ্গে সে আগুনের শিখা দেখতে পেল। হু-হু করে জ্বলছে জঙ্গল। ডেরেকরা ওদের গ্রাম থেকে এই আগুন দেখতে পায়। আর একটু এগোলে নিজেকে আড়াল করার কোনও সুযোগ থাকবে না। চারজন নীচে গিয়েছে, ওপরে কতজন রয়েছে কে জানে। এবং ওরা নিছক চড়ুইভাতি করতে রাতদুপুরে এখানে আসেনি।

হঠাৎ নীচে একটা চিৎকার শোনা গেল। অর্জুন দ্রুত সরতে যেতেই তার পা পিছলে গেল। সরসর করে অনেকটা নীচে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল তার শরীরটা। পড়ার সময় কাঁটাজাতীয় কিছু ফুটে গেল হাতে, কাঁধে। প্রচণ্ড যন্ত্রণা সত্ত্বেও সে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইল। তার পড়ার সময় শব্দ হয়েছে। অবশ্য আগুনে গাছ পোড়ার আওয়াজ ছাপিয়ে সেই শব্দ কারও কানে গিয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ সেই শব্দটা বাজল। তারপর ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেল সেটা। অর্জুন মাথা তুলল। শরীরটাকে সোজা করা যাবে না। পায়ের সামান্য চাপেই নুড়ি গড়িয়ে পড়ছে। সে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে ওপরে উঠতে যেতেই পায়ের তলার পাথর সরে গেল। সরসরিয়ে নেমে যাচ্ছিল সে। প্রচণ্ড আঘাত লাগছে পাথরে। শেষপর্যন্ত দু' হাতে একটা পাথর আঁকড়ে ধরে নিজেকে সামলাতে পারল সে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওপরদিকে তাকিয়ে মনে হল আগুন অনেক কম এখন। অথবা যেখানে আগুন জ্বলছিল সেখান থেকে অনেক নীচে নেমে এসেছে সে। সমস্ত শরীর জ্বলছে। রক্ত বেরিয়ে গেছে কোথাও-কোথাও। সে ঘড়িটার দিকে তাকাল। ঢাকনাটা নেই। এটা কী করে হল? ঢাকনাটা বন্ধ থাকলে সেটা না ভাঙার কথা। তা হলে কি কোনও কারণে ওটা খুলে গিয়েছিল? ও বোতামটা টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে আলোর রেখা বেরিয়ে এল। না, এখনও এটা ঠিক রয়েছে। হাত থেকে খুলে ঘড়িটাকে পকেটে রাখল অর্জুন।

এখন মনে হচ্ছে, তখন ওই আড়াল থেকে না বেরিয়ে এলেই ভাল হত। এই দুর্ঘটনায় সে না পারল লোকগুলোকে দেখতে, না ওই আওয়াজটা কীসের তা বুঝতে। এখন ওপরে উঠতে হবে। হঠাৎ খেয়াল হল লোকগুলো খাদে নেমেছিল। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে খাদের নীচটা বেশি দূরে নয়।

ধীরে-ধীরে নীচে নামতে লাগল অর্জুন। গাছের ঘন ছায়ায় ঝোপঝাড় ক্রমশ অন্ধকার টেনে আনছিল। অর্জুন পকেট থেকে ঘড়িটা বের করল। মাটির দিকে সেটার মুখ করে সুইচ টিপতেই আলোর রেখা বের হল। কিন্তু যেখানেই আলো পড়ছে সেই জায়গাটা ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ছে টুকরো-টুকরো হয়ে। এতে অবশ্য যথেষ্ট আলো পাওয়া যাচ্ছে নীচের দিকে যাওয়ার জন্যে। হঠাৎ কিছু একটু শব্দ

করতেই অর্জুনের হাত সেদিকে ঘুরল। একটা মোটা কালো সাপ ফণা তুলতেই আলোর রেখা ওর শরীরে পড়ল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল সাপটা গলে মাটিতে পড়ে গেল নিঃসাড়ে।

অনেকটা নামার পর মাটি যখন প্রায় সমতল তখন অর্জুন চারপাশে খুঁজল। সেই ডিম্বাকৃতি বস্তুটি কোথায় পড়েছে তা হাজার খুঁজেও বের করতে পারত না সে এই ঘন জঙ্গলের অন্ধকারে। যদি অমল সোম এই ঘড়িটা না দিতেন? এগোতে-এগোতে একসময় সে দাঁড়িয়ে গেল। বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছে সে। আলোর রেখা সচেতনভাবে বস্তুটির ওপর না ফেলে সে কাছে পৌঁছে গেল কোনওমতে। গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়ল।

ডিম্বাকৃতি বলে যাকে মনে হয়েছিল ছবি দেখে, সামনাসামনি অর্জুন বুঝতে পারল অমল সোমের ভুল হয়নি। কিন্তু এ কেমন ডিম? এত বড় এবং এত শক্ত খোলস? বস্তুটির একপাশে চিড় ধরছে। সম্ভবত তার ভেতর দিয়ে ভেতরে হাওয়া ঢুকছে। সেই হাওয়ার স্পর্শ পেয়ে ভেতরে ঘুমন্ত কিছু এখন নড়তে শুরু করেছে। এটা বোঝা যাচ্ছে বস্তুটি এক জায়গায় স্থির হয়ে নেই বলে। ওর ভেতরে একটা কিছু মোচড় না দিলে এভাবে নড়তে পারে না। অর্জুন অনেক চেষ্টা করেও ভেতরটা দেখতে পেল না।

লোকগুলো কি এখানে এসে এই নড়াচড়া দেখে ভয়ে চিৎকার করেছিল? ওর খুব লোভ হচ্ছিল বস্তুটির ওপর আলোর রেখাটাকে রাখতে। একটু বেশি সময় রাখলে হয়তো ওর শক্ত খোলস ফেটে যাবে এবং ভেতরে কী আছে তা দেখা যাবে। কিন্তু উলটোটা যদি হয়? যদি বস্তুটি টুকরো-টুকরো হয়ে যায়? তা হলে ভেতরে যা আছে তা রক্ষা পাবে না।

অর্জুন ঠিক করল, কোনও ঝুঁকি নেবে না। হয়তো কোনও বিস্ময়কর প্রাণী ভ্রূণ অবস্থায় রয়েছে এই বিশাল ডিম্বাকৃতি বস্তুতে। বরং কাল সকালে গ্রাম থেকে ডেরেকদের নিয়ে এখানে চলে আসবে। চেষ্টাচরিত্র করে এটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যে, চব্বিশ ঘণ্টা নজরে রাখা যায়।

চারপাশে মোটামুটি নজর বুলিয়ে জায়গাটাকে বুঝে নিয়ে সে আবার ওপরে উঠতে লাগল। সমস্ত শরীরে ব্যথা ; কেটে যাওয়া শরীরে তীব্র জ্বলুনি। ওপরে উঠতে কাহিল হয়ে পড়ছিল সে। তারপর একসময় আগুনের আঁচ দেখতে পেয়ে বুকে উৎসাহ এল। সে পৌঁছে গিয়েছে।

অর্জুন যখন ওপরে এসে গেল, আগুন অনেক কমে এসেছে। হঠাৎ তার কানে একটা আলতো শব্দ বাজতেই সে মুখ ফিরিয়ে উৎসটা খুঁজতে চেষ্টা করল। এবং তখনই ডেরেকের কাকাকে দেখতে পেল।

ভদ্রলোক ছবি তুলছেন। ওঁর মুখ-চোখে উত্তেজনা, পরপর ছবি তুলতে-তুলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। বিস্মিত হয়ে ক্যামেরাটা দেখলেন। রাগ এবং পরে আফসোস ছড়িয়ে পড়ল মুখে। অর্জুন বুঝতে পারল ভদ্রলোকের ক্যামেরার ফিল্ম

শেষ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আগুন জ্বলার সময় ডেরেকদের গ্রামের লোক এখানে আসে না। অবশ্যই একটা না-জানা-আতঙ্ক ওদের দূরে সরিয়ে রাখে। পরদিন, আলো নিভে গেলে কেউ-কেউ এসে উঁকিঝুঁকি মেরে যায়। এই বৃদ্ধ যেমন ছবি তুলেছিলেন। তা হলে ইনি এই সময় কী করে চলে এলেন? অর্জুন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধ অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ অর্জুনকে দেখে ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আগুনের ছবি তুললেন?"

"অ্যাঁ। ও, হ্যাঁ। কিন্তু আর ফিল্ম নেই। উঃ, কী দারুণ দৃশ্য, ওই ছবিটা তোলা হল না।" বৃদ্ধ হাত বাড়িয়ে দেখালেন। একটা গাছের ডাল আগুনসমেত নীচে ঝরে পড়ল।

"আপনি একা-একাই চলে এলেন?"

"অ্যাঁ। না তো।" বৃদ্ধ চারপাশে তাকালেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি বললেন, "হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে মনে হল কেউ যেন আমার ডার্করুমে ঢুকে কিছু করছে। ওখানে আমি কাউকে যেতে দিই না। বিছানা থেকে উঠে ক্যামেরাটা নিয়ে এগোতেই একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখলাম। বাড়ির পেছনের দরজা খুলে। লোকটাকে দেখব বলে ওর পেছন-পেছন হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎই এই আগুন চোখে পড়ল। মনে হচ্ছিল লোকটাও এইদিকে আসছে। কিন্তু কোথায় হারিয়ে গেল সে।" বৃদ্ধ চারপাশে আবার খুঁজতে লাগলেন।

"আপনি কি এখন গ্রামে ফিরে যাবেন?"

"অ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এখানে থেকে আর কী হবে!" ছবি না তুলতে পারার হতাশা ওঁর গলায় স্পষ্ট। ওরা ধীরে-ধীরে নেমে আসতে-আসতে দেখল আগুন নিভে আসছে।

গ্রামের কাছে এসে ওরা দৃশ্যটা দেখতে পেল। প্রচুর লোক জড়ো হয়ে গেছে রাস্তায়। কিন্তু কেউ কথা বলছে না। সবাই তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে, যেখানে একটু আগে আগুন জ্বলছিল। হঠাৎ কেউ ওদের দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে জনতা সরে এল তাদের দিকে। মূলত বৃদ্ধকেই প্রশ্ন করতে লাগল তারা। কোন সাহসে বৃদ্ধ ওই আগুনের কাছে গিয়েছিল? ছবি তোলার নেশায় নির্ঘাত একদিন মারা পড়বেন তিনি। কেউ-কেউ প্রশ্ন করতে লাগল, সেখানে গিয়ে কী দেখেছেন? ভৌতিক কিছু নজরে পড়েছে কিনা!

বৃদ্ধ উত্তেজিত হয়ে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন ফিল্ম শেষ হয়ে যাওয়ায় কী মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ওরা শুনতে চাইছে ভৌতিক দৃশ্যের বর্ণনা, ফিল্ম সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই। অর্জুন চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে এল ভিলেজ সেন্টারে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বিস্তর শব্দ এবং ডাকাডাকি করার পর পাহারাদাররা দরজা খুলল। একজন আতঙ্কিত গলায় বলল, "ওঃ, আপনি!

পাহাড়ে আবার আগুন জ্বলেছে। আপনার জন্যে খুব চিন্তা হচ্ছিল। ভুল করে ওদিকে যাননি তো?"

"কেন?"

"হয়তো, হয়তো।" লোকটার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

"আমি তো বেঁচেই আছি।" অর্জুন হাসল।

"না। মানে, শুনেছি, ঘোস্ট মানুষের শরীরে ঢুকে চুপচাপ চলে আসে।"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে দোতলার ঘরের দিকে এগোল। কুসংস্কার বড় মারাত্মক জিনিস। বাইরের পৃথিবীতেও সেটা যেমন প্রবল, এখানে, এই বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা মানুষেরাও তা থেকে মুক্ত নয়।

সকালে ঘুম ভাঙল বেশ দেরিতে। ভাঙামাত্র মনে হল আজ বিছানা থেকে নামতে পারবে না। সর্বাঙ্গে ব্যথা, শরীর আরাম চাইছে। সে কোনওমতে টয়লেটে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই দরজায় টোকা পড়ল। অর্জুন দরজা খুলতেই দেখতে পেল ডেরেককে।

"গুডমর্নিং। শরীর ঠিক আছে তো?"

"গুডমর্নিং। হঠাৎ শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছেন?"

"গতকালের তুলনায় আজকে আপনি অনেক দেরিতে ঘুম থেকে উঠলেন। এ কী! এসব কী হয়েছে? দেখি, দেখি। আরে, আপনি দেখছি কাল আহত হয়েছিলেন। কী ব্যাপার?"

"সব বলছি। সমস্যা হল, আমার সঙ্গে কোনও ওষুধ নেই। কেটে-ছড়ে গেলে, পড়ে গিয়ে শরীরে ব্যথা হলে আপনারা কী করেন?"

"ওষুধ খাই। গাছগাছড়ার পাতা, শেকড় থেকে ওষুধ বানানো হয়। এ ছাড়া শিলিগুড়ির একজন ডাক্তার প্রাথমিক চিকিৎসার জন্যে সবরকমের ওষুধ লিখে দিয়েছিলেন। তাও আছে। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।" ডেরেক বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ফিরে এল মিনিট তিনেকের মধ্যে, "এখনই নিয়ে আসছে। ছড়ে যাওয়া ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে। রক্ত পড়েছিল বোঝা যাচ্ছে। আর কি অসুবিধে হচ্ছে?"

"পড়ে গিয়েছিলাম। অনেকখানি। পায়ে এবং কোমরে বেশ ব্যথা।"

"ভাঙেনি তো?"

"না, না। ভাঙলে এতটা পথ ফিরতে পারতাম না, আর এভাবে দাঁড়াতেও না।"

অর্জুন বসল। সেই সময় পল এল চায়ের কাপ নিয়ে। কোনও কথা না বলে সেটা টেবিলে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন ডাকল, "গুডমর্নিং, পল।"

পল দাঁড়াল, "গুডমর্নিং স্যার।" তারপর চলে গেল।

ডেরেক বলল, "আমি শুনেছি আপনি কাল রাত্রে বেরিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ। ওই পাহাড়ে গিয়েছিলাম, যেখানে আগুন জ্বলেছিল।"

"আপনার সঙ্গে কাকাও গিয়েছিলেন?"

"না। আমি গিয়েছিলাম আগুন জ্বলবার আগে। উনি গিয়েছিলেন আগুন জ্বলতে দেখে, ছবি তোলার লোভে। আমরা একসঙ্গে ফিরে এসেছিলাম।"

"কাকার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়নি। বুড়োমানুষ, এখনও ঘুমোচ্ছেন। কীভাবে আগুন জ্বলে উঠল বলুন তো?" ডেরেক জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক কীভাবে জ্বলেছিল আমি দেখার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আমি নিশ্চিত, ওখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে। যারা জ্বালিয়েছে তারা বাইরের লোক।"

"বাইরের লোক? তাদের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ওখানে আগুন জ্বালার?"

"এখনও জানি না।"

এই সময় একটি মানুষ দরজায় এসে দাঁড়াতেই ডেরেক তাঁকে বলল, "আসুন, আসুন। ইনি অর্জুন, আমাদের অতিথি। গতকাল ইনি পাহাড়ে পড়ে গিয়ে একটু আহত হয়েছেন।"

ভদ্রলোক বয়স্ক। প্রথমে তিনি অর্জুনের নাড়ি দেখে মাথা নাড়লেন। তারপর শুকিয়ে যাওয়া দাগগুলো দেখলেন। অর্জুন দেখল ভদ্রলোক ব্যাগ খুলে একটি শিশি থেকে তরল দ্রব্য তুলোয় নিয়ে তার আঁচড়ে যাওয়া চামড়ায় বোলাতে লাগলেন। চিনচিনে ভাবটা সামলে নিল। তারপর চায়ের কাপের দিকে ভদ্রলোক তাকালেন, "আপনি চা খেয়ে নিন। খাওয়ার আধঘণ্টা বাদে ওই পুরিয়াটা খেয়ে নেবেন। এতে যদি ব্যথা না কমে তা হলে এই ট্যাবলেটটা খাবেন। এটা বোধ হয় আপনার চেনা ট্যাবলেট।"

ব্যাগ গুছিয়ে তিনি ডেরেককে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই।"

ডেরেক বলল, "অনেক ধন্যবাদ।"

ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ইনি কি ডাক্তার?"

ডেরেক বলল, "আপনারা যে ডিগ্রি থাকলে কাউকে ডাক্তার বলেন সেটা যে ওঁর নেই, বা থাকতে পারে না, সেটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন। আমাদের পূর্বপুরুষেরা যখন প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টা করছিলেন তখন নিজেদের গরজেই তাঁরা প্রকৃতি থেকে আত্মরক্ষার অস্ত্র খুঁজে নিয়েছিলেন। প্রতিটি প্রজন্ম সেই বিদ্যেটাকে আরও বাড়িয়েছে। গত তিন পুরুষ ধরে এঁরাই আমাদের গ্রামের মানুষের অসুখ-বিসুখে ওষুধ দেন। এখানে হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মরে যাওয়া ছাড়া তেমন কোনও বড় অসুখ এখনও কারও হয়নি। আপনি শুনলে অবাক হবেন, ইনি অপারেশন পর্যন্ত করতে পারেন। তবে সেগুলো খুবই সাধারণ কেস।"

"বড় কেস হলে?"

"এখন আমরা নর্থবেঙ্গল হসপিটালে নিয়ে যাই রুগিকে।"

চা খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুন বলল, "এখন অনেকটা ভাল লাগছে। ডেরেক, আপনি চারজন শক্তিশালী লোককে সঙ্গে নিন। আমাদের একবার পাহাড়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

"যাওয়ার সময় বলব। আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, আমি ঠিকই আছি।"

"পাহাড়ে বলতে?"

"যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছে, তার নীচে। সঙ্গে বেশ শক্ত লম্বা দড়ি নেবেন।"

"কী ব্যাপার?"

"একটা খুব বড় রহস্য পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে আমরা ওখানে গেলে।"

ডেরেক চলে গেলে অর্জুন ঘড়িটা বের করল। গত রাতে এই জিনিসটা তার প্রাণরক্ষা করেছে। একটা নিরীহ ঘড়ি যে অমন মারাত্মক অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে তা কে জানত! অমল সোমই এর রহস্য তার কাছে আগে কখনও ফাঁস করেননি।

বেরনোর আগে কাগজের মোড়ক খুলে পুরিয়াটাকে দেখল সে। শুকনো ছালের গুঁড়ো। এখন সামান্য অসুখ করলেই শহরের মানুষ অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে নেয়। কবিরাজি ওষুধের চল খুবই কমে গেছে। হয়তো তেমন উপকার পায় না বলেই মানুষের ভরসা কম। নেহাত কৌতূহলেই অর্জুন ওটাকে মুখে ঢেলে দিল। কিন্তু সঙ্গে পরিচিত ব্যথা কমানোর ট্যাবলেটটা নিতে ভুলল না। গত রাত্রে যেটা বোঝা যায়নি, এখন পা ফেলতে ব্যথাটা বেশ জানান দিচ্ছে। একটু-একটু করে নীচে নেমে এল সে।

হলঘরে বাচ্চারা ছুটোছুটি করছে। কেউ-কেউ বায়না ধরছে বাইরে যাওয়ার জন্যে। মিসেস বেনসন ওদের জন্যে প্রচুর খেলনা নিয়ে এসেছেন। বাচ্চাগুলোর কেউ-কেউ তাই নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু ব্যতিক্রম একজন। মায়ের কোল ঘেঁষে বসে গম্ভীর মুখে সে সমবয়সীদের দেখছে। সেই মুখের অভিব্যক্তি বলছে, কী ছেলেমানুষ এরা!

অর্জুন তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "হ্যালো।"

বাচ্চাটা মুখ ফেরাল। স্পষ্ট চোখে তাকাল। ওর মা বললেন, "বলো, হ্যালো।"

বাচ্চাটা নীরবে ঘাড় নেড়ে না বলল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওর নাম কী, বব? রবার্ট?" অর্জুন আবার বলল, "হ্যালো বব। তোমার খেলতে ইচ্ছে করছে না?"

বব এবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে আধোগলায় জিজ্ঞেস করল, "হু ইজ হি?"

"হি ইজ আওয়ার ফ্রেন্ড।"

"ফ্রেন্ড?"

"ইয়েস। হি ওয়ান্টস টু হেল্প আস।"

"হোয়াই?"

ওর মা হেসে উঠলেন। অর্জুন থতমত হয়ে গেল। ওইটুকুনি বাচ্চা কী দারুণ বুদ্ধিমানের মতো প্রশ্ন করল। সে নিশ্চয়ই বন্ধুর মতো স্বার্থহীন হয়ে সাহায্য করতে এখানে আসেনি। অমল সোম দক্ষিণার কথা বলেছেন, নেবেনও, যদি ইচ্ছে হয়।

কিন্তু ওর মা যতই বন্ধু বলুন, ওই বাচ্চাটার প্রশ্নের কী জবাব সে দেবে?

অর্জুন বাচ্চাটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই সে বিরক্ত হয়ে মাথা সরাল। দরজার দিকে যেতে-যেতে অর্জুনের মনে হল, এই বাচ্চাটা সবার চেয়ে আলাদা। এই দু' বছর বয়সে ও যেন গভীর জ্ঞান নিয়ে পৃথিবীকে দেখছে। আচ্ছা, এই বাচ্চাটাই ওই বাইরে থেকে আসা মানুষদের লক্ষ্য নয় তো?

বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে ডেরেককে দেখতে পেল। সঙ্গে দড়ি হাতে তিনজন বেশ স্বাস্থ্যবান যুবক। ডেরেক বলল, "আমরা তৈরি।"

"পাঁচজন হচ্ছি। আর একজন হলে ভাল হত। আপনি চার্লসকে নিতে পারেন?"

"চার্লস? কোন চার্লস?"

"আপনাদের দরজি এডের বন্ধু।"

"ওঃ। এই নামটা আপনি সবে গতকাল শুনেছেন। ঠিক আছে। চলুন, যাওয়ার পথে চার্লসের বাড়ি পড়বে। ওকে বলছি।"

ওরা রওনা হল। হাঁটতে-হাঁটতে ডেরেককে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি কোনও অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছেন?"

ডেরেক হাসল, "অস্ত্র? কেন?"

"যদি প্রয়োজন হয়?"

"দুর! এই পাহাড়ে দিনদুপুরে কোনও হিংস্র জীব সামনে আসবে না।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না।

চার্লসের বাড়ি গ্রামের একান্তে। বাড়ির সামনে ছোট্ট বাগানের আগাছা পরিষ্কার করছিল চার্লস। পাঁচজন মানুষকে এগিয়ে আসতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল অবাক হয়ে। ডেরেক ডাকল, "হ্যালো, চার্লস।"

চার্লস এগিয়ে এল, "হ্যালো, ডেরেক।"

"তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত?"

"না। তেমন নয়। কিন্তু কেন?"

"চলো। আমরা পাহাড়ে যাচ্ছি। গতকাল পাহাড়ে আগুন জ্বলেছিল, তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। জায়গাটা আমরা দেখে আসতে যাচ্ছি।"

"তোমরা তো পাঁচজন আছ, আমাকে কী দরকার?"

ডেরেক হাসল, "তুমি বেশ শক্তিমান মানুষ। আমাদের বন্ধু অর্জুন তাই তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চাইছে।"

চার্লসের মুখ অর্জুনের দিকে ফিরল। মুখের অভিব্যক্তিতে প্রশ্ন।

অর্জুন কোনও কথা বলল না।

এবার চার্লস জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাকে চেনেন নাকি?"

"চিনি বলা ঠিক হবে না। তবে দেখেছি।"

"দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। পরশু রাত্রে পাব থেকে বেরিয়ে এডের সঙ্গে গল্প করছিলেন।"

সঙ্গে-সঙ্গে চার্লসের কপালে ভাঁজ পড়ল। এবং তারপরেই লোকটার কথাবার্তা বদলে গেল। হাতের ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে গেট খুলে সে এগিয়ে এল, "ঠিক আছে ডেরেক, চলুন, যাওয়া যাক।"

ওরা হাঁটা শুরু করল। ডেরেক ওর পাশে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কাকার খবর কী?"

ডেরেক বলল, "বৃদ্ধ সারারাত জেগে এখন বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন। আমি গিয়ে দরজায় শব্দ করেও সেই ঘুম ভাঙাতে পারিনি।"

অর্জুন বলল, "ওঁকে দেখে মনে হয় না ওঁর ঘুম এত গভীর।"

ডেরেক জবাব দিল না। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হাঁটার পর ওরা সেই পোড়া জায়গাটায় পৌঁছল। কাল রাত্রে যেহেতু বৃষ্টি হয়নি তাই পোড়া গাছগাছালির ছাই কাদা হয়ে যায়নি। অর্জুন লক্ষ করল ডেরেক ছাড়া অন্যরা একটু দূরেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। কৌতূহল এবং ভয় একই সঙ্গে রয়েছে তাদের দৃষ্টিতে। এখন হালকা রোদ সর্বত্র। জঙ্গলের রহস্যময় চরিত্রটি এখন বোঝা যাচ্ছে না। তবু যে ভীতি ওরা মনে পুষে রেখেছে তা এখনও সরাতে পারছে না।

অর্জুন লক্ষ করল এর আগের বার যেখানে আগুন লাগানো হয়েছিল ঠিক তার পাশেই এবার আগুন জ্বলেছে। এসব জায়গায় গাছগাছালি ছাড়া বুনো ঝোপে ভর্তি। কিন্তু ওই লোকগুলো উধাও হয়ে গেল কোন পথে? সে ডেরেককে ডাকল, "আপনার কাকার সঙ্গে আমার এখানেই দেখা হয়েছিল। ওঁর ক্যামেরার ফিল্ম শেষ হয়ে গিয়েছিল।"

"তখন কত রাত?"

"অনেক।"

"আমি ভেবে পাচ্ছি না কাকা অত রাত্রে আগুন জ্বলছে দেখেও এখানে আসার সাহস পেলেন কী করে? গ্রামের সবাইকে ওই সময়ে বাইরে যেতে নিষেধ করা আছে।"

"একটা লোক নাকি ওঁর ডার্করুমে কাল রাত্রে ঢুকেছিল। সেই লোকটাকে অনুসরণ করে তিনি এখানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অন্তত আমাকে তাই বলেছেন।"

"বাড়ি বন্ধ, ডার্করুমে ঢুকেছিল? তার মানে চুরি করতে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ। ফিরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে আরও বিশদ জানা যাবে।"

"অসম্ভব! আমাদের গ্রামে কেউ এমন কাজ করবে না।"

"হয়তো। কেউ এতদিন করেনি, করবে না ভাবছেন কেন?"

"ভাবছি, কারণ আমি আমার গ্রামের মানুষদের চিনি।"

"তা হলে বলতে হয় বাইরের লোক চুরি করতে এসেছিল।"

"সেই লোকটি যদি আপনি হন?" হঠাৎ ডেরেক ঘুরে দাঁড়াল।

"তার মানে?"

"আপনি জানতেন কাকার সংগ্রহ থেকে নেগেটিভ এবং কিছু প্রিন্ট হারিয়ে গিয়েছে। হয়তো আপনি বিশ্বাস করেননি। রাত্রে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে তাই কাকার বাড়িতে ঢুকেছিলেন সেগুলোর সন্ধানে। না পেয়ে বাইরে এসে আগুন দেখতে পান এবং যেহেতু এই আগুন সম্পর্কে আপনার কৌতূহল আছে তাই সটান এখানে চলে আসেন। কাকাকে আপনার পেছন-পেছন আসতে দেখে লুকোতে চান এবং পড়ে যান। সেই সময় আপনি আহত হন। তারপর উপায় না দেখে কাকার সঙ্গে কথা বলেন এমনভাবে, যেন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।" ডেরেক একটানা বলে থামল।

হেসে ফেলল অর্জুন, "হ্যাঁ, এরকম ভাবা যেতে পারে। আমরা বলি কেউ সন্দেহের উর্ধ্বে নয়। তবে আপনার কাকা লোকটিকে পেছন থেকে দেখেছেন। তার উচ্চতা এবং শরীরের আয়তন সম্পর্কে আন্দাজ নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছিল। সেটার সঙ্গে আমার কতটা মিল আছে তা তিনিই বলতে পারবেন। ততক্ষণ আসুন, আমরা কাজ শুরু করি।"

ডেরেক বলল, "সকালে আপনি যেভাবে শরীরের ব্যথার কথা বলছিলেন, এখানে আসার পথে কিন্তু তার কোনও নমুনা দেখতে পাইনি।"

অর্জুনের খেয়াল হল। সকালে যেরকম তীব্র ব্যথা ছিল এখন সেটা একদম থিতিয়ে গেছে। ওই পুরিয়া দারুণ কাজ করেছে। সে বলল, "এর সমস্ত কৃতিত্ব ওই ভদ্রলোকের, যিনি আমাকে পুরিয়া দিয়েছিলেন। যাকগে, ডেরেক, আমাকে সন্দেহ করলে এই মুহূর্তে আপনার কোনও লাভ হচ্ছে না। আপনাদের গ্রামে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলেই আপনি অমল সোমের কাছে গিয়েছিলেন। আমি এসেছি সেটা সমাধান করতে, সমস্যা বাড়াতে নয়।"

ডেরেক মুখ ফেরাল। সম্ভবত অর্জুনের রাতের অভিযান তার পছন্দ হয়নি। অন্তত তাকে না জানিয়ে অর্জুন বেরিয়েছিল বলে কোথাও লেগেছিল তার। তা ছাড়া গ্রামের মানুষদের সম্পর্কে অর্জুনের সন্দেহ সে পছন্দ করেনি। আর এইজন্যেই মনে যে বাষ্প জমা হয়েছিল তা ওর মুখ দিয়ে কথা হয়ে বেরিয়ে এসেছিল।

ডেরেক জিজ্ঞেস করল, "আমাদের কী করতে হবে!"

"আমরা নীচে নামব। একেবারে নীচে।"

"সে কী!" চমকে গেল ডেরেক।

অর্জুন সবাইকে হাত নেড়ে কাছে ডাকল। ওরা এলে অর্জুন বলল, "চার্লস, আপনি তো পাহাড়টাকে ভালভাবে জানেন। আমরা ঠিক ওইখানে, একেবারে নীচে নামতে চাই। কীভাবে যাব বলতে পারেন?"

চার্লস ডেরেকের দিকে তাকাল, "আমি তো কখনও এর আগে যাইনি।"

"আপনি তো পাকদণ্ডী ভাল চেনেন।"

"এ-কথা কে বলল আপনাকে?"

"আমি শুনেছিলাম। আচ্ছা, কাল রাত্রে যে পথ দিয়ে নেমেছিলাম সেই পথেই চেষ্টা করি। আমাদের খুব সাবধানে নামতে হবে।"

দড়ির সাহায্যে ওরা নামছিল। যেভাবে পা পিছলে যাচ্ছিল তা অর্জুনকে গত রাতের পতনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল। নামবার সময় একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে। ওঠার সময় উঠতে সুবিধে হবে এতে। পা পিছলে মাধ্যাকর্ষণের টানে অল্প সময়ে যতটা নীচে নামা যায়, সচেতনভাবে তার অর্ধেকও সম্ভব নয়। একসময় লম্বা দড়িও শেষ হয়ে এল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল ডেরেক, "আপনি কাল রাত্রে এখানে এসেছিলেন?"

"আরও নীচে।"

"উঠলেন কী করে?"

"খুব কষ্ট করে। তবে সেই জায়গাটা ওপর থেকে দেখে ঠাহর করতে পারিনি।"

আরও মিনিট কুড়ি বাদে ওরা নীচে নামতে পারল। এখানকার গাছগাছালি, বুনো গন্ধ, মাটি হয়তো পৃথিবীর আদিমতম দিনগুলো থেকে মানুষের স্পর্শবর্জিত ছিল। গতরাতের আগে কেউ এখানে নেমেছে বলে মনে হয় না।

চার্লস বলল, "সাবধান। সাপ!"

সবাই স্থির হয়ে গেল। সাপটার পেট এবং লেজ দেখা যাচ্ছে। সামনের অংশ পাতার আড়ালে। কিন্তু, অর্জুনের মনে হল, ওটা নড়ছে না। একটা গাছের ডাল ভেঙে ওর পেটে খোঁচা দেওয়া সত্ত্বেও যখন প্রতিক্রিয়া হল না তখন ডালটা শরীরের তলায় ঢুকিয়ে টেনে তুলল সে। এবং তখনই সে চিনতে পারল। এটা গতরাতের ফণা তোলা সাপ। মাথা এবং তার নীচের খানিকটা অংশ পুড়ে গলে গিয়েছে।

চার্লস এগিয়ে এল, "কীভাবে মরল এটা? আগুনে পুড়েছে বোধ হয়।"

ডেরেক বলল, "হতেই পারে। ওপরের গাছে ছিল। আগুনে পুড়ে খাদে পড়ে গেছে।"

আর একটু হাঁটতেই চার্লস দাঁড়িয়ে পড়ল। ডেরেককে বলল, "ব্যাপারটা লক্ষ করো। দু'পাশের গাছের ডাল ছেঁটে কেউ যেন রাস্তা করে রেখেছে। মানুষ ছাড়া এমন কেউ করতে পারে না। নিশ্চয়ই মানুষ এসেছিল। কিন্তু আমরা কোথায় যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি?"

অর্জুন বলল, "আমরা প্রায় এসে গিয়েছি। একটু বাদেই জানতে পারবেন।"

কিছুক্ষণ পরে অর্জুনই প্রথম দেখতে পেল, পেয়ে ছুটে গেল কাছে। সেই শক্ত বস্তুটি দু' টুকরো হয়ে পড়ে আছে। ভেতরটা ভেজা-ভেজা, লালচে হয়ে আছে। দুটো টুকরো যদি গোল হয় তা হলে সেই খোলের মধ্যে কিছু নেই।

ডেরেক জিজ্ঞেস করল, "এটা কী? কী ছিল এর ভেতরে?"

অর্জুন চারপাশে তাকাল। এখানে মাটি নরম। স্যাঁতসেঁতে। এবার স্পষ্ট দাগ দেখতে পেল সে। ইঞ্চি ছয়েকের গোল দাগ, পাশাপাশি। দাগের গভীরতা বলে দিচ্ছে প্রাণীটি ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর এগিয়ে গেছে। সেই দাগ অনুসরণ করে এগোতেই বাধা পেল অর্জুন। সামনেই পাথর। পাথরে পায়ের চিহ্ন নেই।

সে হতাশ হয়ে বলল, "ইস। দেরি হয়ে গেল।"

"কীসের দেরি?" ডেরেক কিছুই বুঝতে পারছিল না।

অর্জুন বলল, "আপনার মনে আছে ডেরেক, মিস্টার সোম একটা ছবিতে আধপোড়া গাছের ভেতর বিশাল ডিমের আকারের কিছু দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন ওটা কী? আপনি উত্তরটা বলতে পারেননি। আপনার কাকার সঙ্গে আমি আর আপনি যখন আগুনে পোড়া জায়গাটায় প্রথমবার এলাম তখন সেই আধপোড়া গাছটির দেখা পাইনি। বস্তুটিও ওখানে ছিল না। কাছেই একটা বিশাল পাথরের গায়ে ছাই এবং ঘষা দাগ দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল ওটাকে নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। আমি সেটার সন্ধানে গত রাত্রে নীচে নামতে গিয়ে পড়ে যাই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডিমটার কাছে পৌঁছই। এসে দেখি ওই শক্ত ডিম, যদি ডিম বলা যায়, একটু-একটু নড়ছে। অর্থাৎ ওটার মধ্যে কোনও জন্তুর প্রাণ আছে। প্রাগৈতিহাসিক অনেক প্রাণীর ভ্রূণ ওপরের খোলস ফসিল হয়ে গেলেও ভেতরে সুপ্ত অবস্থায় বহুকাল থেকে যেতে পারে। আমার সন্দেহ হয়েছিল এটা সেইরকম হলেও হতে পারে। আগুনের তাত এবং ওপর থেকে পড়ে যাওয়ার আঘাত পেয়ে সেই সুপ্ত প্রাণ জেগেছে। যে-কোনও কারণেই ভাঙা খোলটা দিয়ে ভেতরে বাতাস যাওয়া অক্সিজেন পেয়ে দুলছে। এরকম একটা প্রাণীর সন্ধান জীববিজ্ঞানীরা পেলে সারা পৃথিবীতে কীরকম আলোড়ন হবে ভেবে দেখুন। আমার মনে হয়েছিল অনুমান সত্যি হলেও চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খোলস ভেঙে ওর বেরোনোর ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমি দেরি করে ফেলেছি। উঃ, কী আফসোস হচ্ছে।"

এতক্ষণ সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। চার্লসই প্রশ্ন করল, "ওটা কী প্রাণী?"

"আমি জানি না।"

আর-একজন জিজ্ঞেস করল, "ওটা কি খুব হিংস্র হতে পারে?"

"তাও জানি না। তবে মানুষের চেয়ে হিংস্র প্রাণী পৃথিবীতে কিছু নেই।"

ডেরেক বলল, "সবে জন্মেছে যে, সে আর কতদূরে যাবে? এসো, খুঁজে দেখা যাক।" সবাই গাছের ডাল ভেঙে লাঠি করে নিয়ে চারপাশের গাছে আঘাত করতে লাগল। সেই আঘাতের শব্দে ভয় পেয়ে দুটো খরগোশ আর একটা সাপকে পালিয়ে যেতে দেখা গেল। হঠাৎ একজন চিৎকার করে ডাকতেই অর্জুন ছুটে গেল। পাথরগুলোর ওপাশে জঙ্গলের মধ্যে আবার পায়ের ছাপ রয়েছে। পরপর চারটে। কিন্তু সেগুলো আবার পাথরে মিলিয়ে গেছে। কিন্তু অর্জুন নিজের

চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। একটু আগে যে চিহ্নটাকে মাত্র ছয় ইঞ্চি মনে হচ্ছিল এখন সেটা আরও বড় হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ গজ পথ পেরিয়েই পায়ের চিহ্ন বড় হয় কী করে? না কি এতকাল নির্দিষ্ট খোলের মধ্যে থাকায় প্রাণীটির চেহারা গুটিয়ে ছিল, বাড়তে পারেনি। বাইরের হাওয়া পেয়ে সেটা দ্রুত বড় হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একটা বাচ্চা হাতির পায়ের মাপে এখন ওই দাগটা।

ডেরেক পাশে এসে বসে পড়েছিল দাগটা দেখতে। দেখে বলল, "অসম্ভব! এটা নিশ্চয়ই আলাদা প্রাণী। কিন্তু দুটো প্রাণীর পায়ের আকৃতি একই রকম হল কী করে?"

চার্লস বলল, "আমাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়। এই প্রাণী হিংস্র কি না তা কেউ জানি না। যদি হিংস্র হয় তা হলে আত্মরক্ষার কোনও অস্ত্র নেই আমাদের কাছে।"

অর্জুন দেখল সবাই চার্লসকে সমর্থন করছে। কিন্তু ফিরে যাওয়া মানে প্রাণীটিকে হয়তো চিরকালের মতো হারাতে হবে।

এই পাহাড়-জঙ্গল ভারত, ভুটান, নেপাল ছাড়িয়ে চলে গেছে অনেকদূর। এই বিশাল জায়গায় কাউকে খুঁজে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। যেহেতু এই প্রাণী সদ্য খোল থেকে বেরিয়েছে তাই ও বেশিদূরে যাবে না। এখন দু-একদিন ও খোলের কাছে ফিরে আসবেই। সে ঠিক করল, এখানে আজকালের মধ্যে আবার আসবে।

যে-পথ দিয়ে গতরাত্রে ওপরে উঠেছিল সেটা পাওয়া গেল একটু খুঁজতেই। ওপরে উঠে আসার পর অর্জুন দড়িটাকে খুলতে নিষেধ করল।

হঠাৎ চার্লস জিজ্ঞেস করল, "ওই প্রাণী যদি গ্রামে গিয়ে হামলা করে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ওকে বিরক্ত না করলে ওসব ঘটবে না। তা ছাড়া ওর চরিত্র সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। যারা বাইরে থেকে এসে ঝামেলা ইতিমধ্যে পাকাতে শুরু করেছে তাদের মোকাবিলা করার কথা ভাবুন।"

চার্লস হাসল, "ওঃ, ওই ব্যাপার। বাচ্চাগুলোকে তো আপনার উপদেশমতো ভিলেজ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর কোনও ভয় নেই।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "তা কী করে বলা যায়! ধরা যাক পল, পলের কোনও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কেউ যদি ভিলেজ সেন্টার থেকে কোনও বাচ্চাকে সরিয়ে নেয়?"

ডেরেক অবাক হল, "পলের দুর্বলতা?"

"হ্যাঁ। সবাই জানে মিসেস বেনসনের মেয়ের সঙ্গে পল বন্ধুত্ব করতে চায়। মিসেস বেনসন সেটা চান না। কেউ যদি বলে এ-ব্যাপারে সাহায্য করব, তা হলে পল তার কথা শুনবে। আপনি এই ব্যাপারে কী বলেন চার্লস?" হাঁটতে-হাঁটতে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

চার্লস চমকে তাকাল। অর্জুন দেখল ওর মুখের চেহারা সমস্ত স্বাভাবিকত্ব হারিয়ে অদ্ভুত বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ডেরেক সেটা না লক্ষ করে উষ্ণ গলায় বলল,

"অর্জুন, আপনি আবার ওই ধরনের কথা বলছেন! পল খুব ভাল ছেলে।"

"তা হলে পল মিসেস বেনসনের...!"

"আপনি জানলেন কী করে?"

"জেনেছি।"

"কিন্তু গ্রামের কোনও লোক, ধরে নিলাম আপনার সন্দেহ সত্যি হলে, বাইরের লোক পলকে প্রভাবিত করতে পারবে না। গ্রামের লোকই করবে। কিন্তু কেন? কী তার স্বার্থ?"

"খুব সহজ। টাকার দরকার হতে পারে তার।"

"নো। আমি বিশ্বাস করি না। আমার গ্রামের মানুষ টাকার জন্যে বিশ্বাসঘাতকতা কখনওই করতে পারে না। আপনি আপনাদের দেখা মানুষদের সঙ্গে দয়া করে মিলিয়ে ফেলবেন না।" ডেরেক জোরালো গলায় বলল।

অর্জুন হাসল, "চার্লস, আপনি কি ডেরেকের কথা সমর্থন করেন? ধরুন, কেউ এখানে থাকতে চাইছে না। এই জায়গাটা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার পূর্বপুরুষ ইংল্যান্ড থেকে এসেছিল। এখন তার মনে হচ্ছে সেই দেশে গেলে সে ভাল থাকবে। কিন্তু যেতে হলে অনেক টাকা চাই। সেই টাকার লোভে একটু যদি অন্যায় করে তাতে এমন কী ক্ষতি! সে তো আর এখানে ফিরে আসবে না।"

চার্লসের মুখ তখন প্রায় বুকের ওপর। ডেরেক বলল, "আমরা যদি ইংল্যান্ডে যেতে চাইতাম তা হলে অনেক বছর আগে ফিরে যেতাম। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর আর এখানে পড়ে থাকতাম না। আপনাকে তো বলেছি পূর্বপুরুষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আর যেখানেই যাই না কেন, ইংল্যান্ডে যাব না।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। ফেরার পথে সে লক্ষ করছিল চার্লস আর একটা কথাও বলছে না। মাঝে-মাঝে আড়চোখে তাকে দেখছে। সে হয়তো ভেবেই পাচ্ছে না তার গোপন পরিকল্পনা, যা এড ছাড়া কেউ জানে না, তা বাইরের লোক জানল কী করে? নিশ্চয়ই ওর মনে হচ্ছে, এড ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরকম ক্ষেত্রে চার্লস এডকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন ইচ্ছে করেই অন্যদের থেকে ব্যবধান রেখে চার্লসের পাশে চলে এল, "চার্লস। ওই জন্তুটার খোঁজে আমি আবার জঙ্গলে আসব। আপনি আমার সঙ্গী হলে ভাল লাগবে। কী, রাজি আছেন?"

শুকনো গলায় অস্পষ্ট স্বরে চার্লস বলল, "ঠিক আছে।"

অর্জুন নিচু গলায় বলল, "আর একটা কথা। এড আপনার বন্ধু। উনি আপনার বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেননি। পরশু রাত্রে রাস্তায় উত্তেজিত হয়ে আপনি যখন এডকে আপনার পরিকল্পনার কথা বলছিলেন তখন সেটা আমার কানে এসেছিল। অতএব ভুল করেও এডকে শত্রু ভাববেন না।"

হঠাৎ ওরা দেখতে পেল দু'জন লোক চিৎকার করতে-করতে এদিকে ছুটে আসছে। এটা দেখামাত্র ওরা জোরে পা চালাল। লোক দুটো মুখোমুখি হয়ে

ভীতসন্ত্রস্ত গলায় যা বলল তা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল ওরা। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুম থেকে উঠে দরজা না খোলায় মিস্টার জোন্সের নির্দেশে বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের দরজা ভাঙা হয়। ভেতরে গিয়ে দেখা যায় তিনি মেঝেতে পড়ে আছেন প্রাণ হারিয়ে। ওঁর মাথার পেছনটা কেউ আঘাত করে থেঁতলে দিয়েছে। ডেরেক কেঁদে উঠল।

বৃদ্ধের বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। মিস্টার জোন্স, মিস্টার স্মিথ গম্ভীর মুখে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওদের দেখে সবাই রাস্তা করে দিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডেডবডি কেউ স্পর্শ করেননি তো?"

মিস্টার স্মিথ বললেন, "না। ঘরে ঢুকে ওঁকে ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে আমরা বেরিয়ে এসেছি। কিন্তু এটা খুন, খুন করা হয়েছে ওঁকে।"

অর্জুন ভেতরে গেল। সঙ্গে ডেরেক। বৃদ্ধ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর মাথার পেছনে ক্ষতচিহ্ন। সেখান থেকে রক্ত মেঝেতেও পড়েছে। পরনের পোশাকটাকে গতরাত্রে অর্জুন দেখেছিল। অর্জুন তন্নতন্ন করে খুঁজছিল। কিন্তু আততায়ী কোনও ক্লু রেখে যায়নি। কিন্তু আততায়ী যখন বাইরের দরজা খুলে বের হয়নি তখন গেল কোন পথে? ভেতরের দরজাও বন্ধ। একটা টয়লেট কাম বাথরুম। আর একপাশের দরজা খুলতে বোঝা গেল ওটা বৃদ্ধের ডার্করুম ছিল। সেখানে ঢুকতেই সে ক্যামেরাটিকে দেখতে পেল। এই ক্যামেরা বুকে নিয়ে বৃদ্ধ ঘুরতেন। ক্যামেরাটা খোলা। তাতে কোনও ফিল্ম নেই। অর্জুন দেখল ঘরের জানলাটা বন্ধ। ডার্করুমের কাজ করতে হলে জানলা বন্ধ রাখতেই হয়। কিন্তু কোনও ছিটকিনি বা হুড়কো লাগানো নেই কেন? সামান্য টানতেই সেটা খুলে গেল। আর জানলায় কোনও গ্রিল বা শিক নেই। একজন লোকে অনায়াসেই ওখান দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। অর্জুন দ্রুত বাড়ি থেকে বেরিয়ে জানলাটার কাছে গেল। নীচের মাটিতে দুটো গভীর দাগ। লাফিয়ে ওপর থেকে পড়লে জুতো কিছুটা বসে যায়। যে লোকটা লাফিয়েছিল তার ডানপাটির জুতোর একটা পাশ বেশি ক্ষয়ে গিয়েছে, সেদিকের গোড়ালিও সমান নেই। তার মানে লোকটা যেদিকে বেশি ভর করে রেখে চলে সেই দিকটার জুতো কিছুটা ক্ষয়ে গেছে। অর্জুন ফিরে এল। মিস্টার জোন্সকে বলল, "আপনারা থানায় খবর দিন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ওঁকে খুন করা হয়েছে।"

মিস্টার জোন্স মাথা নাড়লেন। মিস্টার স্মিথের কানে-কানে কিছু বললেন। মিস্টার স্মিথ বললেন, "দেখুন, আজ পর্যন্ত এখানে কেউ খুন হয়নি। পুলিশের সাহায্য তাই কখনও আমাদের প্রয়োজন হয়নি। এক্ষেত্রে পুলিশকে জানানো কি বাধ্যতামূলক?"

"নিশ্চয়ই। যে-কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা পুলিশকে না জানানো অপরাধ।"

কিন্তু অর্জুন দেখল থানায় খবর দেওয়ার ব্যাপারে গ্রামের মানুষ একমত হতে

পারছে না। কেউ-কেউ বলছে, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আজ পর্যন্ত যখন গ্রামে পুলিশের কোনও প্রয়োজন হয়নি তখন খামোকা খবর দিয়ে কী লাভ! পুলিশকে জানালে বৃদ্ধের শরীর আবার উঠে বসবে না। ডেরেক চুপচাপ শুনছিল। এবার বলল, "কিন্তু আমার কাকার হত্যাকারীকে ধরতেই হবে। আর সেই লোকটা ধরা পড়লে চূড়ান্ত শাস্তি দিতে হবে। এখন পর্যন্ত আমাদের নিয়মে যে শাস্তি দেওয়া হয় তা হত্যাকারীর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কারণ এ-ধরনের ঘটনা এর আগে ঘটেনি এখানে। আর লোকটা যদি বাইরের লোক হয় তা হলে এখান থেকে চলে গেলে আমরা কিছুই করতে পারব না। সেক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য লাগবেই। এইজন্যেই খবরটা থানায় জানানো দরকার।"

কথাগুলোয় যুক্তি আছে, মেনে নিল সবাই। মিস্টার জোন্স দু'জনকে তখনই থানায় পাঠালেন। অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। এখানে বাইরের লোক বলতে সে একাই আছে। ডেরেক কি তাকে সন্দেহ করছে! কিন্তু কেন করবে? ওর কাকাকে সে কেন খুন করতে যাবে?

অর্জুন বলল, "মিস্টার জোন্স, কাল রাত্রে আমি এবং মিস্টার মুরহেড একসঙ্গে গ্রামে ফিরে এসেছিলাম। তখন এখানে বেশ ভিড় ছিল। সবাই পাহাড়ের আগুন দেখার জন্যে জড়ো হয়েছিলেন, তাঁদের কেউ-কেউ কি এখানে আছেন?"

সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ। আমরা ছিলাম।"

যাঁরা বললেন তাঁদের একজনকে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সেই সময় কী ঘটেছিল বলুন তো?"

ভদ্রলোক বললেন, "আপনারা একসঙ্গে এলেন। আমরা মিস্টার মুরহেডকে আগুনের কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। আপনি তখন ভিলেজ সেন্টারে চলে গেলেন। মিস্টার মুরহেড তারপরে প্রায় আধঘণ্টা আমাদের সঙ্গে গল্প করে বাড়িতে চলে গেলেন। বললেন, তখনই ফিল্মগুলো ওয়াশ করবেন।"

অর্জুন বলল, "আমি ভিলেজ সেন্টারের দরজা অনেক ডাকাডাকির পর খোলাতে পেরেছিলাম। যাঁরা পাহারায় ছিলেন তাঁরা অত রাত্রে নিঃসন্দেহ না হয়ে দরজা খোলেননি। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর যা ঘটেছে তা ডেরেক জানে। আর রাত্রে, একবার ভেতরে ঢোকার পর পাহারাদারদের ফাঁকি দিয়ে বের হওয়া যায় না।"

মিস্টার জোন্স আপত্তি করলেন, "আহা! এসব কথা বলছেন কেন?"

অর্জুন বলল, "কারণ কেউ সন্দেহের বাইরে নয়। আমার তরফ থেকে যা ঘটেছিল তা আপনাদের জানিয়ে দিলাম। আর মিস্টার মুরহেডের মাথার আঘাত আর শরীরের লক্ষণ দেখে মনে হয়েছে তিনি খুন হয়েছেন ভোরের দিকে। আততায়ী তাঁর সঙ্গেই ঘরে ঢুকেছিল। যেহেতু বাড়ির দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল তাই পরে ঢোকা সম্ভব নয়। আততায়ী মিস্টার মুরহেডের পরিচিত ছিল বলে সঙ্গী হতে পেরেছিল, অনুমান করা যেতে পারে। যা হোক, পুলিশ নিশ্চয়ই

তাড়াতাড়ি আসবে। আমি আশা করছি আততায়ী পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে না।"

কথাগুলো বলে অর্জুন হাঁটতে লাগল ভিলেজ সেন্টারের দিকে।

মিস্টার মুরহেডের মৃত্যুর খবর পেয়ে শুধু শিশু, অসুস্থ আর বৃদ্ধেরা ছাড়া গ্রামের কেউ যে দুপুরে খাচ্ছে না তা অর্জুন জানত না। পল এসে জিজ্ঞেস করল, "আ-আ-জ আমি লা-লা-লাঞ্চ বানাইনি, তবে আপনি যদি খেতে চান তো-তো-তো বানিয়ে দিচ্ছি।" পলের কথার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব স্পষ্ট।

"লাঞ্চ বানাওনি কেন?"

"এটা নিয়ম। যদি কেউ মা-মা-মারা যায়, সবাই উপোস করি।"

"তা হলে আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন?"

"আপনি বা-বা-বাইরের লোক। নিয়ম নাও মানতে পারেন।"

অর্জুন হেসে মাথা নাড়ল। ডেরেক থেকে পল কেউ তাকে নিজেদের লোক বলে ভাবতে পারছে না। সেটাই স্বাভাবিক। সে বলল, "নাঃ। আমারও কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।"

পল চলে যাচ্ছিল, অর্জুন তাকে ডাকল, "পল, এক মিনিট। তুমি কি আমার কথায় দুঃখ পেয়েছ? তা হলে আমি ক্ষমা চাইছি।"

পল কোনও জবাব না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি তোমাকে একটা সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। শত্রুরা তো মানুষের দুর্বলতারই সুযোগ নেয়। তুমি ওটা করবে না জেনেও তোমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছিলাম।"

হঠাৎ পল বলল, "সবাই বলছে, আপনাকে এখানে আ-আ-আনা ঠিক হয়নি। আপনি আ-আ-আসার পর এখানে প্রথম খুন হল।" কথাগুলো বলে পল চলে গেল। অর্জুনের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য-অসভ্য মানুষের এক জায়গায় মিল, কুসংস্কার এড়িয়ে থাকতে পারে না।

এখনও সে এখান থেকে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অমল সোম তাকে কখন ফিরে যেতে হবে, বলেননি। তিনি আসবেন রবিবারে, এটুকুই জানে। অর্জুন এখানে আসার পর যা-যা ঘটেছে তার নোট রাখল কাগজে।

এক, পাহাড়ের আগুন জ্বলা প্রাকৃতিক বা ভৌতিক ঘটনা নয়। কিন্তু মানুষ যন্ত্রচালিত যানে চেপে পাহাড়ে এসে আগুন জ্বালায়। কিন্তু কেন?

দুই, সেই প্রাগৈতিহাসিক বস্তুটি, যা গাছের মধ্যে ছিল, সেটাকে কেন ওরা নীচে ফেলে দিয়েছিল?

তিন, নীচে ফেলে দেওয়ার পর সেটার খোঁজে ওরা কেন নেমেছিল? যে ভয়ার্ত চিৎকার সে শুনেছিল সেটা কীজন্য? বস্তুটিকে নড়তে দেখে কি?

চার, বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের ডার্করুমে যে ঢুকেছিল, সে এখানকার লোক নয়। তা হলে লোকটা আগুনের দিকে আসত না। বৃদ্ধ তাকে অনুসরণ করে এসেও

শেষপর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলেন। লোকটা গেল কোথায়?

পাঁচ, বৃদ্ধ মারা গিয়েছেন ছবি তোলার কারণে। ওই ছবিগুলো সরাতে চেয়েছিল কে অথবা কারা?

ছয়, যে আগন্তুকরা বাচ্চা দেখতে এসেছে এবং আসবে, তাদের সঙ্গে এইসব ঘটনার কোনও যোগাযোগ এখনও প্রমাণিত হয়নি। এরা কি আলাদা?

দরজায় শব্দ হল। অর্জুন মুখ তুলে বলল, "আসুন।"

সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল চার্লস। মুখচোখে অপরাধী ভাব।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার চার্লস?"

"আপনি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" মুখ নিচু করল লোকটা।

"আরে বসুন। হ্যাঁ, ওখানেই বসুন। হঠাৎ আমার কাছে ক্ষমা চাইছেন কেন?"

"আমার মনে হচ্ছে আপনি সব জানেন।" চার্লস মাথা নাড়ল, "আমি অনুতপ্ত, দয়া করে এই ব্যাপারটা আর কাউকে বলবেন না। তা হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।"

"তার মানে আপনি আর ইংল্যান্ডে যাচ্ছেন না?"

"না। আমার পূর্বপুরুষরা যা চেয়েছিল আমি তাই করব।"

"এটা আপনার একটা চাল নয় তো?"

"ছি ছি। বিশ্বাস করুন। আমি মিথ্যে কথা বলছি না।"

"তা হলে আমাকে সব কথা খুলে বলুন।"

"কী কথা?"

"গতবার যারা এসেছিল, পাকদণ্ডী দিয়ে গিয়ে যাদের সঙ্গে আপনি কথা বলেছিলেন সেই কথাগুলো আমাকে বলুন।"

"কেউ যদি জানতে পারে...।"

"আপনি সত্যি কথা বললে কেউ জানতে পারবে না।"

"আমাকে একা দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছিল। দোভাষী বলেছিল ওরা একটা বাচ্চাকে চায়। ওদের মহাগুরু দু'বছর আগে মারা গিয়েছেন। মারা যাওয়ার আগে বলে গেছেন তিনি পাহাড়ের কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করবেন। এই দু'বছর ধরে ওরা পাহাড়ে পাহাড়ে অনেক খুঁজেছে। ওদের গনৎকাররা যেদিকের হদিস দিয়েছে সেইমতো ওরা অভিযান চালিয়েছে। হিমালয়ের অনেক জায়গা ওরা হেলিকপ্টারে ঘুরে দেখেছে, গ্লাইডারে উড়ে পরীক্ষা করেছে। শেষপর্যন্ত এখন ওদের ধারণা, মহাগুরু আমাদের গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছেন। যে-কোনও মূল্যে সেই মহাগুরুকে ওরা নিয়ে গিয়ে মাথায় করে রাখবে। ওরাই প্রস্তাব দেয়, যদি আমি ওদের সাহায্য করি তা হলে দু'লক্ষ টাকা আমাকে দেবে। আমাকে প্রতিটি দু' বছরের শিশুর বর্ণনা তৈরি করতে বলেছে।" চার্লস বলল।

"কবে দিতে হবে?"

"আজই।"

"কোথায়?"

"যেখানে আমি ওদের সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সেখানে। কিন্তু আমি ঠিক করেছি, যাব না। ওদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখব না।" চার্লস মাথা নাড়ল।

অর্জুন বলল, "না চার্লস। আপনি যাবেন।"

"সে কী! আপনি আমাকে যেতে বলছেন?"

"হ্যাঁ। তবে বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে নয়, লোকগুলোকে বোকা বানাতে।"

"কীরকম?"

"আপনি বাচ্চাদের যে তালিকা করবেন তাতে প্রত্যেকের হাবভাব, ভঙ্গি একই রকম লিখবেন। বর্ণনা পড়ে কেউ যেন পার্থক্য না করতে পারে।"

চার্লস বলল, "ওরা বলেছিল ওই বয়সী বাচ্চাদের মধ্যে কেউ কম কথা বলে কিনা, গম্ভীর হয়ে থাকে কিনা খুঁজে দেখতে।"

অর্জুন বলল, "না, কেউ নেই। আপনি কাউকে খুঁজে পাননি।"

"ঠিক আছে।" চার্লস মাথা নাড়ল।

"কাল রাত্রে গ্রামের মানুষ যখন আগুন দেখতে জড়ো হয়েছিল তখন আপনি কোথায় ছিলেন? বাইরে বের হননি?"

"না। আমার মনখারাপ ছিল, কারও সঙ্গে কথা বলতে পারিনি।"

"ঠিক আছে। আজ কখন আপনার যাওয়ার কথা?"

"বিকেল পাঁচটার সময়।"

"আমি আপনার সঙ্গে যাব।"

ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় অর্জুন চার্লসের সঙ্গে যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সেই জায়গাটাকে সবুজ উপত্যকা বলা যেতে পারে। একটা ব্যাপারে অর্জুনের কিছুটা উদ্বেগ ছিল। খবর দেওয়া সত্ত্বেও পুলিশ এখনও গ্রামে আসেনি। পুলিশ না এলে বৃদ্ধের পারলৌকিক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। একটু আগে ডেরেক তার গাড়ি নিয়ে রওনা হয়েছে থানার উদ্দেশে।

চার্লস গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "থানায় যাওয়ার পথটা কোনদিকে? ডেরেক তো থানা থেকে ফিরবে।"

"ওই পথ ও-পাশ দিয়ে গিয়েছে। এদিক দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ। কিন্তু আমার খুব ভয় করছে, যদি ধরা পড়ে যাই?"

"লিস্ট দেখে ওরা কিছু বুঝতেই পারবে না। এই গ্রামের শিশুদের খবর আপনার চেয়ে ওদের ভাল জানার কথা নয়।"

অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে একটা ঘন ঝোপের কাছে চলে এল। ঝোপটার ভেতর ঢুকে গেলে বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না। সে বলল, "আপনি একটু ওপাশে অপেক্ষা করুন। আমি এই ঝোপের মধ্যে রয়েছি।"

চার্লস মাথা নেড়ে এগিয়ে যেতেই অর্জুন মত পালটাল। দ্রুত সরে গিয়ে দুটো

বড় পাথরের খাঁজে শরীরটাকে ঢুকিয়ে দিল সে। এখানে যদিও তাকে আড়ষ্টভাবে পড়ে থাকতে হবে তবু কোনও ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। চার্লস যে এখনও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

দশ সেকেন্ডকে দশ মিনিটের মতো মনে হচ্ছিল অর্জুনের। সামনের উপত্যকায় এখন একটু-একটু কুয়াশা জমছে। দিনের আলো কমতে শুরু করলেও অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিটের আগে অন্ধকার নামবে না। সূর্যদেব এখানে চোখের আড়ালে চলে গেলেও কিছুটা নরম আলো অনেকক্ষণ রেখে যান।

আজ চার্লসের সঙ্গে কথা বলার পর থেকে অর্জুন ভেবেছে। তিব্বতি বৌদ্ধরা তাদের গুরুর সন্ধানে পৃথিবী চষে ফেলে বলে সে শুনেছে। কিছুদিন আগে একটি আমেরিকান শিশুর মধ্যে সেইসব লক্ষণ দেখে তারা মনেস্টারিতে নিয়ে এসেছে তাকে। বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠান রপ্ত করাচ্ছে ভক্তিভরে। শিশুটির হাবভাব দেখে কখনওই মনে হচ্ছে না সে জন্মসূত্রে বৌদ্ধ ছিল না। অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ধর্মগুরুর মতোই সে আচরণ করছে। এ থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে তিব্বতিদের সন্ধান এবং নির্বাচন ভ্রান্ত নয়। কিন্তু মধ্য এশিয়ার কোনও সম্প্রদায়ের মানুষ হিমালয়ের পাহাড়ে তাদের সদ্য জন্মানো ধর্মগুরুর সন্ধানে আসবে, এটা কল্পনা করা খুবই কষ্টকর। গনৎকারের নির্দেশমতো ওরা যেভাবে সন্ধান চালিয়েছে তা অবশ্যই ব্যয়বহুল। এই ধনী লোকগুলোর সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা ডেরেকদের নেই। অমল সোম রবিবারে আসবেন। তার আগে যেন কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে।

এখন কেবলই তার চোখে সেই শিশুটির মুখ ভেসে উঠছিল। ওরা যে শিশু চাইছে তার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। বাচ্চাটাকে দেখলেই বোঝা যায় সে ওই বয়সের শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে, অনেক গম্ভীর এবং মুখে একটা চাপা কৌতুকের প্রকাশ আছে। ওই লোকগুলো কি ওরই উদ্দেশ্যে এসেছে?

হঠাৎ অর্জুনের কানে গুম-গুম শব্দ ভেসে এল। ঠিক গত রাতের শব্দের মতো। সে দ্রুত ঘড়িটা বের করে মুঠোয় ধরল। পাথরের আড়ালে থাকায় শরীর নাড়ানো যাচ্ছে না বটে, তবে আক্রান্ত হলে আঙুলের চাপে ঘড়িটির শক্তি প্রয়োগ করতে তৈরি হয়ে রইল। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

একটু পরেই আকাশে একটা কালো বিন্দুকে বড় হতে দেখল অর্জুন। বিন্দুটা ক্রমশ ডানা মেলল। শেষপর্যন্ত বোঝা গেল ওর ধরন অনেকটা গ্লাইডারের মতো কিন্তু তাতে এঞ্জিন বসানো আছে। স্বচ্ছন্দে চল্লিশ-পঞ্চাশ কিলোমিটার উঠে যেতে পারে। গত রাত্রে এই ধরনের বেশ কয়েকটা গ্লাইডার উলটোদিকের পাহাড়ের ওপরে নেমেছিল। অর্থাৎ চার্লসের সঙ্গে কথা বলতে যারা আসছে তারাই পাহাড়ের জঙ্গলে আগুন জ্বালায়। কেন জ্বালায়?

গ্লাইডারে মাটিতে নামলে কিছুক্ষণ দৌড়তে হয়। কিন্তু যন্ত্র চলছে বলে ওটা স্থির হয়ে রইল এক জায়গায়, তারপর প্রায় হেলিকপ্টারের মতো ধীরে-ধীরে মাটিতে নামল। অর্জুন দেখতে পাচ্ছিল। চার্লস যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে

একটুও নড়েনি। একটা লোক, সবুজ রঙের সালোয়ার কুর্তা পরনে, গ্লাইডার থেকে বেরিয়ে সামনে এগিয়ে এল। লোকটার কাঁধ থেকে একটা অস্ত্র ঝুলছে।

চার্লস নড়ছে না দেখে ভাল লাগল অর্জুনের। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে চার্লসের দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু নিচুগলায় কথা বললে সে কিছুতেই শুনতে পারবে না। এই লোকটা এসেছে দোভাষী সঙ্গে না নিয়ে। তা হলে চার্লসের সঙ্গে কীভাবে কথা বলবে ও?

লোকটা চার্লসের সামনে পৌঁছে হাত বাড়াল।

চার্লস তার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে সেই হাতে তুলে দিল। লোকটা কাগজে চোখ রাখল। অর্জুন দেখল দু'-দু'বার লোকটা কাগজে চোখ বোলাল। তারপর ওর চোখ-মুখে ক্রোধ ফুটে উঠল। কুটি-কুটি করে কাগজটা ছিঁড়ে ফেলে চার্লসকে যা বলল, তা অর্জুনের কানে গেলেও সে বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারল না।

চার্লস হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। বোকার মতো হাত কচলাচ্ছে। লোকটা ওর জামার কলার ধরে ঝাঁকিয়ে অনর্গল কিছু বলে যাচ্ছিল। তারপর এক ঝাঁকুনি দিতে চার্লস ছিটকে খানিকটা দূরে পড়ে গেল। চার্লসের মতো স্বাস্থ্যবান মানুষকে যে ওভাবে ফেলে দিতে পারে, তাকে সমীহ না করে উপায় নেই।

লোকটা যেরকম ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তাতে চার্লসকে মেরেও ফেলতে পারে বলে মনে হল অর্জুনের। কিন্তু লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুর্তার পকেট থেকে কিছু একটা বের করে কানে চাপল। ওটা কি সেলুলার ফোন? মন দিয়ে শুনে ওর ঠোঁট নড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে চার্লসের হাতে যন্ত্রটা তুলে দিয়ে ইশারা করল শুনতে।

অর্জুন দেখল চার্লস যন্ত্রটা কানে লাগিয়ে কিছু কথা শুনে জবাব দিল। দু-তিনবার ওইরকম হওয়ার পর যন্ত্রটা ফেরত নিয়ে লোকটা ফিরে গেল গ্লাইডারের কাছে। তারপরেই গুম-গুম শব্দ শুরু হল। প্রায় হেলিকপ্টারের মতো ঘুরে গিয়ে গ্লাইডারটা আবার আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

এতক্ষণে অর্জুন নিঃসন্দেহ হল চার্লস তার কথা রেখেছে। লোকটা যে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তা বোঝাই যাচ্ছে। নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে আনতেই সে চার্লসের চোখে পড়ে গেল।

অর্জুন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "মনে হল ওই ঝোপের চেয়ে এই পাথরের খাঁজে লুকোনো ভাল। যাকগে, কার সঙ্গে কথা বললে?"

"দোভাষীর সঙ্গে। সে বলল, ওই শিশুদের মধ্যে গম্ভীর প্রকৃতির কেউ আছে। তাকে ওদের চাই। যদি আমি সাহায্য না করি তা হলে মিস্টার মুরহেডের সঙ্গে আমাকেও কফিনে যেতে হবে।" বেশ ভয় পাওয়া গলায় বলল চার্লস।

"কী সাহায্য চাইল ওরা?"

চার্লস বলল, "একটি গম্ভীর প্রকৃতির অথচ সুন্দর দেখতে শিশু নাকি আমাদের

গ্রামে রয়েছে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।"

"তারপর?"

"রবিবারে ওরা গ্রামে আসবে। কিন্তু ওই লোকটা ঠিক সেই সময় আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করবে। বাচ্চাটাকে সকলের চোখ এড়িয়ে এনে ওর হাতে তুলে দিলেই আমাকে টাকাটা দিয়ে দেবে। আমি এখন কী করব?"

"আপনি কী বলেছেন?"

"আমাকে তো 'আচ্ছা' বলতেই হল।"

"চলুন। ফিরে যাই।"

ফেরার পথে ওরা কথা বলছিল না। যারা বাচ্চাটাকে নিতে এখানে এসেছে তারা যে ভারতীয় নয়, তা স্পষ্ট। কিন্তু লোকগুলো নিশ্চয়ই এখান থেকে খুব বেশি দূরে ঘাঁটি গাড়েনি। হয়তো সেটা ভারতীয় এলাকা নয়। ভুটান এবং নেপাল সীমান্ত এখান থেকে মাইল কুড়ির মধ্যে। সেসব দেশের যে-কোনও পাহাড়ি জঙ্গুলে জায়গায় ওরা স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। এই যে যন্ত্রচালিত গ্লাইডারে ওরা উড়ে আসছে তা লোকালয় থেকে সম্ভব নয়।

এগারোজনের দশজনকে এখন বাড়ি চলে যেতে বললে পারত অর্জুন। কিন্তু তাতে ওই বিশেষ শিশুটির মা-বাবা বেশি নার্ভাস হয়ে যাবেন। তার কর্তব্য বাচ্চাটাকে রবিবার পর্যন্ত রক্ষা করা। অর্জুনের হঠাৎ মনে হল, ওই বাচ্চার মা-বাবা যদি শোনেন, তাঁদের সন্তান একটি ধনী এবং শক্তিশালী সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু হবে তা হলে কি আনন্দিত হয়ে ওদের হাতে তুলে দেবেন? যদি দিতে চান তা হলে তো কোনও সমস্যাই থাকবে না। কিন্তু এ-কথা ওঁদের জিজ্ঞেস করবে কী করে?

গ্রামে ঢোকার সময় চার্লস জিজ্ঞেস করল, "আমি কাল কী করব?"

"ভেবে দেখছি।"

"আপনি বলেছিলেন জঙ্গলে যাবেন?"

"হ্যাঁ। আজ রাত্রে। এই ধরুন আটটা নাগাদ। আপনি ভিলেজ সেন্টারে চলে আসবেন।" অর্জুন বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফারের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল একা।

সেখানে তখন বেশ ভিড়। পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন সেপাইকে নিয়ে একজন সাব-ইনস্পেক্টর ডেরেকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তাকে ডেকে অফিসারকে কিছু বলতেই ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকালেন। অর্জুন কাছে যেতে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই অর্জুন? আপনার কথা আমি অনেক শুনেছি।"

"ধন্যবাদ। আপনি এই খুনের ব্যাপারে সব তথ্য পেয়েছেন?"

"হ্যাঁ। শুনলাম। মুশকিল হল এদের সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। এই গ্রামকে লোকে সাহেবগ্রাম বলে। বিহারে সাহেবগঞ্জ বলে যে জায়গা রয়েছে তার যেমন কোনও বিশেষত্ব নেই, তেমনই এই সাহেবগ্রাম বলে ভেবেছিলাম

আমি। অথচ শুনলাম, এদের কাছে নাকি শেক্সপিয়রের নাটক আছে যা তিনশো বছর আগে ছাপা হয়েছিল। ভাবা যায়!" অফিসারের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"না, ভাবা যায় না। আমিই প্রথম শুনলাম। কিন্তু মিস্টার মুরহেড খুব ভালমানুষ ছিলেন। কেউ ওঁকে যে খুন করতে পারে তা এঁরা ভাবতে পারেন না। খুনিকে বের করা দরকার।" অর্জুন কথাগুলো বলতেই সবাই সমর্থন জানাল।

"একদিনের ব্যাপার। খুনি এখানকারই লোক। জেরা করলেই বেরিয়ে যাবে।"

"কয়েকশো মানুষকে একদিনে জেরা করা সম্ভব নয় অফিসার। তা ছাড়া খুনি কেন বাইরের লোক হবে না, তাও আমি বুঝতে পারছি না।" অর্জুন বলল।

"বাইরে থেকে এসে খুন করেছে বলছেন?"

"অসম্ভব নয়!"

"বাইরের লোক এখানে ঢুকতে সাহস পাবে?"

"আপনি-আমি তো ঢুকেছি।"

"আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। আপনি?"

"আমিও তাই।"

"আশ্চর্য! আপনার খবর এরা পেল কী করে? খুন হওয়ার পর এত তাড়াতাড়ি আপনি চলে এলেন কী করে?" অফিসার প্রশ্ন করলেন?

"আমি এসেছি কয়েকদিন হল। এখানকার পাহাড়ে-পাহাড়ে মাঝে-মাঝেই আগুন জ্বলে কেন। কেন জ্বলে, সেটা জানতে এসেছি।"

"ও এমন কিছু নয়। পাহাড়ে অনেক সময় এরকম হয়। কেউ-কেউ আগুন জ্বালিয়েও দেয়। তা আপনি যখন এখানে আছেন তখন খুনিকে খুঁজে দিন না!"

"আমরা সবাই চেষ্টা করছি। কিন্তু মিস্টার মুরহেডের দেহ কবে পাওয়া যাবে?"

"এটাই তো মুশকিল। পোস্টমর্টেম করতে ওঁকে শিলিগুড়িতে পাঠাতে হবে। এখন থানায় কোনও ভ্যান নেই যে তাতে পাঠাব। জিপে করে বডি নিয়ে যাওয়ার কোনও চান্স নেই। আমার একটাই জিপ। ওখানে কবে পোস্টমর্টেম হবে তাও বলতে পারছি না। তদ্দিনে বডি ডিফর্মড হয়ে যাবে।" অফিসার খুব চিন্তিত গলায় বললেন।

"সেটা অসম্ভব ব্যাপার। এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে ওঁর পারলৌকিক কাজ করতে চান।"

"ভদ্রলোকের মাথার পেছনে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখলাম। অর্থাৎ ওঁকে পেছন থেকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে। আপনার কি তাই ধারণা?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পোস্টমর্টেম রিপোর্টও একই কথা বলবে, সঙ্গে একটু মেডিক্যাল কথাবার্তা থাকবে। ঠিক আছে। একটু বেআইনি হয়ে যাচ্ছে অবশ্য, তবে স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা আছে। সেদিকটাও দেখা দরকার। আমি বডি নিয়ে যাচ্ছি না।"

অফিসার কথাটা বলামাত্র জনতা উল্লসিত হয়ে উঠল। মিস্টার জোন্স অফিসারের সঙ্গে করমর্দন করলেন। যে চলে গেছে তার শরীরটাকে বীভৎস দেখতে হল না বলে সবাই খুশি। বিকেল শেষ। সন্ধে নেমে গেছে। মিস্টার মুরহেডের পারলৌকিক কাজ আগামীকাল সম্পন্ন হবে। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "হত্যার মোটিভ কিছু পেয়েছেন?"

অর্জুন বলল, "ভদ্রলোক ফোটোগ্রাফার ছিলেন। ছবি তুলে বেড়ানোই ওঁর শখ ছিল। সেটা করতে গিয়ে নিশ্চয়ই এমন কোনও ছবি তুলে ফেলেছেন যা আততায়ী পছন্দ করেনি।"

"ইন্টারেস্টিং গল্পের মতো মনে হচ্ছে।"

"আপনারা যেখানে যান সেখানেই তো গল্প থাকে।"

"তা অবশ্য।" অফিসার হাসলেন। তারপরই গলা নামালেন, "আপনার যদি কাউকে সন্দেহ হয়ে থাকে তা হলে বলুন, এখনই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাচ্ছি।"

"তা হলে আমাকে অ্যারেস্ট করতে বলতে হয়।"

"তার মানে?"

"আমি নিঃসন্দেহ, কাজটা গ্রামের কেউ করেনি। এদের জীবন এত জটিল নয় যে, একটা ফোটোগ্রাফকে ভয় করবে এবং তার জন্যে একটি শান্ত বৃদ্ধকে খুন করবে। কাজটা যে করেছে সে বাইরের লোক।" অর্জুন বলল।

"বাইরের লোক এখানে এলে কেউ জানবে না?"

"রাত্রে আসতে পারে। তা ছাড়া, অফিসার, আপনি কি জানেন, গ্লাইডারে চেপে আকাশে কিছু মানুষ এই এলাকায় ওড়াওড়ি করে?"

"গ্লাইডার? তাই নাকি? ও হ্যাঁ। আমার কাছে খবর এসেছিল খুব বড় চেহারার পাখিকে নাকি আকাশে উড়তে দেখা গিয়েছে। আমি পাত্তা দিইনি। এইসব পাহাড়ের লোকগুলো তিলকে তাল বানিয়ে দেয়। আপনি যখন বলছেন গ্লাইডার, তখন মনে হচ্ছে ওরা মিথ্যে বলেনি। আজই আমি এস পি-কে জানিয়ে দিচ্ছি।"

"না। আমার মনে হয় রবিবার পর্যন্ত আপনার অপেক্ষা করা উচিত।"

"রবিবার? কেন?"

"আমার মনে হয় সেদিন অপরাধীকে দেখতে পাব।"

"আপনি খুব হেঁয়ালি করছেন।"

অর্জুন হেসে ফেলল, "সেদিন অমল সোম আসবেন। ওঁকে সম্ভবত আপনার এস পি চেনেন। আমি মিস্টার সোমের কাছেই কাজ শিখেছি।"

"আরে হ্যাঁ। আমি ওঁর নাম শুনেছি।" অফিসার উত্তেজিত।

"তা হলে রবিবার সকালেই চলে আসুন।"

অফিসার জিপ নিয়ে বেরিয়ে গেলে ভিড় হালকা হয়ে গেল। এবং তখন অর্জুন টের পেল তার বেশ খিদে পাচ্ছে। কিন্তু এরা যদি সারাদিন না খেয়ে থাকে তা হলে কি তার খাওয়া উচিত হবে?

সে ভিলেজ সেন্টারে ফিরে এল। মিস্টার মুরহেড খুন হয়েছেন বলেই সম্ভবত সেন্টারে পাহারা দেওয়া মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। অর্জুনের মনে হল, তাকেও ওরা সন্দেহের চোখে দেখছে। ঘরে ঢুকে ওই অসময়েও স্নান করে নিল সে। সারাদিন ধরে নানা টেনশনে কাটিয়ে মনে হল শুয়ে পড়লে ভাল হয়। খিদে শরীরটাকে আরও ক্লান্ত করে তুলেছে। এই সময় পলের সঙ্গে মিসেস বেনসন দরজায় এলেন, "অর্জুন, আমি জানতে পারলাম আপনি আমাদের মতো আজ কিছু খাননি। এটা আপনার ভদ্রতা। কিন্তু আপনি আমাদের জন্যে নিজেকে কষ্ট দিচ্ছেন ভাবতে খারাপ লাগছে। আপনি আমাদের অতিথি। তাই অনুগ্রহ করে খেয়ে নিন।"

পল খাবারের ট্রে নামিয়ে রাখল টেবিলে।

অর্জুন আর আপত্তি করল না। খাওয়া শুরু করে বলল, "পল, তুমি কি এখনও রেগে আছ?"

পল সংকোচে পড়ল। মিসেস বেনসনের সামনে সে ওই বিষয়ে কথা বলতে চায় না, তাই বলল, "না, না। ঠিক আছে।"

মিসেস বেনসন জিজ্ঞেস করলেন, "পল কেন আপনার ওপর রাগতে যাবে?"

"ওর রান্না ভাল নয় বলেছিলাম।"

"ওঃ। এটা কিন্তু আমার মেয়ে রেঁধেছে।"

"খুব ভাল। দারুণ। পল তুমি ওর কাছে শিখে নাও।"

পল লজ্জা পেল। কিছু বলল না।

খাওয়ার পর অর্জুন মিসেস বেনসনের সঙ্গে হলঘরে এল। এখন রাত নেমে গেছে বলেই বেশিরভাগ বাচ্চা চুপচাপ। কোনও কোনও মা ঘুমপাড়ানিয়া গান গাইছেন। অর্জুন দেখল সেই শিশুটি মায়ের পাশে বসে তাকে দেখছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মিসেস বেনসন, ওই বাচ্চাটি অত গম্ভীর কেন?"

মহিলা বললেন, "ও একটু ওইরকম। ওর ঠাকুরদা খুব ধার্মিক মানুষ ছিলেন। গ্রামের প্রত্যেকের জন্যে প্রার্থনা করতেন। ওর বাবাও ঠাকুরদার স্বভাব কিছুটা পেয়েছে। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন ওদের সন্তান হয়নি। শেষপর্যন্ত ওরা তিনদিন ধরে চার্চে গিয়ে ধরনা দেয়। ওই তিনদিন ওদের জল পর্যন্ত খাওয়ানো যায়নি। তৃতীয় রাত্রে ওরা দু'জনে একই স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নে মাদার নাকি তাদের আশীর্বাদ করছেন। তখন ওরা বাড়িতে ফিরে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তার ঠিক ন' মাস পরে ওই বাচ্চাটি পৃথিবীতে আসে।"

"বাচ্চাটি জন্মানোর পর কোনও অলৌকিক কাণ্ড করেছে?"

"না তো! সবকিছুই স্বাভাবিক। শুধু বড় বেশি চুপচাপ। কেন বলুন তো?"

"আমার সন্দেহ হচ্ছে যারা রবিবার আসবে তারা ওর জন্যেই আসছে।"

"মাই গড!"

"আচ্ছা ধরুন, কোনও সম্প্রদায় যদি ওকে তাদের ধর্মগুরু করে নিয়ে যেতে

চায় তা হলে কি ওর মা রাজি হবে?”

“কখনও না। ঈশ্বরের আশীর্বাদে যার জন্ম তাকে আমরা ত্যাগ করব না।”

“ঠিক আছে। আপনাকে অনুরোধ, এই কথাগুলো ওর মাকে জানাবেন না।”

“আপনি কী করে জানলেন ওকেই ওরা চায়?”

“আমার অনুমান, এখানে একমাত্র ওরই বিশেষত্ব আছে। বিশেষত্ব আছে বলেই চাহিদা তৈরি হয়েছে। আচ্ছা, আমি একটু ঘোরাঘুরি করে আসি।” অর্জুন হাসল।

মিসেস বেনসন বললেন, “আচ্ছা। কিন্তু সাবধানে থাকবেন।”

পাহাড়ে উঠতে-উঠতে চার্লস জিজ্ঞেস করল, “এই অন্ধকারে আমরা কেন যাচ্ছি?”

যদিও আজ আকাশে মেঘ না থাকায় এবং দেরিতে চাঁদ উঠলেও পথ দেখা যাচ্ছিল। অর্জুন বলল, “যে প্রাণীটি ওই শক্ত খোল ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে তাকে দেখতে চাই।”

“আশ্চর্য! তাকে কোথায় এই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে পাবেন?” চার্লস দাঁড়িয়ে গেল।

“আজ আর কাল তবু একটা সুযোগ থাকবে। মনে হয় ও বেশিদূরে যেতে সাহস পাবে না। দেখাই যাক না!” অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল।

চার্লস আবার দৌড়ে সঙ্গ ধরল। “কিন্তু আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। যদি আক্রান্ত হই তা হলে নির্ঘাত মরে যেতে হবে। ওর পায়ের চিহ্ন যেরকম, তাতে...।”

“আক্রমণ না-ও করতে পারে। সবে একদিনের শিশু।”

“শিশুর ওইরকম পায়ের দাগ?”

ওরা ক্রমশ পাহাড়ের ওপরে উঠে এল। জঙ্গল এখান থেকে ঘন হয়েছে। এখন অন্ধকার একটু গাঢ় হওয়ায় সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। পোড়া জায়গাটার কাছে এসে ওরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

চার্লস ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, “আমরা নিশ্চয়ই নীচে নামছি না?”

অর্জুন বলল, “নামছি। দড়িটা ওইজন্যেই তখন খুলে নিয়ে যাইনি।”

নীচে নামতে এবার তেমন অসুবিধে হল না। এখানে অন্ধকার বেশ ঘন। ঘড়িটা বের করে অর্জুনের মনে হল চার্লস এটার কাণ্ডকারখানা দেখে অবাক হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সঙ্গে টর্চ আনা উচিত ছিল। আলোর রেখা ডালপালা কেটে পথ করে দিচ্ছে। চার্লস অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, “এটা কী হচ্ছে?”

“এটা অদ্ভুত অস্ত্র। আমার পেছন-পেছন আসুন।”

“অদ্ভুত! অদ্ভুত! আচ্ছা, আপনি কেন আমাকে সঙ্গে আনলেন? ডেরেককে বললে তো...।”

“ডেরেক বিশ্বাসঘাতকতার পথে যায়নি। আপনি যা করেছেন তার জন্যে কিছু-না-কিছু শাস্তি তো পেতেই হবে।” ওরা সেই শক্ত বস্তুটির কাছে পৌঁছতেই

শেয়াল জাতীয় দুটি প্রাণী দৌড়ে সরে গেল। অর্জুন ঘড়ির বোতাম টিপে আলোর রেখা নিভিয়ে দিল। একটু পরেই জঙ্গলের নিজস্ব শব্দ শুরু হয়ে গেল। চার্লস বলল, "এতবড় জঙ্গলের কোথায় আছে আপনি জানবেন কী করে?"

অর্জুন জবাব দিল না। কেউ কি বিশ্বাস করবে কোনও আদিম প্রাণীর শরীর থেকে বেরিয়ে আসা ডিম হাজার-হাজার বছর ধরে ফসিল হয়ে থাকার পর তার ভ্রূণ আবার প্রাণ ফিরে পেয়ে এই জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরকম একটা প্রাণীকে কলকাতার চিড়িয়াখানায় না নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে থাকাই অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে এখন। অমল সোমের দেওয়া ঘড়িটার দ্বিতীয় বোতাম এখন তার ভরসা।

হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসতেই চার্লস তার হাত চেপে ধরল। গাছের ডাল ভাঙার শব্দ। শব্দ লক্ষ্য করে অর্জুন এগিয়ে যেতেই মাথার ওপর গুম গুম আওয়াজ শুরু হল। সেটা থেমে যাওয়ামাত্র অর্জুন চার্লসকে বলল, "এবার আমাদের লুকোতে হবে।"

"চারপাশেই তো অন্ধকার, চেষ্টা করলেও তো দেখতে পাবে না।" চার্লস বলল, "কিন্তু ওই শব্দটা আমি শুনেছি। ও হ্যাঁ, আজ বিকেলেই তো—।"

অর্জুন ওর কথা কানে না নিয়ে টেনে নিয়ে গেল একপাশে। বেশ বড় একটা গাছের আড়ালে। তারও মিনিটআটেক পরে সে আলো দেখতে পেল। জোরালো টর্চলাইট ওপর থেকে নীচে নেমে আসছে। চারটে আলো এবং সেগুলো বেশ উঁচুতে ধরা। তারপরেই বুঝতে পারল, হাতে নয়, কয়লাখনির কর্মীদের মতো হেলমেটে আলোগুলো আটকানো, যাতে হাত খালি থাকে।

বেশ খানিকটা খোঁজাখুঁজির পর ওরা সেই কঠিন বস্তুটির কাছে পৌঁছে গেল। এখান থেকে ওদের কথা বোঝা যাচ্ছে না এবং কাউকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে লোকগুলো যে হতাশ হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। ওইসময় ওরাও ডাল ভাঙার শব্দ শুনতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে চারজন সতর্ক হয়ে একটু আগে অর্জুন যে পথে এগোচ্ছিল সেই পথ ধরল। ওরা চোখের আড়ালে চলে যেতেই অর্জুন বলল, "এই অন্ধকারে অনুসরণ করে লাভ নেই। অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে, নয় সাপের কামড়ে প্রাণ যাবে। বরং ওদের ফিরতে হবে এই পথেই। এখানে অপেক্ষা করাই ভাল।"

হঠাৎ গুলির শব্দ শোনা গেল। পরপর বেশ কয়েকটা একটানা। তারপরই দেখা গেল জঙ্গল ভেঙে চারজন পড়ি কি মরি করে ছুটে আসছে আর তার পেছনে জঙ্গল ভাঙতে-ভাঙতে প্রায় ঝড়ের আওয়াজ এদিকেই এগিয়ে আসছে।

লোকগুলো চোখের আড়ালে চলে যাওয়ামাত্র অর্জুনের মনে হল, প্রায় হাতির মতো আকারের এক অন্ধকার এগিয়ে আসছে। জন্তুটার মুখ, চোখ, শরীর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটা উঁচু টিপির মতো কিছু দুলতে-দুলতে আসছে। সে ঘড়িটা তুলে দ্বিতীয় বোতাম টিপল। হঠাৎ প্রাণীটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর ওটাকে নিচু হয়ে যেতে দেখল অর্জুন। এক মিনিট সময় চলে গেল, তবু নড়ছে না।

অমল সোম বলেছিলেন, হাতির মতো প্রাণীকেও ওই বোতাম টিপে অবশ করে ফেলা যায়, কিন্তু কতক্ষণ যায় তা বলেননি। বাঁ দিকে আলো দেখা গেল। যারা দৌড়ে পালিয়েছিল তারা আবার ফিরে আসছে প্রাণীটির সাড়াশব্দ না পেয়ে। দূর থেকে টর্চের আলো পড়ল প্রাণীটির শরীরে। অর্জুন দেখল বেচারা তার বিশাল চেহারা সত্ত্বেও পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। লোকগুলো দৌড়ে চলে এল কাছে। সম্ভবত ওরা ভেবেছে, ওদের গুলিতেই প্রাণীটি মারা পড়েছে।

তারপরের আধঘন্টা প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কাটাল ওরা। ওপর থেকে নীচে কয়েকবার আসা-যাওয়া করে প্রাণীটিকে বেঁধে ফেলল ওরা। তারপরই হুস-হুস শব্দ শুরু হল। অর্জুন বুঝল গ্লাইডার বা কপ্টারের সঙ্গে দড়ি বেঁধে এটাকে ওপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু প্রাণীটি এত ভারী যে, একে সহজে তুলতে পারছে না যন্ত্র। অর্জুন নিঃশব্দে চার্লসকে নিয়ে দ্বিতীয় পথটা ধরে ওপরে উঠে আসতে লাগল। একেবারে শেষ ধাপে পৌঁছে দেখতে পেল গ্লাইডারের চেয়ে বড় একটি আকাশযানে দড়ি ওপরে টানছে। নীচে দাঁড়িয়ে একজন নির্দেশ দিচ্ছে। অর্থাৎ এখানে মাত্র দু'জন মানুষ রয়েছে।

ওরা আড়াল রেখে উঠে এল।

প্রায় আধঘন্টার চেষ্টায় প্রাণীটিকে ওপরে তুলল যন্ত্র। নীচের চারজন ইতিমধ্যে উঠে এসেছে। ছবির পর ছবি তুলছে ওরা। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল। ওদের ভাষা কিছুই বুঝতে পারছিল না অর্জুন। তার চোখ এখন প্রাণীটির দিকে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। প্রাণীটির কাঁধ থেকে লেজ পর্যন্ত পিঠ জুড়ে ছোট-ছোট শক্ত পাখা উঁচু হয়ে রয়েছে। এই ধরনের প্রাণী একসময় উত্তর আমেরিকায় দেখা যেত। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'স্টেগোসর'। প্রচণ্ড শক্তিধর হলেও এই প্রাণীর ঘিলুর ওজন মাত্র আড়াই আউন্স। স্টেগোসরের ছবি সে দেখেছে। এরা মূলত তৃণভোজী এবং ডিম পাড়ত। কিন্তু কয়েক লক্ষ বছর আগে যে প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার ফসিল হওয়া ডিম থেকে এই জীব বেরিয়ে এসেছে, কেউ কল্পনাও করতে পারবে না! অবশ্য পৃথিবীতে রহস্যময় ঘটনা তো ঘটেই চলেছে।

হঠাৎ প্রাণীটি নড়ে উঠল। আলোচনায় ব্যস্ত থাকা লোকগুলো প্রথমে দেখেনি। অর্জুন দেখল এবার প্রাণীটি কাত হয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করছে। এইসময় লোকগুলো চেঁচিয়ে উঠল। দ্বিতীয় বোতামটা টিপতে গিয়েও থেমে গেল অর্জুন। দেখাই যাক না! লোকগুলোর চিৎকারে ঘাবড়ে গিয়ে লেজ নাড়ল প্রাণীটি। সঙ্গে পাশে দাঁড় করানো যন্ত্রটি দুমড়ে ভেঙে পড়ল ওর ওপর। লোকগুলো মরিয়া হয়ে গুলি চালাতে লাগল। কিন্তু কোনও গুলিই প্রাণীটির চামড়া ভেদ করতে পারছে না। তার বদলে কপ্টারের ট্যাঙ্কে আগুন ধরে গেল। সেই জ্বলন্ত পেট্রল প্রাণীটির শরীরে পড়ামাত্র বীভৎস ঘটনা ঘটল। জ্বলন্ত প্রাণীটি ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকগুলোর ওপর। একজন প্রাণভয়ে পালিয়ে আসছিল এদিকে। অর্জুন তাকে আঘাত করতে

সে মাটিতে পড়ে গেল। আর তৎক্ষণাৎ চার্লস হাত চালিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলল।

কিছু করার ছিল না। চোখের সামনে প্রাণীটির সৎকার হয়ে গেল। যাওয়ার আগে সে অবশ্য চার-পাঁচ শত্রুকে মেরে ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। পরে, অর্জুন শুধুই আক্ষেপ করেছে, এই প্রাণীটিকে বাঁচাতে পারেনি বলে। দ্বিতীয়বার বোতাম টিপে অজ্ঞান করে দিলে হয়তো সেই সুযোগ পাওয়া যেত। পাঁচটি মৃতদেহের পাশে একটা ঝলসানো মাংসের স্তূপ পড়ে আছে। যা হয়তো বৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করবে, সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবে।

লোকটিকে বয়ে নিয়ে এল ওরা। জ্ঞান হওয়ার পরও ওর পক্ষে হাঁটা সম্ভব ছিল না। তখন গ্রামের মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে। ভিলেজ সেন্টারে নিয়ে এসে মিস্টার জোন্সকে খবর দিল অর্জুন। সেই রাতেই ভিড় জমে গেল সেন্টারের সামনে। পাহাড়ে যারা আগুন জ্বালে তাদের একজনকে ধরা গেছে। দেখার কৌতূহল প্রত্যেকের। অনেক কষ্টে সবাইকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। অর্জুন ডেরেককে বলল তাদের ডাক্তারের কাছ থেকে সেই পুরিয়া এনে লোকটাকে খাওয়াতে। ওকে একটা ঘরে বন্দি করে রাখা হল।

পরদিন সকালে লোকটাকে একটু সুস্থ মনে হল। প্রথমে লোকটা এমন ভান করছিল, যাতে মনে হচ্ছিল সে ভাষা বুঝতে পারছে না। কিন্তু অর্জুন ওকে চিনতে পেরেছিল। সেই লোকটাই বিকেলে গ্লাইডারে উড়ে এসে চার্লসের সঙ্গে কথা বলেছে। ইশারায় কথা বললেও চার্লসের লেখা পড়েছে। যে ইংরেজি পড়তে পারে, সে কথা বলতে পারবে না? ভাঙা-ভাঙা হলেও তো পারা উচিত। অর্জুন চাপ দিতে লাগল। শেষপর্যন্ত মুখ খুলল লোকটা।

"আমরা আছি এখান থেকে তিরিশ মাইল দূরে ভুটানের জঙ্গলে। আমাদের ধর্মগুরু মারা যাওয়ার পর শয়তানের অভিশাপ নেমে আসছিল। ধর্মগুরু বলেছিলেন তাঁর পুনর্জন্ম হবে ভারতবর্ষে, কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে নয়। আমাদের গনৎকাররা বলেছিল ধর্মগুরু সেই জায়গায় জন্মেছেন, যেখানে এখন পৃথিবীর আদিম প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। আমরা অনেক খুঁজেছি গত দু'বছর ধরে। শেষপর্যন্ত ওই পাহাড়ে আমরা অভিযান চালাই। আমরা একটা জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে চারপাশ খুঁজতাম। এই গ্রামের অস্তিত্ব জানার পর আমরা নিঃসন্দেহ হই ঠিক জায়গায় এসেছি। ক'দিন আগে হঠাৎই একটা আদিম গাছের ভেতর ডিমটাকে আবিষ্কার করি। এটাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় অসাবধানে নীচে পড়ে যায়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওটা থেকে বাচ্চা বেরিয়ে সেটা এত বড় হয়ে যাবে কেউ কল্পনা করিনি!" লোকটা কাতর গলায় বলল।

"এখন আপনার কী চাই?"

"এই গ্রামে আমাদের ধর্মগুরু আছেন। তাঁকে সসম্মানে নিয়ে যেতে চাই।"

"আপনি যাকে ধর্মগুরু বলছেন সে দু' বছরের শিশু। তার কোনও চৈতন্য হয়নি। সে তার মাকে এবং মা তাকে ছেড়ে কী করে থাকবে? কোনও মা কি সন্তানকে ছেড়ে থাকতে পারে, ছেড়ে দেয়?"

"আমরা ওর মাকেও নিয়ে যেতে পারি, যদি যেতে চান!"

"আপনারা পাগলামি করছেন। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যায়। তখন তার স্মৃতি পড়ে থাকে।"

"না। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আবার জন্মেছেন।"

"কিছু প্রমাণ আছে?"

"আছে। সেই শিশুর দুই ভুরু জোড়া হবে এবং ডান হাতে রেখা থাকবে না।"

অর্জুন কথা না বাড়িয়ে ওপরে চলে এল। প্রথমেই সে গম্ভীর শিশুটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অর্জুনের সঙ্গে ডেরেক এবং মিসেস বেনসন আছেন। শিশুটির ভুরু জোড়া নয়।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। একে-একে সবক'টি ছেলেকে দেখা হল। না, কারও সঙ্গে ওই বর্ণনার মিল নেই। চলে আসছিল অর্জুন। হঠাৎ বাকি দুটি মেয়ের একজনের দিকে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল । শিশুটির ভুরু জোড়া। কাছে গিয়ে ওর ডান হাত তুলে মুঠো খুলতেই দেখতে পেল হাতে কোনও রেখা নেই।

মিসেস বেনসন আর্তনাদ করে উঠলেন। সেই বাচ্চার মা দু' হাতে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর সন্তানকে। অর্জুন তাঁকে বলল, "ভয় পাবেন না। ভয় পাওয়ার মতো কিছু হয়নি।"

সেই দুপুরে মিস্টার মুরহেডের পারলৌকিক কাজ সম্পন্ন করা হল।

সেই সকাল থেকেই বন্দির শরীর অসুস্থ হল। তার গায়ে বেশ জ্বর। ওকে জেরা করার অবকাশ পাওয়া যায়নি।

রবিবার সকালে অমল সোম এলেন পুলিশ অফিসারের জিপে চেপে। ডেরেক তাঁকে অভ্যর্থনা জানাল। এই গ্রাম এবং তার মানুষদের দেখে তিনিও বেশ অবাক! অর্জুনের ঘরে এসে তিনি বললেন, "বেশ ভালই তো ছিলে বলে মনে হচ্ছে।"

"ছিলাম কিনা জানি না । কিন্তু একটা অন্যায় করে ফেলেছি।"

"কীরকম?"

অর্জুন তখন বিশদ জানাল। পাহাড়ে আগুন, স্টেগোসর, কপ্টার ভাঙা, আগুন লাগা এবং সেই পাঁচজনের মৃতদেহ পাহাড়ে পড়ে থাকা, সব। অর্জুন বলল, "আমার উচিত ছিল থানায় জানানো। কিন্তু খবরটা গ্রামের বাইরে গেলে আজ যাদের আসার কথা তারা আসবে না, এই ভয়ে জানাইনি।"

"এখান থেকে কত দূরে?"

"বেশি সময় লাগবে না।"

অমল সোম পুলিশ অফিসারকে ডেকে বুঝিয়ে বললেন। অফিসার সঙ্গে-সঙ্গে

কয়েকজন সেপাইকে পাঠিয়ে দিলেন স্পটে। চার্লস ওদের পথ দেখাল।

শিশুরহস্য শোনার পর অমল সোম বললেন, "ডেরেকের কাকার হত্যাকারী কে?"

"ওই বিদেশিদের কেউ হবে।"

"হতে পারে, নাও হতে পারে। ওই ভদ্রলোক ছবি তুলতেন। সেই ছবিতে নিজেকে দেখতে চায় না এমন লোক বিদেশিরা হবে কেন? তারা তো তোয়াক্কাই করবে না। যে করবে সে এখানকার লোক।" অমল সোম বললেন, "ডেরেক, তুমি রটিয়ে দাও, যেসব ছবি তুমি আমার কাছে নিয়ে গিয়েছিলে তা আমি সঙ্গে এনেছি।"

ডেরেক মাথা নেড়ে চলে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তা হলে চার্লসকে সন্দেহ করতে হয়।"

কেউ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এমনকী ডেরেকও। এই ব্রিফকেসটা তোমার টেবিলে রাখো। দাঁড়াও, অ্যালার্মটা সেট করে দিই।" অমল সোম ব্রিফকেসের বোতাম টিপে অর্জুনকে দিলেন। সেটা টেবিলে রেখে দিল অর্জুন।

বেলা বারোটায় দু'জন লোক এবং দোভাষী গ্রামে এল।

মিস্টার জোন্স তাদের নিয়ে এলেন ভিলেজ সেন্টারের সামনে। জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল চারপাশে। অর্জুন এবং অমল সোম পুলিশ অফিসারকে নিয়ে ভিড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দোভাষী বিনীত গলায় বলল, "আপনাদের বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। আপনারা আমাদের প্রস্তাব কি বিবেচনা করেছেন?"

মিস্টার জোন্স বললেন, "সেটা সম্ভব নয়।"

দোভাষী বলল, "আমাদের ধর্মগুরু আপনাদের এখানে যে আছেন সে-ব্যাপারে আমরা নিঃসন্দেহ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য।"

মিস্টার জোন্স বললেন, "এখানে কোনও ধর্মগুরু নেই।"

ডেরেক বলল, "আপনারা যদি শিশুদের দেখে সন্তুষ্ট হতে চান তা হলে তাদের নিয়ে আসছি।"

"দয়া করে আনুন।"

ন'টি শিশুকে নিয়ে আসা হল। আগন্তুকরা গভীর আগ্রহে তাদের পর্যবেক্ষণ করল। ক্রমশ হতাশা ফুটে উঠল তাদের মুখে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করল তারা। এবার অমল সোম এগিয়ে গেলেন, "আপনাদের সমাজে নারীর স্থান কীরকম? তারা কি ধর্মাচরণ করে?"

দোভাষী বলল, "ধর্মের অনুশাসন তাদের মানতে হয়। কিন্তু তাদের ওপর দায়িত্ব সংসার দেখাশোনা করা। কোনও ধর্মীয় ব্যাখ্যা অথবা ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া নিষেধ।"

অমল সোম বললেন, "তা হলে তো আপনাদের ফিরে যেতে হয়।"

দোভাষী বলল, "এই ন'জনই ওই বয়সের শিশু এই গ্রামে আছে? আর কেউ নেই তো! সন্দেহের কারণ, আমাদের গনৎকাররা ভুল করেন না।"

"আছে। তারা মেয়ে। দেখবেন?"

"না। মেয়ে হয়ে আমাদের ধর্মগুরু জন্মাতে পারেন না। তাকে কেউ মেনে নেবে না।"

এই সময় চার্লস সেপাইদের নিয়ে ফিরে এল।

পাহাড়ের অনেকটা খুঁজে ওরা কোনও মৃতদেহ পায়নি। এমনকী সেই প্রাণীটির শরীরের কোনও অবশিষ্ট নেই। অবশ্য কপ্টারের ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে সেখানে। পাঁচটি মৃতদেহ উধাও হয়ে গিয়েছে।

পুলিশ অফিসার বললেন, "বাঁচা গেল!"

দোভাষী বলল, "আপনারা যাদের মৃতদেহ খুঁজছেন তারা কারা?"

অমল সোম বললেন, "পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়ে ভয় দেখাচ্ছিল কিছু বিদেশি। তারাই ওখানে এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে।"

"দুর্ঘটনা ঘটেছিল?"

"হ্যাঁ। বোধ হয় কপ্টারে আগুন ধরে গিয়েছিল।"

"আপনার ভুল করছেন। কেউ আপনাদের ভয় দেখাতে চায়নি। পাহাড়ে আগুন জ্বেলে ওরা সম্ভবত কোনও আদিম প্রাণী খুঁজছিল। আমাদের গনৎকাররা তাই বলেছেন। সেই প্রাণীকে ওরা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু পাঁচজন নয়, ছ'জনের ওখানে থাকার কথা।"

এবার ডেরেক বন্দিকে বের করে নিয়ে এল। সে এখনও পুরো সুস্থ নয়। তাকে দেখে ওরা ছুটে গেল। নিজেদের ভাষায় কথা বলতে লাগল।

দোভাষী বলল, "আমরা নিঃসন্দেহ, শিশুটি এখানে আছে।"

"আছে।" অমল সোম বললেন। তাঁর নির্দেশে শিশুকন্যাকে নিয়ে আসা হল। তার ভুরু এবং হাতের রেখা দেখে ওরা দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেলল। বারংবার মাথা নেড়ে কাঁদতে শুরু করল।

অমল সোম বললেন, "এই মেয়েকে কি আপনারা চান?"

ওরা মাথা নাড়ল, "না।"

ওরা ফিরে যাচ্ছিল। কিন্তু অফিসার ওদের আটকালেন, "আপনাদের আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।"

দোভাষী জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"অনেক অভিযোগ। ভারত সীমান্তে বেআইনি আকাশযান ব্যবহার করা, বন্যপ্রাণী হত্যা, এদের ভয় দেখানো। ওখানে গিয়ে সেসব শুনবেন।" অফিসারের ইঙ্গিতে সেপাইরা ওদের হাতকড়া পরিয়ে দেওয়ামাত্র সেন্টারের ভেতর থেকে অ্যালার্ম বাজার আওয়াজ ভেসে এল।

অর্জুন দৌড়ে ভেতরে যেতেই ওপর থেকে এডকে নেমে আসতে দেখল

ভয়ার্ত মুখে। সে চিৎকার করে বলল, "মিস্টার এড, আপনি!"

এড ধরা পড়ল। চাপের মুখে এড স্বীকার করল। চার্লসের কথা শুনে তার মনে লোভ জেগেছিল। কিন্তু চার্লসের সঙ্গী হয়ে নয়, আলাদা আগন্তুকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টাকাটা পেতে চেয়েছিল সে। তার সন্দেহ হয়েছিল পাহাড়ে আগুন জ্বলার সঙ্গে আগন্তুকদের সম্পর্ক আছে। সে সাহস করে ওইরকম আগুন জ্বলার সময় পাহাড়ে গিয়েছিল। আর তখনই বৃদ্ধ ফোটোগ্রাফার ছবি তোলেন। তার ভয় হচ্ছিল তাকে পেলে কথা উঠবে। তাই সে প্রথমবার নেগেটিভ এবং ছবি চুরি করে। কিন্তু তাতে তার ছবি ছিল না। সে দ্বিতীয়বার ভাল করে দেখতে বৃদ্ধের ডার্করুমে ঢুকলে বৃদ্ধ জেগে ওঠেন। সে পালায়। বৃদ্ধ তাকে অনুসরণ করেন। সে আগুনের দিকে এগিয়ে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। তখন বৃদ্ধ পেছন থেকে তার কিছু ছবি তুলেছিলেন। ওই কারণেই নিজেকে বাঁচাতে সে সবাই চলে গেলে বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করে এবং তাকে খুন করতে বাধ্য হয়। ফিল্ম নিয়ে সে জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। আজ যখন শোনে গোয়েন্দার ব্রিফকেসে বৃদ্ধের তোলা ছবি আছে, তখন প্রমাণ লোপ করার জন্য সে ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। অর্জুন এডের জুতো পরীক্ষা করল। জানলার নীচের ছাপের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই।

আততীয় এবং আগন্তুকদের নিয়ে অফিসার নেমে গেলেন তাঁর গাড়িতে। মিস্টার জোন্স একটা প্যাকেট এগিয়ে দিলেন অমল সোমের হাতে।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"সামান্য সম্মানদক্ষিণা।"

অমল সোম মাথা নাড়লেন, "এটা এখানকার বাচ্চাদের জন্যে খরচ করবেন। এই গ্রামে এসে যে অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে, তার মূল্য টাকার চেয়ে অনেক বেশি।"

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ডেরেকের গাড়ি করে ওঁরা ফিরছিলেন। হঠাৎ খেয়াল হতে অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ঘড়িটা কোথায়?"

অর্জুন তাড়াতাড়ি পকেট থেকে বের করে দিয়ে বলল, "এটা খুব উপকার করেছে।"

অমল সোম সেটা দেখতে-দেখতে বললেন, "হুঁ। কভার দেখছি না। সেটা কই?"

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল, "ওটা জঙ্গলে কখন পড়ে গিয়েছে, খুঁজে পাইনি।"

"এই নিয়ে দু'বার হারাল।"

"তার মানে?"

"প্রথমবার আমিই হারিয়েছিলাম। কিছুতেই সতর্ক হতে শিখলাম না আমি।"

"আমিও।" অর্জুন নিচু গলায় বলল।

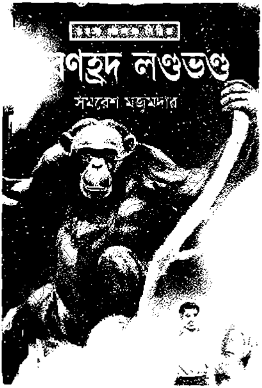

লবণহ্রদ লণ্ডভণ্ড

আজ সাতই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার। কাল মাঝরাত থেকে ঝুপঝুপিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। একসময় বৃষ্টির দিনরাতগুলো আমার ভাল লাগত। তখন বয়স কম ছিল। এখন বৃষ্টি পড়লে বিরক্ত লাগে। এ-সময় আমি কোনও কাজ করতে পারি না। মুক্ত আকাশ না হলে আমার মেশিনগুলো অচল। অতএব এই ভোরবেলায় আমার দোতলার বারান্দায় বেতের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছি।

ঠিক আমার পায়ের দু'পাশে ওরা দু'জন বসে আছে। একটার নাম সার, অন্যটার নাম মেয়। দুটো কুকুরের জন্মদিন এক, দেখতেও হুবহু একই রকম। এদের পূর্বপুরুষরা এদেশি। সেন্ট্রাল পার্কের কোণে জড়োসড়ো হয়ে পড়ে থাকা একদিনের বাচ্চাদুটোকে আমি নিয়ে এসেছিলাম। আজকাল নেড়িকুকুর কেউ বাড়িতে পোষে না, কিন্তু এদের দেখলে কে এখন নেড়ি বলবে? তিন বছর ধরে মুরগির মাংস আর ক্যাপসুল খেয়ে এখন বেশ তাগড়াই হয়ে গেছে। সার বসে আছে তার সামনের দুই থাবায় মুখ রেখে। চোখ দুটো সতর্ক ভঙ্গিতে খোলা। বারান্দায় রেলিংয়ে গড়িয়ে পড়া জলের ফোঁটাকেও ও বোধ হয় সন্দেহ করছে। এই কুকুরটার দেখেছি খুব সন্দেহ বাতিক। মেয় পাশ ফিরে শুয়ে দিব্যি ঘুমিয়ে আছে। এমন আরামপ্রিয় অলস কুকুর পৃথিবীতে আর আছে কিনা আমার জানা নেই। দুটোর স্বভাবে কোনও মিল নেই শুধু একটি ব্যাপার ছাড়া। আরশোলা দেখলে দুটিতেই ভয়ে ছুটে গিয়ে লুকোয় আমার ওয়ার্ডরোবের তলায়।

এই কুকুর দুটো আমায় ইদানীং চিন্তায় ফেলেছে। একদিনের বাচ্চাকে মানুষ করা যে কী ঝামেলার, তা যে করেনি সে বুঝতে পারবে না। তার ওপর একসঙ্গে দু-দুটো। তা ওরা যখন একটু বড় হল, তখন আবিষ্কার করলাম দু'জনের কেউ ডাকাডাকি করে না। বাড়িতে কুকুর আছে দুটো, অথচ ঘেউ-ঘেউ শব্দ নেই। রাগিয়ে দিয়ে দেখেছি রাঙা চোখে তাকায়, দাঁত বের করে ভয় দেখায়, কিন্তু গর্জন করে না। শেষপর্যন্ত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম এ দুটো বোবা। যমজদের ধরনধারণ একরকমের হয় বলে শুনেছি, কিন্তু দুটো কুকুর একসঙ্গে বোবা হবে, এমনটা শুনিনি। একসঙ্গে জন্মেছে, দেখতেও একই রকম

বলে যমজ-যমজ ভাবা যেতে পারে।

সার এবং মেয় হুঙ্কার দেয় না, ডাকাডাকি করে না জানার পরও ওদের ফেলতে পারিনি। আসলে মেয়-র চাহনি দেখে আমার মায়া পড়ে গিয়েছিল। ওকে রেখে সারকে বিদায় করা যায় না। কিন্তু এক বছরের মাথায় সার তার বিক্রম দেখিয়ে আমাকে মুগ্ধ করল! মধ্যরাতে চোর ঢুকেছিল বাড়িতে। ব্যাটা একটা ছিঁচকে চোর। ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে আমি সবে বিছানায় শুয়েছি, এই সময় পরিত্রাহি চিৎকার কানে এল। আলো জ্বালাতেই হেলতেদুলতে মেয় এল আমার ঘরে। আমার পাজামার ঢোলা কাপড় ধরে টানতে লাগল। ওকে অনুসরণ করে দেখলাম ভেতরের বারান্দায় একটি লোক চিত হয়ে পড়ে আছে আর সার তার বুকের ওপর থাবা রেখে বীভৎস দাঁতগুলো দেখিয়ে যাচ্ছে। অনেক ডাকাডাকি করে সারকে ওখান থেকে সরাতে পারলাম। লোকটা হাউমাউ করে কেঁদে আমার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। পেটের জ্বালা সইতে না পেরে চুরি করতে এসেছিল বলে জানাল। তখন মাঝরাত। পুলিশকে ফোন করে ডেকে এনে তাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম। কিন্তু তাতে লোকটা চড়চাপড় একটু বেশি পরিমাণে খেত, মাসখানেকের জেলও হয়তো হত, কিন্তু আরও চুরির জন্যে মরিয়া হত। লোকটা যে পেশাদার চোর নয়, তার প্রমাণ ওর সঙ্গে কোনও অস্ত্র ছিল না। থাকলে সারকে মেরে ফেলে পালিয়ে যেতে পারত।

লোকটার নাম গঙ্গাপদ। কিচেন খুলে ওকে খেতে দিলাম। জানলাম বাড়িতে বৃদ্ধা মা ছাড়া আর কেউ নেই। বাগানে মালীর কাজ করত। এখন বেশিরভাগ লোকই ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকে। মালীর কাজটা গিয়েছে। কোনও বিকল্প না পেয়ে এই পেশায় নেমেছিল। খাওয়াদাওয়ার পর লোকটিকে বিদায় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু পরদিন সকালেই সে ফিরে এল। বলল, সে বাঁচতে চায়। আমি যদি তাকে সাহায্য করি তা হলে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। একবার ভাবলাম। তারপর রাজি হয়ে গেলাম। সেই থেকে গঙ্গাপদ এ-বাড়ির কাজে লেগে গেছে। এর মধ্যে তার মা মারা যাওয়ার পর কোনও পেছনটান নেই। গঙ্গাপদর কাজকর্ম দেখে আমি মুগ্ধ। আমার কখন কী প্রয়োজন তা সে দু'দিনেই বুঝে নিয়েছে। কিন্তু সার ওকে কিছুতেই স্বস্তিতে থাকতে দেয় না। মানুষের জীবনে যে পরিবর্তন আসতে পারে তা বোঝার মতো বুদ্ধি জন্তুদের নেই। সারের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে কিছুক্ষণ অন্তর-অন্তর গঙ্গাপদকে দেখে আসা। এই যেমন এখন বৃষ্টির ফোঁটা ছেড়ে সে ভেতরে চলে গেল। আমি জানি সে গঙ্গাপদকে দেখতে গেছে।

দুপুরের দিকে বৃষ্টি কমল। কিন্তু আকাশের দখল রাগী মেঘেরা ছাড়েনি। মেঘমুক্ত আকাশ না হলে আমার কাজকর্ম বন্ধ। তবু আমি ছাদের ঘরে গেলাম। ওই ঘরেই আমার সব যন্ত্রপাতি রয়েছে। ভারী দরজার তালা খুলে

ভেতরে পা দিতেই বিরক্তিটা বাড়ল। একটা দিন মিছিমিছি নষ্ট হল মেঘের জন্যে। এই ঘরের ছাদ সিমেন্ট-পাথরের নয়; বিশেষ কায়দায় পাতলা ইস্পাতের চওড়া পাত রবারে মোড়া, সুইচ টিপলে যা মাঝখান থেকে সরে যায়। সরে গিয়ে আকাশটাকে দেখিয়ে দেয়। রবারে মোড়া বলে তেমন গরম হয় না দিনের বেলায়। ঘরটি বড় এবং প্রচুর যন্ত্রে ঠাসাঠাসি। মাঝে-মাঝে মনে হয় যেগুলো নিত্য লাগে না সেগুলো সরিয়ে ফেলে চলাফেরার সুবিধে করি। কিন্তু কখন যে কার প্রয়োজন হবে কে বলতে পারে! ঘরের মাঝখানে যে যন্ত্রটা অনেকটা ঢেঁকির মতো উঁচিয়ে আছে, সেটি আমার দীর্ঘ জীবনের সাধনার ফল শব্দ আলোর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। আলো যে প্রচণ্ড শক্তিশালী তা নানাভাবে প্রমাণিত। এমনকী মানুষের শরীরের চিকিৎসার জন্যে নিয়ন্ত্রিত আলো ব্যবহৃত হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই যা দুর্বল তার প্রতি আমার আকর্ষণ বেশি। হয়তো সে-কারণেই শব্দ নিয়ে এককালে গবেষণা শুরু করেছিলাম। পৃথিবীতে যেসব শব্দ বাজে তার অনেকটা দূষণসীমার বাইরে হলেও, বলতে বাধ্য হচ্ছি, আকাশে বেজে যাওয়া শব্দমালার তুলনায় কিছুই নয়। সেইসব মহাশব্দের অতি সামান্যই পৃথিবী স্পর্শ করে। মেঘে-মেঘে ঘর্ষণ লেগে যে আওয়াজ, যা আমাদের কানে তালা লাগিয়ে দেওয়ার উপক্রম করে, তার শক্তিও তো কম নয়!

ওই মহাশব্দের সন্ধানে ছিলাম এতকাল। ওই শব্দ সংগ্রহ করে সুচের মতো সরু করে নিলে এই পৃথিবীতে যা ইচ্ছে তাই করে ফেলা যায়। আলো মানুষের শরীরে গজিয়ে ওঠা উৎপাদগুলো বিনা অস্ত্রোপচারে ছেঁটে ফেলতে পেরেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই উন্নতি আমাদের উপকার করেছে। কিন্তু আলোর তীক্ষ্ণতা শুধু ছেদন করতে পারে, ধ্বংস করতে পারে কিন্তু বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে না। মানুষের শরীরের গতিপ্রকৃতির সম্পূর্ণ আন্দাজ চিকিৎসকরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি। শরীরের ভেতর গজিয়ে ওঠা কোনও-কোনও উৎপাদ সামান্য আঘাতে দ্রুত বিস্তৃত হয়ে মৃত্যুকে ডেকে আনে। তা অস্ত্রের আঘাত হোক অথবা আলোর। এই ক্ষেত্রে আবার শব্দকণা কাজ করতে পারে বলে মনে করছি। ওই বিপুল শক্তিশালী শব্দকণাকে নিয়ন্ত্রণে রেখে শরীরের বাড়তি বিপজ্জনক উৎপাদের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তা কল্পনা করে আমি শিহরিত হচ্ছি। যেভাবে ডিনামাইট একটি টিলাকে উড়িয়ে দিয়ে জায়গাটিকে সমতল করে দেয় নিমেষে, ঠিক সেইভাবে শরীর তার পূর্বাবস্থা ফিরে পাবে। এই আবিষ্কার শেষ হলে মানবজাতির বড় কল্যাণ হবে। এই আবিষ্কারের কোনও নামকরণ আমি এখনও করিনি। ওটা নিয়ে ভাবতে হবে।

মাসকয়েক আগে লন্ডনে যেতে হয়েছিল। আমার পরিচিত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী বব উইলসের সৌজন্যে ব্রিটিশ বিজ্ঞান কনফারেন্সে কথা বলার সুযোগ

পেয়েছিলাম। সে-সময় আমি আমার গবেষণা নিয়ে ধন্দে ছিলাম। এই মেশিনটা সম্পূর্ণ হয়নি তখন। আকাশের বিপুল শব্দমালার সন্ধান পাচ্ছি, কিন্তু তাদের সংগ্রহ করে পৃথিবীতে নিয়ে আসার পদ্ধতিটিতে গোলমাল হচ্ছে। বব আমার কাজকর্মের কথা জানত। সে-ই পরামর্শ দেয় লন্ডনে যাওয়ার। পৃথিবীতে কোনও-না-কোনও বিজ্ঞানী হয়তো একই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন অথবা আমার বিষয়ের কথা জেনে কেউ নতুন আলোকপাত করতে পারেন, সম্মেলনে গেলে এরকম সম্ভাবনা থাকে। ববের পরামর্শ মেনে নিয়েছিলাম। তিনদিনের সম্মেলন। আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল প্রথম দিনেই। আমার বক্তব্য শুনে সবাই বেশ অবাক বলে মনে হল। পরদিন কয়েকটা কাগজ খবরটা ছেপে মন্তব্য করল, বিজ্ঞান যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে শব্দ নিয়ে এই গবেষণা একশো বছর পর পূর্ণতা পেলেও পেতে পারে। অর্থাৎ আমি এবং আমার পরের প্রজন্ম যখন থাকব না পৃথিবীতে, তখন কোনও গবেষক সফল হলেও হতে পারেন। এ যেন ভদ্রতা দেখিয়ে ঘুরিয়ে বোকা বলা।

তৃতীয় দিনের সকালবেলায় ববের সঙ্গে বেড়াতে-বেড়াতে ট্রাফালগার স্কোয়ারে গিয়েছিলাম। এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগে। ব্রিটিশদের এককালে সিংহ বলা হত। পৃথিবীর অনেকটাই তারা জয় করেছিল ছলে বলে কৌশলে। ট্রাফালগার স্কোয়ারের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে দুর্দান্ত দেখতে পাথরের সিংহ। আর সেইসঙ্গে ছড়িয়ে থাকা পায়রার ঝাঁক।

চারপাশ দিয়ে লন্ডনের গাড়িগুলো ছোটাছুটি করছে, মাঝখানের বিরাট বাঁধানো চত্বরটা চমৎকার শান্ত হয়ে রয়েছে। এই সময় বব বলল, "আরে দ্যাখো কাণ্ড, কার্ল সিংহের সওয়ার হওয়ার চেষ্টা করছে। হেই কার্ল, ওটা করতে যাচ্ছ কেন ? পড়ে গেলে দেখতে হবে না !"

আমি দেখলাম একজন প্রবীণ সাহেব অনেকটা উঁচুতে সিংহের পায়ের কাছে পৌঁছে ডাক শুনে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে হাসলেন। বব আরও কয়েকবার চেঁচামেচি করায় ভদ্রলোক হাত ছেড়ে দিয়ে কোনওমতে শরীর বাঁচিয়ে নীচে নেমে এলেন।

বব বলল, "যাক, আমার কথা শুনেছ বলে ধন্যবাদ।"

কার্ল বললেন, "না হে ! এই ভদ্রলোককে দেখে নেমে এলাম। আপনার গবেষণার বিষয় আমাকে উৎসাহিত করেছে। আমিও শব্দ নিয়ে সামান্য কাজকর্ম করছি। আমার নাম কার্ল বেকার।"

পরিচয় হল। ভদ্রলোক থাকেন হামবুর্গে। নিজের গবেষণার ব্যাপারে কিছুই না বলে আমার ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। এটাকে বিনয় বলে মনে হয়েছে আমার। আমার যে যন্ত্রটা শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করছে না, সেটার ব্যাপারে তিনি কৌতূহল দেখালেন। এই সময় বব আমাকে চোখ টিপে সতর্ক করল। আমি বুঝলাম নিজের সব গোপন তথ্য জানাতে সে নিষেধ করছে।

আমি ভাসা-ভাসা বললাম। এভাবে বলতে আমার খারাপ লাগছিল।

ফিরে আসার তিন সপ্তাহ পরে কার্লের চিঠি পেলাম। আমার সঙ্গে আলাপ করে, তিনি রীতিমতো উত্তেজিত। আমার যন্ত্রটার ব্যাপারে তাঁর মতামত জানিয়েছেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলেই আমার হাসি পায়। বব ইশারা করায় আমি আমার যন্ত্রটার বিপরীত চিত্র কার্লের কাছে তুলে ধরেছিলাম। কার্ল লিখেছেন সেই কল্পিত বিপরীত যন্ত্র নিয়ে তাঁর মন্তব্য। অনেক সময় ছেলেবেলায় অঙ্ক কষতে গিয়ে আটকে গেলে উলটো দিক থেকে করতে-করতে সেটা বুঝে ফেলতাম। খুব কম ক্ষেত্রেই এমনটা হয়। এবার হল। কার্লের একটা উপদেশ কাজে লাগিয়ে আমার যন্ত্রটাকে দারুণ শক্তিশালী করলাম। লন্ডনের সম্মেলনে গিয়ে এই বিরাট উপকার হল। তারপর কার্ল দুটো চিঠি লিখেছেন। শেষ চিঠি এসেছে মাসতিনেক আগে। তাঁকে জানিয়েছিলাম আমি তেমন এগোতে পারিনি। এ-কথাটা সত্যি নয়। কিন্তু বব আমাকে অনুরোধ করেছে যতক্ষণ না আমি সম্পূর্ণ কৃতকার্য হচ্ছি ততক্ষণ ব্যাপারটা গোপন রাখাই মঙ্গল।

এই চিন্তাটা ববই আমার মাথায় ঢুকিয়েছে। বিজ্ঞান যেমন মানুষের উপকার করে, ঠিক তেমনই অপকার করতেও তার জুড়ি নেই। কোনও শক্তিমান দেশ যদি সংগৃহীত শব্দ যুদ্ধে ব্যবহার করে তা হলে—, ব্যাপারটা ভাবলেই শরীর হিম হয়ে যায়।

আজকের দিনটাই বেকার চলে গেল! আমার বয়স হয়েছে! এই সময় একটা দিন যদি নষ্ট হয়, তা হলে খুব ক্ষতি। বাঙালিদের তুলনায় আমি খুব লম্বা। ছ'ফুট এক ইঞ্চি। লম্বা মানুষেরা দীর্ঘজীবী হয় না। তা ছাড়া আমি বেশ মোটা। খেতে খুব ভালবাসি। এখন তো গঙ্গাপদ চমৎকার রাঁধছে। যখন একা ছিলাম তখন রোজ ঘি দিয়ে ভাত মেখে আলু সেদ্ধ করে কাঁচালঙ্কা আর সরষের তেলে চটকে খেতাম। পৃথিবীর যে-কোনও উপাদেয় খাবারের চেয়ে এই মেনু আমার কাছে হাজার গুণ আকর্ষক। গঙ্গাপদকে বলে দেওয়ায় আর যা কিছু হোক এটা রাখছে। মোটা মানুষেরা বেশিদিন বাঁচে না। নীরদচন্দ্র চৌধুরী একশো বছরে পা রেখেছেন। ওঁর শরীর খাটো এবং রোগা। আমার পিতৃদেব গিয়েছিলেন পঞ্চান্নতে, আমি তবু পনেরো বছর বেশি টানছি। অবশ্য আমার কোনও রোগবালাই নেই, এই রক্ষে!

সন্ধের মুখে অবনীমোহন এলেন। সময় পেলেই তিনি আসেন। জানবার কৌতূহল তাঁর খুব। ওঁর সঙ্গে কথা বলে বেশ আরাম পাই। অবনীমোহন লোক্যাল থানার ওসি। বাইশ বছর পুলিশে চাকরি করেও চমৎকার ভদ্রলোক হয়ে আছেন। ইদানীং পুলিশ সম্পর্কে আমাদের ধারণা বেশ বদলেছে। লালবাজারে অনেক আই পি এস অফিসার আছেন, যাঁরা ইচ্ছে করলে অধ্যাপনা করতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের গান গীতবিতান না দেখে গাইতে পারেন,

কথাবার্তায় শিক্ষার ছাপ আছে। অবনীমোহন অবশ্য আই পি এস নন তবু রীতিমতো ভদ্রলোক। সামনের চেয়ারে বসে অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার গঙ্গাপদ কীরকম কাজকর্ম করছে?"

বললাম, "চমৎকার।"

"বাঃ। ওকে আমাদের হাতে তুলে না দিয়ে আপনি একটি সামাজিক উপকার করেছেন। আমরা ওকে কয়েক মাসের জন্যে জেলে পুরতাম, ফিরে এসে আবার চুরিচামারি করত। লোকটা যদি চিরদিনের মতো শুধরে যায় তার চেয়ে ভাল আর কী আছে!"

"বুঝলাম। তা তুমি এই বাদলার দিনে উদয় হলে কোত্থেকে?"

"আর বাদলের দিন! এতকাল মানুষ-চোর ধরতাম, এখন জন্তু-চোর ধরতে হবে।"

"কীরকম!"

"প্রায়ই খবর আসছে, একটা বানর জাতীয় প্রাণী, সেটা হনুমান অথবা ওরাং ওটাংও হতে পারে, প্রায়ই কারও-না-কারও কিছু চুরি করছে। দোকান থেকে জিনিস তুলে উধাও হয়ে যাচ্ছে। এ-পাড়ায় গাছগাছালি বেশি। এত দ্রুত সেটা লুকিয়ে পড়ে, কেউ তার হদিস পায় না।"

"কোত্থেকে এল?"

"কেউ বলতে পারছে না। আমি তাকে চোখে দেখিনি।"

"কিন্তু বুনো জন্তুজানোয়ার তো চুরিবিদ্যায় এত দক্ষ হতে পারে না অবনী।"

"ঠিকই বলেছেন। কোনও মতলববাজ লোক ওকে ট্রেনিং দিয়েছে। আজ দোকান থেকে জিনিস তুলছে, কাল ব্যাঙ্কের টাকা ছিনতাই করবে না তা কে বলতে পারে। আমি বিকেল থেকে এই এলাকায় পাক খাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, সন্ধের মধ্যে ব্যাটা নিশ্চয়ই তার মালিকের কাছে ফিরে যাবে। ফিরে যেতে হলে ওকে দেখা দিতেই হবে। গাছপালার আড়াল তখন সে পাবে না। কিন্তু রাত নামল, তবু সে বেপাত্তা!"

আমি হাসলাম! ব্যাপারটা ভাবতে মজা লাগছিল। বানর অথবা হনুমানের বুদ্ধি খুবই সীমায়িত। একমাত্র ওরাং ওটাংই মানুষের কাছাকাছি বুদ্ধি ধরতে পারে। অবনীমোহন চলে গেলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলাম। টিভি বলছে আগামীকাল মেঘমুক্ত আকাশ পাওয়া যাবে। তাই ভোর চারটের মধ্যেই ঘুম থেকে উঠতে হবে।

খাওয়াদাওয়া শেষ করে গঙ্গাপদ বলল, "বাবু, আপনি যদি অনুমতি দেন, তা হলে এখন থেকে এ-বাড়িতেই আমি থেকে যেতে পারি। মা-বাবা নেই, বস্তিতে ঘরভাড়া করে থাকি, শুধু শুতেই তো যাই।"

কয়েক বছর আগে হলে বিরক্ত হতাম। আমি একা থাকাই পছন্দ করি।

একটা লোক নাকের ডগায় ঘুরঘুর করছে, এটা আমার ভাল লাগত না। কিন্তু ওই লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর আমি যেন বেশ দুর্বল হয়ে গিয়েছি। গঙ্গাপদর কথা শুনে ভালই লাগল। বয়স হয়েছে, রাতবিরেতে প্রয়োজন হলেও কাজে লাগবে। বললাম, "বেশ। আমার আপত্তি নেই।"

"তা হলে সামনের রবিবার থেকে থাকব। সেদিন মাসপয়লা।"

গঙ্গাপদ চলে গেলে দরজা বন্ধ করে শোয়ার ঘরে এলাম। আগে এসব প্রায়ই অগোছালো থাকত । গঙ্গাপদ আসার পর শ্রী ফিরেছে। বিছানায় শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুম এসে গেল। ঈশ্বর এই আশীর্বাদিটি আমাকে করেছেন, ঘুমের বড়ি খেতে হয়নি কোনওদিন।

॥ ২ ॥

অদ্ভুত হুটোপুটির আওয়াজ আমার ঘুম ভাঙাল, সঙ্গে-সঙ্গে কানে এল কুঁই-কুঁই শব্দ। একটু অবাক হলাম। সার অথবা মেয় কখনওই ওই শব্দ করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। আজ কী হল! আলো জ্বালতেই দেখলাম সার তার বীভৎস দাঁত বের করে আলমারির ওপরদিকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টি অনুসরণ করতেই চমকে উঠলাম। কী ওটা? মুখ দেখা যাচ্ছে না, এদিকে পিঠ ফেরানো এবং সেই পিঠ ব্রাউন রঙের লোমে ঢাকা। আমায় উঠতে দেখে উৎসাহিত হয়ে সার লাফিয়ে খাটের ওপর উঠে আলমারির নাগাল পেতে চাইল। কিন্তু সেটা অনেক দূরত্বে হলেও জানোয়ারটা মুখ ফেরাল। ওরাং ওটাং।

লম্বা হাত-পা থাকা সত্ত্বেও ওরাং ওটাং যে সারকে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছে তা শরীরের থরথরানি দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। মুহূর্তেই অবনীমোহনের কথা মনে পড়ল। তা হলে এই সেই ওরাং ওটাং, যে চুরি করে বেড়ায়। বেচারা এখন দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকেছে কিন্তু ওর কুতকুতে চোখ আমায় দেখছে। বোধ হয় আমাকে সারের চেয়ে নিরীহ ভাবছে।

আমি দু'পা এগিয়ে যেতে বুঝলাম, ওর গলায় একটা রুপোলি চেন রয়েছে। অর্থাৎ পোষা জীব। কিন্তু এ-ব্যাটা বাড়ির ভেতর ঢুকল কী করে? সব দরজা-জানলা তো বন্ধ। সার তখনও প্রবল রাগ নিয়ে আলমারি আঁচড়ে যাচ্ছে। প্রথমে ওর গলায় চেন পরিয়ে টেবিলের পায়ের সঙ্গে বেঁধে ফেললাম। তারপর দরজা বন্ধ করে ওরাং ওটাংটাকে ডাকলাম। চার-পাঁচবার বাংলায় ডেকেও কোনও সাড়া না পেয়ে গলা চড়িয়ে ইংরেজিতে বললাম নেমে আসতে। এবার হাত সরাল মুখ থেকে, সারকে ভাল করে দেখল ওরাং ওটাং । কিন্তু নামার কোনও চেষ্টাই করল না। সারকে ও ভয় পাচ্ছে, কিন্তু আমি কাছে গেলে কামড়ে দিতে পারে। তার চেয়ে অবনীমোহনকে ফোন করে খবর দেওয়াই ভাল।

ঘড়ির দিকে তাকালাম। এখন রাত দুটো। ঠিক করলাম এখন নয়, ভোর হলেই ফোন করব। কিন্তু ওরাং ওটাংটা ঢুকল কোনখান দিয়ে ? শোয়ার ঘরের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে আমার বাড়িটা দেখতে লাগলাম আলো জ্বালিয়ে। কোথাও কোনও ফাঁক নেই। সিঁড়ি ভেঙে আমার গবেষণার ঘরের কাছে যেতেই চোখে পড়ল জানলার শার্সি ভাঙা। যে ফোকরটি হয়েছে তা দিয়ে মানুষের গলে আসা সম্ভব নয়, কিন্তু ওরাং ওটাংয়ের পক্ষে সহজ। গবেষণার ঘরের আলো জ্বালতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ ! সবকিছু এলোমেলো। এমনকী আমার নতুন মেশিনটা কাত হয়ে আছে। আর তখনই চোখে পড়ল মেশিনের তলায় চাপা পড়ে আছে মেয়। ওর খুব ভাগ্য ভাল যে, মেশিনের একপাশে যে চোঙ রয়েছে সেটি ওর গলার ওপর এসে থেমে গিয়েছে কারণ মেশিনটি কাত হয়ে পড়েছিল। নইলে চোঙটি ওর গলায় বসে যেতে পারত। এই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছে নিশ্চয়ই ওই ওরাং ওটাং। মেয় বোধ হয় ওকে দেখতে গিয়ে এই ঘরে চলে এসেছিল। কুকুরের হাত থেকে বাঁচার জন্যে এই ঘরের যন্ত্রপাতি উলটেপালটে প্রাণীটি নীচে পালায়। আর তখনই মেয় বেচারা চাপা পড়ে গিয়েছে।

আমি কয়েকবার ডাকা সত্ত্বেও মেয় চোখ মেলল না, সাড়াও দিল না। যন্ত্রটা সরিয়ে সোজা করে রেখে মেয়র গায়ে হাত বোলালাম। না, ও মরে যায়নি, তবে জ্ঞান হারিয়েছে। মেয়র মাথায় অল্প জল ছড়িয়ে দিলাম। যেরকম অলস ও, অজ্ঞান হয়ে থাকার সময় ঘুমের আমেজ উপভোগ করলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

মেশিনটাকে দেখলাম। একপাশে চোট লেগেছে। চোঙের যে মুখটা মেশিনের সঙ্গে লাগানো থাকে, সেটি সামান্য সরে গিয়েছে। হয়ে গেল, আমার এতদিনের সব চেষ্টা একটা ওরাং ওটাং বারোটা বাজিয়ে দিয়ে গেল। কয়েকটা বই মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তাদের তুললাম। লন্ডনে একজন বিজ্ঞানী আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, শব্দের জন্ম ঘর্ষণ বা পারস্পরিক আঘাত থেকে। অর্থাৎ মিডিয়াম ছাড়া শব্দ তৈরি হয় না। আমাদের আকাশে মেঘ আছে যা শব্দসৃষ্টিতে মিডিয়ামের কাজ করে। কিন্তু মহাকাশে যেহেতু জলীয় কণা নেই, তাই মেঘের অস্তিত্ব নেই। অতএব আমি মেঘের স্তরের বাইরে কী করে শব্দের অস্তিত্ব কল্পনা করছি।

আপাতচোখে কথাটা ঠিকই। মহাকাশে যেখানে হাওয়া নেই, মেঘ নেই, যেখানে শুধুই ধু-ধু শূন্যতা, সেখানে শব্দ বাজবে কী করে ? আমি তাদের নৈঃশব্দ্যের শব্দ, সাউন্ড আর সাইলেন্স বোঝাতে চেষ্টা করব না। কিন্তু অবিরত যে সমস্ত নক্ষত্রের অংশ খসে পড়ছে এবং পড়ার সময় অন্য নক্ষত্রকে আঘাত করছে, তার শব্দমালার কথা বিস্মরিত হলে চলবে কী করে ? দূর কোনও মহাকাশে সেই মুহূর্তে যে ভয়ঙ্কর শব্দ বাজে, তা পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় না।

কিন্তু যদি সেটা নিয়ে আসা যেত ! আমি অবশ্য এসব কথা বলিনি। বব আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে কাজ শেষ না করে সামান্য মুখ খোলাও ঠিক নয়।

মেঝের ওপর নড়াচড়া শুরু করল মেয়। অর্থাৎ ওর জ্ঞান ফিরে এসেছে। বেশ জব্বর একটা আড়মোড়া দিয়ে সে চোখ খুলল। আমি আদর করে ডাকলাম, "মেয় ! খুব লেগেছে ?" মেয় মুখ তুলল। তারপর আমাকে চমকে দিয়ে ডেকে উঠল, 'ঘেউ !'

আমি যেমন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তেমনই মেয় বোধ হয় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল। সে পিটপিট করে চারপাশে তাকাল। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে উঠে প্রচণ্ড জোরে ডেকে উঠল, 'ঘেউ ঘেউ। ঘেউ ঘেউ।'

নিজের গলায় স্বর ফিরে পেয়ে যেন পাগল হয়ে গেল মেয়। ঘরময় লাফিয়ে তীব্রবেগে নেমে গেল নীচের দিকে। আমি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। এ কী ব্যাপার হল ? একটা বোবা কুকুর স্বর ফিরে পেল কী করে ? হ্যাঁ, এ-কথা ঠিকই, আমি অনেক সময় ভেবেছিলাম ওদের কোনও ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখি ভোকাল কর্ডে গোলমাল আছে কিনা। থাকলে অপারেশন করলে গলা ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু নানা ঝামেলায় এটা আর করা হয়নি। সেই ব্যাপারটা অপারেশন ছাড়াই হয়ে গেল কী করে ? আমি ধীরে-ধীরে নীচে নেমে এলাম। মেয় তার সদ্য আবিষ্কৃত আওয়াজ মনের আনন্দে ব্যবহার করে চলেছে। আমাকে দেখে ছুটে এসে কুঁইকুঁই করে লেজ নাড়ল।

নিচু হয়ে মেয়-কে আদর করলাম। বললাম, "তুই খুব লাকি ! ভগবানের অশেষ করুণায় শব্দ পেয়েছিস গলায়।"

এবার আমার সারের কথা খেয়াল হল। ঘরের দরজা বন্ধ। দরজাটা খুললাম। সার দরজার ওপাশে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আলমারির ওপর তখনও বসে থাকা ওরাং ওটাংটাকে লক্ষ করে যাচ্ছে। হঠাৎ আমার পেছন থেকে মেয় ছুটে এসে ঘরে ঢুকে ওরাং ওটাংটাকে প্রচণ্ড জোরে বকতে শুরু করল। ওরাং ওটাং আরও গুটিয়ে গেল। কিন্তু এই সময় আমি সারের মুখ দেখে খুব কষ্ট পেলাম। কেমন ফ্যালফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছে সে মেয়র দিকে। এতদিন সে মেয়র চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে ছিল কিন্তু আজ গলার আওয়াজ ফিরে পেয়ে মেয় তাকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে। মাথা নিচু করে সে মেয়র দিকে ফিরে লেজ নাড়তে লাগল।

ওই রাতটায় আর ঘুমোতে পারিনি। এর পেছনে মেয়র অবদানও ছিল। মাঝে-মাঝেই সে গলা খুলে ডেকে গিয়েছে। এতদিন যত ডাক সে ডাকতে পারত তা এক রাতে ডেকে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। তা ছাড়া দুটো চিন্তা একই সঙ্গে আমাকে কুরে খাচ্ছিল। ওরাং ওটাংটা কীভাবে

এ-বাড়িতে এল এবং কেন এল ? দ্বিতীয়ত, আমার মেশিনটা কী এমন কাণ্ড করল যাতে মেয় গলার আওয়াজ ফিরে পেয়েছে। যদি মেশিন কাজটা করে থাকে তা হলে বুঝতে হবে আমি সঠিক পথে এগিয়েছি। কিন্তু ওপরের ছাদ বন্ধ ছিল। মেশিনটাকেও আমি চালু করতে পারিনি। ইদানীং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় সামান্য অনুরণন ছাড়া কিছুই টের পাইনি। কিন্তু ওই অনুরণন আমাকে খুব উৎসাহিত করত। মনে হত, মেশিনটার যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার বা সামান্য কোনও পরিবর্তন যা আমি বুঝতে পারছি না, তা করলে সাফল্য আসবে। আচ্ছা, এমন তো হতে পারে, ওই ওরাং ওটাং ছুটোপুটি করে যন্ত্রটাকে ফেলে দেওয়ার সময় ওটা সঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, যা আমি এতকাল চেষ্টা করেও করতে পারিনি। আর মেশিনের ভেতর হয়তো শব্দের কোনও সামান্য মাত্রা সঞ্চিত ছিল, যা চোঙের মধ্যে দিয়ে মেয়র স্বরনালীতে আঘাত করে বৈপ্লবিক কাজটা করে দিয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে বিছানা থেকে উঠে প্রায় দৌড়ে ওপরের ঘরে গেলাম। যন্ত্রটাকে আঁতিপাঁতি করে পরীক্ষা করেও নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। ভোর হয়ে আসছিল। এক কাপ কফি বানিয়ে ছাদে চলে এলাম। বেশ আরামদায়ক বাতাস বইছে। মেয় ঘুরঘুর করছে বেশ গর্বের সঙ্গে। এই সময় গঙ্গাপদ এল। ওর কাছে ভেতরে ঢোকার জন্যে দরজার চাবি দেওয়া আছে। সে দরজা খুলতেই মেয়র ডাক শুনতে পেল। খুব ঘাবড়ে গিয়ে সে অবাক চোখে মেয়কে দেখতে লাগল। আমি ওপর থেকে ওর মাথাটা দেখতে পাচ্ছিলাম। তারপরে দৌড়ে ছাদে উঠে এল গঙ্গাপদ, "কী করে হল বাবু ?"

"হয়ে গেল।"

"সার ? সারও ডাকতে পারছে ?"

"না। এখনও পারেনি।"

"ওমা ! এটা কেন হল ? একজন ডাকবে আর একজন বোবা হয়ে থাকবে ?"

এ-প্রশ্নের জবাব আমার কাছে ছিল না। কফিতে চুমুক দিলাম। গঙ্গাপদ ফিরে যাচ্ছিল মেয়র দিকে তাকাতে-তাকাতে, আমি পেছন থেকে ডাকলাম, "গঙ্গাপদ।"

"বলুন বাবু।"

"নীচের ঘরের দরজার সামনে কাল রাত থেকে সারকে বেঁধে রাখতে হয়েছে। কারণ ঘরের ভেতর আলমারির ওপর একটি ওরাং ওটাং আশ্রয় নিয়েছে।"

"ওরাং ওটাং !"

"একটি বনমানুষ। বানর এবং হনুমানের স্বজাতি। কিন্তু চেহারায় পার্থক্য আছে। হাত-পা বেশি লম্বা। মাথায় অনেক বেশি বুদ্ধি। ওরাং ওটাং

ভারতবর্ষের জঙ্গলে নেই। সম্ভবত আফ্রিকা থেকে একে কেউ এ-দেশে নিয়ে এসেছে।"

"বনমানুষ!" গঙ্গাপদর চোখ বড় হয়ে উঠল।

"হ্যাঁ।" আমি মাথা নাড়ামাত্র নীচে বেল টিপল কেউ। এত ভোরে কেউ আমার বাড়িতে সচরাচর আসে না। গঙ্গাপদ নীচে নেমে গেল দেখতে।

আজ আকাশ পরিষ্কার। ভোরের আলো চমৎকার। এই আলো দেখে রাত জাগার ক্লান্তি দূর হয়ে গেল আমার। আজ বেশ মন দিয়ে কাজ করা যাবে। কিন্তু তার আগে ওই বনমানুষের সমস্যা মিটিয়ে ফেলা দরকার।

গঙ্গাপদ আবার উঠে এল, "বাবু, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান।"

"কী নাম?"

"বললেন, নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না। কিন্তু খুব জরুরি ব্যাপার।"

সাধারণত সকালে আমি বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চাই না। অনর্থক সময় নষ্ট করা ছাড়া হয়তো এমন কোনও কথা অবোধের মতো বলে যাবে, যা সারাদিন আমার মাথায় পাক খাবে। তাই না বলতে যাচ্ছিলাম। পরে ভাবলাম এত ভোরে এসেছেন যখন, তখন নিশ্চয়ই কোনও জরুরি প্রয়োজন রয়েছে।

গঙ্গাপদকে সহবত শেখাতে হবে। বাড়িতে কেউ এলে তাকে বসার ঘরে না নিয়ে এসে দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। দরজাটা সামান্য খোলা, শেকলে আটকানো। শেকল খুলে বললাম, "ভেতরে আসুন।"

গাটাগোট্টা চেহারা, চোখ দুটো ছোট, বছর পঞ্চাশেক বয়স, সাত সকালে এসেছেন বলে পরনে ট্র্যাকসুট, অর্থাৎ বেশি দূরে থাকেন না।

"নমস্কার। আপনাকে এই সময় বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত।"

"আপনি ভেতরে এসে কথা বলুন।"

ভদ্রলোক ভেতরে এলে তাঁকে সোফা দেখিয়ে দিলাম।

"বলুন কী করতে পারি?"

"আমার নাম মন্মথ দত্ত। ব্যবসা করি। এই পাড়ায় যে গোল চত্বরটি আছে তার পাশে থাকি। ব্যাপারটা বলতে আমার খুব খারাপ লাগছে।"

"নিঃসঙ্কোচে বলুন। কাছাকাছি না হলেও একই পাড়ায় যখন থাকি—।"

"আজ্ঞে, আমি সামান্য ব্যবসা করে থাকি। একটু অদ্ভুত ধরনের ব্যবসা।"

"কীরকম?"

"আমার বেশ কিছু ক্লায়েন্ট আছেন। তাঁরা অর্থবান এবং বিচিত্র ধরনের। যেসব জিনিস খুবই বিরল তা সংগ্রহ করার নেশা তাঁদের প্রবল। এঁদের সবাই অবশ্য একই জিনিসে আগ্রহী নন।"

"কেউ স্ট্যাম্প, কেউ কয়েন—।"

"হ্যাঁ, কেউ হয়তো শাল। কতরকমের কাজকরা শাল পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে তা আমি আগে জানতাম না। এই ধরুন কলম। পুরনো কলম সংগ্রহ করা দু'জনের নেশা। কারও নেশা পাথর বা মাটির তৈরি বিভিন্ন গড়নের প্যাঁচা অথবা গণেশ মূর্তি। আমি খোঁজখবর নিয়ে ওঁদের জানালে ওঁরা এসে যাচাই করে কিনে নেন। এই তো গত মাসে উত্তরবঙ্গের এক গ্রাম থেকে কালাপাহাড়ের ব্যবহার করা তরোয়াল উদ্ধার করেছি। বংশপরম্পরায় ওই তরোয়াল অবহেলায় পড়ে ছিল।" মন্মথ দত্ত হাত-পা নেড়ে বোঝাচ্ছিলেন।

"আমার কাছে সেরকম কোনও বিরল বস্তু তো নেই। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।"

"না সার। আমার ভুল হয়নি। এ-ব্যাপারে শকুনের ঘ্রাণশক্তি নাকি পেয়েছি। লোকে তো তাই বলে। এখন আপনি যদি সহযোগিতা করেন তা হলে কৃতজ্ঞ হব।"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

"তা হলে খুলেই বলি সার। আপনার দুটো পোষা প্রাণী আছে। তাই না?"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম।

"ওই কুকুরদুটো যদি বিক্রি করেন— !"

"আশ্চর্য! আমার বাড়িতে যে কুকুর আছে, তাদের স্বজাতিরা পশ্চিমবাংলার পথেঘাটে জন্ম নিয়ে পথেঘাটেই মারা যায়। আপনার কোনও ক্লায়েন্ট নেড়ি কুকুর কিনবে? আর নেড়ি কুকুর বিক্রি করতে তো আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে না। রাস্তা থেকে ধরে চালান করে দিন।" আমি বিরক্ত হচ্ছিলাম এভাবে সময় নষ্ট হচ্ছিল বলে।

মন্মথ দত্ত মাথা নাড়লেন, "না সার। শুনেছি, আপনার কুকুরদুটো নাকি বোবা। সামান্য কুঁইকুঁই শব্দও করে না। পৃথিবীতে কেউ বোবা কুকুরের কথা শোনেনি। ফিজিতে আমার এক ক্লায়েন্টের চিড়িয়াখানা আছে। উনি এমন জোড়া বোবা কুকুর পেলে লুফে নেবেন।"

এবার আমি হেসে ফেললাম, "মানুষের শখ সত্যিই অদ্ভুত!"

"যা বলেছেন! আর ওটা অদ্ভুত বলে আপনাদের আশীর্বাদে আমি করে খাচ্ছি।"

এবার উঠে দাঁড়ালাম, "কিন্তু মন্মথবাবু, আপনি যা শুনেছেন তা এতকাল ঠিক ছিল। আমার কুকুর এখন এক বাড়াবাড়ি রকমের ডাকাডাকি করছে।"

মন্মথ দত্তের চোখেমুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল। সেটা লক্ষ করে বললাম, "আসুন।"

ভেতরের বারান্দায় পা দিতেই চোখে পড়ল গঙ্গাপদ মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। নতুন লোক দেখে মেয় প্রচণ্ড জোরে গর্জন করে উঠল।

গঙ্গাপদ তাকে সামলাচ্ছিল। মন্মথ দত্ত বললেন, "তা হলে সবাই মিথ্যে কথা বলে?"

"না। বললাম তো। গত রাতে ও স্বর ফিরে পেয়েছে।"

"সে কী! আর একটা কুকুর, তার কী অবস্থা?"

"সে বেচারার এখনও ভাগ্য প্রসন্ন হয়নি।"

"তাকে একবার দেখাবেন?"

লোকটার কৌতূহল আমাকে বিরক্ত করছিল। কিন্তু সারকে দেখে যদি ও বিদায় নেয় তা হলে দেখিয়ে দেওয়াই ভাল। আমি ওঁকে দাঁড়াতে বলে বন্ধ ঘরটার সামনে গেলাম। ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে সার বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু টানটান হয়ে-যাওয়া চেন ছেঁড়ার ক্ষমতা তার নেই। আমি তাকে বাঁধন-মুক্ত করতেই ছুটে গেল মেয়র কাছে। মেয় বেশ অহঙ্কারীর মতো চাপা গর্জন করে উঠতেই সার তার সামনে বসে লেজ নাড়তে লাগল বোকার মতন। আমি এবার মন্মথ দত্তকে বললাম, "আশা করি, আপনার দেখা শেষ হয়েছে।"

মন্মথ মাথা নাড়লেন। উঠোনের পাশ দিয়ে একটি দরজা আছে বাইরে যাওয়ার। হাতজোড় করে নমস্কার জানিয়ে মন্মথ সেই দরজা খুলে দিতেই তীরের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে এল ওরাং ওটাংটা। আমি সামনে দাঁড়িয়ে থাকায় ও সামান্য ধাক্কা খেল। তারপর মেয়র চিৎকার উপেক্ষা করে মন্মথ দত্তর খোলা দরজা দিয়ে বাইরে উধাও হয়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এ হে! পালাল, পালাল।"

মন্মথ খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আরে? এটা কী?"

"ওরাং ওটাং। ও গঙ্গাপদ, দ্যাখো তো ওটা কোথায় গেল?"

গঙ্গাপদর পক্ষে তখনই সার এবং মেয়কে সামলে বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না দেখে আমিই ছুটলাম। মন্মথ দত্ত আমার পেছন-পেছন এলেন। চোখের সামনে কোথাও ওরাং ওটাংটি নেই। শুধু বড়-বড় গাছগুলোকে ঘিরে কাকেরা চিৎকার করে চলেছে। আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। মন্মথ দত্তকে বললাম, "কী দরকার ছিল ওইভাবে দরজা হট করে খুলে ধরার। অদ্ভুত মানুষ তো আপনি!"

মন্মথ দত্ত বললেন, "কী করে বুঝব বলুন আপনি ওরাং ওটাং পুষেছেন।"

"আমি পুষিনি। ও-ব্যাটা একটি ট্রেন্ড চোর। পুলিশ ওকে খুঁজছে। কাল রাত্রে এ-বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল। এ হে, ভেবেছিলাম আজ সকালে ওকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। ঠিক আছে, এখন আপনি আসতে পারেন।"

আমি আর দাঁড়ালাম না। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। কয়েক পা এগোতেই সার এসে আমার পায়ের ওপর চলে এল। তার গলা দিয়ে আমার পা ঘষতে লাগল সে। ওর এই পরিবর্তন আগে কখনও দেখিনি। ওর মাথায়

হাত বোলালাম। বললাম, "দাঁড়া, একটু সময় দে। যদি আমার মেশিন মেয়র গলায় স্বর এনে দিতে পারে, তা হলে তুইও ডাকতে পারবি।"

॥ ৩ ॥

অবনীমোহনকে ফোন করে ব্যাপারটা জানালাম। তিনি খুব আফসোস করলেন, "ইস। ওভাবে হাতে পেয়েও কিছু করা গেল না? কাল রাত্রেই আমাকে জানাতে পারতেন। আচ্ছা, এই মন্মথ দত্ত লোকটি কে?"

"আমি কখনও দেখিনি। বলল, এ-পাড়ায় গোল চত্বরের পাশে থাকে।"

"চেহারা?"

"গাঁট্টাগোট্টা, ট্র্যাকসুট পরে এসেছিলেন। বছর পঞ্চাশ বয়স।"

"আপনার কিছু চুরি যায়নি তো?"

"না, না। সেরকম কোনও সুযোগ তো ওরাং ওটাংটা পায়নি। কুকুর তাড়া করেছিল ওকে। ভয়ে আমার গবেষণার ঘরে ঢুকে পড়েছিল। মেশিনপত্র লণ্ডভণ্ড করেছে।" আমি ফোন নামিয়ে রাখলাম। ইচ্ছে করেই অবনীমোহনকে মেয়র স্বর ফিরে পাওয়ার কথা বললাম না। এটা নিয়ে এখনই কোনওরকম প্রচার হোক আমি চাই না।

ব্রেকফাস্ট খেয়ে গবেষণার ঘরে ঢুকেছিলাম। মেশিন ঠিক করতেই দুপুর গড়িয়ে এল। আজ আকাশ মেঘমুক্ত। ভয় পাওয়া ওরাং ওটাং যদি এ-ঘরে না ঢুকত, তা হলে এই সময়টা নষ্ট হত না। দুপুরের খাবার আমি ঠিক সাড়ে বারোটায় খাই। দরজা খুলে বের হতেই দেখলাম গঙ্গাপদ দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে ডায়েরি। গঙ্গাপদ সামান্য লিখতে-পড়তে জানে দেখে আমি হুকুম দিয়েছি গবেষণাঘরে থাকার সময় যদি কোনও ফোন আসে তা হলে আমাকে বিরক্ত না করে নাম এবং টেলিফোন নাম্বার লিখে রাখতে। জরুরি কিছু মনে হলে আমি নিজেই তাদের ফোন করব।

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে চমকে উঠলাম। সাতজন সাংবাদিকের নাম লেখা রয়েছে, পাশে তাদের কাগজের নাম। শুধু কলকাতার নয়, দিল্লি, মুম্বই থেকেও ফোন এসেছিল। এই এত সাংবাদিক একসঙ্গে আমার কাছে কী জানতে চাইছেন? গঙ্গাপদকে জিজ্ঞেস করলাম, "কেউ কিছু বলেছেন?"

"হ্যাঁ। সবাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন। আপনি এখন কাজ করছেন শুনে সবাই জিজ্ঞেস করছিল এ-বাড়ির বোবা কুকুরকে আপনি স্বর ফিরিয়ে দিয়েছেন এ-কথাটা সত্যি কিনা?" গঙ্গাপদ এক-নিশ্বাসে বলে গেল।

"তুমি কী বলেছ?"

"আমি বলব কী! মেয়টা এমন চেঁচাচ্ছিল যে, ওরা ওর গলা শুনতে পেয়েছে। আমি বললাম, আপনারা বাবুর কাছেই যা শোনার শুনবেন।"

"তুমি কি আজ কাউকে বলেছ মেয় হঠাৎ ডাকাডাকি করছে ?"

"না বাবু। আমি তো আজ বাড়ির বাইরে যাইনি।"

বলতে-বলতেই ফোন বাজল। এগিয়ে গিয়ে আমিই রিসিভার তুললাম। কলকাতার এক নামী ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, "সার, খবরটা কি সত্যি ? সত্যি হলে এখনই আপনার ইন্টারভিউ চাই।"

"কী ব্যাপারে বলছেন ?"

"আপনি নাকি শব্দ ব্যবহার করে আপনার বোবা কুকুরের গলায় স্বর আনতে পেরেছেন। এটা কি সত্যি ?"

"এ-খবর আপনারা কোথায় পেলেন ?"

"এক ভদ্রলোক নাকি বিবিসি-কে খবরটা জানিয়েছেন। বিবিসি আজ সকালেই খবরটা ব্রডকাস্ট করেছে। এখন তো সমস্ত পৃথিবীর মানুষ জানে। কিন্তু সার, আপনার সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাতে আমরাই নিউজটার সঙ্গে আপনার ইন্টারভিউ ছাপার সৌভাগ্য পেতে পারি। আমি এখনই আপনার কাছে যেতে চাই।"

আমি বিচলিত হলাম, "দেখুন, আপনারা যা শুনেছেন, তা সত্যি নয়।" আমি রিসিভার নামিয়ে রাখতেই ফোন বাজল। এবার বিবিসি থেকে। আমি তাদের খুব বকাবকি করলাম আমার সঙ্গে কথা না বলে ওরকম একটা খবর প্রচার করার জন্যে। বললাম, "পুরোটাই মিথ্যে, একদম মিথ্যে।"

কিন্তু আমি যাই বলি ফোন আসা বন্ধ হল না, উলটে বাড়িতে সাংবাদিক থেকে শুরু করে টেলিভিশনের লোক ভিড় জমাল। গঙ্গাপদকে আমি বলে দিয়েছিলাম, যে কেউ আসুক বলে দেবে আমি বাড়িতে নেই। পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড় আমার! গঙ্গাপদকে বাহবা দিতে হয়। সে মেয়ের মুখ বেঁধে ওকে চেনবন্দি করে রেখে সাংবাদিকদের সামলাল। আমি বাড়িতে নেই, কোথায় গিয়েছি সে জানে না। কিন্তু গঙ্গাপদ যতই বলুক, লোকজনের ভিড় লেগেই রয়েছে দরজায়। একজন প্রেস ফোটোগ্রাফার লুকিয়েচুরিয়ে সারের ছবি তুলে নিয়ে গেছে। ফোটো দেখে অবশ্য মেয়র সঙ্গে ওর তফাত করা মুশকিল হবে।

আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না প্রথমে, তারপর মনে হল ওই মন্মথ দত্ত এই কাণ্ডটা করেছে। ও-ই নিশ্চয়ই বিবিসি-কে খবরটা পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু লোকটাকে আমার খুবই সাধারণ বলে মনে হয়েছিল। বিবিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে ক'জন বাঙালি চট করে পারে ? মন্মথ দত্ত যখন পেরেছে তখন আর ওকে সাধারণ ভাবা ঠিক নয়। তারপরই মনে হল, ওরাং ওটাংটা ওর পোষা নয় তো ? কায়দা করে আমার বাড়িতে ঢুকে প্রাণীটিকে পালাবার সুযোগ করে দিল ! কেন যে লোকটাকে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিলাম !

বিকেলে অবনীমোহনকে ফোন করলাম। রিসিভার তুলে আমার গলা পেয়ে

অবনীমোহন উত্তেজিত, "আরে, অভিনন্দন। আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার গবেষণা যে সফল হয়েছে তাতে আমি খুব আনন্দিত। তবে আজ সকালে যখন ফোন করেছিলেন তখন আপনি খবরটা প্রকাশ করেননি বলে একটু অভিমান হয়েছিল। পরে যতবার ফোন করেছি আপনাকে, গঙ্গাপদ একই বুলি আওড়ে গিয়েছে, আপনি বাড়িতে নেই।"

বললাম, "অবনীমোহন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আমি এখন পর্যন্ত কোনও আবিষ্কার করিনি।"

"সে কী ! আপনি যে শব্দ নিয়ে গবেষণা করছেন সে-কথা তো আগেও আমায় বলেছেন। তা হলে ?" অবনীমোহন খুব অবাক হয়ে গেলেন।

"গবেষণার কথা মিথ্যে নয়। কিন্তু আবিষ্কার করিনি কিছু। গত রাত্রে ওরাং ওটাং আমার গবেষণার ঘরে ঢুকে যে দুর্ঘটনা ঘটায় তার ফলে মেয় স্বর পেয়েছে। এটা নিতান্তই দুর্ঘটনা। কিন্তু গুজব প্রচার হয়ে যাওয়ায় তা সত্যি বলে বিশ্বাস করছে যারা, তারা আমায় পাগল করে দিচ্ছে।"

"কিন্তু কে গুজব ছড়াল ?"

"বুঝতে পারছি না। ভোরবেলায় মন্মথ দত্ত এসেছিল। ওর কথা তোমাকে বলেছি। তাকে বলেছিলাম মেয়র স্বর ফিরে পাওয়ার কথা। ও এসেছিল দুটো বোবা কুকুর কিনতে। মনে হয় ও-ই প্রচার করেছে।"

"কিন্তু মন্মথ দত্ত নামের কেউ আপনার পাড়ায় থাকে না।"

"থাকে না ?"

"না। লোকটা একটা ঠগ।"

"সে কী !"

"হ্যাঁ। আর মনে হচ্ছে ওই ওরাং ওটাংটা লোকটার পোষা জীব। ও ধরা পড়তেই মুক্ত করতে আপনার বাড়িতে এসেছিল।"

"তার মানে ও জানত ওরাং ওটাং আমার বাড়িতে আছে।"

"তাই মনে হচ্ছে। চুরি করতেই পাঠিয়েছিল।"

"কিন্তু আমার বাড়িতে কী চুরি করবে ?"

"তা তো জানি না। যদি কোনও সাহায্যের প্রয়োজন হয়, বলবেন।"

আমি ধন্দে পড়ে গেলাম। মন্মথ দত্ত ঠগ হতে পারে কিন্তু আমার বাড়িতে চুরি করতে চাইবে কেন ? তারপরেই মনে পড়ল লোকটা মানুষের শখের জিনিস পাইয়ে দেওয়ার দালালি করে বলেছিল। বিদেশেও ওর ক্লায়েন্ট আছে। এমন হতে পারে আমার গবেষণার ঘরই ওর লক্ষ্য ছিল। এটা ভাবতেই খুব নার্ভাস হয়ে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে আমার বন্ধু ডক্টর বব উইলসকে ফোন করলাম। ববের গলা পাওয়া গেল। উচ্ছ্বসিত। বলল, "ওহো ! কতবার তোমাকে ধরার চেষ্টা করেছি কিন্তু শুধু এনগেজড শুনেছি। তোমার খবরটা বিবিসি-তে

শুনলাম।"

আমি কথা না বাড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে বললাম। শোনামাত্র বব উত্তেজিত হয়ে পড়ল, "কী বললে ? ওরাং ওটাং ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তুমি খুব বিপদের মধ্যে আছ বন্ধু। তোমাদের দেশে ওই প্রাণীটি জন্মায় না যখন, তখন কেউ বিদেশ থেকে পাঠিয়েছে ওকে। তোমার গবেষণার ব্যাপারে যাদের আগ্রহ আছে তারাই এই কাণ্ডটি ঘটাতে পারে। সাবধান হও।"

বব তো বলল, আমি কী করে সাবধান হব ? রাত্রে গঙ্গাপদ এসে জানাল এক সাহেব ইংরেজিতে কথা বলছে টেলিফোনে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ভাবলাম বব বুঝি আবার ফোন করেছে। রিসিভার তুলতেই যে গলা পেলাম তা অবশ্যই কোনও ইংরেজের নয়। পরিচয় জানার পর খুব বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "আপনি আমাকে চিনবেন না! আপনার গবেষণার ব্যাপারে আমি খুবই আগ্রহী। যদি একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাই তবে ধন্য হব।"

"আপনি কে ? কোনও বিজ্ঞানী ?"

"না, না। সেই পাণ্ডিত্য আমার নেই। তবে আপনি যে বিষয় নিয়ে কাজ করছেন তা শেষ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আপনার সরকারের কাছে যে আবেদন আপনি করেছেন তা এখনও লাল ফিতেয় আটকে আছে। আপনি সম্মত হলে আমি ফিনান্সের দায়িত্ব নিতে রাজি আছি।"

"আমি আপনাকে চিনি না, জানি না, এরকম প্রস্তাব কেন দিচ্ছেন ?"

"আপনি বিজ্ঞানের সাধক। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমার সাহায্য যদি কাজ দেয় তা হলে ধন্য হব আমি। আপনি ভেবে দেখুন, আগামীকাল আবার ফোন করব। গুড নাইট।" লাইন কেটে দিল লোকটা।

হ্যাঁ, আমার অর্থের প্রয়োজন আছে। এই বিশাল কর্মকাণ্ড কোনও ব্যক্তির নিজস্ব সঞ্চয় থেকে শেষ করা সম্ভব নয়। আমি সরকারের কাছে আবেদন করেছি। তাঁরা বিষয়টি বিবেচনা করছেন বলে জানিয়েছেন। কিন্তু লাল ফিতের বাঁধন তো সহজে খোলার নয়! সমস্যা নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু আগ বাড়িয়ে কেউ আমাকে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দেবে, এমনটাও কল্পনা করিনি। লোকটার কথা বলার ভঙ্গিতে বেশ দৃঢ়তা ছিল। আমার কাজের কথা অনেকেই জানেন। এ-নিয়ে হাসাহাসিও চলে বলে শুনেছি। কিন্তু এই কাজ শেষ করতে যে বিপুল অর্থের দরকার তা কি ফোনের ভদ্রলোক জানেন ? তারপরই খেয়াল হল, অজানা কেউ খামোকা আমাকে অত টাকা দিতে যাবে কেন ? কী স্বার্থ তার ?

খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। রাতে ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না। ভোরবেলায় মনে অন্য চিন্তা এল। মন্মথ দত্ত, ওরাং ওটাং এবং এই সাহেবের টেলিফোন,

তিনটেই একসূত্রে বাঁধা নয় তো ? দ্রুত গবেষণার ঘরে চলে এলাম। যে আলমারিতে আমার গবেষণার কাগজপত্র থাকে সেটা খুলে পরীক্ষা করলাম। না, সব ঠিক আছে।

গতকাল লোকটি বলেছে আজ আবার ফোন করে আমার অভিমত জানতে চাইবে। লোকটির উদ্দেশ্য যদি ভাল হয় তা হলে সাহায্য নিতে আমার আপত্তি থাকবে কেন ? যদি তা না হয় ? বব যে সন্দেহ মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে সেটা ছোবল মারতে লাগল। মনে হল, অবনীকে একটা ফোন করি।

অবনী তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। শুনে বললেন, "অদ্ভুত ! লোকটা পরিচয় দেয়নি ?"

"না।"

"আজ আবার ফোন করবে বলেছে ?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক আছে, ফোন করলে ওর পরিচয়, ঠিকানা জিজ্ঞেস করবেন। আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই, আমি আছি।" অবনী হাসলেন।

বুঝলাম, ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেন না তিনি। একটা ওরাং ওটাং ঢুকেছিল আর একজন উড়ো ফোন করেছিল। পুলিশের অনেক কাজ আছে, এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে কেন ? কিন্তু মন থেকে অস্বস্তি যাচ্ছিল না। ঠিক এই সময় অমলের কথা মনে পড়ল। অমল সোম। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। বছর দশেক আগে কালিম্পং-এ ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সত্যসন্ধান করেন। দু-একবার চিঠিপত্রেও যোগাযোগ হয়েছে। উপন্যাসের বাইরে গোয়েন্দাদের ভূমিকা নিয়ে আমার কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না এবং নেইও, কিন্তু অমল সোমকে ভারী পছন্দ হয়েছিল। ঠিক করলাম ওঁকে সব কথা খুলে বলব। চিঠিতে নয়, টেলিগ্রাম পাঠিয়ে এখানে আসতে বলি তাঁকে। গঙ্গাপদকে দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক করলাম, অমল সোমের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে আড়ালে রাখব, এমনকী টেলিফোনও ধরব না।

॥ ৪ ॥

কলকাতায় এর আগে কয়েকবার এসেছে অর্জুন, কিন্তু সল্ট লেকে কখনও যায়নি। শিয়ালদার কাছে একটা হোটেলে সুটকেস রেখে সে ট্যাক্সি নিয়েছিল। নতুন জায়গায় বাসে চেপে গেলে চিনতে অসুবিধে হবে। গতরাতে দার্জিলিং মেলে চমৎকার ঘুম হওয়ায় এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

টেলিগ্রামের ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দিল অর্জুন। কলকাতা শহরের সঙ্গে সল্ট লেকের পরিবেশ, বাড়িঘরের পার্থক্য

আকাশপাতাল। মনে হচ্ছিল, এখানে সম্পন্ন মানুষেরাই বাস করেন। বাড়িটা দোতলা। সামনের দরজা বন্ধ। পাশের প্যাসেজের মুখে লোহার গেট। সেটাও শেকলবন্দি। অর্জুন বেলের বোতাম টিপল। মিনিটখানেক বাদে একটা জানলা খুলে গেল। গেঞ্জি গায়ে এক মধ্যবয়সী মানুষ প্রশ্ন করল, "কাকে চাই? বাবুকে হলে দেখা হবে না, বাবুর শরীর খারাপ।"

"বাড়িতে আর কেউ আছেন?"

"আমি আছি। এখানে কাজ করি। নিশ্চয়ই আমার কাছে আসেননি।"

"তা আসিনি। তুমি তোমার বাবুকে এই কাগজটা দাও।" পকেট থেকে টেলিগ্রামের কাগজ বের করে জানলা দিয়ে লোকটার হাতে দিল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যে দরজা খুলে গেল। অর্জুন দেখল অত্যন্ত সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ মাথা বাড়িয়ে এপাশ-ওপাশ দেখছেন।

"নমস্কার। আপনি অমল সোমকে এই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। তিনি কোথায়? তিনি আসেননি?" বৃদ্ধ যেন থমকে গেলেন।

"আপনি যদি আমাকে ভেতরে ঢুকতে দেন তা হলে এ-ব্যাপারে কথা বলতে পারি।"

"ও, হ্যাঁ, আসুন। আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম জলপাইগুড়ির অমল সোমকে।" উনি দরজা থেকে সরে যেতে অর্জুন ঘরে ঢুকল। চেয়ার টেবিল এবং দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি ছাড়া এ-ঘরে উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।

অর্জুন বলল, "আমার নাম অর্জুন। টেলিগ্রাম পাওয়ার পর অমলদা টেলিফোনে আপনাকে ধরতে চেয়েছিলেন। আপনার ফোন বেজে গিয়েছে, কেউ ধরেনি। সম্ভবত ফোন খারাপ। তাই অমলদা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"আপনি এসে আমার কী উপকার করবেন? উনি কি খুব ব্যস্ত?"

"না। এখন অমলদা কোনওরকম কাজের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চান না। আপনার সমস্যা কী, তা আমি জানি না, কিন্তু আমার যা কিছু শিক্ষা তা অমলদার কাছ থেকেই পাওয়া। অবশ্য আপনার যদি ভরসা না হয় তা হলে—!" অর্জুন কথা শেষ করল না। সে বুঝতে পারছিল বৃদ্ধ তাকে অমল সোমের বিকল্প বলে ভাবতে পারছেন না। অমলদা তাকে এঁর পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত পণ্ডিত এবং বিজ্ঞানসাধক।

"কিন্তু আপনার কথা আমি বিশ্বাস করব কী করে?"

এবার অর্জুন পকেট থেকে খামটা বের করে এগিয়ে দিল। অমলদা নিজের হাতে তার পরিচয় দিয়ে চিঠি লিখেছেন। বৃদ্ধ সেটা পড়ে মাথা নাড়লেন, "ও। বসুন। কলকাতায় আজই এসেছেন বোধ হয়?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় উঠেছেন।"

"হোটেলে।"

"হুঁ।" অর্জুন দেখল বৃদ্ধ উলটো দিকের চেয়ারে বসে চিবুকে হাত রাখলেন। তারপর বললেন, "আমি এক অদ্ভুত সমস্যার মধ্যে পড়েছি ভাই। আপনার বয়স এত কম যে, দেখে ঠিক ভরসা হয়নি বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু মিস্টার সোম যে চিঠি লিখেছেন তার ওপর তো কিছু বলার নেই।"

"আপনার সমস্যা জানতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই।" বৃদ্ধ শুরু করলেন। একে-একে সব ঘটনা শোনার পর অর্জুন বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না। "আপনি একা এতবড় পরীক্ষা করছেন ?"

"শুরুটা তো কাউকে-কাউকে একাই করতে হয়।"

"আপনি সফল হলে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে যাবে।"

"হয়তো। আচ্ছা, তোমার কি মনে হচ্ছে ব্যাপারটা অবাস্তব !"

"না। জুলে ভের্ন যখন গল্প লিখেছিলেন তখন কেউ কল্পনা করেনি ব্যাপারটা একসময় চূড়ান্ত বাস্তব হবে। কিন্তু এই আবিষ্কার যেমন মানুষের উপকারে আসবে, তেমনই মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করলে প্রলয় হয়ে যাবে।"

"নিশ্চয়ই। যে ব্যবহার করবে তার চরিত্রের ওপর সেটা নির্ভর করছে।"

"আপনি পুলিশকে জানিয়েছেন ?"

"লিখিত নালিশ করিনি। এখানকার অফিসার ইনচার্জ আমার পরিচিত, টেলিফোনে তাঁকে বলেছিলাম। এখনও পর্যন্ত তিনি এতে রহস্য দেখতে পাননি।"

"আপনার বাড়িটা একবার দেখতে পারি ?"

"অবশ্যই।" বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি কেন, আর কাউকে বলুন না সঙ্গে যেতে।"

"আর কেউ বলতে আমার কাজের লোক গঙ্গাপদ। এখন পর্যন্ত রাত্রে আমি একাই থাকি। সাধারণত একতলাটা বন্ধ থাকে। দোতলায় আমার শোয়ার ঘর। লাইব্রেরি। ওখানে আর-একটি বেডরুম রয়েছে। তিনতলায়, মানে ছাদের একপাশে আমার গবেষণার ঘর।" বলতে-বলতে আর-একটি ঘর পেরিয়ে বৃদ্ধ অর্জুনকে নিয়ে ভেতরের বারান্দায় চলে এলেন। একচিলতে শানবাঁধানো উঠোন রয়েছে। এই সময় কুকুরের চিৎকার ভেসে এল। অর্জুন দেখল দুটো কুকুর চেনে বন্দি হয়ে আছে। তার একটা চেঁচাচ্ছে, অন্যটা হিংস্র ভঙ্গিতে ছুটে আসার চেষ্টা করেও চেনে আটকে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "যে চিৎকার করছে তার নাম মেয় ?"

"হ্যাঁ।" বৃদ্ধ হাসলেন, "নেড়ি কুকুরের বাচ্চাদুটোকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে মনে হয়েছিল এদের কুকুর না বলে সারমেয় বললে কৌলীন্য বাড়বে।"

"আপনি বিশ্বাস করেন আপনার যন্ত্র থেকে কোনওমতে শব্দকণা বের হয়ে মেয়র স্বরনালীতে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তারই ফলে ও স্বর ফিরে

পেয়েছে ?”

“এ ছাড়া তো অন্য কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।”

“সারের ওপর একই পরীক্ষা করছেন না কেন ?”

“ওটা ঘটেছিল নিতান্ত দুর্ঘটনাবশত। ইচ্ছে করলেই এক দুর্ঘটনা ঘটানো যায় না। আর পদ্ধতিটা এখনও আমার অজানা।”

অর্জুন লক্ষ করল একটি লোক ওপাশের দরজার আড়াল থেকে উঁকি মারছে। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনার কাজের লোক কি অনেকদিনের ?”

“না। গঙ্গাপদ এদিকে এসো।” বৃদ্ধ ডাকলেন।

গঙ্গাপদ এগিয়ে এল। শক্তপোক্ত চেহারা, অশিক্ষার ছাপ চোখমুখে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তুমি কতদিন এখানে আছ গঙ্গাপদ ?”

“অল্পদিন।”

“এর আগে কোথায় কাজ করতে ?”

গঙ্গাপদ মাথা নিচু করল। বৃদ্ধ হেসে ফেললেন, “গঙ্গাপদর পক্ষে নিজের ইতিহাস বলতে ভাল লাগবে না। বেচারা কোনও কাজকর্ম না পেয়ে লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে জিনিসপত্র সরাত। তেমনই এক রাত্রে আমার বাড়িতে এসে কুকুরের মুখে পড়ে যায়। ওর সঙ্গে কথা বলার পর আমার মনে হয়, সুস্থ জীবনে ফিরে আসার জন্যে ওকে একটা সুযোগ দেওয়া উচিত। এখন ওর কাজকর্ম দেখে মনে হচ্ছে আমি ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জন্মমাত্র মানুষ অপরাধী তৈরি হয় না।”

অর্জুন গঙ্গাপদকে আর একবার দেখল। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে বলল, “ঠিক আছে, পরে তোমার সঙ্গে কথা বলা যাবে।”

মাথা নেড়ে গঙ্গাপদ ফিরে গেল তার কাজে। অর্জুন বলল, “তা হলে ব্যাপারটা এইরকম সাজানো যেতে পারে। প্রথমে গঙ্গাপদ আপনার বাড়িতে চুরি করতে এসেছিল। কিন্তু আপনার কুকুরের জন্যে সে ধরা পড়ে যায়। এর পর একটি ওরাং ওটাং আপনার বাড়িতে ঢোকে, গবেষণাঘরে যায়। কিন্তু সেও কুকুরের তাড়া খেয়ে নীচের ঘরে আশ্রয় নেয়। পরদিন তার মালিক এসে তাকে পালাবার পথ করে দেয়। এর পর টেলিফোনে আপনার কাছে অর্থসাহায্যের প্রস্তাব আসে। অর্থাৎ আপনার গবেষণার ওপর কারও নজর পড়েছে। এ ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি, তাই তো ?”

বৃদ্ধ মাথা নাড়লেন, “কিন্তু গঙ্গাপদর চুরি করতে আসার সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই।”

“আপনি কী করে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন ?”

“আমি ওর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছি। ও নেহাতই ছিঁচকে চোর ছিল।”

“হয়তো। আচ্ছা, দ্বিতীয়বার টেলিফোন এসেছে ? পরের দিন করার কথা ছিল না ?”

"হ্যাঁ, তাই বলেছিল। কিন্তু আমি বা গঙ্গাপদ কেউ টেলিফোন ধরিনি। ওটা বেজে-বেজে থেমে গিয়েছে অনেকবার।" বৃদ্ধ বললেন, "না, গঙ্গাপদকে আমি সন্দেহ করতে পারি না। ওর যদি মতলব থাকত তা হলে যে-কোনওদিন আমার গবেষণাঘরের আলমারি খুলে কাগজপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে যেতে পারত। বাড়িতে তো তৃতীয় ব্যক্তি নেই।"

অর্জুন জবাব না দিয়ে বলল, "চলুন, আপনার গবেষণার ঘরটা দেখে আসি।"

বৃদ্ধ অর্জুনকে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলেন। সিঁড়ির গায়ে জানলাটি এখন বন্ধ কিন্তু তার একটি শার্সি ভেঙে যাওয়ায় ফোকর হয়েছে। বৃদ্ধ সেটি দেখিয়ে বললেন, "আমার সন্দেহ, এখান দিয়েই ওরাং ওটাংটা ঢুকেছিল।"

"ও। এটাকে সারানো হয়নি কেন?"

"গঙ্গাপদকে বলেছি মিস্ত্রি ডাকতে। সল্ট লেকে চাইলেই কাজের লোক পাওয়া যায় না। আগামী রবিবার আসবে। এইটুকু কাজের জন্যে পুরো দিনের চার্জ নেবে।"

"গঙ্গাপদ ঢুকেছিল কোন পথে?"

প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধ হকচকিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "ও খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকে ভেতরে লুকিয়ে ছিল। বিকেলবেলায় খিড়কি দরজা খুলে আমি সার আর মেয়কে পটি করাতে বাইরে বেরিয়েছিলাম।"

"একটা বাইরের লোক বাড়িতে ঢুকে লুকিয়ে আছে তা কুকুরদুটো বুঝতে পারেনি?"

"একটু পরিবর্তন ঘটেছিল আচরণের, কিন্তু না ডাকলে কুকুরের মনের কথা কি বোঝা যায়? আসুন ভাই।" বন্ধ দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন বৃদ্ধ। বললেন, "আগে কখনও এ-ঘরের দরজায় তালা দিইনি, কিন্তু এখন দিচ্ছি।"

ঘরটি বড়। অজস্র যন্ত্রপাতি ছড়িয়ে আছে চারপাশে। ঠিক মাঝখানে বিদঘুটে দেখতে যে মেশিনটি, তার ওপরটা কাচ দিয়ে মোড়া, আবার নীচের দিকের একটা অংশ লোহার জালে ঢাকা। বৃদ্ধ বললেন, "অনেক কষ্ট করে এই যন্ত্রটি তৈরি করেছি। এখন পর্যন্ত আকাশের শব্দগুলোর অনুরণন আমি শুনতে পাই। কখনও সখনও আকস্মিক ভয়ঙ্কর শব্দের হদিস আসে। ওরাং ওটাংটা এই যন্ত্রের ক্ষতি করেছিল কিন্তু আমি সেটাকে সামলে নিয়েছি।" বৃদ্ধ সুইচ টিপতেই মাথার ওপর থেকে ছাদ সরে গিয়ে ঘরটি রোদ্দুরে ভরে গেল। বৃদ্ধ বললেন, "সমুদ্রের নীচে যে রহস্য রয়েছে, মাথার ওপরের আকাশে তার থেকে কয়েক সহস্র গুণ রহস্য এখনও অনাবিষ্কৃত। কিন্তু আমি একটি বিশেষ জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছি প্রতিবার। এবার এগোতে হলে যেসব যন্ত্রের সাহায্য দরকার তা সরকারি অনুদান ছাড়া আমার পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। আমি

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কংগ্রেসের কাছেও আবেদন করেছি। আমার এক ইংরেজ বন্ধু এ-ব্যাপারে চেষ্টা করছেন, দেখি কী হয় !"

অর্জুন ঘরের একপাশে দেওয়াল-ঘেঁষা আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সাধারণ আলমারি। তালা ভেঙে পাল্লা খুলতে কারও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার গবেষণার কাগজপত্র এর মধ্যেই রয়েছে ?"

"হ্যাঁ।"

"এর চেয়ে আর কোনও নিরাপদ জায়গা এ-বাড়িতে নেই ?"

"তা আছে। আমার শোয়ার ঘরে একটা লোহার সিন্দুক আছে। প্রতিদিন কাজের সময় প্রয়োজন হয় বলে কাগজপত্র ওখানে রেখেছি।"

"কিন্তু আর রাখা উচিত হবে না। কাজ শেষ হয়ে গেলে ওগুলো লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখবেন।" অর্জুন জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সল্ট লেকের এই অঞ্চলে ডুয়ার্সের মতো লম্বা-লম্বা দেবদারু গাছের ভিড় দেখা যাচ্ছে। চারপাশ বেশ সবুজ। হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, রাস্তার উলটোদিকের দেবদারু গাছের ওপরের দিকের একটা ডাল যেন অস্বাভাবিকভাবে নড়ে উঠল। সে ভাল করে ঠাহর করতেই বানর জাতীয় কোনও প্রাণী চট করে পাতার আড়ালে হারিয়ে গেল। এত দ্রুত তার সরে যাওয়া যে, তার আদলও ভাল করে বোঝা গেল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের সল্ট লেকে বুঝি খুব বানর আছে ?"

বৃদ্ধ বললেন, "তাই নাকি ? আমি দেখিনি তো !"

অর্জুন জানলা বন্ধ করে বলল, "বানর না দেখতে পারেন, ওরাং ওটাং তো দেখেছেন !"

হোটেলে ফিরে গিয়ে অর্জুন জলপাইগুড়িতে টেলিফোন করল। মোটামুটি ঘটনাটা অমল সোমকে জানিয়ে দিল সে। অমল সোম বললেন, "ও-বাড়িতে যখন তৃতীয় ব্যক্তি নেই এবং যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, তা হলে তুমি হোটেলে থাকছ কেন ? তোমার ওখানেই থাকা উচিত।"

অর্জুন বলল, "আমি নিজে থেকে বলতে পারিনি !"

"উনি কি এখন টেলিফোন ধরছেন ?"

"আমি এ-ব্যাপারে কিছু বলিনি।"

"বেশ। তুমি আজই হোটেল থেকে চেক আউট করে ওঁর বাড়িতে চলে যাও। গিয়ে বলবে আমি তোমাকে ওঁর বাড়িতে থাকতে বলেছি। প্রয়োজন মনে করলে উনি আমাকে টেলিফোন করতে পারেন। আমার নাম্বারটা দিয়ে দিয়ো ওঁকে।"

টেলিফোন রেখে অর্জুন একটু অখুশি হল। কারও বাড়িতে থাকার চেয়ে হোটেলে থাকার স্বাধীনতা অনেক। এই কেসের পাশাপাশি শহরটাকে ঘুরে দেখার সুযোগ পাওয়া যেত তা হলে। কিন্তু অমল সোম যখন বলছেন হোটেল

ছেড়ে দিতে, তখন সেটা অমান্য করা সম্ভব নয়। বিকেলবেলায় সুটকেস নিয়ে সে চলে এল সল্ট লেকে।

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। আজ সকালেও দেখেছে লেটার বক্সের গায়ে লেখা রয়েছে ডক্টর কে. পত্রনবীশ। অমল সোম যে খাম দিয়েছিলেন তার ওপরও লিখেছিলেন ডক্টর কে. পত্রনবীশ। এই কে. অক্ষরের মানে কী, জানা হয়নি। ভদ্রলোক এত প্রবীণ যে, নাম জিজ্ঞেস করতে কুণ্ঠা হয়েছিল।

অর্জুনকে অমল সোম সল্ট লেকের বাড়িতে থাকতে বলেছেন শুনে বৃদ্ধ খুশি হলেন। তখনই টেলিফোন নাম্বার নিয়ে তিনি জলপাইগুড়িতে এস টি ডি করলেন। অর্জুন দেখতে পেল অমল সোমের সঙ্গে কথা বলার সময় বৃদ্ধের মুখে বেশ খুশি-খুশি ভাব ফুটে উঠল। রিসিভার রেখে বললেন, "যাক, ভালই হল। সকালে আমি নিজেই এ-কথা বলব ভাবছিলাম। তুমি বলছি, অ্যাঁ, তুমি এ-বাড়িতে থাকলে আমার ভরসা বাড়বে।"

"কিন্তু আমি কতখানি উপযুক্ত তা আপনি জানেন না!"

"জানার দরকার নেই আর। মিস্টার সোম যখন সার্টিফিকেট দিয়েছেন। হ্যাঁ, গঙ্গাপদকে বলছি দোতলার ঘরে তোমার জন্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে। আমি পাশের ঘরে থাকব। আর হ্যাঁ, ইদানীং আমি নিরামিষ খাই। কোনও কারণ নেই, শুধু মাছ মাংস ডিমে অরুচি এসেছে বলেই খাই না। তুমি চাইলে ওগুলো গঙ্গাপদ রেঁধে দিতে পারে।" বৃদ্ধ হাসলেন।

"খাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও পছন্দ নেই। আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনার নামের আদ্যক্ষর 'কে'। শব্দটা কী?"

"কে. ফর ক্ষেমঙ্কর। নামটা আগে কোথাও দেখেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র।"

"গুড। বাঃ। তোমার সঙ্গে আমার জমবে হে। কথা বলে যদি রেসপন্স পাওয়া যায় তা হলে তার চেয়ে সুখের আর কিছু হয় না।"

সন্ধেবেলায় নিজের ঘরে বসে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল অর্জুন। শিয়ালদার কাছে আজ যেটুকু সময় ছিল, শুধু শব্দই কানে এসেছে। অথচ এখানে কোনও আওয়াজ নেই। চারাগাছের বাংলোতে থাকলে চারপাশের নিস্তব্ধতা যেভাবে চেপে বসে, সল্ট লেকেও যেন তার আঁচ পাওয়া যাচ্ছে। একই শহরের দুটো আলাদা চরিত্রের কথা জলপাইগুড়িতে থাকার সময় অর্জুনের জানা ছিল না।

দরজায় শব্দ হতে অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল গঙ্গাপদ ট্রে নিয়ে ঢুকছে। তাতে চায়ের কাপ আর প্লেটে কিছু খাবার রয়েছে। সামনের টেবিলে ট্রে নামিয়ে গঙ্গাপদ মাথা নিচু করে দাঁড়াল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু বলবে?"

"না, আজ্ঞে, আপনি বলেছিলেন পরে কথা বলবেন!"

অর্জুন চায়ের কাপ তুলল, "তুমিই বলো।"

"আমি কী বলব বাবু। আমার কপাল ভাল না হলে বুড়োবাবুর দেখা পেতাম না। পেটের দায়ে যে কাজ করেছি তা তো নিজের মুখে বলা যায় না। বুড়োবাবু আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।"

"তাই? এ-কাজ তো তুমি ইচ্ছে করলে আগেও জোগাড় করতে পারতে।"

"সত্যি কথা বলব বাবু?"

"বলো।"

"আজকাল আমার বয়সী লোককে কেউ বাড়ির কাজে রাখে না। তা ছাড়া তখন মনে হত অন্যের বাড়িতে গোলামি করব না।"

"সেটা তো এখন করছ।"

"সেদিন ধরা পড়ার পর বুড়োবাবু যখন আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন না, উলটে এ-বাড়িতেই কাজের সুযোগ দিলেন তখন আমার চক্ষু খুলে গেল। এখানে যাকে বলে গোলামি তা আমাকে করতে হয় না। বুড়োবাবু আমাকে ছেলের মতো দেখেন।"

"কিন্তু তুমি এ-বাড়িতে আসার পর থেকেই ডক্টর পত্রনবীশের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো কিছু লোক ওঁর গবেষণার কাগজপত্র চুরি করতে চায়।"

"আমি সবকিছু বুঝতে পারিনি। কিন্তু এবার থেকে কেউ যদি আসে তা হলে তাকে আর এ-বাড়ি থেকে ফিরে যেতে দেব না।"

"তারাই যে তোমাকে এখানে পাঠায়নি তার প্রমাণ কী!"

হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল গঙ্গাপদ। শব্দটা জোরে হওয়ায় নীচ থেকে মেয় তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। কাঁদতে-কাঁদতে গঙ্গাপদ জানাচ্ছিল সে এ-ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানে না, তাকে কেউ এখানে পাঠায়নি। দরকার হলে থানায় গিয়েও সে এ-কথা জানাতে রাজি আছে। অর্জুন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। তার আশঙ্কা হচ্ছিল এখনই ডক্টর পত্রনবীশ এখানে হাজির হবেন। গঙ্গাপদ একটু শান্ত হলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার বুড়োবাবু এখন কোথায়?"

"ছাদের ঘরে কাজ করছেন।"

"ঠিক আছে। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করলাম।"

গঙ্গাপদ চোখ মুছল, তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। গঙ্গাপদকে দেখতে পেয়ে মেয় বোধ হয় শান্ত হয়েছে, কারণ তার চিৎকার আর শোনা যাচ্ছিল না।

অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না কীভাবে এগনো যায়। ডক্টর পত্রনবীশের আশঙ্কা যদি সত্যি হয় তা হলে প্রতিপক্ষ নিজে যোগাযোগ না করলে অন্ধকারে ফুটবল-মাঠে আলপিন খোঁজার ব্যাপার হবে। সেই যোগাযোগ যতদিন না করে

ততদিন চুপচাপ বসে থাকাও বেশ বিরক্তিকর। অর্জুন উঠে পড়ল। না বসে থেকে সল্ট লেকের সুন্দর রাস্তায় একটু হাঁটাহাঁটি করে এলে ক্ষতি নেই।

গঙ্গাপদকে দরজা বন্ধ করতে বলে অর্জুন রাস্তায় পা রাখল। ছবির মতো দেখাচ্ছে আলোয়-আলোয় চারধার। বাড়িটার উলটো ফুটপাথে পৌঁছে সে দেখতে পেল ছাদের ঘরে আলো জ্বলছে। ডক্টর পত্রনবীশ ওখানে কাজ করছেন। ওই নিরীহদর্শন মানুষটিকে দেখে কে ভাববে এই বাড়িতে বসে তিনি কী বিরাট আবিষ্কারের নেশায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। অর্জুন দু'পাশে তাকাল। বেশিরভাগ বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ। রাস্তায় লোকজনও খুবই কম। অর্থাৎ এখানে যে যার মতো থাকেন।

খানিকটা এগিয়ে মোড় নিতেই সে কিছু সাজানো দোকানপাট দেখতে পেল। ওষুধের দোকানটায় বেশ ভিড়। আইসক্রিম পার্লার এবং সিগারেটের দোকানও রয়েছে। অর্জুন আর একটু এগোতেই একটা পার্ক দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়ল। সন্ধে পেরিয়ে যাওয়ায় সম্ভবত পার্কে বাচ্চারা নেই। বড়দেরও দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। একটা খালি বেঞ্চিতে আরাম করে বসে সিগারেট ধরাল অর্জুন। এখন সারাদিনে গোটা দুয়েক সিগারেট খায় সে। সিগারেট শরীরের ক্ষতি করে জেনেও খায় বলে আজকাল অপরাধবোধ কাজ করে। কিন্তু খুব বিরক্তিকর সময়ে অথবা প্রচণ্ড টেনশনে সিগারেট ধরালে মস্তিষ্ক সাফ হয়ে যায় তার। এটা অবশ্য কখনও সিগারেটের সপক্ষে বিজ্ঞাপন নয়, তবু— ।

হঠাৎ অর্জুনের নজরে পড়ল কেউ একজন অন্ধকারে মাটিতে উবু হয়ে বসে কিছু করছে। লোকটার বসার ভঙ্গি বলে দিচ্ছে যে স্বস্তিতে নেই। একটু লক্ষ করে অর্জুন অনুমান করল লোকটা কিছু খুঁজছে। ওই অন্ধকার মাঠে পকেট থেকে কিছু পড়ে গেলে বেচারা কী করবে? একসময় লোকটা উঠে দাঁড়াল। চারপাশে তাকাল। তারপর গেটের দিকে এগিয়ে এল। ওকে যেতে হবে অর্জুনের বেঞ্চির পাশ ঘেঁষে। লোকটার একটা হাতের মুঠো যেন ইচ্ছে করেই আড়ালে রাখা। অর্জুন বেঞ্চিতে বসেই জিজ্ঞেস করল, "পেলেন?"

লোকটা হকচকিয়ে গেল, "অ্যাঁ?"

"যা খুঁজছিলেন তা পেয়েছেন?"

"ও হ্যাঁ। পেয়েছি। ফ্ল্যাটবাড়িতে থাকি, আশেপাশে তো শুধু বালি। এই পার্কে বালির ওপর মাটি ফেলা হয়েছিল বলে দুব্বো গজিয়েছে।"

"দুব্বো? মানে দূর্বাঘাস?"

"হ্যাঁ।" লোকটা হাসল।

"আপনি এতক্ষণ ঘাস খুঁজছিলেন? আমি ভাবলাম কী না কী!" অর্জুন উঠে পাশে এসে দাঁড়াল, "পুজোআচ্চা আছে বুঝি?"

"আরে না, না। ওসব কিছু নয়। অন্য কারণ— ! আচ্ছা!" লোকটা আর

না দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। এই ভঙ্গিটা খারাপ লাগল অর্জুনের। সে পার্কের বাইরে এসে দেখল লোকটা দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে এবং চলার সময় বারংবার ডাইনে-বাঁয়ে তাকাচ্ছে। কোনও গোপন অপরাধ করলে মানুষ ওই ভঙ্গিতে হাঁটে। হাতে কোনও কাজ নেই, অর্জুন লোকটাকে অনুসরণ করল। বড় রাস্তা ছেড়ে লোকটা পাশের গলিতে ঢোকার সময় মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাতেই অর্জুনকে দেখতে পেল। যদিও দূরত্ব অনেক তবু না দেখতে পাওয়ার কিছু নেই। দেখামাত্র লোকটা দ্রুত পা চালাল। অর্জুনের সন্দেহ আরও বাড়তে সে ব্যবধান কমাতে চেষ্টা করল। এবার লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি পৌঁছে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী হয়েছে বলুন তো ?"

"আমার আবার কী হবে ? আপনি কেন পেছন-পেছন আসছেন ?"

"আপনি যেভাবে দৌড়চ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে কিছু লুকোচ্ছেন !"

"বেশ, যদি লুকিয়েও থাকি সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আপনার কী ?"

"আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি।" অর্জুন হাসল।

"দেখুন মশাই, আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই। আমি কিছু লুকোচ্ছি না। আমার এই দুব্বো দরকার ছিল। বাড়ির কোনও পোষা জীবজন্তু অসুস্থ হলে তাকে দুব্বো খাওয়ালে ভাল কাজ দেয়। আচ্ছা ঝামেলা ! বেড়ালকে অসুস্থ হলে দুব্বো খেতে দ্যাখেননি ? এবার কেটে পড়ুন।" লোকটার মুখচোখ শক্ত হয়ে গেল।

অর্জুন হেসে ফেলল। একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে বেশ নাটক করা গেল। এতে সন্ধেটা মন্দ কাটল না। সে পেছন ফিরে কয়েক পা যেতেই ফুচকাওয়ালাকে দেখতে পেল। মোড়ের একপাশে আলো জ্বেলে ফুচকা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে এক বৃদ্ধ পাতায় দেওয়া ফুচকা গালে পুরছেন একটার পর একটা। তাকে দাঁড়াতে দেখে ফুচকাওয়ালা বলল, "দেব বাবু ? টাকায় দুটো। ফাস্ট ক্লাস জিনিস। এই বুড়োবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। রোজ এই সময় উনি পাঁচ টাকার ফুচকা খান।"

"খাই কি সাধে ? ডাক্তারের নিষেধে বাড়িতে সেদ্ধ ছাড়া সব নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। নইলে এ-জিনিস মুখে তুলতাম না আগের দিনে। বেশিদূর হাঁটতেও পারি না যে, কোনও রেস্তরাঁতে বসে খাব। এ-পাড়ায় মনে হচ্ছে নতুন।" বৃদ্ধ খাদ্যবস্তু গলা দিয়ে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কাছে এসে দেখলেই বোঝা যায় ভদ্রলোক মোটেই সুস্থ নন।

"আমি আজই এসেছি। ডক্টর পত্রনবীশের বাড়িতে উঠেছি।"

"সে আবার কে ? এ-পাড়ায় তো ও-নামের কেউ নেই। আমি এই ব্লকের প্রেসিডেন্ট, আমার অজানা কেউ তো এখানে নেই !"

"আজ্ঞে, উনি এ-পাড়ায় থাকেন না।"

"অ। তাই বলো। তা ফোটোগ্রাফারের সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল ?"

"ফোটোগ্রাফার ?"

"আঃ। যার সঙ্গে এইমাত্র কথা বললে !"

"উনি পার্ক থেকে দূর্বাঘাস নিয়ে এলেন। ওঁর কোনও পোষা প্রাণী অসুস্থ। দূর্বাঘাস খেলে সেটা বোধ হয় সুস্থ হয়ে যায়।"

"কী যা-তা বলছ। তা হলে তো পৃথিবীর সব প্রাণী ওষুধপত্র ছেড়ে দূর্বাঘাস খেত। পশু চিকিৎসকদের ব্যবসা লাটে উঠে যেত। তা ছাড়া ফোটোগ্রাফারের বাড়িতে কোনও পোষা প্রাণী আছে বলে তো শুনিনি।"

"ভদ্রলোককে আপনি চেনেন ?"

"বিলক্ষণ। ও যে বাড়িতে আছে সেটা ছিল ডক্টর হালদারের। ওঁর ছেলেমেয়ে দুটোই আমেরিকায় থাকে। বছরখানেক হল ডক্টর মারা গিয়েছে। মা এখানে একা কী করে থাকবে তাই ছেলে এসে নিয়ে গেছে নিজের কাছে। মাসদেড়েক আগে মেয়ে আবার এসেছিল। দু'দিন থেকে চলে যাওয়ার সময় ওই ফোটোগ্রাফারকে বসিয়ে গেল কেয়ারটেকার হিসেবে। গোপনে ভাড়া নেয় কিনা জানি না। তবে ফোটোগ্রাফার একাই থাকে। একদিন আলাপ করেছিলাম। বিয়ে-থা করেনি। বিদেশে ছিল বলে বাড়ির সব কাজ নিজের হাতে করে। কাজের লোক রাখেনি।" বৃদ্ধ বললেন, "অ্যাই, আমার ফাউটা দে।"

pathagar.net

॥ ৫ ॥

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। বাড়ির সামনে জিপ দাঁড়িয়ে। এই জিপ পুলিশের। বেল টিপতেই বৃদ্ধ দরজা খুললেন, "আরে এসো, এসো। গঙ্গাপদ বলল হাওয়া খেতে বেরিয়েছ। আগে বেড়াবার পক্ষে আদর্শ জায়গা ছিল সল্ট লেক।"

"আগে ছিল মানে ?"

"'লবণহ্রদ সংবাদ' বলে একটা পাক্ষিক কাগজ আছে এখানে। খুললেই দেখবে ছিনতাই আর গুণ্ডামি হচ্ছে সন্ধের পর রাস্তায় রাস্তায়। এসো।"

ঘরে ঢুকে অর্জুন দেখল, রোগা ভদ্র চেহারার একটি মানুষ বসে আছেন চেয়ারে। বৃদ্ধ আলাপ করিয়ে দিলেন, "ইনি হচ্ছেন অবনীমোহন। খুব ভাল ছেলে। পুলিশে চাকরি না করে অধ্যাপক হলে মানাত।"

অবনীমোহন হাসলেন, "কেন ? পুলিশের চাকরি করলে বিশাল ভয়ঙ্কর চেহারা করতে হবে ?"

"ইয়েস। কারেক্ট। ইংরেজ আমলে অফিসারদের চেহারা ছিল বুলডগের মতো। আরে সেই চেহারা দেখেই অপরাধীরা ভয়ে মরত। ওহো, এই

ছেলেটির নাম অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকে। আজই আমার কাছে বেড়াতে এসেছে।"

অর্জুন নমস্কার করলে অবনীমোহন হাতজোড় করলেন।

অবনীমোহন বললেন, "আপনার নামটি খুব বিখ্যাত।"

ডক্টর পত্রনবীশ বললেন, "টিভিতে কিন্তু অর্জুনের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণ বেশি বিখ্যাত হয়েছে।"

অবনীমোহন বললেন, "সে অর্জুনের কথা বলছি না। জলপাইগুড়ি শহরে অর্জুন নামের একজন নাকি দারুণ-দারুণ রহস্যের সমাধান করেছেন। আপনি সেই লোক নন তো?"

অর্জুন হেসে ফেলতেই অবনীমোহন উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেন, "ঠিক ধরেছি, তাই না? আসুন হাত মেলান। কিন্তু সার, এ কী ব্যাপার হল? রাতারাতি ওঁকে জলপাইগুড়ি থেকে টেনে আনলেন অথচ আমাকে কিছু জানালেন না?"

ডক্টর পত্রনবীশ বললেন, "আহা, আমি তো ওর কথা জানতামই না। আমি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম অমল সোমকে। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। তিনিই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

"অমল সোম! হ্যাঁ, এই নামটিও শোনা। আমার এক বন্ধু জলপাইগুড়ির ওসি ছিলেন। তিনি খুব প্রশংসা করতেন ভদ্রলোকের। তা অর্জুনবাবু, নিশ্চয়ই সারের কাছে সব শুনেছেন। আপনার কী মনে হয়? আমি তো এখনও আশঙ্কার কিছু দেখছি না। যে ভদ্রলোক টেলিফোনে শাসিয়েছিল সে দ্বিতীয়বার ফোন করেনি। সারের বাড়িতে যে ফোন আসবে তা চেক করার ব্যবস্থাও করেছি।" অবনীমোহন বললেন।

অর্জুন বলল, "কিন্তু দুটো কুকুরের একটা যে গলার স্বর পেয়েছে সেটা তো সত্যি।"

অবনীমোহন অন্যমনস্কভাবে নিজের চুলে হাত বোলালেন, "ওটা নেহাতই দুর্ঘটনা। আমরা শুনেছি দীর্ঘদিন ধরে যে মানুষ বিছানা থেকে নিজে নামতে পারেননি তিনি কোনও আকস্মিক আঘাত পেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছেন। সেই একই আঘাত ওই ধরনের কোনও রুগিকে দিয়ে একফোঁটা কাজ হয়নি। তাই এগুলোকে দুর্ঘটনা বলাই ভাল।"

এই সময় গঙ্গাপদ ছুটতে-ছুটতে এসে জানাল ফোন এসেছে এবং সেই সাহেবই কথা বলছে, যা সে একবর্ণও বুঝতে পারেনি। সঙ্গে-সঙ্গে ডক্টর পত্রনবীশ উঠে দাঁড়ালেন। অবনীমোহন বললেন, "আপনি কথা বলুন। যতটা সম্ভব সময় নেবেন যাতে লোকটার টেলিফোন নাম্বার ভাল করে নোট করা যেতে পারে।"

ডক্টর পত্রনবীশ ভেতরে যেতে বাকিরাও তাঁকে অনুসরণ করল।

রিসিভার তুলে ডক্টর পত্রনবীশ জিজ্ঞেস করলেন, "কে বলছেন ?"

ওদিকের কথা শুনে ইংরেজিতে বললেন, "ইয়েস, ডক্টর পত্রনবীশ স্পিকিং। হ্যাঁ, আমার টেলিফোন গোলমাল করছিল। না, এখনও কিছু ভাবিনি আমি।" এইটুকু বলার পর ডক্টর অনেকটা সময় ধরে ওপাশের বক্তব্য শুনলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি যে এতটা করতে চাইছেন এতে আপনার স্বার্থ কী ?" জবাব শুনে বললেন, "কোনও প্রাইভেট ডোনেশনের চেয়ে সরকারি অনুদানের ওপর নির্ভর করতে আমার ভাল লাগবে। আপনার টেলিফোন নাম্বার দিন, যদি মত পরিবর্তন করি তা হলে জানিয়ে দেব।" কয়েক সেকেন্ড রিসিভার ধরে রেখে ধীরে-ধীরে সেটাকে নামিয়ে ফেললেন ডক্টর।

অবনীমোহন চটপট রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, "কে বক্সী ? শোনো, তুমি এখনই টেলিফোন এক্সচেঞ্জে ফোন করো। ডক্টর পত্রনবীশের বাড়িতে এইমাত্র ঘোস্ট কল এসেছিল। আমি এখানেই আছি। কুইক।" রিসিভার নামিয়ে অবনীমোহন বললেন, "এখনই লোকটার নাম্বার পেয়ে যাব। ও নিশ্চয়ই আপনাকে নাম্বার দেয়নি !"

মাথা নেড়ে না বললেন ডক্টর পত্রনবীশ। ওঁকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল। অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, "কী বলল লোকটা ?"

ডক্টর বললেন, "একই কথা। আমার গবেষণার সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব সে নিতে চায়। স্বার্থ কী জানতে চাইলে বলল, বিজ্ঞানের সেবা করতে চায়। বুঝুন ! আমি নাম্বার চাইতে বলল, ও আবার টেলিফোন করবে। ডিস্টার্বিং, খুব বিরক্তিকর।"

"যদি কেউ ফালতু রসিকতা করে থাকে তা হলে তাকে উচিত শিক্ষা পেতে হবে।" অবনীমোহন বেশ জোরের সঙ্গে বললেন। আর তখনই টেলিফোনটা শব্দ তুলল। অবনীমোহন খপ করে রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যালো ? ও বক্সী, পেয়েছ ? হ্যাঁ, কী ? মাই গড। ঠিক আছে। রাখছি।" রিসিভার রেখে রুমালে মুখ মুছলেন অবনীমোহন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ?"

"অতি ধড়িবাজ লোক। একটা পাবলিক বুথ থেকে পয়সা ফেলে ফোন করেছে। এসটিডি আইএসডি বুথ হলেও ট্র্যাক করা যেত।"

"সল্ট লেকের কোনও টেলিফোন বুথ ?"

"না। লিন্ডসে স্ট্রিটের। ওখানে কাউকে পাঠিয়ে আর কাজ হবে না।"

লিন্ডসে স্ট্রিটের নাম শুনেছিল অর্জুন। কিন্তু এলাকাটা তার জানা নেই। সেটা জিজ্ঞেস করতে অবনীমোহন বুঝিয়ে দিলেন। সেটা শোনার পর অর্জুন বলল, "যদি বিদেশি কেউ হয় তা হলে তার ওই পাড়াতেই থাকা উচিত। কিন্তু আপনার কি মনে হয় যার সঙ্গে কথা বলেছেন সেই লোকটা বিদেশি ?"

"বিদেশি হতে পারে, তবে ইংরেজ নয়। আবার আমেরিকানও নয়।"

অবনীমোহন আর এ-নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইলেন না। তাঁকে এখন অন্য একটি তদন্তে যেতে হবে। তিনি চলে যাওয়ার পর গঙ্গাপদ জানাল, রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। ঘড়িতে এখন মাত্র ন'টা। এত তাড়াতাড়ি জলপাইগুড়িতে খাওয়ার কথা চিন্তাও করে না অর্জুন। কিন্তু ডক্টর পত্রনবীশ তাঁর নিজস্ব রুটিন মেনে চলতেই পছন্দ করেন। অতএব অর্জুনকে তাঁর সঙ্গে বসতে হল। গঙ্গাপদ মন্দ রান্না করে না। খাওয়া শেষ করে ডক্টর চলে গেলেন তাঁর গবেষণাগারে! আজ আকাশ নির্মেঘ।

নিজের ঘরে ফিরে জানলার পাশে চেয়ার টেনে অর্জুন সামনের দেবদারু গাছগুলো দেখছিল। অত ওপরে রাস্তার আলো না পৌঁছনোয় অন্ধকার জাঁকিয়ে রয়েছে গাছগুলোর মাথায়-মাথায়। নাঃ! আজকের দিনটা বৃথাই গেল। ব্যাপারটা এমন সাধারণ যে, কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না এগিয়ে যাওয়ার। ওরাং ওটাংটার এ বাড়িতে ঢোকা, মন্মথ দত্তর উপস্থিতি যে তাকে উদ্ধার করার জন্যে তা প্রমাণ করা যাবে না। ডক্টর পত্রনবীশ যদি ঘরের দরজা না খুলতেন তা হলে ওরাং ওটাংটা পালাবার সুযোগই পেত না। সে ক্ষেত্রে মন্মথ দত্ত কী করে তাকে উদ্ধার করত? আর প্রাণীটি মন্মথ দত্তর হলে ঘর থেকে বেরিয়ে ও মন্মথর কাছেই আশ্রয় নিত। ঘটনাটা তো এমন হতে পারে ওরাং ওটাং এবং মন্মথ দত্তর আসা দুটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ঘটনা। হ্যাঁ, টেলিফোন যে করছে সে নিজেকে রহস্যের আড়ালে রেখেছে। কিন্তু রহস্য মানেই অপরাধ নয়। এক্ষেত্রে অবনীমোহন যা বলছেন সেটাই সত্যি মনে হচ্ছে। ডক্টর পত্রনবীশ খামোকা ভয় পেয়ে অমল সোমকে টেলিগ্রাম করেছিলেন।

এই সময় গঙ্গাপদ জানাল জলপাইগুড়ি থেকে টেলিফোন এসেছে। অর্জুন দ্রুত গিয়ে রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই অমল সোমের গলা পেল, "কিছু কাজ হল?"

"নাঃ। আমার মনে হচ্ছে এখানকার ওসি অবনীমোহনবাবুর কথাই ঠিক। ডক্টর পত্রনবীশের ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এক টেলিফোন ছাড়া। যে লোকটি নিজের পরিচয় না দিয়ে প্রথমবার ফোন করেছিল সে আমরা থাকতেই আবার ফোন করে। তবে ভয় দেখায়নি বা শাসায়নি। বিনীতভাবে আর্থিক সহায়তা দিতে চেয়েছে।"

"কেন?"

"এটুকুই রহস্য। এ ছাড়া আর কিছু নেই।"

"ঠিক আছে। আরও দু'দিন থাকো। বাড়িতে বসে না থাকতে চাইলে আশেপাশের রাস্তায় হাঁটাহাটি করো। শুনেছি সন্ট লেক চমৎকার জায়গা।"

অর্জুনের মনে পড়ল, "আজ সন্ধের পর বেরিয়েছিলাম। একটা ঘটনা।" বলতেই তার খেয়াল হল লোকটার কথা। বৃদ্ধ যাকে ফোটোগ্রাফার

বলছিলেন !

"কী ঘটনা ?" অমল সোম জানতে চাইছিলেন ।

অর্জুন ঘটনাটা বলল। বলতে-বলতে তার মনে হল ব্যাপারটা কীরকম হল ? পাড়ার লোক জানে ভদ্রলোকের বাড়িতে পোষা প্রাণী নেই, অথচ তিনি দূর্বাঘাস নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর অসুস্থ প্রাণীকে খাওয়াবেন বলে ?

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "ওঁর বাড়িটা দেখেছ ?"

"না। আসলে দেখার কারণ তো ছিল না।"

"ভদ্রলোক বিদেশে থাকা বাড়ির মালিকের কেয়ারটেকার হয়ে আছেন। তাঁকে রেখে গেছেন যিনি, তিনি পাড়ায় কীরকম পরিচিত ? কাল গিয়ে আলাপ করে এসো। আরে ফোটোগ্রাফির ওপর নতুন তথ্য হয়তো জানতে পারবে, তাই-বা মন্দ কী ?" অমল সোম টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

সকালে ব্রেকফাস্ট করে হাঁটতে বের হল অর্জুন। ব্রেকফাস্ট টেবিল থেকে বিশ্রাম নিতে চলে গেলেন ডক্টর। কাল সারারাত ভদ্রলোক কাজ করেছেন। বললেন, "সাঙ্ঘাতিক একটা ভুল করতে চলেছিলাম হে ! বড়-বড় অঙ্ক সহজে করেও অনেকে ওয়ান প্লাস ওয়ান যেমন ওয়ান লেখে সেইরকম ব্যাপার। ভুলটা ধরা পড়ায় পুরো ব্যাপারটা নতুন করে করতে হবে। তুমি তো কলকাতা শহর ভাল করে দ্যাখোনি। আজ যাও পাতাল রেল চড়ে এসো। কলকাতার একমাত্র গর্বের বস্তু।"

খানিকটা হাঁটতেই গাড়ির আওয়াজ পেতেই সরে দাঁড়াতেই গাড়িটা পাশে এসে দাঁড়াল। অবনীমোহন ড্রাইভারের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছেন ?"

"কোথাও নয়, এমনি !"

"উঠে পড়ুন। মনে হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং ঘটনা দেখাতে পারব। সুইমিং পুলের কাছে সেই ওরাং ওটাংটা আটকে পড়েছে। উঠুন।"

অর্জুন জিপে উঠে জিজ্ঞেস করল, "আটকে পড়েছে মানে ?"

"একটা বড় গাছ একা দাঁড়িয়ে ছিল। পাবলিকের তাড়া খেয়ে ব্যাটা সেই গাছে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু গাছটাকে ঘিরে এত লোক জমে গিয়েছে, আর পালাতে পারছে না। আমরা জাল ছুড়ে ওকে ধরে ফেলব।" অবনীমোহন বেশ জোরের সঙ্গে বললেন।

দূর থেকেই ভিড় দেখা যাচ্ছিল। শ'খানেক মানুষ গাছটাকে ঘিরে উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে। কেউ-কেউ ঢিল ছুড়ছে। গাড়ি থেকে নেমে অবনীমোহন চিৎকার করলেন, "কেউ ঢিল ছুড়বেন না। বন্য প্রাণীকে আহত করাও অপরাধ। আপনারা গাছের একদিকে সরে যান।" গাড়ির পেছন থেকে নেমে কয়েকজন সেপাই জনতাকে সরিয়ে দিচ্ছিল। অর্জুন চেষ্টা করছিল দেখতে কিন্তু ডালপাতার কোন আড়ালে প্রাণীটি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে

তা ধরা যাচ্ছে না। অবনীমোহনও তাকে দেখতে না পেয়ে কাছাকাছি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরাং ওটাংটা গাছে আছে তো ?"

"দু'মিনিট আগে দেখেছি সার। নীচে নেমে তাড়া খাওয়ামাত্র আবার ওপরে উঠে গেল!" অবনীমোহন তাঁর লোককে নির্দেশ দিলেন, যেদিকে জনতা দাঁড়িয়ে আছে তার উলটো দিকে জাল পাততে। সেটা পাতা হলে গাড়ি থেকে দুটো ধোঁয়াবোম বের করে গাছের গোড়ায় নিয়ে গিয়ে তাতে আগুন দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে গলগল করে ধোঁয়া ওপরে উঠতে লাগল। অবনীমোহন চিৎকার করে সতর্ক করলেন তাঁর সঙ্গীদের, "নাকে ধোঁয়া গেলেই ও লাফিয়ে নীচে নামবে। ও যাতে জালের ওপর পড়ে সেই চেষ্টা করতে হবে। বি অ্যালার্ট।"

সবাই চুপ করে গেল। প্রত্যেকের নজর গাছের ওপর! কৌটো থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে ক্রমশ গাছটিকে গ্রাস করে নিচ্ছে। এই সময় একটি লরি বেশ দ্রুতগতিতে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। সামনে লোক পড়ায় ড্রাইভার ব্রেক কষতে বাধ্য হল। লোকটি সরে যাওয়ামাত্র লরি যখন চলতে শুরু করেছে তখনই ওপর থেকে ওরাং ওটাংটা লাফিয়ে নেমে পড়ল লরির চার দেওয়ালের মধ্যে। হইহই চিৎকারের দাপটে সম্ভবত ঘাবড়ে গিয়েই ট্রাক ড্রাইভার স্পিড বাড়াল। লোকজন পেছনে ধাওয়া করতে না করতেই সেটা উধাও। অবনীমোহন তাঁর গাড়ির দিকে ছুটলেন, ট্রাকটাকে ধরতে হবে। ওর মধ্যেই আছে প্রাণীটি। যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালু করে পুলিশের ড্রাইভার অনুসরণ শুরু করেই একটু থিতিয়ে গেল। রাস্তা সুনসান। কোথাও লরি বা ট্রাকের টিকিও দেখা যাচ্ছে না। সে দুর্বল গলায় জিজ্ঞেস করল, "কোনদিকে যাব সার ?"

"বাঁ দিকে, বাঁ দিকে বাঁক নিয়েছিল, আমি দেখেছি।"

মিনিটপাঁচেক এগিয়েও যখন ওটাকে পাওয়া গেল না তখন অবনীমোহনের আফসোস শুরু হল, "অ্যাঃ। হাতের মুঠোয় পেয়েও ধরতে পারলাম না। ঠিক সময়ে ট্রাকটা এসে গেল গাছটার ওপাশে। ব্যাড লাক।"

ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে, হিন্দি ছবিকেও হার মানায়। হিন্দি ছবির হিরোর মতো কাণ্ড করল ওরাং ওটাংটা। অর্জুন হেসে ফেলল।

"হাসছেন যে ?"

"প্রাণীটি বেশ বুদ্ধিমান।"

"হুঁ।" অদ্ভুত শব্দ ছিটকে এল অবনীবাবুর গলা থেকে।

ছুটন্ত গাড়িতে বসে বাঁ দিকে তাকাতেই আর-একটা রাস্তার পাশে যেন এক ঝলকে কিছু দেখতে পেল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামাতে বলল সে। ড্রাইভার ব্রেক কষতে সে বলল, "ব্যাক করে নিয়ে যান তো, ওই গলি পর্যন্ত।"

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

"এক ঝলক দেখেছি, আর একবার দেখি।"

গাড়ি পিছিয়ে যেতে গলির মধ্যে লরিটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। উত্তেজিত অবনীমোহন ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতেই সে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেল লক্ষ্যে। লরিতে কেউ নেই। ওরাং ওটাংটার থাকার কথা নয়, ড্রাইভার খালাসিও নেই। অথচ লরিতে বালি বোঝাই করা হয়েছে। আশেপাশের ছাড়া-ছাড়া বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ। কাছাকাছি বাড়িটির দরজার বেল টিপে অবনীমোহন আবিষ্কার করলেন সেখানে একজন বৃদ্ধা থাকেন। পুত্র এবং পুত্রবধূ চাকরি করতে বেরিয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধা কিছুই দ্যাখেননি, কারণ তিনি শুয়ে ছিলেন।

অবনীমোহন ফিরে এসে বললেন, "এখানে ট্রাকটা পড়ে আছে কেন ?"

অর্জুন বলল, "যে বালি সাপ্লাই দিতে যাচ্ছিল সে ইচ্ছে করে এখানে ফেলে রেখে যাবে না। যে রেখে গিয়েছে সে লরির চাবিও নিয়ে যায়নি।"

"তাই নাকি ? স্ট্রেঞ্জ !"

"আপনি নিশ্চয়ই থানায় গেলে কমপ্লেন পাবেন কারও লরি ছিনতাই হয়েছে। আর যে ছিনতাই করেছে সে ওরাং ওটাংটাকে বাঁচাবার জন্যেই করেছে।"

"তার মানে, আমাদের চোখের সামনে ওরাং ওটাংটাকে রেসক্যু করে হাওয়া হয়ে গিয়েছে ওর মালিক ? এ তো সিনেমার মতো ব্যাপার ?" অবনীমোহন যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, "তা ছাড়া এখান থেকে যাবে কোথায় ? একটা লোক ওরাং ওটাং নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখলে সবাই তো কৌতূহলী হবে। ওই মোড়ে একটা সিগারেটের দোকান আছে, দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে দেখি ও কিছু বলতে পারে কি না।"

"কোনও লাভ হবে না। ওরাং ওটাং নিয়ে যখন এত টেনশন তখন কেউ ওর হাত ধরে রাস্তায় হাঁটবে না। এখানে গাছগুলো রাস্তার ধারে একেবারে গায়ে-গায়ে চলে গিয়েছে। লোকটা রাস্তা দিয়ে হেঁটেছে আর প্রাণীটি গাছ থেকে গাছে।" অর্জুন নিশ্চিন্ত হয়ে বলল।

লরিটাকে থানায় নিয়ে আসা হল। এবং তখনই ওরা কিছু উত্তেজিত লোককে দেখতে পেল। অবনীমোহনকে দেখে তারা একসঙ্গে অভিযোগ করতে লাগল, লরি ছিনতাই হয়েছে। সুইমিং পুলের ওপাশে একটা নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে। সেখানে লরিটা বালি নিয়ে এসেছিল।

নিজের চেয়ারে বসে অবনীমোহন বিস্তারিত শুনলেন। লরিওয়ালা স্পটে পৌঁছে লরি থেকে নেমে কন্ট্রাক্টরের লোকের সঙ্গে কথা বলছিল যখন, তখন একটা লোক দ্রুত লরিতে উঠে যায়। চাবি গাড়িতেই ঝুলছিল বলে স্টার্ট নিতে অসুবিধে হয়নি। ওরা হইহই করে তেড়ে যেতেই লোকটা লরি ছুটিয়ে উধাও হয়ে গিয়েছিল। সেই লরি যে এত তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়া যাবে, তা ওরা কল্পনাও করেনি।

টেবিলের একপাশে চেয়ারে বসে অর্জুন চুপচাপ শুনছিল। প্রশ্ন যা করার অবনীমোহন করছিলেন। বালিসমেত লরি ফিরে পাওয়ায় লোকগুলোর আগের উত্তেজনা দ্রুত কমে যাচ্ছিল। এখন আর ডায়েরি করে ঝামেলা বাড়াতে তারা তেমন উৎসাহী নয়। কিন্তু অবনীমোহন তাদের কথা শুনলেন না। ডায়েরি লিখে লোকগুলোকে দিয়ে সই করালেন। কোনও লোক তাঁর এলাকায় অপরাধ করে পার পেয়ে যাবে এ তিনি হতে দেবেন না। এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, যে লোকটি লরি চালিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছিল তাকে আপনারা দেখেছেন?"

তিনজনই একসঙ্গে হ্যাঁ বলে উঠল।

"কীরকম দেখতে লোকটা?"

দু'জন দু'রকমের বর্ণনা করল। তৃতীয়জন মাঝামাঝি। সে বলল, "ঠিক লম্বা নয়, আবার খুব বেঁটেও না। তবে যুবক বলে মনে হচ্ছে না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "মনে করে দেখুন তো, লোকটাকে দেখে খুব দুর্বল বলে মনে হয়?"

"না সার। গায়ে যে জোর আছে তা দেখলেই বোঝা যায়।"

"চোখদুটো কি ছোট?"

তিনজনেই বলল তারা চোখ দেখার সুযোগ পায়নি। তবে এখন মনে হচ্ছে লোকটা যাকে বলে কমবয়সী তা নয়। বড়বাবুর বয়সী তো হবেই।

অবনীমোহনের কপালে ভাঁজ পড়ল, "আমার বয়সী? তা হলে তো পঞ্চাশ হয়ে গিয়েছে!" বলে হাসলেন তিনি, "দুর। পঞ্চাশের ওপর বয়সী কোনও বাঙালি এমন করিৎকর্মা হতে পারে না। এরা কী দেখতে কী দেখেছে! ঠিক আছে, যাও তোমরা।"

ওরা চলে গেলে অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আচ্ছা—!"

"আরে! এক কাপ চা খেয়ে যান। এই প্রথম আমার এখানে এলেন।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আজ থাক।"

"একটা কথা। আপনি তো লোকটাকে দেখেননি। তা হলে চোখ ছোট কিনা জিজ্ঞেস করলেন কেন? এইটে আপনার মাথায় কেন এল?"

"কোনও কারণ নেই। একটা কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজতে চেয়েছিলাম, তাই!"

॥ ৬ ॥

সারাটা দিন বই পড়ে আর ঘণ্টাখানেক সময় ডক্টর পত্রনবীশের সঙ্গে গল্প করে দিব্যি সময় কেটে গেল। ভদ্রলোক তাঁর গবেষণার বিষয় ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও খবরে যেমন আকৃষ্ট নন, তেমনই কথা বলতে গেলেও নিজের বিষয় চলে আসে তাঁর ঠোঁটে। শুনতে-শুনতে অর্জুনের মনে হচ্ছিল, সত্যি,

আমরা কিছুই জানি না। সমুদ্রের নীচে জলের তলায় প্রতিনিয়ত কত কী সংঘর্ষ হচ্ছে এবং তার ফলে যে শব্দমালা জলের মধ্যে জন্মে জলেই মুখ ডুবিয়ে মরে যাচ্ছে, তার খবর কি আমরা রাখি ? আকাশ তো আরও বিশাল ব্যাপার। শব্দ তৈরি হতে গেলে সংঘর্ষ দরকার। এটা প্রাথমিক নিয়ম। কিন্তু মেঘেদের ওপাশে অনন্ত আকাশে কোনও বস্তু নেই, যা পরস্পরকে আঘাত করবে। তা হলে শব্দ হবে কী করে ? যেখানে বাতাস নেই সেখানে ? একেবারে অজ্ঞ গলায় এই প্রশ্নটি সে ডক্টর পত্রনবীশকে করেছিল। ডক্টর পত্রনবীশ বলেছিলেন, "বস্তু নেই কে বলল ? এত গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র মহাকাশের সংসারে ভেসে বেড়াচ্ছে তারা কী করতে আছে ?" অর্জুন বলেছিল, "তারা তো প্রতিনিয়ত পরস্পরকে আঘাত করছে না।" ডক্টর হাসলেন, "যা করছে তার অনুরণন দীর্ঘকাল ধরে অনুরণিত হয়ে চলেছে, যার খবর পৃথিবীর মানুষের কাছে অজানা। আর প্রতিনিয়ত যে হচ্ছে না তাই-বা জানছি কী করে ? আজ রাত্রে আমার গবেষণাঘরে তুমি একবার এসো। গতকাল আমি এক শব্দ পেয়েছি। খুব ক্ষীণ। তোমাকে শোনাব।"

বিকেলবেলায় অর্জুন বেরিয়ে পড়ল সেজেগুজে। ডক্টর পত্রনবীশের কথা তার মাথায় পাক খাচ্ছিল। আমরা যেটা বুঝি না সেটাকে অস্তিত্বহীন ভাবলে খুশি হই অথবা আমাদের জাগতিক ধ্যানধারণা থেকে যা সত্যি বলে মনে হয় তার বাইরে কোনও কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চাই না। আবার একদল আছেন যাঁরা জোর করে অস্তিত্বহীনকে স্থায়ী প্রমাণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। লোকে যা বলে তার উলটোটা ভাবাই তাঁদের নেশা। ডক্টর পত্রনবীশকে এঁদের দলে ফেলতে ইচ্ছে করছে না। ভূত নেই তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু পৃথিবীর অনেক শিক্ষিত মানুষও ভূতে বিশ্বাস করেন। তাঁরা প্রমাণ করার চেষ্টাও করেছেন। তেমন পরিস্থিতিতে সবল মানুষও ভীত হন। মনের ডাক্তাররা বলবেন মানুষের মনে সবসময় যে আতঙ্ক সুপ্ত থাকে ভৌতিক পরিবেশ তাকে উসকে দেয়। এই ব্যাখ্যা অনেকে মানতে চান না। বস্তুত ব্যাখ্যা করে কি কারও বিশ্বাস অর্জন করা যায় ? পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম হল কচ্ছপ। তারা সমুদ্রে থাকে। যখন তাদের ডিম পাড়ার সময় হয় তখন তারা জল ছেড়ে তীরে উঠে আসে কেন ? কে শিখিয়েছে তাদের জলে ডিম পাড়লে তা অন্য মাছ খেয়ে নেবে, নষ্ট হয়ে যাবে ? বালিতে উঠে এসে তারা কেন বালি খুঁড়ে গর্ত করে ! কে বলে দিয়েছে বালির ওপর ডিম পাড়লে পাখিরা খেয়ে নেবে ? সেই গর্তে ডিম পেড়ে তারা বমি করে অনেকটা। তারপর বালিচাপা দিয়ে আবার ফিরে যায় জলে। বালির উত্তাপে ডিম ফেটে বাচ্চা বেরিয়ে প্রথম কয়েকদিন ওই বমি খেয়ে বালির তলায় বেঁচে থাকে। তারপর একটু শক্ত হলে বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে জলে নামে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে তার খাদ্যের প্রয়োজন হবে এটা মা-কচ্ছপ জানল কী

করে ? তার তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই, কেউ শেখায়নি। আবার বালি ফুঁড়ে বেরিয়ে বাচ্চা কচ্ছপ মাটির দিকে না এগিয়ে জলের দিকে হাঁটে কেন ? কোন যুক্তিতে ? জীববিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যায় যে শব্দটি ব্যবহার করেন তা হল ইনস্টিংক্ট। যুক্তি যখন ধারালো নয় তখন ওই শব্দটির নির্বাচন চমৎকার আড়াল তৈরি করতে পারে।

একটা কচ্ছপের এই আচরণের কৈফিয়ত যখন আমরা ঠিকঠাক দিতে পারি না তখন ডক্টর পত্রনবীশের গবেষণা নিয়ে মাথা ঘামানোর অধিকার তার নেই। উনি যদি সফল হন তা হলে এর ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। ততদিন অপেক্ষা করাই ভাল। অর্জুন যখন হেঁটে গতকালের ফুচকাওয়ালার কাছে পৌঁছল তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দুটো বাচ্চাকে নিয়ে একজন মহিলা ফুচকা খাচ্ছিলেন। গত সন্ধের বৃদ্ধকে সে দেখতে পেল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ফুচকাওয়ালা হাতের কাজ শেষ করে জিজ্ঞেস করল, "দেব বাবু ?"

অর্জুন মাথা নেড়ে না বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "গতকাল আমি এখানে এসে একজন বুড়োমানুষের সঙ্গে কথা বলেছিলাম মনে আছে ?"

লোকটা সামান্য ভেবে বলল, "হ্যাঁ। ওই মোড়ের বাড়ির বাবু।"

"উনি তো রোজ তোমার ফুচকা খেতে আসেন। আজ আসেননি ?"

"না।"

"আসার সময় তো যায়নি, তাই না ?"

"না বাবু। রোজ বিকেলে হাঁটতে যাওয়ার আগে উনি বলে যান ওঁর জন্যে আলাদা মশলা বানাতে। ফিরে যাওয়ার সময় খান। কিন্তু আজ আসেননি। বোধ হয় শরীর ভাল নেই, বুড়োমানুষ তো !"

"ওঁর সঙ্গে আমার একটু দরকার ছিল যে— কোন বাড়িতে থাকেন বললে ?"

ফুচকাওয়ালা একটু এগিয়ে এসে আঙুল তুলে দেখাল। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে তার বাঁ দিকের হলুদ বাড়িটায় বৃদ্ধ থাকেন বলে সে জানাল।

অর্জুন একটু রোমাঞ্চিত হল। ওই পথে সেই ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক হেঁটে গিয়েছিল দূর্বাঘাস নিয়ে। দু'পাশের বাড়িগুলো নিঝুম। ভেতরে আলো জ্বললেও জানলা-দরজা বন্ধ। ডক্টর পত্রনবীশ বলছিলেন সল্ট লেকের বাসিন্দাদের প্রধান শত্রুদের মধ্যে অন্যতম হল মশা এবং চোর। একপাশের খাল আর অন্যপাশের জলাভূমি থেকে জন্মমাত্র হাজার-হাজার মশা সল্ট লেকের বাসিন্দাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সন্ধের পর তো বটেই, দিনদুপুরে একতলা, কখনও দোতলার জানলা খোলা পেলে ছিঁচকে চোরের দল সরু লাঠি ঢুকিয়ে জিনিসপত্র জামাকাপড় নিয়ে যায়। এই দুই দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে প্রতিটি বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ রাখা হয়। অর্জুন দেখল এর ফলে এত সুন্দর সাজানো উপনগরীর কোথাও প্রাণের স্পর্শ নেই। ডান দিকের মোড়

boighar.net

ঘোরার সময় দাঁড়িয়ে গেল অর্জুন। হলুদ বাড়িটার জানলা দরজা বন্ধ। গেটের গায়ে লেখা আছে, কমলাপতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যারানি মুখোপাধ্যায়। তা হলে কি বৃদ্ধের নাম কমলাপতি ? সে এগিয়ে গিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে দরজার পাশে বেলের বোতামে চাপ দিল।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। কোনও মানুষ নেই। সে যে একটি বাড়িতে আগন্তুক তা কেউ লক্ষ করছে না। দ্বিতীয়বার চাপ দেওয়ার পর দরজা সামান্য ফাঁক হল। ভেতরে চেন আটকানো রয়েছে। জোর করলেও খুলবে না কিন্তু এক ইঞ্চিটাক ফাঁক থাকবে। সেই ফাঁকের ভেতর থেকে একজন মহিলা প্রশ্ন করলেন, "কী চাই ?" ঘরের হালকা আলোয় কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

"কমলাপতিবাবু আছেন ?"

"ওঁর শরীর খারাপ।"

"ও।"

"কিছু দরকার আছে ? কোত্থেকে আসছেন ?"

"বলুন, কাল সন্ধেবেলা ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। ডক্টর হালদারের বাড়িতে যে ফোটোগ্রাফার আছেন তাঁকে নিয়ে কথা হয়েছিল। আমার নাম অর্জুন। যদি একটু দেখা করেন তা হলে খুব খুশি হব।"

জবাব না দিয়ে মহিলা চলে গেলেন। মিনিট দুয়েক পরে ঘরে বড় আলো জ্বলল। মহিলাই দরজা খুলে বললেন, "বসুন।"

অর্জুন ঘরে ঢুকল। নিপাট ভদ্রলোকের ড্রইংরুম। মহিলাটি যে বাড়িতে কাজ করেন, তা সে অনুমান করল। একটা ছোট সোফায় বসল অর্জুন। মহিলা দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন ভেতরে। এবং তখনই সেই বৃদ্ধ দরজায় এসে দাঁড়ালেন, "কে ? হ্যাঁ, দেখেছি মনে হচ্ছে। কালকেই তো পার্কে দেখা হল, তাই না ?" বৃদ্ধ অনাবশ্যক জোরে কথাগুলো বললেন। অর্জুন ঘাড় নাড়ল। কিন্তু সে আপত্তি জানাবার আগেই বৃদ্ধ বললেন, "তা পার্কে যখন কথা হল তখন তো বলোনি বাড়িতে আসবে। কী দরকার বলো, আমার শরীরটা ভাল নেই।" বৃদ্ধ ধীরে-ধীরে উলটোদিকের সোফায় এসে বসলেন।

অর্জুন নিচু গলায় বলল, "আপনার দেখছি মনে নেই, পার্কে নয়, ফুচকাওয়ালার সামনে আপনার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম।"

সঙ্গে-সঙ্গে ঠোঁটের ওপর আঙুল তুলে চুপ করতে বললেন বৃদ্ধ। চট করে দরজাটা একবার দেখে নিলেন। তারপর টেবিল থেকে কাগজ তুলে পকেট থেকে কলম বের করে ফস ফস করে লিখলেন, "আমি ফুচকা খাই, বাড়িতে জানে না। জানলে কুরুক্ষেত্র হবে। কাল ওই ফুচকা খেয়ে সাতবার টয়লেট ছুটেছি। কারণ কাউকে বলতে পারছি না বলে ফুচকাওয়ালা বেঁচে গেল এ-যাত্রায়।" লেখাটা অর্জুনকে পড়িয়ে কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে সেগুলো কলমের সঙ্গে পকেটে ভরে ফেললেন।

অর্জুন হাসল এই লুকোচুরি দেখে। বলল, "আপনার শরীর খারাপ জানতাম না—।"

"ঠিক আছে। আমার কাছে কী উদ্দেশ্যে এলে ? দ্যাখো বাপু, আমি কোনওরকম ডোনেশন করতে পারব না। তা ছাড়া তোমাকে আমি চিনিও না। কোথায় যেন থাকো বলছিলে ?"

"পাশের পাড়ায়। ডক্টর পত্রনবীশের বাড়িতে এসেছি। আমার বাড়ি জলপাইগুড়িতে।"

"জলপাইগুড়ি ? চমৎকার শহর ছিল। নাইনটিন ফিফটি টু থেকে ফিফটি ফাইভ আমি ওখানে ছিলাম চাকরিসূত্রে। এন সি রায়, চারু সান্যাল এঁদের নাম শুনেছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা এবার খোলসা করে বলো।"

"আপনি বলেছিলেন এ-পাড়ায় ডক্টর হালদারের বাড়িতে একজন ফোটোগ্রাফার থাকেন। আপনার মনে পড়ছে ?"

"বিলক্ষণ। কেয়ারটেকার করে গেছে ডক্টর হালদারের মেয়ে।"

"কতদিন আগে ?"

"মাসদেড়েক হবে। কী ব্যাপার ?"

"উনি যে ফোটোগ্রাফার তা আপনি জানলেন কী করে ?"

"প্রায়ই ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে বেরোতে দেখি। আমার শোয়ার ঘর থেকে ওদের সদর দরজা স্পষ্ট দেখা যায়।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ নেই ?"

"আলাপ বলতে যা বোঝায় তা নেই। এক-আধবার যেচে কথা বলে দেখেছি তিনি মুখ খোলেননি।"

"আর কে আছে ওই বাড়িতে ?"

"ভদ্রলোক তো একাই যাওয়া-আসা করেন। বাড়িতে কাজের লোকও রাখেননি। হয়তো বিদেশে ছিলেন বলে নিজের কাজ নিজেই করে নেন। কিন্তু ভাই, তুমি ওর সম্পর্কে এত ইন্টারেস্টেড কেন ?"

"ওই দূর্বাঘাসই আমাকে সমস্যায় ফেলেছে।"

"দূর্বাঘাস ? ঠিক বুঝলাম না।"

"আপনি বলেছিলেন ও-বাড়িতে কোনও পোষা প্রাণী নেই। অথচ ভদ্রলোক তাঁর অসুস্থ পোষা প্রাণীর জন্যে পার্ক থেকে দূর্বাঘাস তুলে নিয়ে গেছেন।"

"তাতে তোমার কী ? আরে সল্ট লেকের নিয়ম হল কেউ কারও ব্যাপারে নাক না গলানো। তুমি কী করো ?" প্রশ্ন করার সময় কমলাপতিবাবু সোজা হয়ে বসলেন হঠাৎই।

"আমি সত্যসন্ধান করি।"

"সত্যসন্ধান ? তার মানে গোয়েন্দাগিরি ? উঃ। একটু দাঁড়াও, ফুচকার রিঅ্যাকশন, আমি এখনই ঘুরে আসছি।" প্রায় বিদ্যুদ্বেগে ভদ্রলোক ঘর ছেড়ে গেলেন।

জানলা বন্ধ। অর্জুনের খুব ইচ্ছে হচ্ছিল বাড়িটাকে ভাল করে দেখতে। কিন্তু তার পক্ষে এখনই উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। কমলাপতিবাবু ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক বাদে। এখন তাঁকে বেশ হালকা দেখাচ্ছে। এসে বললেন, "এত কম বয়সের গোয়েন্দা দেখা যায় না। কার্ড আছে ?"

অর্জুন সদ্য করানো কার্ড পার্স থেকে বের করে দিল। সেটা ভাল করে পড়ে কমলাপতিবাবু বললেন, "তুমি করেছ কী হে ? জলপাইগুড়ির ঠিকানা, তার মানে সেখানে বসেই গোয়েন্দাগিরির ব্যবসা চালাচ্ছ ? কেস পাও ?"

"আমি একে ঠিক ব্যবসা বলে ভাবি না। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন উঠে দাঁড়াতে কমলাপতি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন, "কীরকম গোয়েন্দা হে তুমি ? আমাকে ভাল করে জেরা না করেই চলে যাচ্ছ ?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "আপনার এ-ব্যাপারে কিছু বলার আছে ?"

"অবশ্যই। তুমি ওই ফোটোগ্রাফারকে কোনও কারণে সন্দেহ করছ। নিশ্চয়ই ব্যাটা কোনও অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। আমি তখনই ভেবেছিলাম ওইভাবে একা-একা থাকার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। আমার কাছে ডক্টর হালদারের ছেলের টেলিফোন নাম্বার আছে। তাকে ফোন করলেই লোকটার সম্পর্কে জানা যাবে।"

"উনি কোথায় থাকেন ?"

"নিউ জার্সি, আমেরিকায়। ছেলের সঙ্গে ও-দেশে যাওয়ার আগে ওর মা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখনই ঠিকানা, নাম্বার দিয়ে যান। ফোন করবে ?"

"করলে তো ভাল হয়।"

কমলাপতি বললেন, "বেশ, তা হলে ওপরে চলো। নীচের লাইনটা গোলমাল করছে।" তারপর গলা নামিয়ে বললেন, "আমার স্ত্রীকে খবরদার ফুচকার কথা বলবে না।"

"ঠিক আছে। কিন্তু বিদেশে ফোন করার খরচ তো অনেক।"

"আঃ, ছাড়ো তো। এ-বয়সে জীবন আলুনি হয়ে যাচ্ছে। রোজ-রোজ তো এমন উত্তেজনার সুযোগ পাওয়া যায় না। চলো।"

অগত্যা কমলাপতিকে অনুসরণ করল অর্জুন। তার কার্ড দেখার পর থেকেই যে ভদ্রলোকের ব্যবহার পালটে গিয়েছে এটা স্পষ্ট। দোতলায় উঠে ভদ্রলোক ডাকলেন, "ওগো শুনছ ? একটু বেরিয়ে এসো।"

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে এক বৃদ্ধা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। কম বয়সে যে তিনি

অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন তা এখনও বোঝা যায়। কমলাপতি পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এই ছোকরার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়িতে থাকে। ডক্টর চারু সান্যালকে চেনে। কী করে জানো?"

বৃদ্ধা নীরবে ঘাড় নাড়লেন।

"সত্যসন্ধান। হা হা হা। ইংরেজিতে যাকে বলে ডিটেকটিভ, এ হল তাই।"

বৃদ্ধা বললেন, "বাঃ, ভালই হল। আমি ভাবছিলাম কোনও কারণ ছাড়াই মাঝে-মাঝে তোমার পেট কেন খারাপ হয় তা খুঁজে বের করতে ডিটেকটিভ লাগাব।"

কমলাপতি আচমকা গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, "এসো অর্জুন, এই ঘরে।"

ঘরে ঢুকে বোঝা গেল এটা একটা বেডরুম কিন্তু সেই কাজে ব্যবহৃত হয় না। টেবিলের ওপর ফোনের পাশে থাকা একটা ডায়েরি খুললেন কমলাপতি। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এদিকের জানলাটা একটু খুলতে পারি?"

"জানলা? মশা ঢুকবে যে! অবশ্য এখন সন্ধে পেরিয়ে গিয়েছে, খোলো।"

অর্জুন জানলা খুলল। সামনেই রাস্তা। রাস্তার ওপাশে লম্বা দেবদারু গাছের সারি। উলটো দিকের বাড়িটা সেই গাছের আড়ালে অনেকটাই চাপা পড়ে গিয়েছে। শুধু দেখা যাচ্ছে দোতলায় আলো জ্বলছে এবং তার একটি জানলা খোলা। অর্থাৎ ফোটোগ্রাফার বাড়িতে আছে। বাড়ির একতলা অন্ধকার এবং সদর দরজা বন্ধ।

"বিদেশের নাম্বার ডায়াল করা ঝকমারি। আঙুল ব্যথা হয়ে যায়। আচ্ছা, এখন ওদের সময়টা কী? সকাল হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই।" নিজের মনেই কথা বলতে-বলতে কমলাপতি বলে উঠলেন, "হ্যালো? হ্যাঁ, মিসেস হালদার আছেন? ও, আপনি ওঁর ছেলে? আমি কমলাপতি মুখোপাধ্যায় বলছি, সল্ট লেকের উলটো দিকের বাড়ি। চিনতে পেরেছেন? গুড! আচ্ছা, আপনার বাড়িতে যিনি কেয়ারটেকার হিসেবে আছেন তাঁকে চেনেন ভাল করে? কী? আপনি জানেন না কেউ এখানে কেয়ারটেকার হিসেবে আছে কিনা? আরে আপনার বোনই তো কিছুদিন আগে রেখে গেছেন। আপনার বোন বলেননি? তাঁকে জিজ্ঞেস করুন। আমার নাম্বার আপনার মায়ের কাছে আছে। জেনে আমাকে জানালে খুশি হব। একটু সমস্যা হয়েছে। রাখছি।" ঝপ করে টেলিফোন নামিয়ে রেখে কমলাপতি চোখ বড় করলেন, "বোন দাদাকে না জানিয়ে লোকটাকে এখানে রেখেছে।"

"তাই?"

"কীরকম বিল উঠবে বলো তো?"

আচমকা প্রসঙ্গ পালটাতে হেসে ফেলল অর্জুন, "আমার ধারণা নেই।"

"যাকগে। এখন কী করা যায়? আচ্ছা, লোকটাকে গিয়ে চার্জ করব?"

“কী ব্যাপারে ?”

“ওর আইডেন্টিটি ?”

“উনি যা বলবেন তাই আপনাকে মেনে নিতে হবে। তারপর ?”

এই সময় কাজের লোকটি এক কাপ চা নিয়ে এল। কমলাপতি বললেন, “উনি তোমাকে ঘুষ দিচ্ছেন। চা খাও কিন্তু ওঁর কেসটা হাতে নিয়ো না।”

চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু খেতে হল। আর তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলে কমলাপতি গলা শুনে ইশারায় বোঝালেন বিদেশের ফোন। বললেন, “হ্যাঁ। আপনার বোন বললেন তিনিই রেখে গেছেন। ওঁর পরিচিত ? ওয়াশিংটনে থাকেন। ও, ফোনে এর মধ্যে কথা বলা হয়ে গেল ! না, না, ওঁকে টেলিফোন করার দরকার নেই। সমস্যাটা হল, এ-পাড়ার দেখাশোনা করার জন্যে যে কমিটি তৈরি হচ্ছে তাতে আপনাদের তরফে ওঁকে নেওয়া যায় কিনা তাই নিয়ে সমস্যায় পড়েছি সবাই। নেব না। বেশিদিন থাকবেন না। আচ্ছা।” রিসিভার নামিয়ে হাসলেন কমলাপতি, “যৌবনে কলেজের নাটকে অভিনয় করতাম। সেই অভিজ্ঞতাটা চালিয়ে কীরকম ম্যানেজ করে নিলাম বলো ! বেশিদিন থাকবে না।”

নতুন কোনও ঘটনা ঘটলে কমলাপতিকে জানিয়ে দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে এল অর্জুন। গঙ্গাপদ বলল ডক্টর পত্রনবীশ গবেষণাঘরে ঢুকেছেন। তিনি আজ রাত্রে নামবেন না। অর্জুনকে খেয়ে নিতে বলেছেন।

রাত্রে একা-একা খেতে-খেতে অর্জুন পুরো ব্যাপারটা ভাল করে বলল। সে এখানে এসে যে জায়গায় ছিল তার থেকে এক পাও এগোতে পারেনি। ওই তথাকথিত ফোটোগ্রাফারকে নিয়ে সে অনর্থক মাথা ঘামাচ্ছে। ডক্টর হালদারের মেয়ে যখন তাকে চেনেন তখন আর রহস্যের কিছু নেই।

গঙ্গাপদ খাবার দেওয়ার সময় টেলিফোন বাজল। সে রিসিভার তুলে দু'বার হ্যালো বলে কাছে এসে জানাল, “সেই সাহেব বোধ হয়, বাবুর নাম বলছে। কিন্তু বাবু তো আজ রাত্রে তাঁকে ডাকতে নিষেধ করেছেন। আপনি একটু বলে দিন না বাবু।”

অর্জুন রিসিভার তুলে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কে বলছেন ?”

কাটা-কাটা গলায় জবাব এল, “আমি ডক্টরের হিতৈষী। আপনি কে বলছেন ?”

“আমি ডক্টর পত্রনবীশের সেক্রেটারি। উনি এখন ল্যাবরেটরিতে আছেন, যদি কিছু বলার থাকে তা হলে আমাকে বলতে পারেন।”

“ডক্টরকে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম, তার কী সিদ্ধান্ত হল ?”

“ডক্টর পত্রনবীশ ও-ব্যাপারে মন স্থির করতে পারেননি। কারণ আপনি আপনার নাম-ঠিকানা জানাননি। এ-ব্যাপারে আপনার কোনও শর্ত আছে কিনা তাও জানা যাচ্ছে না।”

"উনি রাজি হলে এ-সবই জানানো হবে।"

"তা হলে আপনার সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়। আপনি এ-বাড়িতে কাল চলে আসুন।"

একটা ছোট্ট হাসির শব্দ পাওয়া গেল। তারপর গলা শোনা গেল, "দেখতে পাচ্ছি ডক্টর আমাকে বিশ্বাস করতে পারেননি। আমরা জানতাম ওঁর কোনও সেক্রেটারি ছিল না। আপনি কি ওই লোকাল পুলিশ অফিসারের লোক যিনি আমি শেষবার কোথা থেকে ফোন করেছি জেনে আমায় খুঁজতে লোক পাঠিয়েছিলেন ?"

"আপনি এসব কী বলছেন ?"

উত্তর না দিয়ে লাইনটা কেটে দিল লোকটা। অর্জুন কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এতক্ষণে রহস্য জট বাঁধছে। যে ফোন করছে সে হেঁজিপেজি কেউ নয়। সে মুখ ফিরিয়ে দেখল গঙ্গাপদ দরজার গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। নিশ্চয়ই এতক্ষণ তার কথা শুনছিল। এই লোকটা স্পাই নয় তো! অর্জুন বিরক্ত হল, "কী চাই ?"

"খাবার দেব ?"

"দাও।"

খাওয়া শেষ হওয়ার আগেই ফোন বাজল। অবনীবাবুর গলা, "কে ? অর্জুনবাবু নাকি ? আজও তো ডক্টরের সেই ফোন এসেছিল। আপনি কথা বলেছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা ট্র্যাক রেখেছিলাম। লোকটা এয়ারপোর্ট থেকে ফোন করেছিল। ওই পাবলিক বুথ। ব্যাপারটা বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে।"

"আপনি কথাবার্তা শুনেছেন ?"

"হ্যাঁ। অপারেটর আমায় রেকর্ড বাজিয়ে শুনিয়েছে।" অবনীমোহন হাসলেন, "ও যখন জানতে পেরেছে আমি এর মধ্যে এসে গেছি তখন আর দেখা করার সাহস পাবে না। ঠিক আছে, গুড নাইট।"

রাত্রের খাওয়া শেষ করে অর্জুন একবার ওপরে গেল। গবেষণাঘরের দরজা বন্ধ। ডক্টরকে এখন ডাকাডাকি করে লাভ নেই। সে নীচে নেমে গঙ্গাপদকে জিজ্ঞেস করল, "বাইরের দরজার চাবি তোমার কাছে আছে ?"

গঙ্গাপদ মাথা নাড়ল, "না বাবু।"

"আমি একটু বেরুচ্ছি। ফিরতে রাত হবে। শব্দ পেলে দরজা খুলে দিতে পারবে ?"

"হ্যাঁ বাবু। আমি তো বাইরের ঘরেই শুই। ঘুম আমার খুব পাতলা।"

সাড়ে দশটা নাগাদ অর্জুন বেরিয়ে পড়ল। এমনিতেই সল্ট লেকের রাস্তায় মানুষজন কম দেখা যায়, এই সময়ে মনে হল পরিত্যক্ত শহরে হাঁটছে সে।

মাঝে-মাঝে হেডলাইট জ্বেলে হুসহাস করে ছুটে যাওয়া কয়েকটা গাড়ি ছাড়া কোথাও কোনও প্রাণের স্পর্শ নেই। জলপাইগুড়ির রাস্তায় মাঝরাত্রে হাঁটলে কুকুরেরা চিৎকার করে। এখানকার পথের কুকুরগুলোর বোধ হয় সেই শক্তিও নেই। অর্জুন পার্কটার কাছে পৌঁছতেই একটা গাড়িকে খুব জোরে বেরিয়ে যেতে দেখল। গাড়িটা বেশ খানিকটা গিয়ে সজোরে ব্রেক কষল। তারপর আচমকা আলো নিভিয়ে দিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। লক্ষ্য রেখেছিল বলে অর্জুনের বেশ কৌতূহল হল। গাড়ির ড্রাইভার দেখা যাচ্ছে খুব খামখেয়ালি। কিন্তু আলো নিভিয়ে দাঁড়িয়েও গাড়ি থেকে কেউ নামেনি এটা স্পষ্ট। অর্জুন এগিয়ে যাচ্ছিল। ওই পথ দিয়ে তাকে যেতে হবে।

দূরত্বটা কমে গেলে অর্জুনের মনে হল গাড়িটা চলে যাওয়া পর্যন্ত তার অপেক্ষা করা উচিত। অত জোরে গাড়ি চালিয়ে যে চট করে থামে তার নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে। সে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে পড়ল। সল্ট লেকের সুবিধে হল সে যে লুকিয়ে আছে তা দেখতে কেউ জানলা খুলবে না। মিনিটপাঁচেক দাঁড়াবার সময়ে মশার আক্রমণে তটস্থ হল অর্জুন। তার এবার মনে হল এমন হতে পারে ড্রাইভার নেমে পাশের বাড়িতে ঢুকে গিয়েছে, সে দেখতে পায়নি। সেক্ষেত্রে মশার কামড় হজম করা বোকামিই হবে।

এই সময় সে পাশের গলি দিয়ে একজনকে এগিয়ে আসতে দেখল। গাড়ির পাশে আসামাত্র দরজা খুলে গেল। লোকটা ঢুকল কিন্তু দরজা বন্ধ করল না। তারপরই একটা তীব্র শিস বাজল কোথাও। আধা-অন্ধকার থাকায় অর্জুন কিছু বুঝতে পারল না। গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে হেডলাইট জ্বালিয়ে গাড়িটা যে-গতিতে এসেছিল, সেই গতিতে বেরিয়ে গেল। অর্জুন এবার এগিয়ে গেল গাড়িটা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। পাশের বাড়িটার দরজা-জানলা স্বাভাবিকভাবেই বন্ধ, আলো নেভানো। ওই বাড়ির বাসিন্দাদের সঙ্গে এই গাড়ির কোনও সম্পর্ক নেই বলেই মনে হল তার। তা হলে গাড়িটা এসেছিল কাউকে তুলে নিতে। তা যদি হয়, সেই লোকটা গাড়িতে ওঠার পরও দরজা খুলে কার জন্যে অপেক্ষা করছিল ওরা ?

খামোকা মাথা না ঘামিয়ে অর্জুন গলিতে ঢুকল। সেই ফুচকাওয়ালার জায়গাটা এখন খালি। কমলাপতি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির আলো নেভানো। পুরো পাড়াটাই ঘুমিয়ে রয়েছে। উলটোদিকের বাড়িটাকে ঘুরে-ঘুরে দেখল সে। বাড়ির কোথাও আলো জ্বলছে না। ভাল করে দেখার পর সে একটা রাস্তা খুঁজে পেল। সল্ট লেকের বাড়িগুলো আধুনিক, নতুন স্টাইলে তৈরি। জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ বাড়ির মতো লুডোর গুটির মতো চৌকো নয়। এখানে দৃষ্টিনন্দন করতে বাড়ির গায়ে অনেক ভাঁজ, অনেক কায়দা। পাশের দেবদারু গাছের সাহায্য নিয়ে অর্জুন খানিকটা ওপরে উঠে বাড়ির গায়ে পা রাখল। তারপর খাঁজে-খাঁজে পা রেখে সন্তর্পণে ওপরে উঠতে লাগল।

দোতলার বারান্দায় নেমে সে দরজা ঠেলে বুঝল ওটা ভেতর থেকে বন্ধ। দোতলা থেকে ছাদে যাওয়া অসম্ভব হত, যদি না দেবদারু গাছটা থাকত। অনেক চেষ্টা করে অনেকটা ঝুঁকি নিয়ে অর্জুন শরীরটাকে টেনে-হিঁচড়ে ছাদের আলসেতে পৌঁছে দিতে পারল। প্রাচীর ডিঙিয়ে ছাদে পৌঁছে সে কয়েক সেকেন্ড স্থির হয়ে বসে নিজেকে সামলাল।

রাস্তার আলো ছাদে না আসায় তারার আলো সম্বল। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে অর্জুন দরজার দিকে এগোল। যা স্বাভাবিক তাই, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন পকেট থেকে একটা চ্যাপটা চামড়ার খাপ বের করল। জলপাইগুড়ির এক ওস্তাদ তালা খুলিয়েকে অর্জুন পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল এক শর্তে যে, সে আর তার আগের জীবিকায় ফিরে যাবে না। লোকটি এখন পর্যন্ত কথা রেখেছে। সেই জীবিকা ছেড়ে দেওয়ার সময় এই খাপটা সে অর্জুনকে দিয়েছিল। বলেছিল ওটা দেখলেই তার হাত নিশপিশ করে। মনকে শক্ত রাখতে তাই সে খাপটা অর্জুনকে উপহার দিয়ে দিয়েছিল। ওই খাপের মধ্যে তালা খোলার নানান ধরনের সরু শক্ত তার, ল্যাচ-কি খোলার জন্যে চ্যাপটা ইস্পাত ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম ছিল।

ছাদের দরজায় ল্যাচ-কি লাগানো। বাইরে থেকে সাধারণভাবে খোলা অসম্ভব কিন্তু যন্ত্রটা অদ্ভুত কাজ করল। একচিলতে ফাঁক দিয়ে চ্যাপটা ইস্পাত ঢুকিয়ে সামান্য চাপ নিতেই খুট করে শব্দ হল, দরজাটা খুলে গেল। অর্জুন সিঁড়িতে পা দিল।

দোতলায় তিনখানা ঘর। কোনও ঘরেই মানুষ নেই। অর্জুন একতলায় নামল। একতলাও ফাঁকা। অর্থাৎ এই মুহূর্তে এই বাড়িতে কোনও মানুষ নেই। এত রাত্রে লোকটা গেল কোথায়? হঠাৎ অর্জুনের চোখের সামনে সেই ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল যে অন্ধকার গলি থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে উঠেছিল। তা হলে এই লোকটাকে দিতেই কি গাড়িটা এসেছিল?

অর্জুন ওপরে উঠল। দ্বিতীয় ঘরটাতে লোকটা থাকে, জিনিসপত্র জামাকাপড়ে বোঝা যাচ্ছে। সুটকেসগুলো এদেশি নয়। পকেট থেকে টর্চ বের করে আলো জ্বেলে দেখতে লাগল অর্জুন। ট্র্যাকসুট রয়েছে। সন্দেহজনক আর কিছু খুঁজে পেল না সে।

পাশের ঘরে ঢুকে টর্চের আলো ফেলতেই চোখে পড়ল খাটের ওপর ছোট্ট বিছানা। এত ছোট যে, বাচ্চা ছেলেরাই শুতে পারে। পাশের টেবিলে আধখাওয়া কলা, আপেল এবং ছবি রয়েছে। আর তারপরেই অর্জুন দেখতে পেল টেবিলের একপাশে প্লেটের ওপর কিছু শুকিয়ে যাওয়া দূর্বাঘাস পড়ে আছে।

অর্জুন আবার বিছানার দিকে তাকাল। কুকুর-বেড়ালের শোয়ার জন্যে মানুষ ওভাবে বিছানা পেতে দেয় না। অথচ এই ঘরে যে জন্তু থাকে তা পরিষ্কার।

অর্জুন বিছানাটা পরীক্ষা করল। প্রাণীটি আজও এখানে শুয়েছিল। বিছানার ওপর বাদামি রঙের লোম পড়ে আছে কিছু। এবং তখনই তার মনে পড়ল ওরাং ওটাংটার কথা। এই ফোটোগ্রাফারের পোষা প্রাণী নয় তো ? দোতলার বারান্দা থেকে দেবদারু গাছে উঠে গেলে পাড়ার লোকদের চোখ এড়িয়ে জন্তুটা বহুদূরে যেতে পারে। আর সন্ধের পর বের হলে কাকদের চোখে পড়ার ভয় নেই। শুধু এ-কারণেই কমলাপতিবাবুর পক্ষে জানা অসম্ভব এ-বাড়িতে কোনও পোষা প্রাণী আছে কিনা! কিন্তু লোকটা একাই গাড়িতে উঠেছে ধরে নিলে ওরাং ওটাংটা গেল কোথায় ?

অর্জুন আবার পাশের ঘরে ফিরে এল। পার্ক থেকে যে লোকটা দূর্বাঘাস নিয়ে এসেছিল তার সঙ্গে ডক্টর পত্রনবীশের বর্ণনা দেওয়া মন্মথ দত্তর বেশ মিল আছে। ট্রাক ড্রাইভাররা যদিও সঠিক বর্ণনা দিতে পারেনি তবু ওরা যা বলেছে তার সঙ্গে ওই মন্মথ দত্তকে মিলিয়ে দেওয়া যায়। অর্জুন তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও বই বা ডায়েরি পেল না। এমন একটা কাগজও নেই যাতে মন্মথ দত্ত শব্দদুটো লেখা। কিন্তু খুঁজতে-খুঁজতে সে ইংরেজি খবরে কাগজের ওপর অন্যমনস্কভাবে লেখা 'টেডি' শব্দটাকে অনেকবার দেখতে পেল। টেডি টেডি টেডি! টেডি কারও নাম। কার নাম ?

ভদ্রলোকের জামাকাপড়গুলো পরীক্ষা করল। সবই বিদেশে কেনা। বেশিরভাগই হয় তাইওয়ান, নয় ইন্দোনেশিয়ার। এখন অবশ্য শিলিগুড়িতেও এগুলো পাওয়া যায়, নেপাল হয়ে আসে। কিন্তু এই ভদ্রলোক যে এদেশীয় জিনিস ব্যবহার করেন না তা স্পষ্ট।

এই অভিযান কোনও কাজে লাগল না। বেশ হতাশ হয়ে অর্জুন নীচে নেমে এল। সদর দরজা খুলে সেটা বাইরে থেকে চেপে দিতেই ল্যাচ কি আটকে গেল। আধা-অন্ধকার পথে হেঁটে সে যখন বড় রাস্তায় পৌঁছল তখন সল্ট লেক আরও গভীর ঘুমে।

॥ ৭ ॥

বাড়িটা নিস্তব্ধ। ওপরের ঘরে আলো জ্বলছে। অর্জুন বেল না বাজিয়ে দরজায় শব্দ করল। কারও কোনও সাড়া নেই। গঙ্গাপদ বলেছিল, সে বাইরের ঘরে শোয়, সামান্য আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাবে তার, দরজা খুলে দেবে। অর্জুন আরও জোরে শব্দ করল। কারও কোনও সাড়া নেই। এত রাত্রে বেল বাজালে ডক্টর পত্রনবীশের কাজে ব্যাঘাত হতে পারে, কিন্তু এখন না বাজিয়ে উপায় নেই।

রাত নিস্তব্ধ বলেই বেলের আওয়াজ বেশ কানে লাগল। ঘুম যত গভীর হোক ওই আওয়াজে গঙ্গাপদর উঠে পড়া উচিত। গঙ্গাপদর দেখা মিলল না।

অর্জুন খিড়কির দরজায় এল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। মহা ফাঁপরে পড়ে গেল সে। শেষপর্যন্ত চামড়ার খাপের যন্ত্র ব্যবহার করা ছাড়া কোনও উপায় দেখল না। মধ্যবিত্ত বাঙালি বাড়ি তৈরি করার সময় সদর দরজার কাঠ বেশ মজবুত নির্বাচন করলেও ল্যাচ কি-র ব্যাপারে নামী কোম্পানির ওপর অন্ধ হয়ে নির্ভর করেন। সল্ট লেক বলেই সদর দরজার তালা যন্ত্রের সাহায্যে খুলতে কোনও অসুবিধে নেই, নিতান্ত দুর্ঘটনা না ঘটলে কেউ দেখবে না। একটু আগের ছাদের দরজা খুলতে যত কম সময় লেগেছিল এখন তার চেয়ে বেশি লাগল। কিন্তু দরজাটা শেষপর্যন্ত খুলে গেল।

ঘর অন্ধকার। আর কিছু না হোক এই সময় কুকুরদুটোর ছুটে আসা উচিত। বাঁধা থাকলে মেয় কেন গলা ফাটাচ্ছে না! আলো জ্বালল অর্জুন। দরজা বন্ধ করল। ঘরে গঙ্গাপদ নেই। এখন রাত বারোটা। লোকটা এখনও ঘুমোয়নি কেন?

ভেতরের বারান্দায় পা দিতেই কানে চাপা আওয়াজ এল। কেউ যেন যন্ত্রণা পেয়ে গোঙাচ্ছে। অর্জুন আলো জ্বেলে পাশের ঘরের দরজায় যেতে দেখতে পেল গঙ্গাপদ মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে আর তার শরীরের দু'পাশে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে সার এবং মেয়। অর্জুন দ্রুত কাছে চলে গেল। গঙ্গাপদর মাথার পাশ দিয়ে রক্ত পড়েছে মেঝের ওপর। লোকটা এখনও বেঁচে আছে। কুকুরদুটোর একটা মাঝে-মাঝে শব্দ করছে, পা ছুড়ছে, অন্যটা স্থির।

এ-বাড়িতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। অর্জুন উঠে দাঁড়াল। তারপর দৌড়ে সোজা ওপরে উঠে গবেষণাগারের সামনে চলে এল। ঘরে আলো জ্বলছে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড। আলমারির দরজা খোলা। যে যন্ত্রটির মাধ্যমে ডক্টর পত্রনবীশ তাঁর গবেষণা চালাচ্ছিলেন সেটি উধাও হয়ে গিয়েছে। ঘরে ডক্টর নেই।

অর্জুন বেশ চেঁচিয়ে "ডক্টর, ডক্টর" বলে ডাকল। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। অর্জুন দ্রুত টেলিফোনের কাছে পৌঁছে আবিষ্কার করল লাইন মৃত। সম্ভবত তার কেটে দেওয়া হয়েছে।

গভীর জঙ্গলে মাঝরাতে পথ হারালে যে অবস্থা হয়, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পুলিশকে খবর দিতে প্রায় সেইরকম অভিজ্ঞতা হল অর্জুনের। ট্যাক্সির দর্শন পাওয়া এ-সময় খুব অসম্ভব নয়। মাঝরাতে যারা সল্ট লেকের বাড়িতে ডাবল ভাড়া দিয়ে ফেরেন, তাঁদের নিয়ে আসা ট্যাক্সির ড্রাইভাররা থানার নাম শুনেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। দু'-একটা প্রাইভেট গাড়ি তো অর্জুনের হাত নাড়াকে পাত্তাই দিচ্ছে না। আর এগুলো চলে গেলেই ঝুপ করে নেমে আসছে নির্জনতা।

এই সময় অর্জুন দেখতে পেল একটা মারুতি ভ্যান আসছে। দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে ভ্যানটা সোজা পথে আসছে না। হেডলাইট দুটো রাস্তার এ-পাশ

থেকে ও-পাশে চলে যাচ্ছে মাঝে-মাঝেই। অর্জুন হাত নাড়তে লাগল। আর আশ্চর্য ব্যাপার, ভ্যানটা থেমে গেল। ড্রাইভারের সিটে যিনি বসে ছিলেন তিনি জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "মতলবটা কী ? ছিনতাই করবে ? নো চান্স। পকেটে একটাও টাকা নেই।"

অর্জুন বলল, "আমাকে এখনই থানায় যেতে হবে। দয়া করে একটা লিফ্‌ট দেবেন ?"

"লিফ্‌ট ? আমি নিজেই নিজেকে লিফ্‌ট দিতে পারছি না তো। গাড়ি চালাতে জানো ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে উঠে এসো। আমার বাড়ি থানার কাছে। আমি ঠিক বলে দেব। মাতালরা নিজের বাড়ি ভুল করে না। কিন্তু আমি আর চালাতে পারছি না।" ভদ্রলোক কোনওরকমে শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে পাশের সিটে নিয়ে গিয়ে বললেন, "ভগবানকে ডাকলে তা হলে কাজ হয় এখনও। আঃ!" যেন খুব স্বস্তি পেয়েছেন এমন গলায় শব্দটা করলেন।

অর্জুন স্টিয়ারিংয়ে বসল, "কোনদিকে যাব ?"

"থানায় যাবে বললে বলে মনে হল !"

"থানা কোনদিকে ?"

"অ। সোজা চলো। সোজা।"

অতএব অর্জুন সামনের পথ ধরল। ভদ্রলোকের মাথা বুকের ওপর ঢলে পড়েছে। অর্জুন দু'পাশে তাকাতে-তাকাতে চলছিল। আজ সে থানায় গিয়েছিল। কিন্তু দিনের বেলায় দেখা পথ এক, রাত্রে সেটা হয়ে যায় অন্য। তা ছাড়া ফেরার সময় তাকে জিপে করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল।

হঠাৎ ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, "ব্যস, ব্যস। থামাও গাড়ি।"

অর্জুন তাড়াতাড়ি ব্রেক চাপল। ভদ্রলোক বললেন, "ওই বাড়ি। সাদা বাড়ি কালো রাস্তা। আমি নামছি।"

"নামছেন মানে ? আমি তা হলে থানায় যাব কী করে ?"

"গাড়ি নিয়ে যাও, আমাকে বিরক্ত কোরো না।"

"দেখুন মশাই, আমাকে ঝামেলায় ফেলবেন না। থানা এখান থেকে কতদূর ?"

ভদ্রলোক হাসলেন, "সর্বত্র ভগবান অথচ লোকে তাঁকে খুঁজে বেড়ায়। তুমি যেই বললে থানায় যাবে তখনই আমার মনে হল বেঁচে গেলাম। তোমাকে গাড়ি চালাতে দিলে আমি সশরীরে বাড়িতে পৌঁছে যাব। আমার বাড়ির উলটোদিকে থানা।"

অর্জুন অবাক হয়ে ডান দিকে তাকাতেই চিনতে পারল। সে দ্রুত ভ্যান থেকে নেমে পড়ল।

থানায় অবনীমোহন ছিলেন না। সেকেন্ড অফিসার টেলিফোনে কথা বলছিলেন। তিনি অর্জুনকে দেখে ইশারায় বসতে বলে কথা শেষ করলেন। তারপর রুমালে মুখ মুছতে-মুছতে বললেন, "ওঃ। আর পারি না। রোজ রাত্রে চুরি আর চুরি। কী ব্যাপার ? ওহো, আপনি, আপনি বড়বাবুর পরিচিত, তাই না ?"

"হ্যাঁ। উনি কোথায় ?"

"রাউন্ডে বেরিয়েছেন।"

"তা হলে আপনি এখনই চলুন। ডক্টর পত্রনবীশের বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। ওঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওঁর কাজের লোককে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি এখানে নতুন, কাউকে চিনি না, ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে পারিনি। প্লিজ।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। ডক্টর পত্রনবীশ মানে, বড়বাবুর সঙ্গে যে বৈজ্ঞানিকের পরিচয় আছে, আপনি তাঁর কথা বলছেন ? তাঁর বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে ?

"হ্যাঁ। দেখুন, এর মধ্যে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।"

"কিন্তু আমি এখন থানা ছেড়ে যাই কী করে ?"

"একটা মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আপনার যাওয়া উচিত।"

খানিকটা দোনোমনা করে ভদ্রলোক উঠলেন। একজন সেপাইকে খবরটা বলে আর একজনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন, "আপনি এখানে পৌঁছলেন কী করে এ-সময় ?"

অর্জুন মাতাল ভদ্রলোককে দেখতে পেল না। বলল, "লিফ্‌ট নিয়েছিলাম।"

"লিফ্‌ট ? সল্ট লেকেও তা হলে লোকে লিফ্‌ট দেয় !"

"আপনি এমনভাবে বলছেন, যেন সল্ট লেক ডুয়ার্সের জঙ্গল।"

"আমি কিছু বলছি না।"

ডক্টর পত্রনবীশের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেই ওরা জিপটাকে দেখতে পেল। পুলিশের জিপ। দরজার সামনে অবনীমোহন দাঁড়িয়ে আছেন। ভেতর থেকে কুকুরের তারস্বরে চিৎকার ভেসে আসছে। মাঝে-মাঝে বন্ধ দরজার ভেতর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে কুকুরটা, শব্দ তা জানান দিচ্ছে। গাড়ি থেকে নেমে অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গেল, "আপনি কী করে খবর পেলেন ?"

অবনীমোহন বললেন, "খবর ? আমি তো কোনও খবর পাইনি। রাউন্ডে বেরিয়ে এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কুকুরের চিৎকার কানে এল। এমন চিৎকার আগে কখনও শুনিনি। কী ব্যাপার জানতে তখন থেকে বেল টিপছি কিন্তু কারও সাড়া পাচ্ছি না।"

থানায় যাবে বলে বেরুবার সময় অর্জুন দরজা টেনে দিয়েছিল, ফলে ল্যাচ-কি আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সেকেন্ড অফিসার বললেন, "মনে হচ্ছে

বাড়ির ভেতরে কেউ দরজা খোলার মতো অবস্থায় নেই। অর্জুনবাবু বললেন, ডক্টর পত্রনবীশকে পাওয়া যাচ্ছে না আর ওঁর চাকর প্রচণ্ড উন্ডেড। দরজা ভাঙা দরকার।"

অর্জুন ততক্ষণে তার চামড়ার খাপ বের করেছে। উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছিল। ওকে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে তালা খোলার চেষ্টা করতে দেখে সেকেন্ড অফিসার বললেন, "আরে। এই বিদ্যে আপনার জানা আছে দেখছি। ডেঞ্জারাস ব্যাপার।"

অবনীমোহন তাঁকে হাত তুলে চুপ করতে বললেন।

এবার একটু বেশি সময় লাগলেও দরজা খুলল। অর্জুন দেখল, মাঝরাতে এত কথাবার্তা হচ্ছে, দু'-দুটো পুলিশের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আশেপাশের বাড়ির লোক কৌতূহল প্রকাশ করছে না। বাড়িগুলো রাতের গাছের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

দরজা খোলামাত্র মেয় ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড হিংস্র দেখাচ্ছিল তাকে। শেষপর্যন্ত অর্জুনকে দেখে সে শান্ত হল কিছুটা। দ্রুত ছুটে গেল ভেতরে।

গঙ্গাপদ তখন সংজ্ঞাহীন। তাকে একটা জিপে করে তখনই হাসপাতালে পাঠানো হল। মাথায় জল ঢেলে সার-এর জ্ঞান ফিরিয়ে দুটো কুকুরকেই ঘরে বন্দি করে রাখা হল। কুকুরদুটোর শরীরে কোনও আঘাত নেই। সম্ভবত ওষুধ দিয়ে ওদের অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছিল।

এবার অবনীবাবু তদন্তে নামলেন। দোতলার ঘরগুলো অন্ধকার। ছাদের গবেষণাঘরের চেহারা অর্জুন যেমন দেখে গিয়েছিল তাই রয়েছে। একবার দেখে নিয়ে অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি এই ঘরে ঢুকেছিলেন?"

"হ্যাঁ। ডক্টর পত্রনবীশকে খুঁজতে এখানে এসেছিলাম।"

"কোনও জিনিসপত্রে হাত দেননি তো?"

"প্রশ্নই ওঠে না।"

"সারা ঘর জুড়ে তাণ্ডব হয়েছে। মনে হচ্ছে আততায়ীরা কোনও কিছুর সন্ধানে এসেছিল। ডক্টর তো এ-ঘরেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ। রাত্রে আমি যখন বেরিয়েছিলাম তখন তিনি এখানেই কাজ করছিলেন। গঙ্গাপদ বলেছিল আমাকে উনি একাই খেয়ে নিতে বলেছেন।"

"ঘটনাটি যখন ঘটেছিল তখন আপনি বাড়িতে ছিলেন না?"

"না।"

"কোথায় গিয়েছিলেন?"

"খাওয়াদাওয়ার পর একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।" অর্জুন এখনই চট করে সত্যি কথাটা বলল না। অবনীবাবু তার দিকে তাকালেন।

"ওই হাঁটাহাঁটি আপনি কতক্ষণ করছেন?"

"একটু বেশি সময়, ধরুন বারোটা নাগাদ আমি ফিরে আসি। গঙ্গাপদ

বলেছিল ও বাইরের ঘরে শোয়, ঘুমও পাতলা। সামান্য শব্দ করলেই দরজা খুলে দেবে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও যখন ও দরজা খুলল না—"

"তখন আপনি আপনার যন্ত্রের সাহায্য নিলেন ?"

"হ্যাঁ।"

অবনীবাবু বললেন, "কিন্তু অন্যের দরজার তালা ওইভাবে খোলা অপরাধ, তা তো আপনার অজানা নয়। দরজা কেউ খুলছে না দেখে আপনার থানায় যাওয়া উচিত ছিল।"

"আমার ভয় হচ্ছিল বাড়িতে কোনও বিপদ হয়েছে, তাই—।"

অবনীবাবু আর কথা না বাড়িয়ে সন্তর্পণে ঘরের জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। দেখতে-দেখতে বললেন, "যেভাবে কাগজপত্র ছড়ানো রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে আততায়ীরা কোনও বিশেষ কাগজ খুঁজতে চেয়েছিল। ডক্টর পত্রনবীশ আপনাকে কখনও এই ঘরে নিয়ে এসেছেন ?"

"হ্যাঁ। উনি ওঁর এই কাজের জায়গা আমাকে দেখিয়েছেন।"

"তখনকার দেখা সব জিনিসপত্র এখন দেখতে পাচ্ছেন ?"

"সব মনে নেই, তবে ডক্টর পত্রনবীশ যে মেশিনটা নিয়ে কাজ করতেন সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না। ওখানে ছিল মেশিনটা। মেয় ওর তলায় চাপা পড়েছিল।"

"আচ্ছা! আর— ?"

"আর কিছু, হ্যাঁ, ডক্টর বলেছিলেন ওঁর গবেষণার সমস্ত কাগজপত্র এ-ঘরের আলমারিগুলোতে রাখা আছে। আমি ওঁকে পরামর্শ দিয়েছিলাম এই ঘর থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও রাখতে। উনি বলেছিলেন দোতলায় একটা লোহার সিন্দুক রয়েছে। সেখানে উনি সরিয়ে রেখেছিলেন কিনা তা জানি না।"

"এরকম পরামর্শ দিতে গেলেন কেন ?"

"কেউ যদি ওরাং ওটাং পাঠিয়ে চুরি করার প্ল্যান করে, সে নিজে যে আসবে না এমন নিশ্চয়তা নেই। তাই সতর্ক হতে বলেছিলাম।" কথা বলতে-বলতে অর্জুনের চোখে পড়ল ঘরের মেঝের ওপর একটা স্ট্র্যাপ ছেঁড়া ঘড়ি পড়ে আছে। অবনীবাবুর অলক্ষ্যে সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে পুরল সে।

দোতলার সিন্দুক বন্ধ। চাবি কোথায় আছে তা একমাত্র ডক্টর পত্রনবীশই বলতে পারেন। অবনীবাবু বললেন, "অর্জুনবাবু, আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড না জানা থাকলে এখন আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতাম। রাত্রের খাওয়া শেষ করে হাঁটাহাঁটির গল্প আমি বিশ্বাস করি না। হয় আপনি আমার কাছে কোনও সত্যি চেপে যাচ্ছেন, নয় মিথ্যে কথা বলছেন। এখন গঙ্গাপদই আমাদের ভরসা। তার জ্ঞান ফিরে এলে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে। ডক্টরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ওঁকে যত দ্রুত সম্ভব খুঁজে বের করতে হবে। উনি যখন ওঁর অস্বস্তির কথা বলেছিলেন তখন আমি ঠিক গুরুত্ব দিইনি। দেওয়ার কারণও

ছিল না। সে-কারণেই উনি আপনাদের শরণাপন্ন হন। অথচ আপনি ওঁকে বাঁচাতে পারলেন না। আততায়ীরা যখন এল ঠিক তখনই আপনি ঠুনকো কারণ দেখিয়ে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।"

"কোথায় ?" অর্জুন অবাক হল।

"থানায়।"

"আপনি আমায় অ্যারেস্ট করছেন ?"

"না। তবে সন্দেহভাজনের লিস্টে আপনিও আছেন। গঙ্গাপদর স্টেটমেন্ট না পাওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমি ছাড়তে পারি না।" অবনীবাবু গম্ভীর গলায় বললেন।

"আপনি চাইলে আমি যেতে বাধ্য। কিন্তু আমাকে সন্দেহ করার কারণ নেই। আমি এখানে এসেছি ডক্টর পত্রনবীশকে সাহায্য করতে। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তা হলে ডক্টর পত্রনবীশের উপকার হবে।"

"কী সাহায্য চাইছেন ?"

"প্রথম ভেবে দেখুন আততায়ীরা কীভাবে বাড়িতে ঢুকেছিল ?"

"সেটা আমি ভেবেছি। দরজা-জানলা ভাঙা হয়নি। তার মানে গঙ্গাপদ খুলে দিয়েছে।"

"এটা সরল ভাবনা। কিন্তু স্বার্থ ছাড়া গঙ্গাপদ ওদের সাহায্য করবে কেন ?"

"ওরা নক করেছিল। গঙ্গাপদ ভেবেছিল আপনি ফিরে এসেছেন। তাই দরজা খুলেছে।"

"এত রাতে ওরা নক করে নিজেদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেবে কেন ? দরজা না খুলে গঙ্গাপদ যদি ওদের পরিচয় জানতে চাইত তা হলে অচেনা গলা পেয়ে না-ও খুলতে পারত। এই ঝুঁকি কেন ওরা নেবে ? ওরা নিশ্চয়ই সতর্ক হয়ে এসেছিল।"

"তা হলে ধরে নিতে হচ্ছে গঙ্গাপদ ওদের লোক। টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে। তারপর চলে যাওয়ার সময় আমাদের বিভ্রান্ত করতে ওকে আহত করে ফেলে রেখে গেছে। এ ছাড়া আর কী হতে পারে ?"

"এটা সত্যি কিনা তা আপনি গঙ্গাপদকে জেরা করে জানতে পারবেন। বেশিক্ষণ সত্য গোপন করার মতো মনের জোর লোকটার নেই। কিন্তু এটা সত্যি নয় তার কারণ এই কাজটা আমি আসার আগেই গঙ্গাপদ করতে পারত। কিন্তু করেনি।"

"আপনি কী বলতে চাইছেন ?"

"আপনি কি লক্ষ করেছেন গবেষণাঘরের ওঠার সিঁড়ির-জানলার কাচ এখনও ভাঙা। ডক্টর বলেছিলেন মিস্ত্রি ডেকে এনে ওটা সারিয়ে নেবেন। কিন্তু সেটা করার সময় পাননি। ওই পথ দিয়ে আগেরবার ওরাং ওটাং ঢুকেছিল। তাই জায়গাটা ওর জানা, আজও সেই পথে সে ঢুকতে পারে।"

"সে ঢুকলে কুকুরদুটো নিশ্চয়ই পাথর হয়ে থাকত না।"

"কুকুরদুটোকে অজ্ঞান করে ফেলার মতো কোনও খাদ্যবস্তু যদি প্রাণীটি নিয়ে আসে তা হলে তো তার ভয়ের কিছু নেই। সার আর মেয় দিশি কুকুর। খাবার দেখেও নির্লোভ থাকার কোনও শিক্ষা ওদের নেই। তারপর একটি ট্রেন্ড ওরাং ওটাং-এর পক্ষে সদর অথবা খিড়কির দরজা খুলে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার নয়!

অর্জুনের কথাগুলো শুনে অবনীবাবু ফোনের দিকে এগোচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন তাঁকে জানিয়ে দিল সে দেখে গেছে টেলিফোন মৃত। অবনীবাবু তবু রিসিভার তুললেন এবং বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, "চমৎকার!"

ওপাশে বন্ধ ঘরে মেয় ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছিল। অর্জুন বলল, "এ-কথা নিশ্চয়ই স্পষ্ট, যারা কিডন্যাপ করেছে তারাই ডক্টর পত্রনবীশকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। উনি রাজি না হওয়াতে এটা করা ছাড়া ওদের অন্য পথ ছিল না।"

অবনীবাবু বললেন, "আশ্চর্য! আপনি এমন গলায় কথা বলছেন যেন ওদের ওপর আপনার প্রচুর সহানুভূতি আছে!"

"আপনি আবার আমাকে ভুল বুঝছেন। ডক্টর পত্রনবীশকে যারা নিয়ে গিয়েছে তারা নিশ্চয়ই এখনই খুন করবে বলে নিয়ে যায়নি। তাই ওদের অবস্থানের কথা জানতে হলে ওদের মতো করেই ভাবা উচিত, তাই না?" অর্জুন বলল।

"বেশ। আপনি ভেবে কিছু বের করতে পারলেন?"

"ভাবনা বেশ কিছু সম্ভাবনা সামনে এনে দেয়। সেগুলোর কোনওটাই হয়তো ঠিক নয়। তবু—! যেমন ধরুন, যারা অপহরণ করেছে তারা ডক্টর পত্রনবীশের গবেষণা সম্পর্কে রীতিমতো ইন্টারেস্টেড। অর্থাৎ ওই গবেষণা সাফল্য পেলে তারা শব্দকে কাজে লাগাবে।"

"আপাতভাবে তাই মনে হচ্ছে।"

"কারা শব্দকে কী কাজে লাগাতে পারে?"

"ডক্টর চেয়েছিলেন মানুষের শরীরের অনেক অসুখ শব্দের অনুরণনে নির্মূল করতে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক অবরোধ বা ওই জাতীয় কিছুর ব্যাপারে শব্দকে প্রয়োগ করে মানুষের উপকার করতে চেয়েছিলেন তিনি।" অবনীবাবু বললেন, "আমার অবশ্য শুনে কখনওই বিশ্বাস হয়নি কিন্তু উনি এত সিরিয়াস ছিলেন যে, চুপচাপ শুনে যেতাম।"

"কিন্তু যারা অপহরণ করেছে তারা যে বিশ্বাস করেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। তারা শব্দকে কাজে লাগাতে চায়। নিশ্চয়ই কোনও সাধারণ মানুষ তা চাইবে না। এমনকী যারা কাজটা করেছে, তারাও নয়। তাদের পাঠিয়েছে যারা, তারা রয়েছে আড়ালে এবং সেই আড়ালটা ভারতবর্ষে নয়।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন বিদেশিরা ইনভল্‌ভড ?"

"এ-সবই আমার অনুমান। মানুষের কল্যাণের জন্যে যদি ডক্টর পত্রনবীশের আবিষ্কারকে তারা কাজে লাগাতে চাইত তা হলে টাকার লোভ দেখিয়ে না পেরে গায়ের জোর প্রয়োগ করত না। ওরা অন্য কিছু করতে চায়। আর সেটা একাধিক মানুষের বাসনা, কোনও একজনের নয় বলেই আমার মনে হয়।"

"ঠিক আছে। এগুলোকে ধরে নিলাম বাস্তবসম্মত ভাবনা। কিন্তু ডক্টর পত্রনবীশকে কারা কোথায় নিয়ে গিয়েছে তার কোনও ক্লু পাচ্ছি না আমরা।"

"চলুন, আর-একবার বাড়িটাকে ভাল করে খোঁজা যাক।"

বাড়ির সমস্ত আলো জ্বালিয়ে খোঁজাখুঁজি আরম্ভ হল। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখেই আধখাওয়া মাংস দেখতে পেল একজন সেপাই। মাংসগুলো প্লাস্টিক প্যাকেটে আনা হয়েছিল। আর এগুলো খেয়েই সার এবং মেয় অজ্ঞান হয়ে যায়। প্যাকেটের গায়ে কোনও ছাপ নেই। অবনীবাবুর নির্দেশে ওগুলো আলাদা সরিয়ে রাখা হল পরীক্ষার জন্যে।

দোতলা বা গবেষণাঘরের সিঁড়িতে কিছুই পাওয়া গেল না।

গবেষণাঘরের দরজায় পৌঁছে অর্জুন বলল, "মনে হয় ডক্টর পত্রনবীশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ভয় দেখিয়ে ওঁকে আত্মসমর্পণ করাতে পারেনি আততায়ীরা। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে থাকা সেটাই প্রমাণ করছে।"

ঘরটি খোঁজা হল। অবনীবাবু একটি বোতাম পেলেন। সাদা বোতাম। সুন্দর। বললেন, "এরকম বোতাম নিউ মার্কেটে পাওয়া যায়।"

"তার মানে টানাহ্যাঁচড়া হয়েছিল। এই দেখুন, এই ঘড়িটাকে পেলাম এখানে।"

পকেট থেকে ঘড়ি বের করে রেখেছিল অর্জুন। প্রথমবার যখন সে ওটাকে কুড়িয়ে নিয়েছিল তখন ভেবেছিল অবনীবাবুকে তখনই বলে লাভ নেই। কিন্তু এই ভদ্রলোকের সাহায্য ছাড়া এখানে তার পক্ষে এগনো মুশকিল।"

অবনীবাবু ঘড়িটাকে নিলেন, "নাইলনের ব্যান্ড বলেই ছিঁড়ে গেছে। এটা কি ডক্টর পত্রনবীশের ঘড়ি ? আমি কোনওদিন অবশ্য ভদ্রলোককে ঘড়ি পরতে দেখিনি।"

"ঘড়িটা বিদেশি ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সুইজারল্যান্ডের তৈরি নয়, ফ্রান্সের। ফ্রান্সে ঘড়ি তৈরি হয় বলে কখনও শুনিনি। হয়তো হয়। হয়তো কেন, হয়েছে বলেই এখানে লেখা রয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সের ঘড়ি ডক্টর কী করে পাবেন ? হতে পারে, উনি তো কিছুদিন আগে বিলেতে গিয়েছিলেন। সেখানে কেউ উপহার হিসেবে এটা দিতে পারে !"

অর্জুন ঘড়িটাকে আবার হাতে নিল। সাধারণ ঘড়ি নয়। দু'পাশে অনেক চাবি রয়েছে। তলার দিকে আলাদা কাচের খুপরিতে নাম্বার লেখা। ঘড়ির

পেছনে ছোট্ট করে লেখা, 'টেডি'।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল অর্জুন। মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "আরে!"

"কী হল?" অবাক হয়ে তাকালেন অবনীবাবু।

"এটা টেডির ঘড়ি!" চিৎকার করে উঠল অর্জুন।

"টেডি কে?"

"জানি না। তবে নামটা আমি দেখেছি।"

"দূর মশাই। এমন করে চেঁচালেন! টেডি বিয়ার শোনেননি? যাক গে, ওই ঘড়ি আর বোতাম ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। কোনও বড় গোয়েন্দা হলে এই ক্লু থেকে বিশাল ব্যাপার ঘটিয়ে দিতে পারতেন। এখন আমরা সেটা পারছি না। আপাতত বাড়িটাকে সিল করে আমরা চলে যেতে পারতাম। কিন্তু প্রবলেম হল ওই কুকুরদুটো। এইজন্য আমি কোনও জীবজন্তু পুষতে চাই না। বাড়ি বন্ধ করে ইচ্ছেমতো কোথাও যাওয়া যায় না।"

"আপনার কি এখনও আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আছে?"

"না থাকলে?"

"তা হলে আমি এ-বাড়িতে থাকতে পারতাম। কুকুরদুটো আমাকে চিনে গেছে।"

"এমনিতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আপনার অতীতের কথা মনে করে—।" নীচে নামতে লাগলেন অবনীবাবু। অর্জুন পা বাড়িয়েও থমকে গেল। ভাঙা কাচ, যেখান দিয়ে প্রথমদিন ওরাং ওটাং ঢুকেছিল, যেটা সারানো হয়নি, সেটার গায়ে কিছু লেগে আছে। এখন প্রায় কালচে হয়ে যাওয়া দাগটা যে রক্তের তা বুঝতে অসুবিধে হল না তার। যদি ওরাং ওটাং আবার ওই পথ দিয়ে ঢুকে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই আহত হয়েছিল। আহত অবস্থায় জন্তুটা ঠাণ্ডা মাথায় কুকুরদুটোকে খাবার দিয়েছে, দরজা খুলে দিয়েছে?

গঙ্গাপদ জ্ঞান ফিরলেই অর্জুনকে খবর দেওয়া হবে, এই আশ্বাস দিয়ে অবনীবাবু চলে গেলেন। বলে গেলেন, "আপনি কোনও অবস্থাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যাবেন না। পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ এলে দরজা খুলবেন না।"

অর্থাৎ গৃহবন্দি হয়ে থাকুন। বাইরের দরজা বন্ধ করে আলো না নিভিয়ে অর্জুন কুকুরদুটোকে ছেড়ে দিল। তীরের মতো তেড়ে গেল তারা অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে। দোতলায় নিজের ঘরে এল সে। বড্ড কাহিল লাগছে এখন। আর কয়েক ঘণ্টা বাদে ভোর হয়ে যাবে। জামাপ্যান্ট না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। সাধারণত বেশি রাত জাগলে তার ঘুম আসতে চায় না। কিন্তু আজ উলটোটা হল।

গভীর ঘুমের মধ্যে কেউ যেন ডাকছে। অর্জুন যেন সমুদ্রের নীচ থেকে

ভুল করে ওপরে উঠে এল। এবং তখনই তার কানে ডাকটা স্পষ্ট হল, "টেডি, টেডি, টেডি !" এর সঙ্গে-সঙ্গে পকেটঘেঁষা পায়ের ওপর অস্বস্তি। সে কি স্বপ্ন দেখছে ? টেডির স্বপ্ন ? কিন্তু গলার স্বর স্পষ্ট আর সেটা আসছে নীচের দিক থেকে। এবং তখনই সে অস্বস্তিটাকে আবার টের পেল। ঝট করে পকেটে হাত ঢোকাতে ঘড়িটাকে পেতেই হাতে কুটুস করে কিছু ধাক্কা দিয়ে আবার সরে গেল।

উঠে বসল অর্জুন। তড়িঘড়ি পকেটে হাত ঢোকাতে ঘড়িটা বেরিয়ে এল। শব্দটা ভেসে আসছে ঘড়ি থেকেই। সেইসঙ্গে ডানদিকের চাবিগুলোর পাশ থেকে একটা সরু সুচের মতো জিনিস বেরুচ্ছে আর ঢুকে যাচ্ছে ঘড়ির মধ্যে। অর্জুন ঘড়িটাকে হাতের ওপর রাখতেই সুচের জন্যে চিনচিনে অনুভূতি এল। এবং তারপরই থেমে গেল শব্দটা, সুচটাও ভেতরে ঢুকে স্থির হয়ে গেল।

ঘড়িটাকে চোখের সামনে নিয়ে এল অর্জুন। এবং তখনই দেখতে পেল নাইলনের ব্যান্ড এবং মেটাল ঘড়ির মাঝখানের ফাঁকে কয়েকটা বাদামি লোম আটকে আছে। লোমগুলোকে টেনে বের করতেই সে উত্তেজিত হল। তা হলে টেডি কি ওই ওরাং ওটাংয়ের নাম ? আর এই ঘড়ি ওরাং ওটাংয়ের হাতে পরিয়ে দেওয়া হত ? কীভাবে ঘড়িটা ওরাং ওটাংয়ের হাত থেকে পড়ে গিয়েছে তা কেউ বলতে পারবে না। কিন্তু এই ঘড়ির মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক সঙ্কেত ঢোকানো আছে। সুচ ফোটানো এবং নাম ধরে ডেকে ওকে কিছু মনে করিয়ে দেওয়া হত।

অর্জুন দৌড়ে ফোনের কাছে পৌঁছে থেমে গেল। ফোন তো মৃত। সময় এখন খুবই মূল্যবান। টেলিফোনের তার বাইরে থেকে কাটা হয়েছে। কিন্তু সেই জায়গাটা এই রাত্রে খুঁজে বের করা অসম্ভব ! এই সময় একটা মোটরবাইকের আওয়াজ কানে আসতেই অর্জুন দৌড়ে জানলার কাছে গেল। হেলমেটে ঢাকা মাথা নিয়ে সেই আরোহীকে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল অর্জুন। তারপরই এঞ্জিনের আওয়াজ থেমে গেল। লোকটা এই বাড়িতেই এসেছে। মেয় এবং সারকে ছেড়ে দেওয়ায় ওরা এখন ঝিমোচ্ছে। মেয় আর চিৎকার করছে না। আততায়ীরা খাবারে বিষ মিশিয়ে দিতে পারত। তা না করে ওদের অজ্ঞান করে দিয়েছিল ওষুধ দিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে খামোখা প্রাণিহত্যা ওদের পছন্দ নয়।

অর্জুন নীচে নেমে এল। দরজা খোলার আগেই টেলিফোন হঠাৎ জোরে বাজতে আরম্ভ করল। ভৌতিক ব্যাপার। তারপরই মোটরবাইকের আওয়াজ উঠল এবং দ্রুত মিলিয়ে গেল। তা হলে ওদের কেউ এসে টেলিফোনের লাইন জুড়ে দিয়ে গেল নাকি ? ওরকম একটা ঘটনা ঘটিয়ে আবার যারা অকুস্থলে ফিরে আসে তাদের ক্ষমতা উপেক্ষার নয় ! অর্জুন টেলিফোন ধরল। হ্যালো বলতেই চাপা গলায় কেউ বলল, "প্লিজ হোল্ড অন।" তার কয়েক সেকেন্ড

বাদে ডক্টর পত্রনবীশের গলা শুনতে পেল অর্জুন, "হ্যালো ? কে ? গঙ্গাপদ ?"

অর্জুন উত্তেজিত গলায় বলল, "ডক্টর পত্রনবীশ। আমি অর্জুন বলছি। আপনি কোথায় ? তাড়াতাড়ি বলুন, আপনি কোথায় ?"

এসব প্রশ্নের ধার দিয়ে গেলেন না ডক্টর। অদ্ভুত স্বরে বললেন, "আমার দোতলার ঘরের সিন্দুকটা খুলতে হবে। চাবি আছে আমার মা-বাবার ছবির ফ্রেমের পেছনে। সিন্দুক খুললে একটা ফাইল পাবে। কাউকে কিছু না বলে ওটা নিয়ে চলে এসো।"

"কোথায় ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল। পাঁচ-সাত সেকেন্ড চুপচাপ থেকে ডক্টর পত্রনবীশ বললেন, "সুইমিং পুলের স্টপেজে। পনেরো মিনিটের মধ্যে। কিন্তু পুলিশ যেন জানতে না পারে। আঃ !"

"কী হল ? আপনি কোত্থেকে কথা বলছেন ? হ্যালো, হ্যালো !"

লাইনটা কেটে গেল। ডক্টর পত্রনবীশ কথা বললেও তাঁকে কেউ বলতে বাধ্য করেছে বলে মনে হল অর্জুনের। স্বেচ্ছায় কেউ তার সারাজীবনের গবেষণাসংক্রান্ত কাগজ শত্রুপক্ষের হাতে তুলে দেয় না। এখন কী করা যায় ?

অর্জুন ডক্টর পত্রনবীশের শোয়ার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল। ঘরের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে মধ্যবয়সের দু'জন পুরুষ এবং মহিলার ছবি বাঁধানো রয়েছে। এঁরা নিশ্চয়ই ডক্টর পত্রনবীশের বাবা এবং মা। অর্জুন ছবিটা নীচে নামাতেই পেছনদিকের খাঁজে একটা বড় লোহার চাবি দেখতে পেল। চাবিটি অভিনব। অনেক ঘাট আছে এবং বেশ ভারী।

চাবিটা নিয়ে ছবি যথাস্থানে রেখে অর্জুন ঘরের কোণে রাখা সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর কী ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল। না। সে সিন্দুক খুলবে না। কণ্ঠস্বর ডক্টর পত্রনবীশের হলেও নয়। খুলতে হলে তিনি নিজে এসে খুলুন। চাবিটা কোথায় রাখা যায় ভাবতে-ভাবতে নীচে নামতেই সার এবং মেয়েকে দেখতে পেল। প্রাথমিক উত্তেজনা চলে যাওয়ার পর ওরা এখনও ওষুধের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়নি। মেয়ে শুয়ে-শুয়ে একবার চোখ খুলল মাত্র, সার তবু উঠে বসল। অর্জুন কুকুরটার গলায় হাত বুলিয়ে আদর করতে যেতেই বকলসটাকে অনুভব করল। লোমের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে সেটা। সঙ্গে-সঙ্গে মতলব মাথায় এল। বকলসের স্ট্র্যাপ খুলে সেটা চাবির গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার সারের গলায় বেঁধে দিল সে। ভারী চাবিটা সামান্য ঝুলে রইল বটে, কিন্তু খুঁটিয়ে না দেখলে কেউ ধরতে পারবে না।

মিনিট কুড়ি বাদে আবার ফোন বাজল। অর্জুন রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই সেই আগের ইংরেজি বলা গলা ধমকে উঠল, "কী ব্যাপার ? আপনি কি চান ডক্টর মারা যাক ? পনেরো মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল, আসেননি কেন ?"

"চাবি খুঁজে পাইনি।"

"মিথ্যে কথা ! ডক্টর বলে দিয়েছে কোথায় চাবি আছে !"

"সেখানে কোনও চাবি নেই।"

"খবরটা পুলিশকে জানানো হয়েছে ?"

"ডক্টর আমাকে নিষেধ করেছেন সেটা করতে। কিন্তু আপনারা কে ? কেন জোর করে ডক্টরকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন ? ওঁর গবেষণার কাগজপত্রে আপনার কী দরকার ?"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। অর্জুন কয়েকবার হ্যালো বলা সত্ত্বেও সাড়া এল না। অথচ লাইন মৃত নয়। তারপর আবার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "ডক্টর ভুল করতে পারেন। ওঁর বাবা-মায়ের ছবি ছাড়া অন্য ছবিগুলোর পেছনে দেখুন। কুইক।" লাইন এবার কেটে দেওয়া হল। অর্জুন জানলার বাইরে তাকাল। অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে। টেডি। নামটা মনে আসামাত্র সে উঠে দাঁড়াল। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। কিন্তু একা ওই বাড়িতে গিয়ে কোনও লাভ হবে না। সে রিসিভার তুলল। গাইড দেখে নাম্বার বের করে ডায়াল করে বুঝল নাম্বার পালটে গেছে। শেষপর্যন্ত লালবাজারকে চাইল সে। অপারেটরকে বলল সল্ট লেক থানার নাম্বার দিতে। ঠিক তখনই বাড়ির সামনে গাড়ির শব্দ হল। রিসিভার রেখে অর্জুন দৌড়ে গেল জানলায়। গাড়ি থেকে অবনীমোহনবাবু নামছেন।

দরজা খুলতে অবনীমোহনবাবু বললেন, "হাসপাতাল থেকে আসছি। গঙ্গাপদর সেন্স ফিরে এসেছে। খিড়কির দরজায় আওয়াজ হতে সে বিছানা ছেড়ে ভেতরের বারান্দায় গিয়েছিল দেখতে। হঠাৎ দুটো লোক তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সে লুটিয়ে পড়ে। তার জ্ঞান চলে যায়।"

"কিন্তু ওকে পাওয়া গিয়েছে ঘরের ভেতরে, কুকুরদুটোর সঙ্গে !"

"ঠিক। কিন্তু কীভাবে ও ঘরে গেল তা গঙ্গাপদ জানে না। হয়তো ওদের ঘরের ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু মোদ্দা কথা হল গঙ্গাপদর কাছ থেকে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না, এমনকী, সে আততায়ীদের বর্ণনা পর্যন্ত দিতে পারছে না।"

"এর মধ্যে আবার ফোন এসেছিল।"

"ফোন ? লাইন ঠিক হল কী করে ?"

"জানি না। হয়তো ওরাই আবার জুড়ে দিয়ে গিয়েছে। ওরা ডক্টর পত্রনবীশকে দিয়ে কথা বলিয়েছিল। গবেষণার কাগজপত্র নিয়ে তিনি আমাকে পনেরো মিনিটের মধ্যে সুইমিং পুলের কাছে যেতে বলেছিলেন। ওঁর গলার স্বর শুনে মনে হয়েছে উনি স্বেচ্ছায় কথাগুলো বলেননি। ওঁকে বাধ্য করা হয়েছিল।"

"তারপর ?"

"কাগজগুলো আমি খুঁজেই পেলাম না যে নিয়ে যাব।"

"পেলে নিয়ে যেতেন নাকি ?"

অর্জুন হেসে ফেলল।

অবনীমোহন বললেন, "চলুন, একবার সুইমিং পুলের ওদিকটা ঘুরে আসি। লোকগুলো যদি ওখানে এখনও থাকে—।"

অগত্যা দরজা বন্ধ করে অর্জুন অবনীমোহনের গাড়িতে উঠল। সুইমিং পুলের রাস্তায় পৌঁছনো পর্যন্ত কেউ কথা বলেনি। এই প্রায়-ভোর সময়ে রাস্তা ফাঁকা। কোথাও কোনও গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই। আফসোসে মাথা নাড়লেন অবনীমোহন। অর্জুন বলল, "একটা ব্যাপার নিশ্চিত, ডক্টর পত্রনবীশ সল্ট লেকেই রয়েছেন।"

"সল্ট লেকে ? কতখানি জায়গা জানেন ? কেউ যদি লুকিয়ে থাকতে চায় তা হলে তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব !"

"মনে রাখবেন যারা ডক্টরকে কিডন্যাপ করেছে তারা স্থানীয় বাসিন্দা নয়।"

"ডক্টর পত্রনবীশের মতো মানুষ নিখোঁজ হয়েছেন এই খবরটা চেপে রাখা যাবে না। কাল সকাল হতেই সাংবাদিকরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওপরওয়ালাদের কাছে কৈফিয়ত দিতে-দিতে—উঃ। কী করা যায় ! ডক্টর যখন তাঁর সন্দেহের কথা বলেছিলেন তখনই যদি ওঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতাম !" অবনীমোহন আফসোস করছিলেন।

অর্জুন বলল, "গাড়িটা চালু করুন।"

"বাড়ি যাবেন ?"

"না। সোজা চলুন।"

গাড়ি চালু করে অবনীমোহন জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছি আমরা ?"

"একটা ঝুঁকি নিতে চাই। হ্যাঁ, ওই মোড়ে গাড়ি থামান। আপনার সেপাইদের বলুন এখানেই অপেক্ষা করতে।" গাড়ি থামানোমাত্র অর্জুন নেমে পড়ল।

হাঁটতে-হাঁটতে অবনীমোহনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যাচ্ছেন কোথায় ?"

ঠিক তখনই অর্জুনের পকেটে রাখা ঘড়ি থেকে শব্দ বের হল, "টেডি, টেডি, টেডি !" অবনীমোহন দাঁড়িয়ে পড়লেন, "কী ব্যাপার ?"

অর্জুন বলল, "আমরা টেডির সন্ধানে যাচ্ছি।"

"টেডি কে ?"

"বোধ হয় ওই ওরাং ওটাংটার নাম।"

"আপনি জানলেন কী করে ?"

"এখনও স্পষ্ট জানতে পারিনি, অনুমান করছি মাত্র।"

"আপনার পকেট থেকে শব্দটা আসছিল কী করে ?"

"খুব আধুনিক টেপে শব্দটাকে রেকর্ড করা হয়েছে, যা নির্দিষ্ট সময় অন্তর

pathagar.net

বেজে যায়। হয়তো ওরাং ওটাংটাকে বারংবার মনে করিয়ে দেয় যে, তার নাম টেডি। যা করতে বলা হয়েছে তাই যেন সে করে। ও যাতে উপেক্ষা না করে তাই শব্দটা যখন বাজে তখন একটা পিন মৃদু চাপ দেয় চামড়ায়। তাতেই বোধ হয় কাজ হচ্ছিল।”

“কিন্তু এসব হচ্ছে কোথায় ?”

“ঘড়িতে। ঘড়িটা যে ওরাং ওটাংয়ের শরীরে বাঁধা ছিল এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। দাঁড়ান, ওই বাড়ি।” আঙুল তুলে দেখাল অর্জুন বাড়িটাকে। আজ সন্ধের পর সে যে অবস্থায় বাড়িটাকে দেখে গিয়েছিল এখন সেই অবস্থাতেই আছে বলে মনে হল। নতুন কোনও আলো জ্বলছে না বাড়িতে।

অর্জুন বলল, “আপনি সদর দরজায় অপেক্ষা করুন। দশ মিনিট হয়ে গেলেই দরজার বেল টিপবেন। তাতেও যদি দরজা না খোলে, ভাঙতে পারেন।” অবনীমোহনকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে অর্জুন আগের চেনা পথে দোতলার বারান্দায় উঠে এল। এবং ওঠামাত্র চোখে পড়ল দরজা ইঞ্চি ছয়েক খোলা। অথচ সে যখন বাড়িতে এর আগে ঢুকেছিল তখন দরজা বন্ধ ছিল, সে যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল তখন দরজা বন্ধ দেখেই গিয়েছে।

তার মানে ইতিমধ্যে লোক এসেছে। সে সন্তর্পণে দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে কিছু শুনতে চাইল। না, কোনও শব্দ নেই। অর্জুন চাপ দিয়ে দরজা সরিয়ে ফাঁকটাকে বাড়াল। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। সে চট করে ভেতরে ঢুকে পড়ে দেখল ঘরের মধ্যে ওষুধের গন্ধ ভাসছে। ওষুধটা ডেটল জাতীয় কিছু।

pathagar.net

অন্ধকার চোখ সয়ে গেলে অর্জুন জল পড়ার আওয়াজ শুনতে পেল। শাওয়ার ছেড়ে স্নান করলে এমন আওয়াজ হয়। অর্জুন টর্চ বের করে সরু আলো ফেলতেই চমকে উঠল। বিছানায় গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে একটা ওরাং ওটাং। শুধু তার চোখ দুটো পিটপিট করছে অর্জুনের দিকে। জন্তুটা তাকে দেখে ভয় পেয়েছে বলে মনে হল না। ওর হাতের অনেকটা জুড়ে ব্যান্ডেজ করা হয়েছে। বোধ হয় সেই যন্ত্রণায় ও কাতর হয়ে আছে। অর্জুন বুঝল তার অনুমান ঠিক। ভাঙা কাচের গর্ত দিয়ে ঢুকতে গিয়ে বেচারার হাত কেটে রক্ত বের হয়েছে। ঠিক তখনই অর্জুনের পকেটে রাখা ঘড়ি আবার বেজে উঠল, “টেডি টেডি টেডি।”

সঙ্গে-সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে বসল ওরাং ওটাং। অভ্যস্ত পরিচিত ডাক শুনতে পেয়ে বিছানা থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে এল অর্জুনের দিকে। তারপর জখম না হওয়া হাত বাড়িয়ে মুঠো খুলল।

বাথরুম থেকে গলা ভেসে এল, “টেডি, ঘড়িটাকে কোথায় ফেলেছিলে ? আমি তোমাকে বলেছি ঘড়িটাকে না খুলতে। তখন থেকে জিজ্ঞেস করছি ঘড়ি

কোথায়, অথচ দেখাতে পারোনি।" এই বাক্যগুলো ইংরেজিতে উচ্চারিত হচ্ছিল। টেডি সম্ভবত ইংরেজি বোঝে।

অর্জুন পকেট থেকে ঘড়ি বের করে ওরাং ওটাংটাকে দেখাল। প্রাণীটা কুতকুতে চোখে সেটাকে দেখে ছোঁ মেরে নিয়ে নিল হাতে। তারপর জখম না হওয়া হাতে পরার চেষ্টা করল। কিন্তু ওর পক্ষে বকলসের মধ্যে স্ট্র্যাপের মুখ ঢোকানো সম্ভব হচ্ছিল না। তা ছাড়া ছিঁড়ে যাওয়ায় স্ট্র্যাপটা লাগবে না, এই বুদ্ধি প্রাণীটার নেই। এই সময় বেল বাজল। শব্দটা কানে আসতেই এক লাফ দিয়ে ওরাং ওটাং উঠে গেল বিছানায়। ঘড়ি হাতে নিয়ে শুয়ে পড়ে পিটপিট করতে লাগল। দ্বিতীয়বার বেল বাজামাত্র বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজ হল। অর্জুন দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির ওপর চলে গেল যেটা ছাদে গিয়েছে। লোকটা গজগজ করছিল, "এই ভোরবেলায় আবার কে এল ? টেডি, চুপচাপ শুয়ে থাকো। আমি ওয়ার্নিং দিলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গাছে চলে যাবে। ও কে ?" কথাগুলো ইংরেজিতে বলে লোকটি নীচে চলে গেল। অর্জুন লোকটার চেহারা দেখতে পায়নি। সে দ্রুত ঘরে ঢুকে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিল, যাতে ওরাং ওটাং পালিয়ে গাছে না যেতে পারে। তারপর দ্রুত গাছের ডাল বেয়ে সে নীচে নেমে এল।

ওদিকে ততক্ষণে দরজাটা খোলা হয়েছে। ভারী গলায় প্রশ্ন হল, "কী চাই ?"

অবনীমোহন কিছুই জানেন না। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি এই বাড়িতে থাকেন ?"

"কী আশ্চর্য ! এ-বাড়িতে না থাকলে ভোরবেলায় দরজা খুলব কেন ? কে আপনি ? কী চাই আপনার ?" খুব বিরক্ত হলেন ভদ্রলোক।

অর্জুন ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। এবার সে ভদ্রলোককে দেখতে পেল। পার্কে দূর্বাঘাস তোলা ভদ্রলোকই ওই বাড়ির দরজায়। সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনার টেডির সঙ্গে আলাপ করতে চাই।"

"তার মানে ?" ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন।

"আপনি সেদিন পার্ক থেকে দূর্বাঘাস তুলছিলেন অসুস্থ পোষা প্রাণীকে খাইয়ে সুস্থ করবেন বলে। আমার মনে হয় ওই পোষা প্রাণীটার নাম টেডি। তাই না ?"

"দেখুন, এই ভোরবেলায় এভাবে আমাকে বিরক্ত করবেন না। আমার বাড়িতে যে কোনও পোষা প্রাণী নেই তা পাড়ার সবাই জানেন। ইচ্ছে হলে জিজ্ঞেস করতে পারেন।" ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ামাত্র রাস্তার উলটো দিকের বাড়িটার দোতলার জানলা খুলে গেল। গলায় চাদর ঝুলিয়ে কমলাপতিবাবু মুখ বের করলেন, "ওহে ! তুমি অর্জুন তো ? সারারাত ঘুমোও না নাকি ? গোয়েন্দাদের খুব পরিশ্রম করতে হয় দেখছি। তা ও-বাড়িতে কী

করছ ?"

অর্জুন ঘুরে তাকাল, "গুড মর্নিং। এঁকে চেনেন ?"

কমলাপতি বললেন, "বিলক্ষণ। তবে সাতসকালে পুলিশকে চিনতে চাইনি। মার্জনা করবেন দারোগামশাই।"

"দারোগা ? আপনারা পুলিশ ?" লোকটি হকচকিয়ে গেল।

এবার অবনীমোহনবাবু তাঁর ফর্ম ফিরে পেলেন, "আপনি ভেতরে চলুন। আপনার বাড়ি সার্চ করব।"

"সার্চ করবেন ? ওয়ারেন্ট এনেছেন ?"

প্রশ্নটা দোতলার জানলায় কানখাড়া করে রাখা কমলাপতিবাবুর কানে যাওয়ামাত্র তিনি চেঁচিয়ে বললেন, "বাড়িটা ডক্টর হালদারের ছিল। উনি মারা যাওয়ায় ওঁর স্ত্রী এখন 'ওনার'। তিনি আমেরিকায় আছেন। ইনি কেয়ারটেকার। কেয়ারটেকার ওয়ারেন্ট দেখতে চাইবে কেন ? কোনও এক্তিয়ার নেই!"

হঠাৎ ভদ্রলোক নিজের ঘড়িতে চাপ দিতে লাগলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপরের দরজায় শব্দ হল। কেউ যেন দরজা খোলার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। অর্জুন বলল, "আপনার সিগন্যালিং-এ কোনও কাজ হবে না। ব্যালকনির দরজা বন্ধ। ছাদেরটারও। বেচারাকে বেরুতে হলে ওই দরজা দিয়ে বেরুতে হবে।"

ওরাং ওটাং এবং তার মালিককে গ্রেফতার করতে বেশি বেগ পেতে হল না। লোকটির নাম মন্মথ দত্ত নয়। এই নাম সে ব্যবহার করেছিল ডক্টর পত্রনবীশকে বিভ্রান্ত করতে। ডক্টর হালদারের মেয়ে যিনি আমেরিকায় থাকেন তাঁকেও বলা হয়েছে ভদ্রলোকের নাম মন্মথ দত্ত। ওখানকার প্রবাসীদের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ডলারে পেমেন্ট করে এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল মন্মথ দত্ত ওরফে টিটো বসু। এই ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারটা ডক্টর হালদারের স্ত্রী এবং ছেলে জানতেন না। আমেরিকার দুই প্রান্তে ছেলে এবং মেয়ে থাকে। মা এসেছেন ছেলের কাছে।

মন্মথ দত্তের আসল নাম টিটো বসু, তা বের করতে অবনীমোহনকে অনেক কসরত করতে হয়েছে। এখন দোতলার শোয়ার ঘরে ওরা বসে। ওরাং ওটাংটাকে একটা চেনে আটকে রাখা হয়েছে। টিটো বসু বলল, "আমার বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগ কী তাই এখনও বুঝতে পারছি না। আমি এই ওরাং ওটাংটাকে পুষেছি। এটা কি অপরাধ ? ইস্ট বার্লিনের মেয়র আমাকে ওকে পোষার লাইসেন্স দিয়েছেন। আমি সম্পূর্ণ বৈধভাবে ওর মালিক।"

"ওর পাশপোর্ট আছে ?"

"পাশপোর্ট ? পশুপাখিদের পাশপোর্ট লাগে নাকি ?"

"ওকে কীভাবে এ-দেশে নিয়ে এলেন ?"

"আমার সঙ্গে এসেছে। কাস্টমস ইমিগ্রেশন কেউ আপত্তি করেনি।"

"তারা দেখেছিল ওকে ?"

"না দেখার কোনও কারণ নেই। আমি বোম্বে পোর্টে নেমেছিলাম।"

"বোম্বে পোর্টে ? মানে এয়ারপোর্ট ?" অর্জুন বিশ্বাস করছিল না।

"না। আমি জাহাজে এসেছিলাম মিডল ইস্ট থেকে। নাউ মিস্টার, একটা ওরাং ওটাংকে পোষ মানিয়ে কাছে রাখা যদি এ-দেশে অপরাধ বলে গণ্য হয় তা হলে আমি ওকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আমার পাশপোর্ট দেখেছেন, আমি আপনাদের আইনে পড়ছি না।"

অবনীমোহন বললেন, "কিন্তু বিদেশিরা যদি এ-দেশে অপরাধ করে তা হলে তার বিচার এ-দেশের আইনেই হয়ে থাকে।"

"আমি কী অন্যায় করেছি ?"

"আপনার ওরাং ওটাং করেছে। বেশ কয়েকটা চুরির অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে। ওর জ্বালায় দোকানদাররা তটস্থ। শেষ ক্রাইম করেছে ও গত রাত্রে।"

"গত রাত্রে ?"

অর্জুন হাসল, "বেচারার হাতের ব্যান্ডেজ তার প্রমাণ। ডক্টর পত্রনবীশের বাড়িতে ঢুকে দরজা খুলে দিয়ে কিডন্যাপ করতে সাহায্য করেছে ও।"

"বাঃ ! এর কোনও প্রমাণ আছে ?"

"নিশ্চয়ই। ওর রক্ত এখনও ডক্টর পত্রনবীশের বাড়ির ভাঙা কাচে লেগে আছে।" অর্জুন এগিয়ে এল সামনে, "ডক্টর পত্রনবীশকে কোথায় রেখেছেন ?"

"কী আশ্চর্য ! কার কথা বলছেন আপনি ? তাঁকে তো আমি চিনিই না।"

"মিথ্যে কথা বলছেন আপনি।"

"কোনও প্রমাণ করতে পারবেন না।"

অর্জুন টেবিলের ওপর তাকাল। টিটো বসুর পকেটে যা-যা ছিল সব বের করে ওখানে জড়ো করে রাখা হয়েছে। এমনকী লোকটার পাশপোর্টও। সে হাত বাড়িয়ে ছোট্ট রিমোট তুলল। গেট থেকে এটা টিপেই সে ওরাং ওটাংকে নির্দেশ দিচ্ছিল পালিয়ে যাওয়ার জন্যে। রিমোট টিপতেই ওরাং ওটাংয়ের হাতে ধরা ঘড়ির রেকর্ড বাজতে লাগল, "টেডি, টেডি, টেডি।"

তৎক্ষণাৎ প্রাণীটি উঠে দাঁড়িয়ে ব্যালকনির দিকে ছুটে গেল। দরজা বন্ধ দেখে কুঁইকুঁই করতে লাগল। অর্জুন অবনীবাবুকে বলল, "চলুন, ওঁকে নিয়ে একটু মর্নিং ওয়াক করে আসা যাক।" বলে সে ঘড়িটাকে ওরাং ওটাংয়ের হাতে ভাল করে বেঁধে দিল। দিয়ে ব্যালকনির দরজা খুলে দিল। তৎক্ষণাৎ প্রাণীটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেবদারু গাছে উঠে বসল। অর্জুন এবং অবনীমোহন বাধ্য করল টিটো বসুকে নীচে নামতে। গাড়ি রয়েছে মোড়ের মাথায়। ওরা রাস্তায় নামামাত্র কমলাপতিবাবু বেরিয়ে এলেন দরজা খুলে, "ইন্টারেস্টিং ব্যাপার।

আমি এইমাত্র একটা হনুমান জাতীয় প্রাণীকে ও-বাড়ির ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। স্ট্রেঞ্জ!"

অর্জুন আঙুল তুলে দেবদারু গাছ দেখাল, "ওই দেখুন তাকে। খুব ভাল এবং অনুগত ভৃত্য। মালিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

ওদের দেখে অবনীমোহনবাবুর ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে এল সামনে। অর্জুন বলল, "উঠুন। আমাদের পূর্বপুরুষকে অনুসরণ করা যাক।"

টিটো বসু আপত্তি করলেন, "কী বলতে চাইছেন আপনি ? আমার পক্ষে কোথাও যাওয়া অসম্ভব। যদি আমাকে অ্যারেস্ট করতে চান, স্বচ্ছন্দে সেটা করে থানায় নিয়ে চলুন। আমি অন্য কোথাও যাব না।"

অবনীমোহন এবার দাঁতে দাঁত রাখলেন, "আপনি যদি কথা না শোনেন তা হলে এমন ব্যবস্থা নেব যে, জীবনে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবেন না। উঠুন বলছি, এই, একে গাড়িতে তোলো।" বলামাত্র দু'জন সেপাই ওকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিল। ড্রাইভারের পাশে অবনীমোহন এবং ধারে বসল অর্জুন। তখন ভোরের আলো ফুটে গেছে। গাছগুলো শান্ত। ওর কোনটায় ওরাং ওটাং আছে, বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন রিমোট টিপল। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা তফাতের একটা গাছের ডাল নড়ে উঠল আচমকা। তারপর এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে যেতে দেখা গেল ওরাং ওটাংটাকে।

অবনীমোহনবাবুর ড্রাইভারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যতটা সম্ভব শ্লথগতিতে গাড়ি চালাতে, যাতে ওরাং ওটাংয়ের পেছনে থাকা যায়। মাঝে-মাঝেই প্রাণীটি থেমে যাচ্ছে এবং তখন রিমোট টিপতে হচ্ছে অর্জুনকে।

যে পথ পাঁচ মিনিটে যাওয়া যেত সেটা পার হতে সময় লাগল কুড়ি মিনিট। যেখানে গাছ নেই সেখানেই মুশকিল হয়েছে। আড়াল থেকে নামতে চায়নি প্রাণীটা সহজে। ক্রমাগত রিমোট টিপে রেকর্ড বাজিয়ে বিরক্ত করে তবে কাজ হয়েছে।

অবনীমোহনবাবু বললেন, "আমরা যে উদয়াচলে চলে এসেছি।"

"উদয়াচল ?"

"টুরিস্ট বাংলো।"

অর্জুন গাড়ি থামাতে বলল। তারপর অবনীমোহনকে নীচে নামতে বলে খানিকটা তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। অবনীমোহন কাছে এলে সে বলল, "আমার বিশ্বাস, এই টুরিস্ট লজেই ডক্টর পত্রনবীশকে রাখা হয়েছে। ওই যে সামনে যে গাড়িটা পার্ক করা রয়েছে ওটাকেই কাল রাত্রে আমি দেখেছি। আপনি আরও পুলিশ আনান, ওরা অ্যাটাক করতে পারে।"

কথা বলতে-বলতে অর্জুন দেখল ওরাং ওটাংটা গাছ থেকে নেমে টুরিস্ট লজের বারান্দায় উঠে পড়ল। এবং চোখের আড়ালে চলে গেল। অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়ল। অবনীমোহনবাবু দ্রুত টিটো বসুকে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে

গাড়ির সঙ্গে আটকে সেপাই দুটোকে সঙ্গে নিয়ে অনুসরণ করলেন অর্জুনকে। টুরিস্ট লজের অফিস তখন বন্ধ, লোকজন ঘুম থেকে ওঠেনি। ওরা দোতলায় উঠে দেখল কোণের দিকের একটা ঘরের দরজা খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে একটা লোক সন্তর্পণে বেরিয়ে আড়াল থেকে নীচে দাঁড়ানো পুলিশের গাড়ি দেখল। তারপরই ঢুকে গেল ভেতরে। অবনীমোহন ইশারায় জানতে চাইলেন এগোবেন কি না। অর্জুন ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল। ওই লোকটাকে বিদেশি বলে মনে হয়েছে তার। তখনই ওরাং ওটাংটা বেরিয়ে এল। ওর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল ভাল করে হাঁটতে পারছে না। কিছু একটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে ওর বুকে। বারান্দায় এসে দাঁড়াতে ভেতর থেকে কেউ বোধ হয় ওকে কিছু হুকুম করল। ওরাং ওটাং নীচে নেমে গাড়ির দিকে এগোতে লাগল। এইবার লোকটার গলা পাওয়া গেল, "কুইক, টেডি কুইক।"

সঙ্গে-সঙ্গে দৌড়তে লাগল প্রাণীটা। গাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ামাত্র প্রচণ্ড আওয়াজে চারধার কেঁপে উঠল। বিস্ফোরণে গাড়িটার অনেকখানি উঠে গেল। দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল গাড়িতে। অবনীমোহন চিৎকার করে উঠলেন, "মাই গড!"

সঙ্গে-সঙ্গে দু'জন লোক কোণের ঘর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে পড়ল। নীচে দাঁড়ানো দ্বিতীয় গাড়িটার দিকে তারা ছুটে যেতেই অর্জুন চিৎকার করল, "হল্ট!"

অবনীমোহন তখন তাঁর রিভলভার বের করেছেন। লোক দুটো একটু ইতস্তত করতে ওঁরা এগিয়ে গেলেন সামনে। এবার লোক দুটো আবার দৌড়ল গাড়ির ভেতর ঢোকার জন্যে। অবনীমোহন এবার গুলি চালালেন। একটা লোক পড়ে গেল মাটিতে। দ্বিতীয়জন গাড়িতে উঠে এঞ্জিন চালু করে বিদ্যুদ্বেগে গাড়িটি ঘোরাতে অবনীমোহনবাবু চাকায় গুলি করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ফেটে গেল চাকা। আর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটা গিয়ে ধাক্কা মারল জ্বলন্ত গাড়িতে। একটা আর্তনাদ কয়েক মুহূর্তের জন্যে শোনা গেল।

ডক্টর পত্রনবীশকে চেয়ারে বেঁধে রাখা হয়েছিল। অর্জুন ঘরে ঢুকে তাঁকে বাঁধনমুক্ত করতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বাইরে কী হয়েছে?"

"অপরাধীরা নিজেদের শাস্তি নিজেরাই ডেকে এনেছে। আর কোনও ভয় নেই।"

"কার্ল? কার্ল কোথায়?"

"কার্ল? মানে সেই জার্মান বৈজ্ঞানিক?"

"হ্যাঁ। কার্লই এই প্ল্যানটা করেছিল।"

ডক্টরকে নিয়ে বাইরে এল অর্জুন। আহত লোকটি বিদেশি কিন্তু সে কার্ল নয়। কার্ল গাড়ি নিয়ে পালাতে চেয়েছিল। কিন্তু এখন তার শরীর পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে আরও দুটো পোড়া মৃতদেহ পাওয়া গেল। টিটো বসু

ও ওরাং ওটাংটার। ডক্টরের কাছে শোনা গেল কার্ল ওই ওরাং ওটাংটার বুকে টাইম বোম বেঁধে পাঠিয়েছিল অর্জুনদের উড়িয়ে দিতে।

সেই সকালে ডক্টর পত্রনবীশের বাড়িতে বসে তাঁর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনছিলেন পুলিশের বড়কর্তারা। এরকম একটা ঘটনার সমাধান অর্জুনের সাহায্য ছাড়া সম্ভব ছিল না, ডক্টর পত্রনবীশ বারংবার বলেও যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না। সার এবং মেয় তাঁর দু'পাশে বসে ছিল। তাদের গলায় হাত বোলাতে-বোলাতে ডক্টর চমকে উঠলেন, "এটা কী ? এ তো লকারের চাবি।"

"হ্যাঁ। বিশ্বস্ত জায়গায় রেখে দিয়েছিলাম। আপনার সব কাগজ সুরক্ষিত আছে।"

"আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ অর্জুন।"

"না। কৃতজ্ঞতা যদি জানাতে হয় তা হলে জানানো উচিত ওই অবলা প্রাণীকে, যে নিজের জীবন দিয়েছে আদেশ পালন করতে। যে পথ না দেখালে আমরা উদয়াচলে পৌঁছতে পারতাম না। তার বদলে মানুষের খামখেয়ালির শিকার হয়েছে বেচারা!"

দিনদুপুরেই
রাতদুপুর

হাতে কোনও কাজ না থাকলে অমল সোমের বাড়িতে আড্ডা মারার সুযোগ হয়। আর ওই সুযোগ মানে অনেক কিছু অজানা তথ্য জেনে নেওয়া। কিন্তু অমল সোম এখন জলপাইগুড়িতে নেই। তিনি আজকাল মাঝে-মাঝেই উধাও হয়ে যান। সত্যসন্ধানে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। এইরকম সময় অর্জুনের খুব খারাপ কাটে। মা এককালে বলতেন, "ওসব শখের গোয়েন্দাগিরি ছেড়ে চাকরি-বাকরির চেষ্টা কর। এখন তো তোর সঙ্গে কত বড়-বড় লোকের জানাশোনা হয়েছে। এস পি রায়ের ছেলে এ পি রায় তোকে তো খুব পছন্দ করে। ওকে গিয়ে বল, চা-বাগানে চাকরি দিতে।" কথাগুলো অর্জুনের কানে ঢোকেনি। বাঁধাধরা চাকরি করা তার পোষাবে না। মাঝেমধ্যে সে যেসব কেস পেয়েছে তার দক্ষিণায় মোটামুটি চলছে। জলপাইগুড়ি বলে সত্যসন্ধানের কাজ বেশি পাওয়া যায় না। যদি সে কলকাতায় থাকত তা হলে অন্য চিন্তা করতে নিশ্চয়ই মা বলতেন না।

অমল সোম না থাকলে রোজ একবার ওঁর বাড়িতে যায় অর্জুন। অমল সোমের পরিচারক বোবা-কালা হাবু তাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়। আজ সকালে নিজের লাল বাইকে চেপে অর্জুন হাকিমপাড়ায় গেল। অমল সোমের বাড়ির বাগানের গেটের পাশে দু'জন বসে আছে। একজন তো হাবু, অন্যজন কালো পোশাক পরা দাড়িওয়ালা এক প্রৌঢ়। দাড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে। দাড়িওয়ালা একনাগাড়ে বলে যাচ্ছিল আর হাবু মাথা নেড়ে যাচ্ছে সমানে। অর্জুনের হাসি পেল। ইশারা ছাড়া যে কোনও কথা শুনতে পায় না বলেই বোঝে না সেই হাবু ওভাবে মাথা নাড়ছে কেন? বাইকের আওয়াজও হাবু শুনতে পেল না, দাড়িওয়ালা কথা বন্ধ করে তার দিকে মুখ ঘোরায়। এবার হাবু তাকে দেখতে পেয়েই তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে অঁ-অঁ শব্দ তুলে ইশারায় বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল কিছু।

বাইক থেকে নেমে অর্জুন দাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

দাড়িওয়ালা বলল, "ব্যাপারটা কী তা জানতে-জানতে জীবন কেটে যায়

কিন্তু জানা হয় কই ? আচ্ছা বলুন তো, আমার বাপ-ঠাকুর্দা, তাঁর বাবা কেন জন্মেছিলেন ?”

অর্জুন বলল, “তাঁরা না জন্মগ্রহণ করলে আপনি এখানে বসে থাকতে পারতেন না, তাই। হাবুকে কী বোঝাচ্ছিলেন ?”

“বেচারা খুব ভয় পাচ্ছে একা থাকে বলে। আমি বললাম তোর কোনও ভয় নেই ! তবে ওকে তিনটে জিনিস জোগাড় করতে হবে।”

“কীরকম ?”

“একটা কালো বেড়াল যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে। দু' নম্বর হল, একটা কানা কাক। জন্ম থেকেই তাকে কানা হতে হবে, কেউ ঢিল ছুড়ে কানা করে দিলে চলবে না। তিন নম্বর হল, একটা খোঁড়া শকুন। ওই একই ব্যাপার, জন্ম থেকেই খোঁড়া হতে হবে। এই তিনরকম প্রাণী জোগাড় করলে ওর কোনও ভয় থাকবে না আর।”

অর্জুনের হাসি পাচ্ছিল। মানুষের বিশ্বাস অন্ধ হলে সে কী না ভাবতে পারে ! তবে ওই তিন পশু ও পাখির নির্বাচনে বুদ্ধির ছাপ আছে। কালো বেড়াল, কানা কাক আর খোঁড়া শকুনের কথা শুনলে বেশ ছমছমে পরিবেশ তৈরি হয়।

“এদের দিয়ে কী হবে ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“আমরা যা দেখতে পাই না এরা তা দেখতে পায়। এই যে আমাদের চারপাশে অজস্র আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে আপনি তাদের দেখতে পাচ্ছেন ?”

“না থাকলে কী করে দেখতে পাব ?”

লোকটি উঠে দাঁড়াল। অর্জুন দেখল ওর কাঁধে একটা বড়সড় ঝোলা রয়েছে। লোকটি শান্তমুখে জিজ্ঞেস করল, “আপনাকে একটা প্রশ্ন করব বাবু ?”

“নিশ্চয়ই।”

“আপনার মা-বাবা বেঁচে আছেন ?”

“মা আছেন। বাবা নেই।”

“ও। তা তিনি যখন গত হয়েছিলেন তখন তাঁর শ্রাদ্ধ হয়েছিল ?”

“হ্যাঁ।”

“তা হলে ? শ্রাদ্ধ কেন করা হয় ? মৃত মানুষের আত্মাকে মুক্তি দিতে। ওই যে পিণ্ডদান করা হয় তা তো আত্মার উদ্দেশেই। তাতেও যাদের মন ভরে না তারা গয়ায় গিয়ে পিণ্ডদান করে। এর পর আপনি বলবেন আপনার বাবার আত্মা ছিল না, সবাই মিছিমিছি শ্রাদ্ধ করেছে ?”

অর্জুন ভাল করে দেখল। লোকটি অবশ্যই বুদ্ধিমান। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে ও হাবুর মাথা খাওয়ার চেষ্টা করছে তা ধরা যাচ্ছে না। লোকটি বলল, “চুপ করে থাকবেন না, জবাব দিন বাবু !”

"এটা হিন্দুদের প্রচলিত বিশ্বাস। কোনও প্রমাণ নেই। যেহেতু যুগ যুগ ধরে করে আসা হচ্ছে তাই সবাই করে।"

"যার পেছনে কোনও যুক্তি নেই তা যুগ-যুগ ধরে চলতে পারে না বাবু। আত্মা নেই এ-কথা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না বলেই ব্যাপারটা মেনে নিচ্ছেন। তা যা বলছিলাম, সেই তেনাদের ওই বেড়াল, কাক আর শকুন দেখতে পায়।"

"চমৎকার!"

"আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"কালো বেড়াল প্রচুর দেখা যায়, বাকি দুটো পাখির খবর আপনি জানেন?"

"অবশ্যই। সেনপাড়ায় বলাই মিত্তিরমশাইকে আপনি চেনেন? ব্যবসা করতেন। তিন বছর হল গত হয়েছেন। শ্রাদ্ধশান্তি হয়েছে, গয়ায় গিয়ে পিণ্ডি দিয়ে আসা হয়েছে, কিন্তু তবু তাঁর আত্মার শান্তি হয়নি। ও বাড়ি ছেড়ে তিনি কিছুতেই যাচ্ছেন না। শেষপর্যন্ত আমার কথায় মিত্তিরমশাই-এর ছেলে ওই তিনটে প্রাণীকে জোগাড় করেছেন আজ। আমি সেই উদ্দেশ্যেই এসেছিলাম। আগে এসে পড়েছি বলে ভাবলাম, যাই, একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।" লোকটি হাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, "চলি ভাই, যা বললাম খেয়াল রেখো। দ্যাখো, ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছুই নয়।"

কথাগুলো বলে লোকটি অমল সোমের বাড়ির দিকে তাকাল। তারপর গেট খুলে কয়েক পা হেঁটে একটা টগর গাছের পাশে দাঁড়িয়ে সেখানকার মাটিকে প্রণাম করল। অর্জুন দেখল লোকটার দেখাদেখি হাবুও সেই জায়গাটার মাটিকে প্রণাম করল। এবার লোকটি প্রসন্ন মুখে হাঁটা শুরু করতেই অর্জুন বলল, "আচ্ছা, এইসব বিশ্বাস নিয়ে আপনারা একটা আলাদা জগৎ তৈরি করে বেশ আছেন, না?"

লোকটি বলল, "তা আসুন না আজ।"

"কোথায়?"

"ওই যে, যেখানে আমি যাচ্ছি। সেনপাড়ার মিত্তিরমশাইয়ের বাড়িতে। নিজের চোখে সব দেখেশুনে নেবেন। বড়বাবু শুনলে বলবে, ঠিক করেছ গোরক্ষনাথ। চলি।"

গোরক্ষনাথ! যে নাম রেখেছিল তার তারিফ না করে পারল না অর্জুন। এদের কী করে বোঝানো যাবে যে, এইসব কুসংস্কার দূর করা দরকার। এখন একটু-একটু করে শ্রাদ্ধের প্রচলিত অনুষ্ঠান উঠে যাচ্ছে। মৃতের আত্মীয়বন্ধুরা সেই দিনে একত্রিত হয়ে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করেন, তাঁর প্রিয় গান গাওয়া হয়।

অর্জুন দেখল বাগানে হাবু কেমন জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাবুর গায়ে যে শক্তি আছে তার ব্যবহার ও যদি ঠিকঠাক করতে পারে তা হলে কোনও

কিছুতেই ভয় পাওয়া ওর উচিত নয়। সেই হাবু ভয় পেয়েছে কেন ? সে সামনে গিয়ে ইশারা করে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে ? হাবু মাথা নেড়ে বোঝাল তার কিছু হয়নি। অর্জুন ইশারায় বোঝাল ওই লোকটাকে বাড়িতে ঢুকতে না দিতে। হাবু একটু ভাবল, তারপর আঙুল তুলে টগর গাছের পাশের মাটি দেখাল। অর্জুনের মনে পড়ল ওই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে লোকটা প্রণাম করেছে, দেখাদেখি হাবুও। কিন্তু ঘাসমাটি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। লোকটা বড়বাবু বলল কাকে ? অমলদাকে ? প্রশ্নটা হাবুকে করতেই সে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলল। অর্জুন বেশ অবাক হল। তার পক্ষে অমল সোম বাড়িতে থাকলে কে আসছে না আসছে তা জানা সম্ভব নয়, যদি অমলদা না বলেন। এ লোকটার কথা সে কখনও শোনেনি। ইদানীং অমল সোম একটু অন্যরকম হয়ে গিয়েছেন। ইদানীং বলা ভুল হল, কয়েক বছর ধরে তিনি সত্যসন্ধানের কাজ আর করেন না। সারাক্ষণ হয় বই পড়েন, নয় চুপচাপ ভাবেন। আবার হঠাৎ-হঠাৎ উধাও হয়ে যান হাবুর ওপর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে। কিন্তু চিরকাল যে মানুষ বিজ্ঞানের সপক্ষে কথা বলে এলেন, তাঁর পক্ষে এই লোকটাকে কী করে মেনে নেওয়া সম্ভব ? অর্জুনের মনে পড়ল, অমলদার শেল্‌ফে বেশ কিছু পরলোক-সংক্রান্ত বই সে দেখেছে।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে হাবুর দেখানো মাটিতে পা রাখতেই হাবু দ্রুত তাকে টেনে সরিয়ে দিল। তারপর চোখ পাকিয়ে রাগত ভঙ্গিতে ওরকম করতে নিষেধ করল। অর্জুন খুব অবাক হয়ে গেল। এরকম আচরণ হাবু কখনও তার সঙ্গে করেনি। এখন ওকে দেখে মনে হচ্ছে প্রয়োজন হলে শক্তিপ্রয়োগ করতেও দ্বিধা করবে না। ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল অর্জুনের। সে খুব বিমর্ষ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হাবু শান্ত হয়ে গেল। তারপর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। অর্জুনের মনে হল ওখানকার জমি ভাল করে দেখা দরকার।

সে ইশারা করে হাবুকে ডাকতেই হাবু মাথা নিচু করেই এগিয়ে এল। পকেট থেকে টাকা বের করে অর্জুন হাবুকে দিয়ে ইশারায় বলল সিগারেট কিনে আনতে। এই কাজটা হাবু এর আগেও করেছে। কোন ব্র্যান্ড, তাও জানে। টাকা নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। দোকান থেকে ফিরে আসতে হাবুর মিনিট দশেক লাগবে। অর্জুন দ্রুত বাগানের এককোণে রাখা কোদাল নিয়ে এসে জায়গাটা খুঁড়তে লাগল। সামান্য গর্ত খুঁড়তেই খট করে শব্দ হল। হাত ঢুকিয়ে জিনিসটাকে বের করল অর্জুন। একটা আট ইঞ্চি চওড়া স্টিলের বাক্স। বাক্সর ঢাকনা খুলতেই একটা লকেট দেখতে পেল সে। চেন ছাড়া লকেটটি চকচক করছে। একটা কালো সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে লকেটের চেহারা নিয়েছে। মুখটা সামান্য উঁচুতে, ফণা তোলা। খুব হালকা গালা বা ওই জাতীয় পদার্থে লকেটটা তৈরি।

অর্জুন দ্রুত বাক্সটাকে পুঁতে ফেলে মাটি চাপা দিল। কোদাল সরিয়ে রেখে চেষ্টা করল যতটা সম্ভব মাটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হচ্ছিল না কিছুতেই। টগর গাছ থেকে পাতা ছিঁড়ে খোঁড়া জায়গাটার ওপর ছড়িয়ে দিয়ে সে গেটের পাশে চলে এল লকেটটাকে হাতে নিয়ে।

এই সময় টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল।

জলপাইগুড়িতে এ-সময় একবার বৃষ্টি নামলে আর রক্ষে নেই। অর্জুন দেখল হাবু দৌড়ে আসছে। সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে রেখে দিতে ইশারা করতে হাবু দৌড়ে চলে গেল বাগান পেরিয়ে বারান্দায়, বৃষ্টির ছাঁট থেকে বাঁচতে। অর্জুন তাকে ইশারা করে বাইকে উঠে বসল। তার মনে হচ্ছিল বৃষ্টি আরও জোরে নামলে বাঁচা যায়। হাবুর পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে না মাটিটা খোঁড়া হয়েছিল।

বাড়িতে এসে জামাপ্যান্ট ছেড়ে অর্জুন লকেটটাকে নিয়ে বসল। যিনি বানিয়েছেন তাঁকে শিল্পী হিসেবে উঁচুদরের বলতেই হবে। নিটোল সাপ। কালনাগিনী ? এমনকী চোখ দুটো ভীষণ রকমের জীবন্ত। এখন কথা হল, এই সাপের লকেটকে কেন টগর গাছের নীচে পুঁতে রাখা হয়েছে ? লোকটা এবং হাবু যখন প্রণাম করেছে তখন ওরা এর অস্তিত্ব জানে। লকেট রাখা ছিল স্টিলের বাক্সে, যাতে জল-মাটি এর কোথাও ক্ষতি করতে না পারে। অমলদা কি জানেন ? অর্জুনের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল না অমল সোম এরকম অবৈজ্ঞানিক কাজকে প্রশ্রয় দেবেন ? এটাকে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে কেন ? কোথায় যেন পড়েছিল অর্জুন, তান্ত্রিকরা মন্ত্রপূত লোহার সাপ মাটিতে পুঁতে দেয়, যাতে গৃহস্থের বাড়িতে অকল্যাণ প্রবেশ করতে না পারে। অসম্ভব ! অমলদা এটা কিছুতেই করতে পারেন না। নিশ্চয়ই ওই লোকটা হাবুকে ম্যানেজ করে এসব করেছে।

টেবিলের ওপর লকেটটা রাখতেই মা ঘরে ঢুকলেন, "হ্যাঁ রে, শুনেছিস, সেনপাড়ার এক বাড়িতে খুব ভূতের উপদ্রব হয়েছে।"

অর্জুন হো-হো করে হাসল, "মা ! তুমিও ?"

"না রে ! সবাই বলছে। তোর খোঁজে সুধাদি এসেছিলেন। উনিও গিয়েছেন দেখতে।"

"সুধামাসি গিয়েছেন ভূত দেখতে ?"

"যে বাড়িতে উপদ্রব হচ্ছে সেই বাড়ির লোকদের তিনি চেনেন।"

"তা হলে ভূতকেও চিনতে পারবেন।"

"ইয়ার্কি মারিস না। সুধাদি বলছিলেন তোর সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। এই, এটা কী ?" মা এগিয়ে এলেন টেবিলের কাছে।

"লকেট।"

"কী ভয়ঙ্কর লকেট ! কোথায় পেলি ?"

"ভয়ঙ্কর কেন ?"

"জানি না। দেখেই কেমন গা ছমছম করছে। ফেলে দে, ফেলে দে। ওরকম অমঙ্গল জিনিস বাড়িতে রাখিস না।"

"সুন্দর সাপের মূর্তি, অমঙ্গল বলছ কেন ?"

"না বাবা, চোখ দুটো দ্যাখ, গিলে খাবে। কিনেছিস ?"

"নাঃ। পেলাম।"

"দূর করে দে।" চলে যাওয়ার আগে মা বললেন, "সুধাদির সঙ্গে দেখা করিস।"

সঙ্গে-সঙ্গে অর্জুনের মনে হল এখনই সেনপাড়ার বলাই মিত্তিরের বাড়িতে গেলে হয় ! সুধামাসির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে, সেইসঙ্গে গোরক্ষনাথের ভেলকিও।

সুধামাসি মায়ের বন্ধু। জলপাইগুড়ির অভিজাত পরিবারের বউ। ওঁর একমাত্র মেয়ে এখন আমেরিকায়। স্বামী মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে। এখানে তিনি একাই থাকেন। সুধামাসি বই পড়তে খুব ভালবাসেন। মায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বাবুপাড়া পাঠাগারে। মাকে উনি বলেন অর্জুনকে ওর মতো থাকতে দিতে। বলেছিলেন, "সবাই তো চাকরি করে কিন্তু কেউ-কেউ সত্যসন্ধানী হয়।" সেটা শোনার পর থেকে ভদ্রমহিলাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে অর্জুন।

বাড়ির সামনে পৌঁছে অর্জুন বুঝল জলপাইগুড়ি শহরের অনেকেই খবর জেনে গেছেন। শ'পাঁচেক লোকের ভিড় জমেছে বাড়ির সামনে। উলটোদিকে কিছু ছেলে চিৎকার করে বলছে, "ভূত বলে কিছু নেই ! এসব বুজরুকি, আপনারা বিশ্বাস করবেন না।"

থানার সেকেন্ড অফিসার তাঁর বাহিনী নিয়ে এসে ভিড় সামলাচ্ছেন। অর্জুনকে দেখে বললেন, "এখানে কীসের সন্ধানে ? ভেতরে যাবেন ? যান।"

বাড়ির ভেতরেও লোকজন কম নেই। তবে তাঁরা আত্মীয়বন্ধুজন। অর্জুন দেখল শ্রাদ্ধবাড়িতে যেমন আয়োজন হয় তেমনই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন প্রবীণা মহিলা আসনে বসে আছেন মাথায় ঘোমটা দিয়ে। তাঁর সামনে নিলডাউন হয়ে গোরক্ষনাথ বিড়বিড় করে যাচ্ছে। একসময় গলা খুলল সে, "বাবু, আপনি তো মানুষ ভাল ছিলেন। তা হলে এরকম করছেন কেন ? গিন্নিমা যে কষ্ট পাচ্ছেন বুঝতে পারছেন না ? আমি আপনাকে বলছি পিণ্ড গ্রহণ করে এখান থেকে চলে যান। আপনি হ্যাঁ বলুন। ওই ডালটাকে সরিয়ে দিন। ও, দেবেন না ? বেশ। তবে মনে রাখবেন, খারাপ হতে চাইলে আমার চেয়ে খারাপ কেউ হবে না। অ্যাই কে আছিস ? নিয়ে আয় ওদের।"

বলামাত্র একজন প্রৌঢ় এবং একজন যুবক তিনটে খাঁচা নিয়ে এল। অর্জুন

দেখল খাঁচা তিনটেতে বসে আছে কালো বেড়াল, কানা কাক আর খোঁড়া শকুন। গোরক্ষনাথ বলল, "গিন্নিমা, আপনি বিশ্রামে যান। সন্ধে না হলে কাজ শুরু করা যাবে না। ততক্ষণ এরা পাহারায় থাকুক।"

বৃদ্ধা উঠে ভেতরে চলে যেতেই অর্জুন দেখল সুধামাসি এগিয়ে আসছেন ওর দিকে। সে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার সুধামাসি ?"

সুধামাসি বললেন, "এই, তুই আমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাবি?"

॥ ২ ॥

অবাক হয়ে গেল অর্জুন, "তুমি আমেরিকায় যাবে ?"

"হ্যাঁ রে, এবার না গিয়ে উপায় নেই। জামাইয়ের অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। মেয়ে ফোন করেছিল, অবস্থা ভাল নয়। ওকে সংসার দেখতে হচ্ছে, হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে দু' বেলা। বলল, মা, যদি পারো চলে এসো।" সুধামাসি একদমে কথাগুলো বলে গেলেন।

সুধামাসির মেয়ে বছর দুয়েক আগে এসেছিলেন তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। একদিন দেখাও হয়েছিল। আমেরিকায় যাঁরা থাকেন তাঁদের মতো চেহারা। মায়ের কাছে শুনেছে সে, অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও সুধামাসি দুর্ঘটনার খবরে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, এটা অস্বাভাবিক নয়।

"কীসের দুর্ঘটনা হয়েছে ওঁর ?"

"ফোনে তো মেয়ে কিছুই বলল না। তারপর থেকে আমি স্বস্তি পাচ্ছি না।"

"এখানে এসেছ কেন ?"

"ওই যে শুনলাম, একজন তান্ত্রিক নাকি ভূত তাড়াবে। এসব তো কখনও বিশ্বাস করিনি তাই ভাবলাম নিজের চোখে দেখে আসি। তা সন্ধেবেলার আগে তো কিছু হবে না। এসব থাক, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে। তুই আমার বাড়িতে যাবি ?"

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা পৌঁছে গেল। সুধামাসির বাড়ি অনেকটা জমিজমা গাছগাছালি নিয়ে। মেসোমশাইয়ের বাবা রায়বাহাদুর ছিলেন। প্রচুর সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন তিনি। মেসোমশাই এখানকার কলেজে পড়াতেন। পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। হঠাৎই দু' দিনের অসুখে মারা গিয়েছিলেন তিনি। এখন এত বড় বাড়িতে সুধামাসি থাকেন বিশ্বস্ত কর্মচারীদের নিয়ে। ব্যাঙ্কের সুদ বাবদ যা পান তা এসব খরচ চালানোর পক্ষে পর্যাপ্ত।

বাইরের ঘরে পূর্বপুরুষদের ছবি টাঙানো। দেওয়াল জুড়ে স্মৃতি আর স্মৃতি। পুরনো আমলের সোফায় বসে সুধামাসি বললেন, "আমাকে যেতেই হবে রে! মুশকিল হল, আমি তো একা কখনও কোথাও যাইনি তাই সঙ্গে তুই

pathagar.net

গেলে ভাল হয়।"

"আমার কথা মনে পড়ল কেন?" অর্জুন হাসল।

"তুই তো এর আগে একবার গিয়েছিলি। রাস্তাঘাট চিনিস। তোর মাকে বলেছিলাম, সে বলল তোর সঙ্গে কথা বলবে। এখন তোর হাতে জরুরি কাজ আছে?"

"এই মুহূর্তে নেই।"

"তা হলে চল বাবা। সেরকম হলে আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে আসবি।"

অর্জুন আবার হাসল, "তুমি এমনভাবে বলছ যে, দার্জিলিং মেলে কলকাতায় তোমাকে পৌঁছে দিয়ে সেই সন্ধেবেলায় ট্রেন ধরে ফিরে আসা। কবে যেতে চাও?"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

"কিন্তু তোমার পাশপোর্ট আছে?"

"হ্যাঁ। দু' বছর আগে মেয়ে এসে জোর করে দরখাস্ত করিয়েছিল, মাসতিনেক বাদে ডাকে সেটা এসেছিল। পাশপোর্ট ছাড়া তো যাওয়া যায় না। তুই এখন বল, চেনাজানা কার পাশপোর্ট আছে বুঝব কী করে? তুই গিয়েছিলি বলে জানি তোর আছে।"

অর্জুন বলল, "শোনো, যাব বললেই যাওয়া যাবে না কিছু নিয়মকানুন আছে। কলকাতায় গিয়ে ভিসার জন্যে আবেদন করতে হবে আমেরিকান কনস্যুলেটে। তারপর কবে টিকিট পাওয়া যাবে তার ওপর যাওয়া নির্ভর করছে।"

সুধামাসি মাথা নাড়লেন, "এসব মেয়ে আমাকে ফোনে বলেছে। ওর চেনা একটা অফিস আছে কলকাতায়, যারা সব ব্যবস্থা করে দেবে। আমি নাম-ঠিকানা লিখে রেখেছি। তুই বললে আজকালের মধ্যে এক লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ফেলব।"

"অত টাকা কেন?"

"মেয়ে যে বলল ওইরকম লাগবে।"

"তা হলে ট্র্যাভেলার্স চেকে নিয়ো। আমি মায়ের সঙ্গে কথা বলছি।"

"তোর মা বলেছে তার আপত্তি নেই। আমরা আগামীকালই কলকাতায় রওনা দিই। সেখানে কয়েকদিন থেকে যত তাড়াতাড়ি পারি প্লেনে উঠব। হ্যাঁ?"

"বেশ।"

বাড়িতে ফিরে মাকে সে জিজ্ঞেস করল, "আমেরিকায় যাওয়ার ব্যাপারটা জেনেও তুমি আমাকে কিছু বলোনি কেন?"

মা হাসলেন, "যে যেতে চাইছে তার মুখ থেকে শোনাই তো ভাল। কী

pathagar.net

বলেছিস ?”

“কাল যেতে চাইছেন উনি ।”

“ঠিক আছে ।”

“তুমি একা থাকতে পারবে ?”

“আহা কী কথা ! যখন তুই এখানে-ওখানে যাস তখন কে থাকে আমার সঙ্গে ।”

“বেশ । আমি চেষ্টা করব দিন সাতেকের মধ্যে ঘুরে আসতে ।”

“হ্যাঁ রে, ভূত দেখেছিস ?”

“না । দিনের বেলায় নাকি হবে না, সন্ধের অন্ধকার নামলে তবে ভূত নামবেন ও-বাড়িতে । যতসব বুজরুকি ।”

“তুই কী-কী নিয়ে যাবি বল, সুটকেসে গুছিয়ে রাখব ।”

“তুমি তো জানো । গতবার যা-যা নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই দিয়ো ।”

গোরক্ষনাথ চিৎকার করে মন্ত্র পড়ছিল ।

এখন সন্ধে পেরিয়ে গেছে । বিরাট উঠোনের মাঝখানে আসনে বসে আছে গোরক্ষনাথ । তার সামনে সেই বৃদ্ধা বাবু হয়ে বসে আছেন মাথায় সাদা কাপড়ের ঘোমটা টেনে । নানারকমের শ্রাদ্ধের উপচার ছাড়াও তিন-তিনটি খাঁচা রাখা হয়েছে সামনে । আর ওদের ঘিরে বৃত্তাকারে জমজমাট ভিড় নিশ্চুপ হয়ে রয়েছে । অর্জুন সেই ভিড়ের সামনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে গোরক্ষনাথকে লক্ষ করছিল ।

মন্ত্র পড়া আচমকা থামিয়ে গোরক্ষনাথ বলল, “মানুষের চেয়ে আত্মারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান হয় । মানুষ নিজেকে লুকোতে পারে না কিন্তু আত্মা পারে, এটাই ওদের সুবিধে । কিন্তু মা, আপনার স্বামী ছিলেন বিষয়ী মানুষ । মারা যাওয়ার পরেও তিনি বিষয়ের মায়া ত্যাগ করতে পারছেন না । আমরা যে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেছি এখানে, এটা তাঁর সহ্য হচ্ছে না বলে তিনি দূরে-দূরে আছেন এখন । কিন্তু তাঁকে আসতেই হবে । আর তিনি এলে তাঁকে দেখতে পাবে ওরা । ওই কালো বেড়াল, কানা কাক আর খোঁড়া শকুন । ফাঁকি দিতে পারবে না ।”

এবার অর্জুন কথা বলল, “কিন্তু কাক শুনেছি কানাই হয় ।”

গোরক্ষনাথ মুখ ঘুরিয়ে অর্জুনকে দেখে হাসল, “ও, আপনি এসে গিয়েছেন । ভালই হল, ভগবানে যারা বিশ্বাস করেন ভূতে তাদের অবিশ্বাস হবে কেন ? হ্যাঁ, আপনি যা শুনেছেন তা অর্ধসত্য । কাক একসঙ্গে দু' চোখে দেখতে পায় না বলে মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দ্যাখে । এ-চোখ যখন দ্যাখে তখন অন্য চোখ দৃষ্টিরহিত হয়ে যায় । কিন্তু এই কাকটি সত্যিকারের কানা । কানা বলে ওর দৃষ্টিশক্তি বেশি । অত দূরে কেন, আপনি এখানে আসুন না !”

"না, ঠিক আছি।"

গোরক্ষনাথ বলল, "এবার এখানকার সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হোক।"

সঙ্গে-সঙ্গে উঠোন, বারান্দা এবং ঘরগুলোর আলো কেউ নিভিয়ে দিল। গোরক্ষনাথ বলল, "মা, আপনার সামনে কলাপাতায় পিণ্ড রাখা আছে। তুলে নিন, পেয়েছেন?"

মহিলার নিচু গলা শোনা গেল, "হ্যাঁ।"

"বেশ! আমি বলামাত্র ওই পিণ্ড সামনে ফেলে দেবেন।" তারপরেই তার গলা থেকে সংস্কৃত শব্দ বের হতে লাগল। অর্জুন যার বাংলা করল এভাবে, "হে প্রেত, তুমি অশান্ত। তোমার এই অতীত বাড়িতে ফিরে আসছ যে টানে তা অবাস্তব। তোমার আবির্ভাব এখানে কাম্য নয়।"

অর্জুন দেখল অন্ধকারে বেড়ালের চোখ জ্বলছে। হঠাৎ কাকের ডাক শোনা গেল এবং সেইসঙ্গে পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ। সেটা যে শকুন করছে তা অনুমান করা গেল। গোরক্ষনাথ চিৎকার করে উঠল, "আমি জানি তুমি এখানে উপস্থিত হয়েছ। ওই কালো বেড়াল, কানা কাক আর খোঁড়া শকুন নিশ্চয়ই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে। তুমি ধরা পড়ে গিয়েছ। অতএব হে প্রেত, এই পিণ্ড গ্রহণ করে তুমি বাসনামুক্ত হয়ে যাও। মা, পিণ্ডটা ফেলুন এবারে।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর গোরক্ষনাথ হাঁকল, "কে আছ, আলো জ্বালো।"

দপ্ করে চারপাশ আলোকিত হতে দেখা গেল বৃদ্ধা উপুড় হয়ে রয়েছেন। নিজের আসনে খাড়া হয়ে বসে আছে গোরক্ষনাথ। অর্জুন দেখল, বেড়াল অথবা শকুন এখন শান্ত হয়ে থাকলেও কাকটা কাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

গোরক্ষনাথ আসন ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে দেখল মাটিতে পড়ে থাকা চালকলার পিণ্ডটিকে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করল কিছু।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"অতি শয়তান প্রেত। পিণ্ড গ্রহণ করেনি।"

"কী করে করবে? আপনি সংস্কৃতে যা বলছিলেন তা ওর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়? বেঁচে থাকতে সাধারণ বাঙালির মতো সংস্কৃত বুঝতে উনিও নিশ্চয়ই পারতেন না।"

"আপনি রসিকতা করছেন বাবু?"

"মোটেই না। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন আমি সত্য বলছি।" অর্জুন বলল, "আগে লোকে সংস্কৃত পড়ত, তাদের প্রেতরা তাই মন্ত্র বুঝতে পারত।"

গোরক্ষনাথ কাত হয়ে পড়ে থাকা কাকটাকে দেখাল, "ওর এই অবস্থা কী করে হল?"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে কাকটাকে দেখল। ঘাড় মটকে গিয়েছে।

গোরক্ষনাথ বলল, "এ প্রেত স্বাভাবিক প্রেত নয়। আজ কাকের ওপর ওর

ক্রোধ মিটিয়েছে। কিন্তু এখানেই আছে সে।" বলামাত্র একটা ঝাঁটা তুলে নিয়ে গোরক্ষনাথ বারংবার মাটিতে মারতে লাগল, সেইসঙ্গে বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ চলল। হয়তো সেই ঝাঁটার শব্দেই খাঁচায় বসা শকুনটা নড়েচড়ে উঠল। বারংবার ন্যাড়ামাথা ঘোরাতে লাগল। গোরক্ষনাথ ছুটে গেল। চিৎকার করে বলল, "খবরদার। ওর গায়ে হাত দিলে তোর সর্বনাশ হয়ে যাবে।" হাতের ঝাঁটা দিয়ে একটা জায়গায় দ্রুত বৃত্ত আঁকল যেন গোরক্ষনাথ। তারপর বলল, "থাক এখানে বন্দি হয়ে।"

গোরক্ষনাথকে এখন কিছুটা প্রসন্ন দেখাল। চিৎকার করে বলল, "আপনারা এখন চলে যান। আত্মা বন্দি হয়ে আছে। ছাড়া পেয়ে গেলে আপনাদের ক্ষতি করতে পারে। যান আপনারা।" সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম করে মানুষজন পালাতে আরম্ভ করল। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বাড়ি ফাঁকা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ওঁর আত্মাটাকে বন্দি করেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কিন্তু ওখানে আত্মা আছে তা বুঝব কী করে ?"

একটা মাটির পাত্র থেকে কালো তিল মুঠোয় নিয়ে সেই জায়গাটায় ছুড়ে-ছুড়ে মারতে লাগল গোরক্ষনাথ, "কী, চলে যাবি ? আর আসবি না তো ? কথা দিচ্ছিস ? বেশ, যাওয়ার আগে ওই পিণ্ডর দলাটাকে ভেঙে দিয়ে যা।" ঝাঁটা নিয়ে উলটোদিক থেকে বৃত্ত আঁকল গোরক্ষনাথ। তারপর একদৃষ্টিতে তাকাল মাটিতে পড়ে থাকা চালকলার পিণ্ডটির দিকে। গোরক্ষনাথের মুখে হাসি ফুটল, "দেখুন বাবু, ওটা ভেঙে দিয়ে গেল।" বলে আর দাঁড়াল না গোরক্ষনাথ। উঠোন পেরিয়ে পাশের একটা ঘরে ঢুকে গেল।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে পিণ্ডটাকে দেখল। সত্যি চিড় ধরেছে মাঝখান থেকে। কিন্তু এই চিড়টা যে আগে থেকে ছিল না তার কোনও প্রমাণ নেই। মাটিতে পড়ে থাকতে-থাকতে অনেকসময় আপনা থেকেই চিড় ধরতে পারে। সে কাকের খাঁচাটার কাছে গেল। ঘাড় ভেঙে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

বৃদ্ধাকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হল। চোখের সামনে যা ঘটে গেল তার সত্যতা অস্বীকার করে লাভ নেই। প্রেত এসে কাকের গলা টিপে মেরেছে এ খবরটা চাউর হবেই। অর্জুন বারান্দায় উঠে যে ঘরে গোরক্ষনাথ ঢুকেছিল সেখানে গেল। মেঝের ওপর পাটি পেতে গোরক্ষনাথ শুয়ে পড়েছে এর মধ্যে। অর্জুন পাশের তক্তপোশে বসল, "প্রেত আছে কিনা তা প্রমাণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আজ এখানে প্রেত আসেনি।"

"আপনি বললে তো হবে না, সবাই দেখেছে।" গোরক্ষনাথ হাসল।

পকেট থেকে সাপের লকেটটা বের করল অর্জুন। সামনে ধরে বলল, "এ জিনিস মাটির নীচে পোঁতা থাকলে যদি বাড়িতে কোনও অশুভ ব্যাপার না ঘটে তা হলে মাটির ওপর পকেটে থাকলে কোনও প্রেতের আসা উচিত নয়। তাই

না ?”

গোরক্ষনাথের চোখ জ্বলে উঠল। তড়বড়িয়ে উঠে বসে বলল, “এ কী ! এ জিনিস আপনি কোথায় পেলেন ?”

“আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দিন।”

লকেটটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে গোরক্ষনাথ বলল, “হ্যাঁ, সেই জিনিস। পৃথিবীতে মাত্র দুটো আছে। একটা আমার গুরু আমাকে দিয়েছিলেন। বড়বাবুর মঙ্গলের জন্যে আমি তাঁর বাড়ি বেঁধে রেখেছিলাম একে দিয়ে। আপনি মাটি খুঁড়েছেন বাবু ?”

“আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।”

গোরক্ষনাথের মাথা নেমে গেল, “হ্যাঁ, আজ আমাকে অভিনয় করতে হয়েছিল। কিন্তু এ-বাড়ির কাছেই সেই দুষ্ট আত্মা আছে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে না আনতে পেরে মানুষকে বোঝাতে অভিনয় করতে হয়েছিল আমাকে।”

“আপনার ডান হাত তুলুন তো !”

গোরক্ষনাথ তার হাত তুলতেই বোঝা গেল রক্ত শুকিয়ে রয়েছে আঙুলে। গোরক্ষনাথ বলল, “আপনি ঠিকই ধরেছেন, কাকটাকে আমিই মেরেছি। না মারলে লোকে বিশ্বাস করত না। এখন বুঝতে পারছি ওই লকেটটার জন্যে প্রেত এই বাড়িতে পা দেয়নি। ওটা আমাকে দিন।”

“কেন ?”

“ওটা আমার জিনিস। ভয়ঙ্কর জিনিস। মাটিতে পোঁতা না থাকলে প্রচণ্ড ক্ষতি হয়ে যাবে। অস্তিমুনির ক্রোধ ধ্বংস করে দেবে আপনাকে।”

“আবার গল্প শোনাচ্ছেন ?”

“না বাবু। নীলার কথা শোনেননি ? অনেকের সহ্য হয় না, ধ্বংস হয়ে যায় !”

“দেখা যাক। আপনি তো মাটির তলায় পুঁতে দিয়েছিলেন, আপনার আর কোনও দাবি থাকতে পারে না। এখন বলুন তো, এটা কে বানিয়েছিল ?”

গোরক্ষনাথ বলল, “আমার গুরুদেব আমাকে মারা যাওয়ার আগে দিয়েছিলেন। তিনি যৌবনে জাহাজে চাকরি করতেন। আফ্রিকার এক বন্দরে কীভাবে জানি না ওটা ওঁর হাতে আসে। খবরটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় একদল আফ্রিকার মানুষ ওঁর পেছনে ধাওয়া করে জিনিসটা ফেরত নেওয়ার জন্যে। গুরুদেব জাহাজে ফিরে এসে রক্ষা পান। পথে জাহাজ ঝড়ের মুখে পড়ে। জাহাজডুবি হয়। একটা কাঠ আঁকড়ে তিনদিন ভেসে থাকার পর অন্য জাহাজের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে। সেই ভেসে থাকার সময় গুরুদেবের শরীর যখন অসাড়, জ্ঞান লোপ পেয়ে যাচ্ছে, তখন তিনি অনুভব করতেন একটা বিশাল সাপ তাঁর আঁকড়ে থাকা কাঠটাকে ভাসিয়ে রাখছে। সেই থেকে

উনি প্রতিদিন ওই লকেটটাকে নিয়ম করে দুধকলা ভোগ দিতেন। আমাকে তিনি বলেছিলেন, নিয়মের ব্যতিক্রম যেন না হয়। হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে অনেক ভোগ দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখতে। আমি তাই করেছিলাম। দিন বাবু!"

"দিতে পারি। কিন্তু আপনাকে এটা দিলে আমি সবাইকে ডেকে বলব কাকটাকে আপনি মেরেছেন, কোনও প্রেত যে আসেনি তা আপনিই স্বীকার করেছেন!"

"না বাবু! দয়া করে অমন কাজ করবেন না। এ বাড়ির চারপাশে প্রেত আছে। আমি আজ সামান্য ছলনার আশ্রয় নিয়েছি ঠিক, কিন্তু—।"

"আমি চললাম।" অর্জুন দরজার দিকে এগোল।

গোরক্ষনাথ ককিয়ে উঠল, "যাবেন না বাবু। ওটা সঙ্গে রাখলে আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে। ভয়ঙ্কর জাগ্রত সর্পদেবতা।"

অর্জুন বেরিয়ে এসে তার বাইকে চাপল।

দার্জিলিং মেল ঠিক সময়েই শেয়ালদায় পৌঁছেছিল। সূর্য সেন স্ট্রিটের একটা হোটেলে ওরা দুটো ঘর ভাড়া করল। স্নান-খাওয়া শেষ করে সুধামাসির পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে অর্জুন চলে এল থিয়েটার রোডে। এর আগে কলকাতায় কিছুটা পরিচিত হয়েছিল রাস্তাঘাটের সঙ্গে। কিন্তু ভিড় বাসে উঠতে একদম ইচ্ছে করে না ওর। ফলে ট্যাক্সি নিয়েছিল সে। সুধামাসির মেয়ে যে কোম্পানির নাম ফোনে বলেছিলেন তা তিনি লিখে রেখেছিলেন। নাম্বার মিলিয়ে সে যে অফিসটিতে পৌঁছল সেটি একতলায়। লম্বা ঘরের দু' পাশে মানুষজন কাজ করছেন। ঘরের একপ্রান্তে বড় টেবিলের ওপাশে সৌম্যদর্শন এক প্রৌঢ় বসে আছেন। অর্জুনকে দেখে হেসে বললেন, "বলুন!"

"মিস্টার লাহিড়ী একটু বেরিয়েছেন, আমিই শিবাজি সিন্‌হা। কোত্থেকে আসছেন?"

"জলপাইগুড়ি থেকে।" অর্জুন বলল, "আমরা আমেরিকায় যেতে চাই।"

"খুব ভাল কথা। পাশপোর্ট এনেছেন?"

"হ্যাঁ।" এই সময় লম্বা ছিপছিপে এক ভদ্রলোক ঢুকতেই শিবাজি সিন্‌হা বললেন, "এই যে অরূপ এসে গেছে। অরূপ দ্যাখো তো।"

নিজের চেয়ারে বসে অরূপ লাহিড়ী বললেন, "বলুন ভাই।"

অর্জুন বলল, "আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। আমেরিকায় যেতে চাই।"

"আমরা মানে?"

"আমি আর একজন বয়স্কা মহিলা।"

অরূপ লাহিড়ী অর্জুনের মুখের দিকে তাকালেন একটু, তারপর হাত

বাড়ালেন, "দিন, পাশপোর্টটা দেখি।" অর্জুন দুটো পাশপোর্ট টেবিলে রাখল।

সুধামাসিরটা দেখার পর দ্বিতীয়টা হাতে নিয়ে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে অরূপ লাহিড়ী বললেন, "এবার কী হবে ? ম্যানহাটনে হানটান ?"

"তার মানে ?"

"আরে ভাই, আপনি তো সেই অর্জুন ? লাইটারের অর্জুন ? আপনার কথা অনেক শুনেছি আমি। এই চা দাও এখানে। বিখ্যাত লোকদের কেন যে তোমরা বুঝতে পারো না।" হাতে হাত মেলালেন অরূপ লাহিড়ী।

॥ ৩ ॥

অবিশ্বাস্য দ্রুততায় কাজ শুরু হয়ে গেল। পার্ক স্ট্রিটের একটা ফোটোর দোকান থেকে বিশেষ সাইজের ছবি তুলতে হল আমেরিকার ভিসার জন্যে। সুধামাসিকে নিয়ে সকাল ন'টার মধ্যে আমেরিকান কনসুলেটে হাজির হয়ে অর্জুন দেখল, অরূপ লাহিড়ী নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। কথা ছিল ওঁদের কোনও কর্মচারী অর্জুনদের সাহায্য করতে আসবেন।

সুধামাসির সঙ্গে পরিচিত হয়ে অরূপ লাহিড়ী বললেন, "একটা কথা বলা হয়নি, আমেরিকানরা ওদের দেশে অবিবাহিতদের যেতে দিতে আদৌ ইচ্ছুক নয়। একলা কোনও মানুষ ওদেশে গেলে ওখানেই থেকে যাবে বলে ওদের খুব ভয়।"

"সে কী ! খামোকা থাকতে যাবে কেন ?"

"পৃথিবীর গরিব দেশগুলোর প্রচুর মানুষ মনে করে ওদের দেশে যেতে পারলে একটা-না-একটা কাজ ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। এই কারণে ভিসা দেওয়ার ব্যাপারে এখন কড়াকড়ি আরম্ভ হয়েছে। ওরা নিজেদের দেশের জনসংখ্যা বাড়াতে চায় না।"

সুধামাসি বললেন, "আমরা কেন থাকতে যাব ? জামাইকে দেখতে ক'দিনের জন্যে যাচ্ছি। এখানে আমাদের সবকিছু ফেলে ওখানে থাকতে যাব কেন ?"

অরূপ লাহিড়ী বললেন, "সেটাই ওঁদের বোঝাতে হবে। অর্জুনবাবুর তো বিয়ে হয়নি, তাই তো ? আপনি বলেছেন চাকরিবাকরি করেন না। আপনার প্রফেশন সার্টিফাই করবে এমন কোনও কাগজ কাছে আছে ?"

অর্জুন মাথা নেড়ে না বলল।

"তা হলে কিন্তু আপনি ওদের চোখে অবিবাহিত বেকার। এমনিতে এক্ষেত্রে ভিসা ওরা দেবে না। তবে আপনার পাশপোর্টে আমেরিকান ইমিগ্রেশনের ছাপ আছে। ওটা প্রমাণ করছে আপনি ওদের দেশে গিয়েছিলেন এবং ফিরেও এসেছেন।"

"ও তো আমাকে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে !" সুধামাসি বললেন।

"সেটাই ওদের বোঝাতে হবে।"

"তা যদি বলো, আমিও তো কাজকর্ম করি না।"

"হ্যাঁ। মেসোমশাই যখন জীবিত নন তখন কোনও পিছুটান নেই যে এদেশে ফিরে আসবেন। ওরা বলতেই পারে এ-কথা। আপনার যেসব বিষয়সম্পত্তি আছে তার বিশদ বিবরণ দাখিল করলে ওরা ভাবতে পারে আপনি ফিরে আসবেন।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তা হলে কী হবে? আমরা তো সত্যি ওদেশে থাকতে বা বেড়াতে যাচ্ছি না। প্রয়োজনটা যে জরুরি তাতে তো সন্দেহ নেই!"

"না নেই। গতকাল বিকেলে আমি আপনার মেয়েকে ফোন করেছিলাম। ওঁকে বলেছিলাম দুর্ঘটনার কথা লিখে আপনাকে এবং অর্জুনবাবুকে অবিলম্বে ওখানে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানিয়ে ফ্যাক্স করতে। আজ সকালে সেই ফ্যাক্স এসে গেছে। বলুন, এই ফ্যাক্স নিশ্চয়ই কাজে দেবে।"

অরূপবাবু নিজে উদ্যোগী হয়ে ফ্যাক্স না আনালে সত্যি ভিসা পেতে অসুবিধে হত। ভিসা অফিসার প্রথমে আপত্তি তুলেছিলেন। শেষপর্যন্ত ফ্যাক্সটি নিয়ে ভেতরে গিয়ে মিনিট দশেক ওদের অপেক্ষায় রেখে বলেছিলেন ভিসার টাকা জমা দিতে। বিকেলবেলায় পাশপোর্ট ফেরত দেওয়া হবে ভিসার ছাপ মেরে।

সেদিনই দমদম থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের প্লেনে উঠে বসল ওরা। এত দ্রুত সবকিছু হয়ে গেল যাঁর জন্য তাঁকে সুধামাসি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বেল্ট বাঁধার পর সুধামাসি বললেন, "আমার খুব ভয় করছে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"আমি এর আগে কখনও প্লেনে উঠিনি।"

"দার্জিলিং মেলে বসে থাকলে যতটা বিপদ হতে পারে এখানে তার থেকে বেশি বিপদ হবে না সুধামাসি। আমি তো পাশে আছি।"

সুধামাসি হেসে ফেললেন।

"হাসলে যে!"

"রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতার কথা মনে পড়ল।"

অর্জুন হাসল। সত্যি, এখন আকাশে প্লেন বিপদে পড়লে তার কিছু করার নেই। অথচ কী সহজে সে সুধামাসিকে বলল, আমি তো পাশে আছি। অর্জুন চারপাশে তাকাল। এই প্লেন সরাসরি কলকাতা থেকে ছাড়ে বলে যাত্রীদের অনেকেই বাঙালি। মাসিমা বসেছেন জানলার ধারে, ও তাঁর পাশে। তারপরেই যাতায়াতের পথ, পথের পাশের সিটে থান পরা একজন মহিলা চোখ বন্ধ করে আছেন। অর্জুনের মনে হল, ইনিও ভয় পেয়েছেন। অর্জুন একটু ঝুঁকে বলল, "কোনও অসুবিধে হচ্ছে?"

বিধবা মহিলা খিঁচিয়ে উঠলেন, "দেখছে আহ্নিক করছি, তবু ঝামেলা।"

অর্জুন সোজা হয়ে বসল।

প্লেন যখন তিরিশ হাজার ফুট উঁচুতে তখন অর্জুন টয়লেটে গেল। সে লক্ষ করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের হোস্টেসরা সবাই বেশ লম্বা, সুন্দরী এবং প্রত্যেকের মুখে হাসি লেগে রয়েছে। গতবার আমেরিকা থেকে ফেরার সময় কিছুদিন মেজরের সঙ্গে লন্ডনে এবং আশেপাশে চমৎকার কেটেছিল তার। মেজর এখন কি আমেরিকায় আছেন? বিষ্টু সাহেব? অর্জুনের হঠাৎ মনে হল, বিদেশবিভুঁই নয়, সে পরিচিত মানুষদের কাছেই বেড়াতে যাচ্ছে। সিটে ফিরে এসে সে দেখল ইতিমধ্যেই এয়ারহোস্টেসরা ট্রলি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে খাবার পরিবেশন করতে। অরূপ লাহিড়ী টিকিট করার সময় বলে দিয়েছিলেন সুধামাসির জন্যে নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করতে। ওরা তাই দিল। পাশের বিধবা মহিলা কিন্তু খাবার নিলেন না। বাঁ হাত নেড়ে না বলে দিলেন নিঃশব্দে। খাওয়া শেষ করার পর অভিনব কাণ্ডটি দেখল অর্জুন। বিধবা মহিলা তাঁর ব্যাগ খুলে একটা বড় কৌটো বের করলেন। কৌটো খুলতেই দেখা গেল তাতে লুচি এবং আলুর ছেঁচকি এবং সন্দেশ রয়েছে। তৃপ্তমুখে তিনি সেগুলো খেতে লাগলেন। ট্রেনে এই দৃশ্য খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু প্লেনে কেউ বাড়ির খাবার নিয়ে ওঠে কিনা অর্জুন জানে না। বিধবা মহিলার খাবার দেখে ওঁর ডানপাশে বসা বিদেশিনী ঝুঁকে কিছু বলতেই তিনি সিঁটিয়ে এপাশে সরে এলেন। অর্জুন মন্তব্য শুনল, "শান্তিতে খেতেও দেবে না। ভিখিরির দেশ নাকি?"

হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে সুধামাসি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের জিনিসপত্র?"

অর্জুন বলল, "চিন্তা কোরো না। ওগুলো নিউ ইয়র্কে সোজা চলে যাবে। আমরা ওখানে গেলে পেয়ে যাব।" হাঁটতে-হাঁটতে অন্য যাত্রীদের সঙ্গে ওরা যখন ট্রানজিট লাউঞ্জের দিকে এগোচ্ছে তখন বিধবা মহিলা অন্য রাস্তা ধরলেন। অর্জুন বুঝতে পারল উনি লন্ডনেই থেকে যাবেন এবং এই পথে আসা-যাওয়ার অভ্যেস আছে। একটাও ইংরেজি শব্দ না জেনেও বাঙালি বিধবা মহিলারা কীরকম বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আজকাল।

ডিউটি ফ্রি দোকানগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সুধামাসি জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁ রে, আমরা তা হলে বিলেতের মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছি?"

অর্জুন হাসল, "মাটি এখান থেকে অনেক নীচে। বিলেতের এয়ারপোর্টে বলো।"

"তোর মেসোমশাই কলেজে পড়ার সময় এখানে এসেছিলেন। সে কতদিন আগের কথা। আমাকে তখনকার গল্প করতেন। টেম্‌স না কী একটা নদী আছে এখানে?"

"টেম্‌স।"

বিশাল কাচের দেওয়ালের ওপাশে দেখা যাচ্ছে অনেক প্লেন দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ সুধামাসি প্রশ্ন করলেন, "সিরাজের সময় তো প্লেন ছিল না, সমুদ্র বেয়ে যেতে হত। কতদিন লাগত কলকাতায় যেতে?"

"দু' মাসের ওপর।"

"তখনকার একটা জাহাজে কত লোক ধরত?"

"ঠিক বলতে পারব না। তবে পাঁচ-সাতশো হবে।"

"এখান থেকে ইংরেজরা অতদূরে গিয়ে আমাদের দেশ দখল করল কী করে রে? আমি ভাবতেই পারছি না। সমুদ্রে অতদিন থাকলে কত বিপদের সামনে পড়তে হয়। নিশ্চয়ই শ'য়ে-শ'য়ে জাহাজ গিয়েছিল।"

"না সুধামাসি। সরকারি সৈন্যরা তো যায়নি, গিয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকজন। তাদের জাহাজের সংখ্যাও খুব বেশি হওয়ার কথা নয়।"

"তা হলে? সিরাজের তো অনেক সৈন্য ছিল, সমুদ্রযাত্রা করে ইংরেজরা নিশ্চয়ই কাহিল ছিল, তবু তারা জিতে গেল কী করে?"

"মিরজাফরদের জন্যে। ভারতবর্ষে চিরকাল একদল মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। কিন্তু এসব অতীতের কথা। এখনকার ইংরেজদের অতশত মনেও নেই। কিন্তু লন্ডন শহরে গেলে তোমার মনে হবে তুমি ভারতবর্ষের কোনও বড় শহরে আছ।"

"কেন?"

"সব চেনা-চেনা লাগবে। ডাব্‌লডেকার বাস, রাস্তার নামগুলো। এমনকী শেক্‌সপিয়রের বাড়ি, ডিকেন্সের বাড়ির কথা বইয়ে এত পড়েছে সবাই যে, অচেনা বলে মনে হবে না। রাস্তায় চলার নিয়মগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের কোনও পার্থক্য নেই। আমেরিকায় আবার সব উলটো। ইংরেজরা যা-যা করে, ওরা তার উলটো করে। এমনকী সুইচ টিপে যে আলো জ্বালানো হয় তার পদ্ধতিও বিপরীত করে রেখেছে ওরা। কিন্তু আমাদের সবকিছু ব্রিটিশরা নিজেদের মতো তৈরি করেছে বলে লন্ডনে এলে ভারতীয়দের কোনও অসুবিধে হয় না।"

সুধামাসি বললেন, "না বাবা। ছেলেবেলা থেকে জেনে আসছি ইংরেজরা আমাদের শত্রু। ক্ষুদিরামকে ফাঁসি দিয়েছিল, সুভাষ বোসকে বন্দি করে রেখেছিল, কত বিপ্লবীকে মেরে ফেলেছে।"

অর্জুন হেসে ফেলল।

"অ্যাই, হাসছিস কেন?"

"তোমার শ্বশুরমশাই ছিলেন ইংরেজ আমলের রায়বাহাদুর।"

"তো কী হয়েছে?"

"কে না জানে, ইংরেজরা কোনও শিক্ষিত ভারতীয়দের ওপর সন্তুষ্ট হলেই রায়বাহাদুর উপাধি দিত। তা সন্তুষ্ট কেন হত ?"

সুধামাসির মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, "এইজন্যেই তো তোর মেসোমশাই-এর সঙ্গে তাঁর বাবার কোনও মিল ছিল না। নিজের বাবাকে তিনি একটুও পছন্দ করতেন না। মায়ের জন্যে তিনি বাড়ি ছেড়ে যেতে পারেননি। জলপাইগুড়ির কলেজে চাকরি নিয়ে নিজের মতো ছিলেন। বলতেন, রায়বাহাদুরের ছেলে বলে ভাবতেই লজ্জা লাগে। শুধু ভাবতেনই না, বিশ্বাসও করতেন।"

হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে ঘণ্টা পাঁচেক কাটাতে হবে। সুধামাসিকে টয়লেটে পাঠিয়ে অর্জুন সিগারেট ধরাল। রোজই ভাবে এই সিগারেট খাওয়া বন্ধ করে দেবে। যাকে বলে নিয়মিত খাওয়া তা সে খায় না। কিন্তু হঠাৎ কোনও অলস মুহূর্তে মনে হয় একটা ধরাই। ঠিক নয়। আমেরিকায় গিয়ে সে একটাও সিগারেট খাবে না বলে ঠিক করল। পৃথিবীর সব ডাক্তাররা যখন বলছেন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর তখন তা অমান্য করা আর আগুনে আঙুল দেওয়া একই ব্যাপার।

চেয়ারে বসে অর্জুনের মনে হল এ-যাত্রায় কোনও উত্তেজক কিছু ঘটবে না। শুধু যাওয়া-আসা, সুধামাসির কথা রাখা। মা বলেন, "তোর কপালে সবসময় কোনও না কোনও গেরো লেগেই থাকে, না ? তুই কোথাও বেড়াতে গেলেও ঠিক কেউ সেখানে বদমায়েশি করে বসে।" এবার বাড়ি থেকে বেরোবার সময় সে ঠাট্টা করে বলেছিল, "তোমার কোনও চিন্তা নেই। এবারের যাত্রা একেবারে নিরামিষ।"

মা বলেছিলেন, "দ্যাখো। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান কোটে। দ্যাখো, কোথা থেকে কী হয়ে যায়। তবে দয়া করে জড়িয়ো না।"

হিথ্‌রো এয়ারপোর্টের চেয়ারে বসে অর্জুন মনে-মনে বলল, "তেমন হলে তো ভালই হত। কিন্তু মনে হচ্ছে এবারের যাত্রা নেহাতই আলুনি হবে।"

সুধামাসি ফিরে এলে অর্জুন গেল পরিষ্কার হতে। পুরুষদের টয়লেটে লজ্জার বালাই বেশ কম। যারা কমোডে বসেছে তাদের জুতো পা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে। বেসিনগুলোর সামনে নানা দেশের মানুষ। পরিষ্কার হওয়ার পর চুল আঁচড়ে আয়নায় নিজেকে দেখতে গিয়ে অর্জুনের চোখে পড়ল পাশের বেসিনের কলে সন্তর্পণে দাঁত ধুচ্ছে একটা লোক। বাঁধানো দাঁতের পাটি এর আগেও দেখেছে সে। রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে পরিষ্কার করা হয়। এই লোকটির সেই সুযোগ না থাকায় কলের জলেই ধুয়ে নিচ্ছে। হঠাৎ অর্জুনের চোখে পড়ল ধোয়ার সময় দাঁতের ভেতরের দিকে টুক করে সাদা রঙের কিছু আটকে ফেলল লোকটা। লম্বা লেবুর কোয়ার মতো বেঁকানো জিনিসটা কি প্লাস্টিকের তৈরি ? লাগিয়েই মুখে পুরে ফেলে হাঁ করে দাঁতটা ঠিক বসেছে কিনা আয়নায় দেখল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে গরম বাতাস

বেরনো মেশিনের নীচে হাত রেখে শুকিয়ে নিল। অর্জুন লোকটাকে দেখল। গায়ের চামড়া সাদা, রুমালে মুখ মুছে বেরিয়ে এল লোকটা।

অর্জুনও ওর পেছনে চলে এল। লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে অর্জুনকে দেখল, দেখে হাসল, "পাকিস্তানি ?"

"নো। ইন্ডিয়ান।"

"আ, ইন্ডিয়ান। গুড। হোয়ার আর ইউ গোয়িং ?"

"আমেরিকা।"

"আ। মি ট্র। টুরিস্ট ?"

"ইয়েস।"

"আই স্টে দেয়ার।"

লোকটার গলার স্বর জড়ানো। উচ্চারণে জড়তা আছে। এমনিতে বেশ হাসিখুশি কিন্তু ও যে দাঁতের ভেতর কিছু লুকিয়েছে তাতে অর্জুনের কোনও সন্দেহ নেই। লোকটা চলে যেতেই অর্জুন ফিরে এল সুধামাসির কাছে। সুধামাসি বললেন, "কী চমৎকার বানিয়েছে রে। দোকানগুলোতে কতরকমের জিনিস, কিন্তু বড্ড বেশি দাম।"

"কিছু খাবে ?"

"পাগল। প্লেনে যা খাইয়েছে তাতে গলা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"এখানে যারা আছে তাদের কেউ লন্ডনে যাবে না ?"

"না। এটাকে বলে ট্রানজিট লাউঞ্জ। যে যার গন্তব্যে যাওয়ার জন্যে প্লেন ধরবে এখান থেকে। তাই এখানে নামলে বিলিতি ভিসার দরকার হয় না।" অর্জুন কথা শেষ করতেই রোগামতো এক মহিলা সামনে এসে দাঁড়ালেন। মহিলার বয়স বেশি নয়, দেখলেই রাগী মেমসাহেব বলে বোঝা যায়।

"এক্সকিউজ মি জেন্টলম্যান। ইওর পাশপোর্ট প্লিজ !" হাত বাড়ালেন মহিলা। সেইসঙ্গে নিজের আইডেনটিটি কার্ড দেখালেন তিনি। ঝটপট কিছুই পড়তে পারল না অর্জুন। সে পাশপোর্ট বের করে মহিলার হাতে দিল। তিনি কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "ওই লোকটিকে কী করে চিনলেন ?"

অবাক হয়ে গেল অর্জুন, "কোন লোকটি ?"

"যার সঙ্গে টয়লেট থেকে বেরিয়ে কথা বলছিলেন !"

"ও। ওকে আগে আমি চিনতাম না। টয়লেটেই প্রথম দেখি।"

"কী বলল লোকটা ?"

"এমনি, সাধারণ কথাবার্তা। কোত্থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছি, এইসব।"

"আর ইউ শিওর, ওকে আগে কখনও দ্যাখেননি ?"

"না। কিন্তু কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন জানতে পারি ?"

ভদ্রমহিলা এবার হাসলেন, "তেমন কিছু নয়। ইনি আপনার সঙ্গে

আছেন ?”

“হ্যাঁ। ইনি আমার মাসিমা।”

ভদ্রমহিলা সুধামাসির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন ঈষৎ হেসে। তারপর বললেন, “অজানা লোকের সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভাল, বিশেষ করে যারা গায়ে পড়ে ভাব জমাতে আসে। ওয়েল !” মাথা নাড়লেন মহিলা, “এইসব কথা আর কাউকে না বললেই ভাল করবেন।” ভদ্রমহিলা চলে গেলেন।

ইংরেজিতে কথা হলেও সুধামাসি কিছু-কিছু বুঝতে পারছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “কে রে ? কার সঙ্গে কথা বলেছিস ?”

“একটা লোক আমাকে জিজ্ঞেস করছিল আমি পাকিস্তানি কি না !”

“তাতে দোষ কী হল ? এ কি মেয়ে-পুলিশ ?”

“ওইরকমই কেউ হবে।”

সময় কাটতে চায় না। সুধামাসিকে বসিয়ে রেখে অর্জুন সামনের দোকানে ঢুকল। কাচের দেওয়ালে আলো পড়ায়, ঝকঝক করছে। একদিকে চকোলেটের এগজিবিশন, অন্যদিকে নানান ধরনের সিগারেটের কার্টুন আর মদের বোতল।

এ-দোকান থেকে ও-দোকানে ঘুরতে-ঘুরতে একটা কফিশপে চলে এল সে। কফিশপ হলেও কোল্ড ড্রিঙ্কস বিক্রি হচ্ছে। সে জানল এক কাপ কফির দাম এখানে দেড় পাউন্ড। তার মানে ভারতীয় টাকায় প্রায় চুরাশি টাকা। দোকানে ঢুকে না কিনে বেরিয়ে যেতে সঙ্কোচ হচ্ছিল। কলকাতা থেকে আসার সময় সুধামাসির টাকায় কিছু ডলার দু'জনের নামে কিনে দিয়েছিলেন অরূপ লাহিড়ী। দাঁত মাজার পর চা বা কফি না খেলে খারাপ লাগে। অর্জুন এককাপ কফি নিয়ে চুমুক দিতেই শুনল, “হাই !”

সে দেখল ওই লোকটি হাত নেড়ে কাছে এল, “কফি ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “ইয়েস। ডু ইউ লাইক ইট ?” ইচ্ছে করেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“ওঃ, নো নো। নো হট ড্রিঙ্ক ! সরি !” লোকটা হাসল।

ওর বাঁধানো দাঁতের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে পড়ল প্লাস্টিকের থলের কথা। গরম জিনিস মুখে গেলে সেই থলে কেটে যেতে পারে বলেই কি ও খাচ্ছে না ! এই সময় দু'জন লোক হঠাৎ লোকটার দু'পাশে চলে এসে তাদের কার্ড দেখিয়ে টানতে-টানতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে দিল। একজন ওর জ্যাকেট, শার্ট প্যান্ট থেকে শুরু করে সর্বাঙ্গ সার্চ করতে লাগল। ওর জুতো খুলেও দেখল ওরা। জ্যাকেটের ভাঁজও পরীক্ষা করা হল। শেষপর্যন্ত কিছুই না পেয়ে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। লোকটা কিন্তু একটুও রাগল না। ফিরে এসে অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, “এরা কী ভাবে বলো তো ? সবাই ক্রিমিনাল ? হুঃ।”

॥ ৪ ॥

শেষপর্যন্ত নিউ ইয়র্কগামী প্লেনের যাত্রীদের বলা হল, তেইশ নম্বর গেটের দিকে এগিয়ে যেতে, প্লেন এখনই ছাড়বে। সুধামাসিকে নিয়ে এগোল অর্জুন। সুধামাসি বললেন, "জানিস, অনেক বাঙালি এই এয়ারপোর্টে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একজনকে দেখলাম আমার চেয়ে বয়স্কা, ছেলের কাছে যাচ্ছেন।"

অর্জুন হাসল, "ইচ্ছে করলে তুমি একাই আসতে পারতে।"

"অসম্ভব। এই দ্যাখ না, আমরা কোথায় বসেছিলাম আর প্লেনে উঠতে কোথায় হেঁটে যেতে হচ্ছে!" সুধামাসি তাল রাখতে একটু দ্রুত হেঁটে চলেছিলেন।

কথাটা ঠিক। এয়ারপোর্টটা এত বড়, চোখ খোলা রেখে না চললে ঝামেলা হবেই। অর্জুনের মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবী থেকে মানুষ এই ট্রানজিট লাউঞ্জে এসে একটা মিনি পৃথিবী তৈরি করে ফেলেছে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখতে চেষ্টা করছিল। কফির দোকান থেকে সেই যে লোকটা উধাও হয়েছে আর দেখা পায়নি সে। লোকটা অবশ্য ক্রিমিনাল। ওর দাঁতের ভেতরদিকে কিছু একটা বেআইনি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। তার উচিত ছিল নিরাপত্তাকর্মীদের খবরটা দিয়ে দেওয়া। কিন্তু সুধামাসি তাকে বারংবার নিষেধ করেছেন, "না বাবা, দেশের বাইরে এসে তুই ওসব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়িস না। আমরা একটা কাজে যাচ্ছি, এইটে মনে রাখিস।"

নতুন প্লেনে উঠে সুধামাসির পাশে আরাম করে বসল সে। স্থানীয় সময়ের সঙ্গে ওদের ঘড়ির ভারতীয় সময়ের যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হল সুধামাসিকে। এখানে সকাল হলেও কলকাতায় প্রায় বিকেল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পিছিয়ে গেছে তারা ইতিমধ্যে। আমেরিকায় গেলে আরও পিছিয়ে যাবে। সুধামাসি অবাক হয়ে বললেন, "তাই! এতক্ষণে বুঝলাম এ দেশে এসে সবাই এত চটপটে কী করে হয়! প্রত্যেকের বয়স কমে যায় যে!"

অর্জুন হাসল। এখন বেশ কয়েক ঘণ্টা আকাশে উড়ে যাওয়া। খাওয়াদাওয়ার পর সিনেমা দেখানো হবে। অনেকেই ঘুমোবে। প্লেন আকাশে ওড়ার পর সে টয়লেটের দিকে এগোল। খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন লোকটাকে দেখতে পেল। মাঝখানের সিটে বসে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে, "হাই।" সে মাথা নেড়ে টয়লেটে ঢুকে গেল। এই লোকটা ক্রিমিনাল হলেও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে। এ তো করবেই। যে-কোনও ক্রিমিনাল হয় কারও বাবা অথবা ছেলে কিংবা স্বামী। অর্থাৎ একজন মানুষ।

কেনেডি এয়ারপোর্টে যখন প্লেন নামল তখন সূর্যদেব বহাল আছেন আকাশে। যাত্রীদের লাইন দিতে হচ্ছে ইমিগ্রেশন কাউন্টারে। অনেক কাউন্টারের পেছনে কম্প্যুটার নিয়ে বসে আছেন গম্ভীর মুখের কর্মচারীরা।

প্লেনে তাদের একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছিল যাতে নাম-ধাম, পাশপোর্ট নাম্বার ইত্যাদি লিখতে হয়েছিল। সেই ফর্ম এবং পাশপোর্ট ওঁরা পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তবে আমেরিকায় ঢোকার অনুমতি দেওয়া হবে।

সুধামাসি লাইনে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হলেন, "এ কী রে! যেন কেরোসিনের লাইন দিয়েছি। আমরা কি এত খারাপ লোক যে, লাইনে দাঁড় করিয়ে পরীক্ষা নেবে?"

অর্জুন বলল, "যারা বিদেশ থেকে আসে তাদের এই পরীক্ষা আমাদের দেশেও করা হয়ে থাকে সুধামাসি। কে ভাল কে মন্দ তা তো মুখ দেখে বোঝা যায় না।"

"যাই বলিস, ওরা যেন আমাদের কৃপাপ্রার্থী হিসেবে দেখছে। ওই দ্যাখ, কীরকম ধমকাচ্ছে।"

অর্জুন দেখল একজন যাত্রী লাইন ছেড়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে নিরাপত্তাকর্মী ধমক দিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। সত্যি, জলপাইগুড়িতে কেরোসিনের অভাব হলে দোকানে যে লাইন পড়ে তার কথা এখন মনে পড়ে যাচ্ছে। আসলে প্রতি মিনিটে গোটা পৃথিবী থেকে লোক এই এয়ারপোর্টে নামছে আমেরিকায় ঢুকবে বলে। সুতরাং লাইন তো পড়বেই।

শেষ পর্যন্ত ওদের সামনে কেউ নেই এবং একই সঙ্গে পাশাপাশি দুটো কাউন্টার খালি হওয়ায় ওরা এগিয়ে গেল। অর্জুন পাশপোর্ট আর ফর্ম এগিয়ে দিল। লোকটি ফর্মের লেখায় টিক মেরে পাশপোর্টের ভিসার ছাপ দেখল। দেখে জিজ্ঞেস করল, "কেন এসেছ?"

অর্জুন বলল, "আমি ওই মহিলার এসকর্ট হিসেবে এসেছি।"

"আর?"

"আর কিছু নেই।"

লোকটি একটি যন্ত্রের ওপর পাশপোর্টের একটা পাতা চেপে ধরল। তারপর নাম্বারটা কম্পিউটারে টাইপ করে স্ক্রিনের দিকে তাকাল। চট করে মুখ তুলে অর্জুনকে একবার দেখে নিয়ে লোকটি একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে-সঙ্গে একজন সাদা পোশাকের অফিসার দ্রুত চলে এলেন কাছে। পাশপোর্ট আর ফর্মটা দেখলেন তিনি। কম্পিউটারের দিকে তাকালেন। অর্জুন বুঝতে পারছিল না কী এমন গোলমাল হয়েছে। ওদিকে সুধামাসির পাশপোর্টে ছাপ মেরে ওরা ছেড়ে দিয়েছে। তিনি সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, "এই যে আমি এখানে, চলে আয়।"

সাদা পোশাকের অফিসার ইংরেজি বলল কিন্তু জড়ানো উচ্চারণ, "আমার সঙ্গে এসো।"

অর্জুন চেঁচিয়ে সুধামাসিকে বলল, "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।"

সুধামাসি কিছু বলার সুযোগ পেলেন না। অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "ওই

মহিলা তোমার সঙ্গে ?”

“হ্যাঁ। আমরা একসঙ্গে আসছি। আমি ওঁর এসকর্ট। কিন্তু কী হয়েছে ? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?”

“একটু পরেই জানতে পারবে।”

দোতলার একটি ঘরে ওকে বসতে বলল অফিসার। সুদৃশ্য কয়েকটি চেয়ার ছাড়া ঘরে কিছুই নেই। অফিসার ভেতরে চলে গেলে অর্জুন চেয়ারে বসল। সে বুঝতে পারছিল, ওরা তাকে আটক করেছে কিন্তু সে ভেবে কোনও কারণ খুঁজে পাচ্ছিল না। আমেরিকান সরকারের পক্ষে অপ্রীতিকর কোনও কাজ সে করেনি এবং প্রশ্নও ওঠে না। সুধামাসির জন্যে খারাপ লাগছিল। উনি নিশ্চয়ই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এই সময় আর-একজন অফিসার ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি জিমকে কতদিন ধরে চেনো ? কী সম্পর্ক তোমাদের ? একসঙ্গে কাজ করো ?”

“কে জিম ? আমি ওই নামের কাউকে চিনি না।”

“মিথ্যে কথা বলে কোনও লাভ হবে না মিস্টার অর্জুন।”

“আমি মিথ্যে কথা বলছি না।”

“তুমি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। এর আগে আমাদের দেশে এসেছিলে কেন ?”

“বেড়াতে।”

“হুঁ। তুমি জিমকে চেনো না ?”

“না।”

“ফলো মি।” লোকটি ইঙ্গিত করতে অর্জুন তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হল। দ্বিতীয় ঘর পার হওয়ার পর তৃতীয় ঘরে পৌঁছে সে অবাক হয়ে গেল। সেই লোকটাকে চেয়ারে বসিয়ে দু'জন অফিসার কথা বলছে। ওকে কখন ইমিগ্রেশনের লাইন থেকে ধরে নিয়ে এল কে জানে!

লোকটিকে তৃতীয় অফিসার জিজ্ঞেস করল, “একে তুমি চেনো ?”

লোকটি মাথা নেড়ে হাসল, “হাই।”

এবার অফিসার ঘুরে দাঁড়াল, “তা হলে তুমি মিথ্যেবাদী।”

“কখনও না। ওর নাম যে জিম তাই আমি জানি না। এয়ারপোর্টের টয়লেটে আমার সঙ্গে হেসে দু'-একটা কথা বলেছিল। আমি ওর নাম জিজ্ঞেস করিনি। তারপর ওখানকার নিরাপত্তাকর্মীরা আমাকে ওর ব্যাপারে প্রশ্ন করে এবং সন্তুষ্ট হয়ে চলে যায়।”

“এবং তারপরেও তোমরা কফির দোকানে কথা বলেছ।”

“হ্যাঁ। সেখানে হঠাৎই দেখা হয়ে যায়। আমি আবার বলছি ওকে আমি চিনি না, এর আগে কখনও দেখিনি, নামও এই প্রথম শুনলাম। আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল, সাধারণত লোকে যেরকম করে। তা ছাড়া আমার কাজ

অপরাধীকে খুঁজে বের করা, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়।" অর্জুন বলল।

"তার মানে একে অপরাধী ভেবে বন্ধুত্ব করতে চাওনি?"

"অবান্তর কথা। পথ চলতে আলাপ হওয়া সহযাত্রী সম্পর্কে কোনও ধারণা তৈরি হয় না, যদি না বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে সেরকম কিছু হয়নি।"

অফিসাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলার পর একজন এগিয়ে এলেন, "আপনাকে একটু কষ্ট করতে হল বলে দুঃখিত। আশা করি আপনার আমেরিকায় থাকতে ভাল লাগবে। আসুন।"

অফিসারটি পাশপোর্টে ছাপ মারিয়ে অর্জুনকে ফেরত দিল।

সুধামাসি একমুখ ভয় নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনকে আসতে দেখে দ্রুত আসার চেষ্টা করলেন, "কী ব্যাপার? তোর এত দেরি হচ্ছিল কেন? ভয়ে আমার হাত-পা কাঁপছিল। কী হয়েছিল?"

"তেমন কিছু নয়। মাঝে মাঝে এক-একজনকে ওরা প্রশ্ন করে। তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি?"

"না। কী বলল বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম মেয়ের কাছে এসেছি। জামাই হাসপাতালে। তো এই পাশপোর্টে ছাপ মেরে ইশারা করল এদিকে চলে আসতে।"

ওরা সামান্য এগোতেই দেখল বেল্টে সুটকেস ঘুরছে। যাত্রীরা এর মধ্যে যার-যার লাগেজ নিয়ে চলে গিয়েছে। শুধু চারটে সুটকেস পাক খাচ্ছে। অর্জুন তাড়াতাড়ি তিনখানা নামিয়ে নিল। চতুর্থ সুটকেস ওদের নয়। ওপাশে দেওয়ালের ধারে সার দিয়ে ট্রলি রাখা আছে। তার একটাকে টেনে বের করতে না পেরে অর্জুনের মনে পড়ল এ-দেশে পয়সা না দিলে ট্রলি ব্যবহার করা যায় না। পকেটে দশ ডলারের নীচে নোট নেই অথচ ডলার জমা দেওয়ার গর্তের ওপর লেখা আছে এক ডলার দিতে হবে। কাছাকাছি কেউ নেই যে, জিজ্ঞেস করবে কী করা যায়! এই সময় সে অবাক হয়ে দেখল লোকটা যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে। তা হলে ওরা ওকে ছেড়ে দিয়েছে? নিশ্চয়ই ওর সম্পর্কে খবর এসেছিল কিন্তু কোনও প্রমাণ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। লোকটি বাঁ হাত দিয়ে সুটকেস তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, "হাই! প্রব্লেম?"

"আমার কাছে চেঞ্জ নেই কিন্তু ট্রলি দরকার।"

"কত ডলারের নোট আছে?"

"দশ।"

"ওটাই ভেতরে ঢোকাও।"

অর্জুন অবাক হয়ে চ্যাপটা সরু গর্ত দিয়ে দশ ডলারের নোট ঢোকাল। তারপরেই ঝনঝন করে কয়েন পড়তে লাগল। পঞ্চাশ সেন্টের আঠারোটা

কয়েন। খট্ করে শব্দ হল। ট্রলিটা টানতেই সেটা বেরিয়ে এল দঙ্গল থেকে। এগিয়ে গিয়ে সুটকেসগুলো তুলল অর্জুন। লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে কেন ? ওরা নিশ্চয়ই ওর ওপর নজর রাখছে। সে সুধামাসিকে বলল, "চলো।"

অরূপ লাহিড়ী বলেছিলেন, "আমি টেলিফোনে আপনার মেয়েকে বলে দিয়েছি কোন ফ্লাইটে আপনারা যাচ্ছেন। উনি এয়ারপোর্টে থাকবেন।" সুধামাসির মেয়ে নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে আসবে। এ-দেশে গাড়ি ছাড়া থাকাই যায় না।

অর্জুন দেখল সামনেই কাস্টমসের অফিসাররা দাঁড়িয়ে আছেন। সবুজ এবং লাল, দু'রকম গেট রয়েছে বাইরে যাওয়ার জন্যে। যারা কোনও বেআইনি জিনিস সঙ্গে আনেনি তারা স্বচ্ছন্দে সবুজ গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। লাল গেটে একটাও লোক নেই। অর্জুন সুধামাসিকে নিয়ে সবুজ গেটের দিকে এগোচ্ছিল। ওপাশে যেসব কাস্টমস অফিসার দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের একজন এগিয়ে এসে পাশপোর্ট দেখতে চাইলেন। অর্জুন নিজেরটা বের করে দিতেই তাতে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি নিশ্চিত যে, ডিক্লেয়ার করার মতো কোনও জিনিস তোমার কাছে নেই ? একটু ভেবে বলো।"

অর্জুন ঘাড় নাড়ল, "না। আমরা কোনও বেআইনি জিনিস আনছি না।"

"ঠিক আছে, তোমরা ওই টেবিলের সামনে যাও।"

ওরা সুটকেস খুলতে বলল। অর্জুন বাধ্য হল তার সব জিনিস দেখাতে। সেখানে কোনও বেআইনি জিনিস নেই। লোকগুলো তার সুটকেস ঠুকে-ঠুকে দেখে সুধামাসির দুটো সুটকেস খুলতে বলল। কিছু জামাকাপড়, তারপর প্যাকেট বের হতে লাগল। বিভিন্ন ধরনের বড়ি, নাড়ু, মিষ্টি, চিঁড়ে, মুড়ি, সরষের তেলের টিন। কাস্টমসের অফিসার প্রত্যেকটির নাম এবং কী কাজে লাগে জেনে নেওয়ার পর সব বাজেয়াপ্ত করে নিল। আমেরিকায় বিদেশ থেকে খাবার নিয়ে আসার অনুমতি নেই। সুধামাসি খুব রেগে গিয়ে ভাঙা ইংরেজি এবং বাংলায় ওদের বোঝাতে চাইছেন এসব তিনি নিজের হাতে বানিয়েছেন। সাহেবরা কোনওদিন খায়নি বলে বুঝতে পারছে না। ইচ্ছে হলে তাঁর মেয়ের বাড়িতে গিয়ে খেয়ে আসতে পারে। মেয়ে এসব খুব পছন্দ করে বলে তিনি অনেক কষ্ট করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এতে বরফ গলল না। এর ওপর সুধামাসির কাপড়ের ভাঁজে ন্যাপথলিনের গোল বল পেয়ে ওঁদের মুখ চকচক করে উঠল। প্রবল উৎসাহে সেগুলো সংগ্রহ করে খবর পাঠাতে আর একজন অফিসার ভেতর থেকে এলেন। সামান্য পরীক্ষা করে তিনি হেসে মাথা নাড়লেন, "ন্যাপথলিন। ছেড়ে দাও।" ভদ্রলোক ফিরে গেলেন।

এবার একজন অফিসার অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাকে সার্চ করতে চাই।"

"যা ইচ্ছে করুন।" দু'টো হাত দু'দিকে বাড়িয়ে দিল অর্জুন।

পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত আতিপাতি করে খুঁজে কিছুই না পেয়ে জামার তলায় লুকিয়ে থাকা লকেটটি চেপে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী ?"

"লকেট।"

অর্জুন বাধ্য হল লকেটসুদ্ধ হার মাথা থেকে বের করে নিতে। সাপের লকেটের দিকে তাকিয়ে অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী ধরনের লকেট ?"

"এটা একটা সাপের লকেট।"

"সেটা দেখতে পাচ্ছি। মেটালটা কী ?"

"মনে হয় গালা বা ওই জাতীয় কিছু।" অর্জুন জবাব দিল।

সুতো ধরে লকেট ঝুলিয়ে ভদ্রলোক সহকর্মীদের দেখালেন। তাঁদের তিনজন বলল, "বিউটিফুল, নাইস্, গুড।"

"এটা তুমি কেন পরেছ ?"

"যারা আমার সঙ্গে বিনা কারণে শত্রুতা করবে, সাপের দেবতা তাদের ধ্বংস করবেন।"

"মাই গড।" লোকটি লকেট ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "প্যাকআপ করে চলে যান।"

সুটকেসে ভাঁজ করে জামাপ্যান্ট ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তা আবার খুলে বের করলে নতুন করে ঢোকানো খুব কষ্টকর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনও উপায় নেই। অর্জুন সুধামাসিকে বোঝাল, কাস্টমস অফিসারদের অধিকার আছে জিনিসপত্র তল্লাশ করার। দেশের স্বার্থেই করে ওরা। লকেট গলায় পরে মালপত্র সুটকেসে কোনওমতে ঢুকিয়ে ওরা আবার ট্রলি নিয়ে বাইরের দিকে এগোল। একটা এলাকার পর অনেক মানুষ নজরে পড়ল। দেশ থেকে আসা অতিথিদের নিয়ে যেতে এসেছেন ওঁরা। অর্জুন দেখল সুধামাসির মেয়ে হাত নাড়ছেন ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে। সে হাত নেড়ে সুধামাসিকে বলতেই তিনি সেখান থেকে চিৎকার করলেন, "কী অসভ্য দেশ রে এরা। তোর জন্যে যা-যা এনেছিলাম সব কেড়ে নিল ! নিশ্চয়ই নিজেরা খাবে অথচ তোদের জন্যে নিয়ে আসতে দেবে না।"

অর্জুন বলল, "সুধামাসি, অত জোরে-জোরে বলবেন না।"

ততক্ষণে ওরা বেরিয়ে এসেছে। সুধামাসির মেয়ের নাম অঞ্জনা ব্যানার্জি। তাঁর পরনে জিন্স্ এবং হালকা পুলওভার। চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। মায়ের হাত ধরে বললেন, "তুমি এসেছ তাই যথেষ্ট।"

"জামাই কেমন আছে, সেটা আগে বল !"

"এখন একটু ভাল। তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেতে দেরি আছে।"

"তোর সঙ্গে এর আলাপ আছে ? আমাদের জলপাইগুড়ির গর্ব, অর্জুন।"

"হ্যাঁ, চিনতে পেরেছি। ওয়েলকাম।" অঞ্জনা একগাল হাসলেন।

"এখান থেকে তোর বাড়ি কত দূরে?" সুধামাসি জিজ্ঞেস করলেন।

"বেশি সময় লাগবে না। এই তিনটে সুটকেস তো? তোমরা বাইরে অপেক্ষা করো, আমি পার্কিং থেকে গাড়ি নিয়ে আসি। এখানে এত দূরে গাড়ি রাখতে হয়!"

ওরা অঞ্জনার পেছন-পেছন বাইরে আসতেই চমৎকার ঠাণ্ডা আবহাওয়া পেল। কড়া শীত নয়, কিন্তু তার আমেজ রয়েছে। অঞ্জনা চলে গেলেন।

সুধামাসি বললেন, "এই প্রথম আমি মেয়েকে প্যান্ট পরতে দেখলাম।"

"ওঁকে কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে।" অর্জুন বলল।

এর আগেরবার যখন সে লাইটারের সন্ধানে নিউ ইয়র্কে এসেছিল তখনকার কথা মনে করার চেষ্টা করছিল সে। মেজর এখন এখানে আছেন কিনা কে জানে! অনেকদিন যোগাযোগ নেই ওঁর সঙ্গে। তার ডায়েরিতে ওঁর নাম্বার লেখা আছে কিন্তু সেই নাম্বারে উনি আছেন কিনা কে জানে।

এই সময় সে লোকটিকে আবার দেখতে পেল। সুটকেস নিয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। লোকটা তো আগেই সবুজ গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, তা হলে এখনও চলে যায়নি কেন? এই লোকটার জন্যে তাকে দু'-দু'বার ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। অর্জুন দেখল লোকটি এগিয়ে আসছে। কিন্তু হাঁটার ভঙ্গি বেশ আড়ষ্ট, কেমন ভয়-ভয় ভাব। অর্জুন চোখ সরিয়ে নিল। অঞ্জনাদি গাড়ি নিয়ে চলে এলে বাঁচা যায়।

"সার!" কাঁপা কণ্ঠস্বর কানে আসতে মুখ ফেরাল অর্জুন।

লোকটি দাঁড়িয়ে আছে আড়াই হাত দূরে।

"সার। যদি কিছু মনে না করেন তা হলে একটা অনুরোধ করতে পারি?"

"বলুন!"

"আপনি যে লকেটটা পরে আছেন সেটা একবার দেখাবেন?"

"লকেট?"

"হ্যাঁ, খুলতে হবে না, দূর থেকে দেখালেই হবে। প্লিজ।"

"আপনি আমাকে মিছিমিছি বিরক্ত করছেন।"

"আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু সার, একবার, প্লিজ।"

অর্জুন বিরক্ত ভঙ্গিতে জামার নীচ থেকে লকেটটা বের করে সামনে তুলে ধরল। সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত শব্দ করে উঠল লোকটা। তারপর হাউমাউ করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল অর্জুনের সামনে। সুধামাসি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ও কী, ও কী করছে রে?"

অর্জুনও বুঝতে পারছিল না। এখন এ দিকটা বেশ ফাঁকা বলে লোকজন দৃশ্যটা তেমন উপভোগ করছে না। বিড়বিড় করে কিছু বলে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বারংবার মাথা ঝাঁকাতে লাগল। অর্জুনের হাসি পাচ্ছিল। এই সময়

অঞ্জনা গাড়ি নিয়ে একেবারে পাশে চলে এলেন। ডিকি খুলে তিনি এগিয়ে আসতেই অর্জুন সুটকেস তাতে তুলে দিয়ে দেখল লোকটা তখন পরম শ্রদ্ধায় মাথা দুলিয়ে চলেছে।

মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি চাপল। দু' পা এগিয়ে গিয়ে অর্জুন বলল, "তোমার দাঁতের ভেতরে একটা প্যাকেট আছে, ওটার কথা কিন্তু আমি এদের বলিনি।"

কথাটা শোনামাত্র লোকটা সুটকেস তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগল। সুধামাসি পেছনের আসনে বসে ছিলেন। অর্জুন ড্রাইভিং সিটের পাশে বসতেই অঞ্জনা জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে ? ও পালাল কেন ? ভূত দেখল নাকি ?"

"বোধ হয় তাই। অঞ্জনাদি, আপনি একটু ঘুর রাস্তায় গাড়ি চালাবেন ? আমরা কোথায় যাচ্ছি তা যদি কেউ ফলো করে দেখতে চায়, তা যেন না পায়।" অর্জুন বলল।

"সর্বনাশ। ঢেঁকি দেখছি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানছে। পরে গল্পটা শুনব, আগে তুমি সিটবেল্ট বাঁধো। নইলে আমাকে ফাইন দিতে হবে।" অঞ্জনা গাড়ি চালু করলেন।

॥ ৫ ॥

অনেক রাস্তায় চক্কর খেয়ে হাডসন নদীর ওপর ব্রিজ পার হয়ে নিউ জার্সির রাস্তা ধরলেন অঞ্জনা। অর্জুন প্রায়ই লক্ষ করছিল পেছনে কোনও গাড়ি আসছে কিনা তাদের অনুসরণ করে। একটা সময় সে নিঃসন্দেহ হল, না, কেউ নেই। এখন দু'পাশে জঙ্গল, কিন্তু সুদৃশ্য জঙ্গল, মাঝখানের মসৃণ রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। অঞ্জনা বললেন, "জানো মা, আগে আমরা কুইন্সে থাকতাম। আটতলার ফ্ল্যাটে। চারপাশে লোকজন সবসময় ক্যাচম্যাচ করছে। এখন একেবারে ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছি। কিন্তু বাড়িটা বোধ হয় অলুক্ষুনে, নইলে ওর অ্যাকসিডেন্ট হল কেন ?"

"অ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে বাড়ির কী সম্পর্ক রে ? তোরা এখানে এসে দেখছি আরও সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিস। যে-কোনও একটা ভুল অথবা গোলমালের জন্যে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। এখন তো ও ভাল আছে বলছিস। ছেলে কোথায় ?" সুধামাসি জিজ্ঞেস করলেন।

"ও এতদিন ছিল। আর কামাই করা যাবে না বলে হস্টেলে চলে গিয়েছে।"

"একমাত্র ছেলে, তাকেও নিজের কাছে রাখিস না ?"

"কী করব বলো ? আমরা দু'জনেই সকাল আটটায় বেরিয়ে সন্ধে ছ'টায় ফিরি। ও কার কাছে এতদিন থাকত ? তোমাকে বলেছিলাম চলে এসো, তুমি আসোনি। একা-একা জলপাইগুড়িতে যে কোন মায়ায় থাকো কে জানে !"

মা এবং মেয়ের এসব কথাবার্তা অর্জুনের কানে ঢুকছিল না। সে জামার নীচে পরে থাকা লকেটটাকে ওপর থেকে স্পর্শ করল। এই লকেট দেখে জিম নামের লোকটা ওইরকম শ্রদ্ধা দেখাল কেন? এই লকেটের সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক? জিম নিশ্চয়ই কোনও বেআইনি জিনিস দাঁতের ভেতর আটকে এদেশে নিয়ে এসেছে। সে ইচ্ছে করলে যে-কোনও নিরাপত্তাকর্মীকে খবরটা দিতে পারত। কেন দেয়নি তা অর্জুনের নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়। যদি জিম ওটা ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলত তা হলে খবরটা দিয়ে সে বেশ বেকায়দায় পড়ে যেত। লোকটা শত্রু হয়ে গেলে তার কী লাভ হত! কিন্তু লকেটটা দেখার পর জিমের আচরণের কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন। কিন্তু এটা যে মূল্যবান জিনিস তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই জিনিস গোরক্ষনাথ অমল সোমের বাগানে গাছের তলায় পুঁতে রেখেছিল। অমলদা নিশ্চয়ই এর গুরুত্ব সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন না।

"আমরা এসে গেছি অর্জুনবাবু।" অঞ্জনা বললেন।

অর্জুন লক্ষ করছিল গাছপালা মাঠজঙ্গল পেরিয়ে মাঝে-মাঝেই গাড়ি জনবসতির পাশ কাটিয়ে এতক্ষণ ছুটে যাচ্ছিল। কোথাও ঘিঞ্জি বাড়িঘর নেই, মানুষের ভিড় নেই। এবার একটা পেট্রল পাম্প চোখে পড়ল। এরা অবশ্য বলে গ্যাসস্টেশন। তারপরেই রেললাইন পেরিয়ে দু'পাশে সুন্দর ছবির মতো একতলা দোকান শুরু হয়ে গেল। বড়জোর দেড়শো গজ রাস্তার দু'পাশে দোকান অথবা বার এবং রেস্টুরেন্ট। তারপর বাগানওয়ালা বাড়ি শুরু হয়ে গেল। এই সময় ফুটপাথে দু-একজন মানুষকে হাঁটতে দেখা গেল। অঞ্জনা ঘোষণা করলেন, "এই হল আমাদের শহরের বাজারহাট করার জায়গা।"

সুধামাসি বললেন, "সে কী রে! আমার তো মনে হচ্ছিল ভৌতিক জায়গা, লোকজন নেই।"

অঞ্জনা হাসলেন, "শনি-রবিবার এসে দেখো লোক গিজগিজ করছে। এদেশে সোম থেকে শুক্র কেউ অফিস আর বাড়ি ছাড়া কোথাও যায় না। বাঁ দিকের নীলচে বাড়িটা আমাদের।"

অর্জুন দেখল বাগান সামনে নিয়ে একটা দেড়তলা বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ইংরেজি ছবিতে যেসব বাড়ি দেখা যায় ঠিক সেইরকম। অঞ্জনা গাড়ি থামিয়ে গেট খুলতে যেতেই সিট বেল্টের ফাঁক থেকে নিজেকে মুক্ত করে অর্জুন নীচে নামল। নুড়ি বিছানো প্যাসেজের দু'পাশে সুন্দর ছাঁটা ভাল ঘাস। রাস্তার দু'পাশে বড়-বড় গাছ রয়েছে কিন্তু তার শুকনো পাতা ঘাসের গালিচার ওপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। অর্জুন কয়েক পা হেঁটে এগিয়ে গিয়েছিল ঘাসের ওপর পা ফেলে, অঞ্জনা তাকে ডাকলেন, "এই যে, এপাশে চলে আসুন। ওই বর্ডারটা ক্রশ করবেন না।"

"বর্ডার?" অর্জুন হকচকিয়ে গেল।

"আজ্ঞে সার। ওই অবধি আমাদের এলাকা, ওর ওপাশে পাশের বাড়ির। আপনি যেহেতু ওদের এলাকায় দাঁড়িয়ে আছেন এবং আপনাকে ওরা চেনে না অতএব কোনও মতলব আছে কিনা বুঝতে পারছে না, তাই এখনই পুলিশকে খবর দেওয়ার অধিকার ওদের আছে। আর খবর পাওয়ামাত্রই ছুটে আসা এ-দেশের পুলিশের প্রাথমিক কর্তব্য।"

অর্জুন দ্রুত ফিরে এল, "সে কী ? আপনাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে সদ্ভাব নেই ?"

"থাকবে না কেন ? তাই বলে অন্যের জমিতে দাঁড়িয়ে থাকব কেন বিনা কারণে ?" অঞ্জনা গাড়ি ভেতরে নিয়ে গেলেন। অর্জুন দেখল দুটো বাড়ির মাঝখানে কোনও পাঁচিল নেই। শুধু ঘাস এমনভাবে কাটা আছে যে, রেখা তৈরি হয়ে জমি চিহ্নিত হয়েছে।

সুটকেস ভেতরে নিয়ে এলে সুধামাসি জিজ্ঞেস করলেন, "পুরো বাড়িটা কি কাঠের ?"

"হ্যাঁ মা। ওদের কাছে গিয়ে পছন্দমতো বাড়ির অর্ডার দিলে ওরা তৈরি বাড়ি রাস্তা দিয়ে টেনে এনে জমির ওপর বসিয়ে দিতে পারে। আমরা অবশ্য পছন্দমতো তৈরি করিয়ে নিয়েছি।"

দীর্ঘ পথ উড়ে এলেও শরীরে যে ক্লান্তি জমে, তা টের পাচ্ছিল না অর্জুন। সুধামাসি একটু কাহিল হয়ে পড়লেও জামাইকে দেখতে তখনই হাসপাতালে যেতে চাইছিলেন। কিন্তু অঞ্জনা তাঁকে নিষেধ করলেন। আজ বিশ্রাম নিয়ে আগামীকাল গেলেই হবে। ওদের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে অঞ্জনা নিজে হাসপাতালে চলে গেলেন।

অর্জুন বাড়িটা ঘুরে দেখল। মাটির নীচের ঘরটিকে বলা হয় বেসমেন্ট। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেটে মোড়া ঘরটি পছন্দ হল তার। কিন্তু এখানে নয়, তার থাকার জন্যে অঞ্জনা ওপরে যে ঘরটি ছেড়ে দিয়েছেন সেটি সুন্দর সাজানো। জানলার পরদা সরালে গাছগাছালি দেখা যায়। ঘরে দামি মডেলের টিভি এবং টেলিফোন আছে। এখানকার বাথরুমের মেঝেতেও কার্পেট পাতা থাকে। স্নানের জন্যে ছোট কাচের ঘরের ব্যবস্থা। আধুনিক সবরকম সুবিধে হাতের কাছে সাজানো।

ঘরে ফিরে গিয়ে স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে পড়ল অর্জুন। না, একটুও সম্ভাবনা নেই ঘুমের। এখন কলকাতায় প্রায় ভোর হয়ে আসছে। সময়ের হেরফের মানিয়ে নিতে হয়তো একটু দেরি হবে। সে রিমোট টিপে টিভি খুলল। এত চ্যানেলে একসঙ্গে অনুষ্ঠান হচ্ছে, লোকে দ্যাখে কী করে ?

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে জানা গেল অঞ্জনাদির স্বামীর আর একটা অপারেশন হবে। সুধামাসি মাস তিনেকের মধ্যে ফিরতে পারবেন বলে মনে হয় না। অর্জুন হেসে বলল, "আমার দায়িত্ব শেষ, এবার আমি ফিরে যাই

সুধামাসি।"

অঞ্জনা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "এ কী ! বাড়িতে পা দিয়েই চলে যাওয়ার কথা বলছ কেন ? এই দেশ ঘুরে দ্যাখো। এর আগের বার কি লস অ্যাঞ্জেলিসে গিয়েছিলে ? তবে ? ডিজনিল্যান্ড আর হলিউড না দেখে কেউ ফিরে যায় ! তুমি কিছু চিন্তা কোরো না, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।"

পাতলা কাঠের বাড়ি কিন্তু যারা থাকে তাদের কোনও দুশ্চিন্তা নেই। প্রতিটি বাইরের দরজায় চোর-ডাকাতের জন্যে অ্যালার্ম সেট করে অঞ্জনা শুয়ে পড়লেন সুধামাসির সঙ্গে। অর্জুনের ঘুম আসছিল না। একটার পর একটা চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মনের মতো ছবি খুঁজছিল সে। হঠাৎ একটা চ্যানেল টিপতেই একজন বৃদ্ধ কালো আমেরিকানকে দেখা গেল কথা বলছেন, "সাপ সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। পৃথিবীতে অবশ্য যেসব সাপের খবর পাওয়া গিয়েছে তার অধিকাংশেরই বিষ নেই। যদি বিষ থাকত তা হলে আজকের পৃথিবীতে মানুষ খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বিষধর সাপের নাম কী ? বলতে বাধ্য হচ্ছি সবচেয়ে বিষধর সাপটি আজ পৃথিবীতে নেই। বিবর্তন তাকে গ্রাস করে নিয়েছে। আফ্রিকার উগান্ডায় সেই মহাবিষধর সাপের রাজত্ব ছিল। কথিত আছে মানব সভ্যতার প্রথমদিকে একজন আফ্রিকান শিল্পী সেই সাপের অবিকল মূর্তি এমন হালকা কালো পাথরে নির্মাণ করেছিলেন যাকে কোনও ধাতু বলে ভুল হবে। তিনি মাত্র দুটো মূর্তি তৈরি করেন। সেই মূর্তির চোখে পাথর দেওয়া ছিল। অনেকের ধারণা, ওই পাথরের নীচে তিনি বিষধর সাপটির এক ফোঁটা বিষ রেখে দিয়েছিলেন। হয়তো এ সবই বানানো গল্প, কিন্তু যে-কথা সত্যি, তা হল সাপ সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে।" সঙ্গে-সঙ্গে পরদায় লেখা ফুটে উঠল, "বিষধর সাপের সন্ধান করুন। সাপটির নাম 'ব্লু-কোবরা'।"

এটা বিজ্ঞাপন না টিভি কোম্পানির ঘোষণা, বোঝা গেল না। তারপরেই পরদা জুড়ে ব্লু কোবরার ছবি দেখানো হল। কোনও শিল্পীর আঁকা ছবি। কিন্তু সেই ছবি দেখে চমকে উঠল অর্জুন। সে বুকে হাত দিল। মনে পড়ল স্নানের সময় লকেটটাকে খুলে রেখেছিল সে। দ্রুত বাথরুমে ঢুকে টয়লেট বক্সের ওপর সে লকেটটাকে দেখতে পেল। লকেটটা হাতে নিয়ে আলোর সামনে আসতেই সে বুঝতে পারল অনেকটা মিল থাকলেও টিভির ছবির হুবহু কপি এটা নয়। টিভির ছবিতে সাপের লেজ কুণ্ডলী পাকিয়ে ডান দিকে পড়ে ছিল, এটার বাঁ দিকে। এর গায়ে উঁচু-উঁচু আঁশের মতো ছড়ানো, টিভির ছবিতে সেটা ছিল না। কিন্তু ভঙ্গি আর আকৃতিতে কোনও পার্থক্য নেই। অর্জুন টিভির দিকে তাকাল। সেখানে নাচগান শুরু হয়ে গেছে। অনেক যন্ত্র নিয়ে একজন কালো আমেরিকান গায়িকা চিৎকার করে গান গাইছে।

হাতে ধরা সাপের লকেটের দিকে তাকাল অর্জুন। এটা কি ব্ল্যাক কোবরা !

গোরক্ষনাথ তাকে যে গল্প বলেছিল সেটাকে নেহাতই বুজরুকি বলে মনে হয়েছিল তার। এই লকেট পরে থাকা ডুবন্ত মানুষকে বিশাল সাপ সমুদ্রে ভাসিয়ে রেখেছিল এমন গল্প বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কিন্তু টিভির ভদ্রলোক দর্শকদের কোন বিষধর সাপের সন্ধান করতে বলছেন ? ব্লু-কোবরা তো অনেকদিন আগেই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং সেটা বলাও হল। তা হলে কোন সাপকে খুঁজবে মানুষ ? গোখরো, কেউটে, শঙ্খচূড় বিষধর সাপ এবং তাদের সঙ্গে মানুষ দিব্যি বেঁচে আছে। তাদের খুঁজতে নিশ্চয়ই ঘোষক উৎসাহ বোধ করেননি। ব্যাপারটা দুর্বোধ লাগছিল। এই সময় গান শেষ হতেই আবার সেই এক ঘোষণা শোনা গেল। যেভাবে টিভিতে বিজ্ঞাপন বারংবার দেখানো হয়, এও তেমন। বিষধর সাপের সন্ধান করুন, সাপটির নাম ব্লু-কোবরা, বলার পর টিভির পরদায় কিছু সংখ্যা ফুটে উঠল। ওটা যে টেলিফোনের নাম্বার তা বুঝে অর্জুন দ্রুত একটা পত্রিকার পেছনে টুকে রাখল।

আবার গান শুরু হতে অর্জুনের মনে হল বিশেষ উদ্দেশ্যে এই ঘোষণা প্রচারিত হচ্ছে। যারা বুঝতে পারবে তারা নিশ্চয়ই এই চ্যানেলটির দর্শক। কিন্তু এখন তার মাথা আর কাজ করছিল না। টিভি বন্ধ করে আলো নিভিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

শরীর যে কাহিল ছিল তা বোঝা গেল দরজায় শব্দ হওয়ার পর। এখন ন'টা বেজে গেছে। ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলতেই দেখল সুধামাসি বাইরে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছেন।

"কী রে ? শরীর খারাপ লাগছে ?"

"না, না।" লজ্জিত হল অর্জুন।

"তুই তা হলে বিশ্রাম নে। তোর জলখাবার তৈরি করে মাইক্রোওভেনের সামনে রাখা আছে, গরম করে নিস। পারবি না ? খুব সোজা রে। আমরা দেশে কত ঝক্কি সামলে রান্না করি, আর এরা কত সুবিধে পায়। তা হলে আমি অঞ্জনার সঙ্গে হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি ?"

"ঠিক আছে। আমি না হয় বিকেলে যাব।"

দাঁত মেজে পোশাক পালটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অর্জুন দেখল বাড়ি খালি, ওরা বেরিয়ে গেছে। খিদে পাচ্ছিল না তেমন। রান্নাঘরে ঢুকে দেখল একটা ট্রের ওপর তার ব্রেকফাস্ট সাজানো আছে। এক প্যাকেট অরেঞ্জ জুস, একটা আপেল, ডিমের পোচ, দুটো টোস্ট, কর্নফ্লেক্স, দুধ, জ্যাম এবং চিনি সুন্দর করে সাজানো। তার পাশে একটা চিরকুটে লেখা, "দুধ গরম করে নিয়ো। চা খেলে জল গরম করে টি-ব্যাগ ব্যবহার কোরো।"

কয়েক মিনিটের মধ্যে সে খাবার শেষ করে ফেলল। জুস এবং আপেল বাদ দিল। দেশে তার ওসব খাওয়ার অভ্যেস নেই, অসুস্থদেরই খেতে দেখেছে। কাপপ্লেট ধুয়ে পরিষ্কার করে সে নিজের ঘরে ফিরে এসে বিছানা ঠিক করল।

আমেরিকায় প্রচুর বড়লোকও বাড়িতে কাজের লোক রাখে না। প্রথমত, তার খরচ খুব বেশি ; দ্বিতীয়ত, অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকা ওরা পছন্দ করে না। তাই কলকাতায় যে কুটোটি নাড়েনি, আমেরিকায় গিয়ে তার সব কাজ না করে কোনও উপায় নেই।

বন্ধ টিভির দিকে তাকাতেই গতরাতের ঘটনা মনে পড়ল। অর্জুন পত্রিকার পেছনে লিখে রাখা নাম্বারটা পড়ল। এখানে একটা ফোন করলে কেমন হয় ? সে পত্রিকাটা নিয়ে লিভিং রুমে চলে এল। টেলিফোনের নাম্বারগুলো টিপতেই ওপাশে রিং হল, "গুডমর্নিং সার।"

"আপনারা কাল রাত্রে সাপের বিষয়ে যা বলেছেন তার বিশদ জানতে চাই।"

"কী জানতে চান ?"

"আপনারা বলেছেন ব্লু-কোবরা পৃথিবীতে নেই। তা হলে কোন সাপ খুঁজবেন ?"

"আপনার পরিচয় ?"

"আমি সাপ নিয়ে গবেষণা করছি।"

"আমরা ব্লু-কোবরার যে ছবি টিভিতে দেখিয়েছি সেটা অনেকটা শোনা কথা এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে আঁকা। ব্লু-কোবরার কোনও ফোটোগ্রাফ থাকার প্রশ্ন নেই। জানা গিয়েছে তখনকার শিল্পী ওই সাপের দুটো মূর্তি তৈরি করেছিলেন। আমরা সেই মূর্তির সন্ধান করছি।"

"দুটো মূর্তির সন্ধান করছেন ?"

"একটি মূর্তি আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেটা সত্যি কিনা প্রমাণিত হবে দ্বিতীয় মূর্তি পেলে।"

"কিন্তু সেটা যে আমেরিকায় থাকবে এমন ধারণা হল কেন ?"

"ধারণা হওয়ার কারণ ঘটেছে।"

"তা হলে সাপ সম্পর্কে আপনারা সাবধান করছেন কেন ?"

"ওই বিষধর সাপের মূর্তিটি কাছে রাখলে ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারে বলেই সাবধান করা হচ্ছে। কিন্তু মহাশয়, অনুগ্রহ করে আপনার টেলিফোন নাম্বারটা বলবেন কী ?"

"আমি একটা পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে কথা বলছি।" লাইন কেটে দিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ল অর্জুন। এ-দেশে কি কোত্থেকে টেলিফোন এল চট করে খুঁজে বের করা যায় ? যদি যায়, তা হলে তো ওরা এখানে পৌঁছে যেতে পারে। এই লোকগুলো ভাল না মন্দ তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তার মনে হল টেলিফোনটা এখান থেকে করা উচিত হয়নি। লোকগুলো যদি মন্দ হয় তা হলে সুধামাসিদের বিপদে ফেলা হবে।

কিন্তু এসব ছাপিয়ে ওর মনে যে ভাবনা প্রবল হল তা ওই সাপটিকে নিয়ে।

সে ঘরে ফিরে সাপটিকে দেখল। নিশ্চয়ই দীর্ঘকাল ধরে এই সাপটির হদিস ওরা পায়নি। হয়তো এর কথা শুধু শুনে এসেছে। কারণ গোরক্ষনাথ এবং তার গুরুদেবের কাছে এই সাপটির মূর্তি পৌঁছেছে নিশ্চয়ই অনেক হাত ঘুরে। এয়ারপোর্টের সেই লোকটি যে এই সাপের লকেট দেখে ভক্তিতে গদগদ হয়েছিল তার কাছ থেকেই খবরটা পেতে পারে এরা। তা হলে সেই লোকটি এবং এরা একই দলের। আর লোকটা যখন বেআইনি জিনিস দাঁতের ভেতর নিয়ে এ-দেশে এসেছে তখন দলটা ভদ্রলোকের নয়। এখন কী করা যায়? অঞ্জনাদি এলে কি সব কথা বলে পুলিশকে জানিয়ে দেবে? অর্জুন আবার টেলিফোনের কাছে গেল। সেখানে অনেক টেলিফোন ডাইরেক্টরি সাজানো আছে। তার একটার পাতা খুলে লোক্যাল টেলিফোন অফিসের নাম্বার বের করে ডায়াল করল। ওপাশে সাড়া পেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিছু মনে করবেন না, একটু আগে আমাকে কেউ টেলিফোন করেছিল, উড়ো ফোন, কোন ফোন থেকে ওটা করা হয়েছিল সেটা আপনারা কি বলতে পারবেন?"

অপারেটার বললেন, "আগে থেকে আমাদের না জানানো থাকলে বলা সম্ভব নয়। আপনার যদি তেমন সমস্যা থাকে তা হলে এই নম্বরে ফোন করুন।"

স্বস্তি হল কিছুটা। কিন্তু মন খুঁতখুঁত করতে লাগল। সে আবার ঘরে ফিরে গিয়ে লকেটটা নিয়ে বসল। সাপের মূর্তির পেছনদিকটাও মসৃণ নয়। খুব যত্নে তৈরি হয়েছে এটা। সে চোখদুটো দেখল। প্রথম থেকেই অন্য পাথর বসানো চোখদুটো তাকে আকর্ষণ করেছিল। এই চোখের ভেতরে সেই মহাবিষধর সাপের বিষ রাখা আছে? এ কখনও সম্ভব! যদি এর ভেতর গর্ত করাও থাকে তা হলে সেই তরল বিষ এতদিনে উবে যাওয়ার কথা। চোখের পাথরটাকে খোলার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল অর্জুন।

আর তখনই তার মেজরের কথা মনে পড়ল। মোটাসোটা দাড়িওয়ালা অনেকটা টিনটিনের হ্যাডকের মতো চেহারা, যে মানুষটি বিয়েথা না করে সারাজীবন অভিযান করে বেড়াচ্ছেন। সেই কালিম্পং-এ সীতাহরণ রহস্য সমাধান করতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। লাইটার রহস্য সমাধান করতে ওঁর সঙ্গে প্রথমবার আমেরিকায় এসেছিল সে।

ডায়েরি থেকে নাম্বার বের করে ডায়াল করল সে! সঙ্গে-সঙ্গে হেঁড়ে গলায় ইংরেজি, স্প্যানিশ এবং ফরাসিতে সম্ভবত একই প্রশ্ন উচ্চারিত হল, "সাতসকালে আপনি কে?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "কেমন আছেন আপনি, আমি অর্জুন।"

"অ্যাঁ। ও ভগবান! আমি কি ঠিক শুনছি? অর্জুন? মধ্যম পাণ্ডব?"

"হ্যাঁ।"

"কোত্থেকে কথা বলছ?"

"নিউ জার্সি থেকে।"

"অ্যাঁ ? আমেরিকায় এসেছ ? আমাকে না জানিয়ে আমেরিকায় ? এটা কেমন কথা হল ? না, না, আমি কৈফিয়ত চাই।"

"হঠাৎ আসতে হয়েছে। জানাবার সময় পাইনি।"

"এক্ষুনি চলে এসো। এক্ষুনি।"

"কীভাবে যাব ?"

"ও ভগবান ! তুমি তো গাড়ি চালাতে পারবে না। কোথায় আছ ? কোন শহরে ?"

"ক্রোস্টার।"

"অ। বাস ধরে চলে এসো ওয়াশিংটন স্টেশনে। আমি সেখানে থাকব। ওখান থেকে আসতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে। তা হলে আমি একঘণ্টা বাদে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি।"

"না, না। এই মুহূর্তে বের হওয়া সম্ভব নয়। বাড়িতে আমি একা।"

"তাতে কী হয়েছে ! এদেশে কেউ বাড়ি পাহারা দেয় না।" মেজর বললেন, "দুটো কাগজে একই নোট লেখো। বিশেষ কাজে আমার কাছে আসছ। আমার টেলিফোন নাম্বার লিখে দিয়ো। দেখবে ছোট চিরকুটের প্যাড আছে টেবিলে। প্রত্যেক বাড়িতেই থাকে। কাগজের মাথায় আঠা লাগানো আছে। সেটা ফ্রিজে আর দরজায় সেঁটে দিলেই ওরা দেখতে পাবে। কুইক।" রিসিভার নামিয়ে রাখলেন মেজর।

॥ ৬ ॥

ক্রোস্টার শহরটা বেশ ছোট, কিন্তু ছবির মতো সুন্দর।

অঞ্জনাদির বাড়ির সামনে যে পরিষ্কার নির্জন রাস্তা, সেটা গাড়ি-চলাচলের জন্যে। মানুষ সেই রাস্তায় হাঁটে না। রাস্তার পাশে অনেকটা ঘাসজমি এবং সেই ঘাসের ঠিক মাঝখানে হেঁটে যাওয়ার জন্যে সরু বাঁধানো পথ রয়েছে। আমেরিকায় গাড়ি রাস্তার ডান দিক ঘেঁষে যায় বলে অর্জুনের একটু অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি দুর্ঘটনা ঘটল। মোড়েই একটা গির্জা। খুব শান্ত চেহারা। এখন সেখানে মানুষজন নেই। অর্জুন বাঁ দিকে ঘুরল। গতকাল অঞ্জনাদি ওই পথেই তাদের নিয়ে এসেছিলেন। মিনিট তিনেক হাঁটতেই দোকানপাট শুরু হল। এখন বেশ হাওয়া বইছে। একটু শীত-শীত ভাব। দোকানগুলো গায়ে-গায়ে ঠাসা নয়। বাড়িগুলোও একতলা। প্রথমে একটা সেলুন চোখে পড়ল। তারপরই কেক-পাউরুটির দোকান। পরেরটি পাব। পোশাকের দোকানটিতে ঢোকার ইচ্ছে হলেও অর্জুন ঠিক করল, এখন সময় নষ্ট করবে না। বাসস্টপ লেখা থামটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল সে। তারপরেই খেয়াল হল পুরনো অভ্যাসে সে বাঁ দিক দিয়ে হাঁটছে। রাস্তার ডান

pathagar.net

দিকে না গেলে সে নিউ ইয়র্কের বাস পাবে না। গতকাল তারা তো নিউ ইয়র্ক থেকে বাঁ দিক দিয়ে এসেছিল। সে রাস্তা পার হয়ে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াতে লক্ষ করল, এতক্ষণ যেটাকে বাঁ দিক মনে হচ্ছিল সেটা এখন ডান দিক হয়ে গিয়েছে। আসলে তুমি যেদিকে মুখ করে দাঁড়াচ্ছ দিকটা সেইমতো নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে।

বাস এল। ড্রাইভারের পাশের দরজা বোধ হয় বোতাম টিপতেই খুলে গেল। অর্জুন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কি নিউ ইয়র্ক যাবে?"

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "না। জর্জ ওয়াশিংটন পর্যন্ত যাবে। ওখান থেকে তুমি টিউব পেয়ে যাবে। এক ডলার কুড়ি সেন্ট দাও।"

গতকাল অনেক পঞ্চাশ সেন্টের কয়েন পেয়েছিল ট্রলি নিতে গিয়ে। অর্জুন তার তিনটে দিতে ড্রাইভার ব্যালান্স এবং টিকিট দিয়ে বোতাম টিপতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অর্জুন দেখল বাসটা বেশ বড় কিন্তু মাত্র গোটা চারেক লোক বসে আছে। জানলার ধারের সিটে বসে বাইরে তাকাতেই বাস চলতে শুরু করল। খুব আরামদায়ক সিট। এক ডলার কুড়ি সেন্ট মানে ভারতবর্ষের টাকায় অনেক। লোকাল বাসে চল্লিশ টাকার ওপরে ভাড়ার কথা কেউ চিন্তা করতে পারে? অবশ্য এদের কাছে এক টাকা কুড়ি পয়সা মাত্র। ডলার সেন্টকে টাকা এবং পয়সায় ভাবতে পারলে কোনও সমস্যা থাকে না। একশো পয়সায় এক টাকা আর একশো সেন্টে এক ডলার। সুধামাসির টাকায় ডলার কেনা হলেও ওটা যে কিছুতেই ভাবা যাচ্ছে না।

বাস বেশ জোরেই ছুটছে। মাঝে-মাঝে সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে, ড্রাগ-ফ্রি জোন। অর্থাৎ এই এলাকায় কেউ ড্রাগ নেয় না। এ থেকে বোঝা যায় অনেক এলাকা আছে যেখানে ড্রাগের চল রয়েছে। আমেরিকান সরকার চেষ্টা করেও বন্ধ করতে পারছে না? পরপর দুটো স্কুল চোখে পড়ল। ছেলেরা বাস্কেটবল খেলছে। কোনও-কোনও বাড়ির সামনে বাস্কেটবলের স্ট্যান্ড দেখা যাচ্ছে। একটা নির্জন মাঠের মধ্যে বিশাল সাজানো বাড়ির ওপর লেখা রয়েছে 'কে মার্ট'। সামনের পার্কিং লটে প্রচুর গাড়ি। এতবড় বাড়িটা দোকান?

শেষপর্যন্ত জর্জ ওয়াশিংটনে বাস পৌঁছে গেল। বাস থেকে নেমে জিজ্ঞেস করতেই টিউব স্টেশনের হদিস পেয়ে গেল অর্জুন। সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে টানেল দিয়ে সে যখন স্টেশনের দিকে হাঁটছে তখন অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। দশ হাত দূরে-দূরে বিশাল চেহারার নিগ্রো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের পরনে জিন্স এবং জ্যাকেট। দাঁড়িয়ে আছে ঠিক স্ট্যাচুর ভঙ্গিতে, সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গম্ভীর এবং জড়ানো গলায় বলছে, "হে ম্যান, গিম্মি এ ডলার!" শুনলেই বুকটা কীরকম করে ওঠে। দিনদুপুরেই যদি এই অবস্থা হয়, সন্ধের পরে যে কী হবে কে জানে! কিন্তু লোকগুলো নড়ছে না। পাশে হেঁটে বিরক্তও করছে না।

টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকে ট্রেনে উঠতে কোনও অসুবিধে হল না। কিন্তু ট্রেনটায় বেজায় ভিড়। যারা বসে আছে তারা ভাগ্যবান, অর্জুন কয়েকজন সাদার পাশে হাতল ধরে দাঁড়িয়ে পড়তেই নজরে এল। প্রায় সাত ফুট লম্বা এবং তেমনই মোটা একটি কালো যুবক পা ছড়িয়ে সিটের ওপর ঘুমোচ্ছে। তার মাথা এবং পায়ের কাছে খানিকটা জায়গা ছেড়ে যাত্রীরা বসে আছে। যারা দাঁড়িয়ে তারা লোকটাকে কিছু বলছে না। এত লোক যখন কষ্ট করে যাচ্ছে, তখন নিগ্রো ছেলেটা ওভাবে সিট দখল করে ঘুমোচ্ছে কেন এই প্রশ্ন কেউ করছে না। মুখ দেখে অসুস্থ বলে মনেও হচ্ছে না। অর্জুন সহযাত্রীদের দিকে তাকাল। এরা সবাই সাদা। সাদা বলে যে আমেরিকান তা নাও হতে পারে। অর্জুন তার পাশে দাঁড়ানো মধ্যবয়সী ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল কারণটা। লোকটি ইশারা করল চুপ করতে। তারপর নিচু গলায় বলল, "তুমি কি নতুন ?"

অর্জুন মাথা নাড়তেই লোকটি বলল, "আমি এসেছি পাঁচ মাস হল। আমার বাড়ি বেলগ্রেডে। এখন এখানে ধাতস্থ হয়ে গেছি। খবরদার এই কালো মানুষগুলোকে চটিও না। এরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারে।"

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতে কিছু লোক যেমন নামল, অনেক বেশি উঠল। চাপ বাড়ছে। হঠাৎ 'এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি' বলে এক বৃদ্ধা ভিড় কাটিয়ে অর্জুনের সামনে এসে কোনওমতে দাঁড়ালেন। মহিলাটি কালো এবং রোগা। পাঁচ ফুটের বেশি লম্বা নন। তাঁর এক হাতে একটা চামড়ার হাতব্যাগ, অন্য হাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ। সামনে শায়িত যুবককে দেখে তিনি বলে উঠলেন, "এ কী ! এ এখানে শুয়ে আছে কেন ? দেখে তো অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে না। অ্যাই ছোকরা, ওঠো, উঠে বোসো। ভদ্রতাবোধগুলো কি বাড়িতে রেখে এসেছ ?"

যুবকটি কোনও কথা বলা দূরে থাক, চোখও খুলল না।

বৃদ্ধা বললেন, "আচ্ছা ত্যাঁদড় তো। কালা নাকি ?" বলে লম্বা করে ভাঁজ-করা কাগজটাকে লাঠির মতো করে মারতে লাগলেন যুবকের শরীরে। শব্দ হচ্ছিল। এবার যুবক চোখ খুলল। অত্যন্ত বিরক্ত সে। বৃদ্ধা বললেন, "অ্যাই, ওঠ ! এটা তোর বাড়ি পেয়েছিস ? মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দিতে হয় তোর মতো হতচ্ছাড়াদের। ওঠ বলছি।"

পাশের যুগোস্লাভ লোকটি নিচু গলায় বলল, "এইবার বুড়ি মরল।"

লোকটা উঠল। উঠতেই বৃদ্ধা বসে পড়লেন সিটে, "বসুন আপনারা, আরাম করে বসুন।" শেষের কথাগুলো অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। তৎক্ষণাৎ সিটটা ভরে গেল। যুবক দরজার দিকে এগোল। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই নেমে গেল সে নিঃসাড়ে। সিটে বসে পাশের বৃদ্ধার দিকে তাকাল অর্জুন। যে কাজটা করতে কোনও সাদা সাহস পাচ্ছিল না, সেই কাজ

ইনি অবলীলায় করলেন কোন সাহসে ? ভদ্রমহিলা এত রোগা যে, যুবক একটা আঙুলের চাপেই ওঁকে কাহিল করে দিতে পারত। সিটে বসে মহিলা তখন কাগজ খুলে সামনে ধরেছেন। অর্জুন না জিজ্ঞেস করে পারল না, "আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, আপনি এমন সাহসী কী করে হলেন ?"

"সাহসী ? আমি ? দুর, আমি মোটেই সাহসী নই। আমাকে প্যারাসুট নিয়ে প্লেন থেকে নামতে বললে আমি ভয়েই মরে যাব। একটা আরশোলা দেখলে আমি তো প্রায় ভিরমি খাই।"

"তা হলে ওই বিশাল চেহারার লোকটাকে মারলেন কী করে ?"

"ও, এর কথা বলছ ? ও তো অন্যায় করেছিল। কেউ অন্যায় করলে সে মনে-মনে দুর্বল হয়ে যাবে। আর অন্যায় দেখলেই আমার খুব রাগ হয়ে যায়। তোমাদের উচিত ছিল অনেক আগে ওকে উঠিয়ে দেওয়া।" বৃদ্ধা আবার খবরের কাগজে মন দিলেন।

পোর্ট অথরিটি স্টেশনে নেমে ফোনের বুথ খুঁজছিল অর্জুন। হঠাৎ একটা রোগা ঢ্যাঙা নিগ্রো এগিয়ে এল সামনে, "তুমি কোনও হেল্প চাও ?"

"হ্যাঁ। টেলিফোন বুথ— !"

"এসো দেখিয়ে দিচ্ছি।" বলেই ছেলেটা হাঁটতে লাগল। ওকে অনুসরণ করতে না করতেই দেওয়ালে সার-সার টেলিফোন দেখতে পেল অর্জুন। সে ছেলেটাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখল ও হাত বাড়িয়ে রেখেছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ?"

"আমার পারিশ্রমিক। আমি তোমার জন্যে পরিশ্রম করেছি।"

"সে কী !" আঁতকে উঠল অর্জুন।

"এমন ভাব করছ যেন তুমি আমাকে টেলিফোনের কথা বলোনি। ওসব কায়দা ছেড়ে আমাকে একটা ডলার দাও। নইলে আমি সবাইকে ডেকে বলব তুমি কাজ করিয়ে আমাকে ডলার দিচ্ছ না। দাও।"

অর্জুন বাধ্য হল লোকটাকে দুটো পঞ্চাশ সেন্টের কয়েন দিতে। লোকটা যেন কাজ করে পয়সা পেল এমন ভঙ্গিতে চলে গেল। অর্জুন কিছুক্ষণ ওর যাওয়া দেখল। পোর্ট অথরিটি স্টেশন এবং বাস টার্মিনাস বিশাল এলাকা জুড়ে একটি বাড়িই বলা যায়। যে বাড়ির মাটির নীচে এবং ওপরে অনেক তলা আছে। প্রতিটি তলায় বিভিন্ন গেট থেকে লোকাল এবং দূরগামী বাস ছাড়ছে। টিউবরেলও এর নীচ দিয়ে চলে গিয়েছে। এই সময় যাত্রীরা ব্যস্ত পায়ে যে যার কাজে গেলেও বহু নিগ্রো ছেলে ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে, অলস ভঙ্গিতে। বোঝাই যাচ্ছে এদের কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। ওয়াশিংটন স্টেশনে এদের রূপ দেখেছে সে, এখানে অন্য রূপ।

টেলিফোন করতেই মেজর রিসিভার তুললেন, "কে ? অর্জুন ? কোত্থেকে বলছ ?"

"পোর্ট অথরিটি থেকে।"

"বাঃ। এসে গেছ। আমি যাচ্ছি।"

"কিন্তু এটা তো বিশাল জায়গা, আমাকে খুঁজে পাবেন কী করে?"

"দ্যাট্‌স ট্রু। তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ তার সামনে কিছু আছে?"

অর্জুন তাকাল। উলটোদিকেই একটা রেস্টুরেন্ট, যার ওপরে লেখা রয়েছে "পিজা।"

অর্জুন বলল, "পিজা বিক্রি হয় এমন রেস্টুরেন্টের উলটোদিকে টেলিফোনের সামনে আমি দাঁড়িয়ে আছি। কতক্ষণ লাগবে আপনার?"

"দশ মিনিট।"

কয়েক পা সরে এসে অর্জুন অপেক্ষা করতে লাগল। যে ছেলেটি তার কাছে ডলার চেয়েছিল তাকে দেখতে পেল এক এশীয় ভদ্রলোকের পাশাপাশি কথা বলতে-বলতে হেঁটে যেতে। ভদ্রলোকের আঙুলে সিগারেট ছিল। যেই তিনি হাত তুলেছেন ওই সিগারেটে টান দিতে, অমনই ছেলেটি ঝট করে তাঁর কবজিতে আঘাত করল। সঙ্গে-সঙ্গে সিগারেটটা ছিটকে ওপরে উঠে গেল। ছেলেটি অত্যন্ত দক্ষ ফিল্ডারের মতো সেটা লুফে নিয়ে টানতে-টানতে অন্যদিকে চলে গেল। ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে ওর যাওয়া দেখলেন, তারপর দ্রুত নিজের পথে চলতে লাগলেন।

বোঝাই যাচ্ছে এই কালো ছেলেগুলো খুব গরিব। চাকরি পায়নি। কোথায় যেন পড়েছিল এরা পড়াশুনা করতে তেমন আগ্রহী নয়। গরিব মানুষ আমাদের দেশেও আছেন। কিন্তু তাঁরা পরিশ্রম না করে এইভাবে নিজের প্রয়োজন মেটান না। অথচ ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় অর্জুন আঙ্কল টম্‌স কেবিন পড়েছিল। পড়তে-পড়তে সে কেঁদেছিল। আঙ্কল টম তার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। সেই কালো মানুষটির ওপর যেসব সাদা অত্যাচার করেছিল তাদের জন্যে ঘৃণা তৈরি হয়েছিল। আফ্রিকা থেকে কালো মানুষের দলকে ক্রীতদাস করে নিয়ে এসে সাদারা কী ভয়াবহ অত্যাচার করে গিয়েছে বছরের পর বছর। ফলে কালো মানুষদের প্রতি সহানুভূতি এবং ভালবাসা তৈরি হয়েছিল অর্জুনের মনে। অথচ আজ এদের আচরণ দেখে আতঙ্ক হচ্ছে। ওই বিশাল চেহারা নিয়ে তারা তো যে-কোনও কাজ করতে পারত। তা না করে এভাবে ঠকাচ্ছে অথবা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ভিক্ষে চাইছে? সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল অর্জুনের।

"হাই!" হেঁড়ে গলায় চিৎকারটা ভেসে আসতেই অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল মেজর দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন। আর একটু মোটা হয়েছেন ভদ্রলোক। প্যান্টের ওপর টাইট গেঞ্জিশার্ট পরায় ভুঁড়ি আরও প্রকট হয়েছে। মুখ ঢাকা জঙ্গলে দাড়িতে সাদা ছোপ ছড়িয়ে পড়েছে। কাছে এসে দু'হাতে তিনি এত জোরে জড়িয়ে ধরলেন যে, হাঁসফাস করতে লাগল অর্জুন।

প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কমে গেলে মেজর বললেন, "ব্যাপার কী হে ? প্যাঁচার মতো অন্ধকারে আমেরিকায় উড়ে এলে ? আগাম একটা খবরও দাওনি ?"

হঠাৎই আসতে হল। পরিচিতা এক বয়স্কা মহিলার মেয়ে এখানে থাকেন। তাঁর স্বামী দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আসতে হল।"

"অ। এসকর্ট। তিনি এখন কেমন আছেন ?"

"আগের থেকে ভাল।"

"তা হলে এবার কোনও রহস্য সমাধানের দায়িত্ব নেই ?"

অর্জুন হাসল, "না। আপনি কেমন আছেন ?"

"ভাল। খুব ভাল। মাস তিনেক আগে প্রশান্ত মহাসাগরের নীচে গিয়েছিলাম নতুন ধরনের শ্যাওলা খুঁজতে। আবার দু'মাস বাদে যাচ্ছি উত্তরমেরুতে।"

"তাই ?"

"ইয়েস ব্রাদার। তোমার মিস্টার সোম কেমন আছেন ?"

"আছেন। একটু সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব এসে গেছে।"

"তাই নাকি ! এ আবার কী কথা। চলো আমার ওখানে চলো। একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।" মেজর হাঁটা শুরু করতেই অর্জুন তাঁকে অনুসরণ করল। পোর্ট অথরিটির বাইরেই ম্যানহাটান। সেই বিখ্যাত ম্যানহাটান, যার নাম সিনেমা এবং বইয়ের কল্যাণে অনেক বাঙালির জানা। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে গিয়ে সেই দৃশ্য আবার দেখতে পেল অর্জুন। বিশাল বিশাল চেহারার নিগ্রো হয় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে, নয় ফুটপাথে পা ছড়িয়ে বসে আছে। সামনে দিয়ে কেউ গেলেই পয়সা চাইছে। এদের কারও চেহারা দেখে মনে হয় না অনাহারে আছে। অর্জুন কথাটা বলতেই মেজর খেপে গেলেন, "এই পাজি শয়তান আহাম্মক হিপোদের কথা আমাকে বোলো না তো ! আমেরিকার কলঙ্ক এরা। প্রত্যেকে বেকার ভাতা পায়। সেটা পেয়েই ড্রাগ কেনে আর উড়িয়ে দেয়। দশদিন বাদে হাত খালি হতেই সারাদিন এখানে দাঁড়িয়ে থাকে নবাবপুত্তুরের মতো। ভিক্ষে হল তো ভাল, নইলে সন্ধে নামলেই ছিনতাই শুরু করে।"

"পুলিশ কিছু বলে না ?"

"নিশ্চয়ই বলে। কিন্তু মুশকিল হল এরা জেলে যেতে ভালবাসে।"

"সে কী !" অর্জুন অবাক !

"এখানকার জেলে কয়েদিরা জামাই আদরে থাকে হে। রীতিমতো ভাল খাবার, টিভি, ব্যায়াম, কী নেই ! ভেতরে ঢুকে ওখানকার কয়েদি-নেতাকে সেলাম করলে একদম নিশ্চিন্ত। শুনেছি জেলে বসে ড্রাগও পেয়ে যায় ওরা।"

পার্কিংলটের দিকে এগিয়ে গেলেন মেজর। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু এভাবে চললে কালোদের প্রজন্ম শেষ হয়ে যাবে না?"

"খুব স্বাভাবিক। তবে এরাই সব নয়। প্রচুর কালো মানুষ আছেন যাঁরা পড়াশুনা করে ভাল চাকরি বা ব্যবসা করছেন। এই নিউ ইয়র্ক শহরের মেয়র একজন কালো মানুষ ছিলেন। ওঁদের মধ্যে থেকে খেলোয়াড়, অ্যাথলেট, বক্সার, অভিনেতা এবং কবি উঠে এসেছেন। তাঁরা না থাকলে আমেরিকার গৌরব বাড়ত না। অতএব এই যাদের দেখলে, তারাই সব নয়।" মেজর গাড়ির দরজা খুললেন।

গাড়িতে বসে অর্জুনের মনে হল, কথাটা ঠিক। জনসন নামেই দু'জন বিখ্যাত অ্যাথলেট আছেন, একজন পৃথিবীবিখ্যাত বাস্কেটবলার। আমেরিকার যে দলটা ওলিম্পিক বা ওয়ার্ল্ড কাপে অংশ নেয় তার অধিকাংশই কালো মানুষ। পৃথিবীর অন্যতম শ্রদ্ধেয় মানুষ মার্টিন লুথার কিং অথবা গায়ক পল রবসন কালো মানুষ। তা হলে?

মেজর থাকেন যে-বাড়িতে সেটি পনেরো তলা। গাড়ি পার্ক করে ওরা লিফ্‌টের দিকে এগোচ্ছিল। হঠাৎ অর্জুনের মনে পড়ল লকেটটার কথা। সে জিজ্ঞেস করল, "মেজর, আপনি তো পৃথিবীর অনেক দেশ, বিশেষ করে আফ্রিকায় অনেকবার গিয়েছেন। সেখানে এমন কোনও লকেটের কথা শুনেছেন যেটা সাপের আকৃতি নিয়ে আছে এবং যার চোখের পাথরের নীচে মারাত্মক বিষ রাখা ছিল।"

"নো। নেভার। শুনিনি তো! তুমি দেখেছ?"

অর্জুন জামার ভেতর থেকে লকেট বের করে মেজরকে দেখাল। মেজর ঝুঁকে ওটা দেখতে-দেখতে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক। কী দিয়ে তৈরি এটা?"

"বলতে পারব না।"

"ঠিক আছে। এ-বাড়িতে একজন আফ্রিকান-আমেরিকান থাকেন। খুব পণ্ডিত মানুষ। আফ্রিকার আদিবাসীদের ওপর অনেক কথা জানেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো কিছু জানা যাবে।" ঘড়ি দেখলেন মেজর, "মিস্টার মালাম্বাকে বোধ হয় এখন ওঁর ফ্ল্যাটেই পেয়ে যেতে পারি।"

লিফ্‌টের পাশে ঝোলানো টেলিফোনে কথা বললেন মেজর। তারপর রিসিভার রেখে বললেন, "চলো, আমি দশতলায় আর উনি আটতলায়।"

আটতলায় লিফ্‌ট থামতেই মেজর বেরিয়ে একটা দরজার কাছে পৌঁছতেই সেটা খুলে গেল। অর্জুন দেখল বেশ বৃদ্ধ একজন মানুষ হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। মেজর মুখ খোলার আগেই তিনি বললেন, "ওয়েলকাম। ভারতীয় ভদ্রলোকদের জন্যে যদি কিছু করতে পারি তা হলে গৌরবান্বিত বোধ করব।"

॥ ৭ ॥

মিস্টার আলাম্বার বয়স সত্তরের ওপরে। মাথায় পাকা চুল, রোগা এবং মুখে মিষ্টি হাসি লেগেই রয়েছে। আফ্রিকার মানুষ বলে গায়ের রং কালো কিন্তু আজ নিউ ইয়র্কে যেসব ভয়ঙ্কর চেহারার কালোকে অর্জুন দেখেছে, তাদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। মিস্টার আলাম্বার পরনে ফুলপ্যান্ট এবং ফতুয়া গোছের রঙিন জামা। অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তিনি ওদের বসতে বললেন।

মেজরের সঙ্গে পাশাপাশি সোফায় বসল অর্জুন। উলটোদিকে মিস্টার আলাম্বা। অর্জুন দেখছিল এই ঘরটি আফ্রিকার বিভিন্ন রকমের শিল্পদ্রব্যে সাজানো। কাঠের সরু অথচ প্রায় সাত ফুট দুটি নারী-পুরুষ মূর্তি চোখে পড়ার মতো।

মেজর পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এ হল আমার জুনিয়ার বন্ধু অর্জুন। ইন্ডিয়ার পূর্বপ্রান্তে হিমালয়ের নীচে একটি শহরে থাকে। অর্জুন একজন সত্যসন্ধানী। অনেকবার আমি ওর সঙ্গে কাজ করেছি।"

মিস্টার আলাম্বা চোখ বড় করলেন, "তাই নাকি ? এ তো খুব ভাল খবর। আপনি ভগবানে বিশ্বাস করেন অর্জুন ?"

অর্জুন হাসল, "যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের অমর্যাদা করি না।"

ভদ্রলোককে খুব চিন্তিত দেখাল, "ও, আই সি।"

অর্জুন বলল, "আমাকে আপনি ভুল বুঝবেন না। আমি নাস্তিক নই। যখন আমাদের পুজো হয় তখন ভগবানের প্রতীক হিসেবে যে মূর্তিগুলো পূর্বপুরুষরা তৈরি করেছেন তাঁদের দিকে হাতজোড় করে নমস্কার করতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু কোনও কাজে সফল হওয়ার জন্যে নিজে উদ্যোগী না হয়ে ভগবানের ওপর ভরসা করে বসে থাকাটাকে আমি ঘৃণা করি। আপনি নিশ্চয়ই মাদার টেরিজার নাম শুনেছেন। অসহায় মানুষের উপকার করার জন্যে তিনি প্রতিনিয়ত ভগবানকে স্মরণ করেন। মানুষের উপকার যদি ভগবানকে স্মরণ করলে সম্ভব হয় আমি নিশ্চয়ই সেটা করতে রাজি আছি। তবে আমার কাছে মাদার ভগবান।"

মিস্টার আলাম্বার মুখ এবার হাসিতে ভরে গেল। মাথা নাড়লেন তিনবার, তারপর বললেন, "আপনি সত্যসন্ধানী। আফ্রিকা আমার মহাদেশ। একদিকে মোজাম্বিক আর জিম্বাবোয়ে, অন্যদিকে অ্যাঙ্গোলা, জাইরে আর তানজানিয়া, মাঝখানে আমার দেশ জাম্বিয়া। লিভিংস্টোন নামের এক শহরের কাছে আমার বাড়ি। প্রায় প্রতি বছর আমি আমার দেশের বাড়িতে গিয়ে এক মাস করে থাকতাম। কিন্তু গতবছর যেতে পারিনি। এবারও যাওয়া হবে না।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ?"

"দু'বছর আগে দিনপাঁচেক বাড়িতে থেকে বত্সওয়ানা গিয়েছিলাম।

আফ্রিকার উপজাতিদের শিল্প নিয়ে অনেক পড়াশোনা করেছি। বত্সওয়ানার গ্যাবর্নেতে পৌঁছে দু'দিন ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। পাশেই কালাহারি মরুভূমি। মরুভূমি পেরিয়ে বেদুইন, যাযাবরের দল গ্যাবর্নে আসে বিশ্রামের জন্যে। সেই সুযোগে কেনাবেচা চলে। কালাহারিতে এখনও কিছু হিংস্র উপজাতি রয়েছে। তারা সাধারণত শহরে আসে না। একদিন বাজারে এলোমেলো ঘুরছি, একটি লোককে দেখলাম কাঁধে ব্যাগ নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে। লোকটা যে মরুভূমির উপজাতিদের একজন তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। লোকটি একটি কিউরিও-শপে ঢুকে যেতে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। সম্ভবত দোকানদার তখন দোকানে ছিল না। একটি বাচ্চা ছেলে কাউন্টারে ছিল। লোকটি তাকে নিচু গলায় কিছু বললে সে জিনিসটা দেখতে চাইল। আমি তখন দোকানের অন্য জিনিস মন দিয়ে দেখার ভান করছিলাম। আড়চোখে দেখলাম লোকটা একটা কালো চকচকে জিনিস দেখাচ্ছে। ছেলেটার সেটা ঠিক পছন্দ হল না। লোকটা একটু অনুরোধ করায় ছেলেটা যা দাম বলল তা শুনে জিনিসটা ব্যাগে ঢুকিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। আমি সঙ্গে-সঙ্গে ওকে অনুসরণ করে একটু নির্জন জায়গায় গিয়ে ধরে ফেললাম। বললাম, 'তুমি যে জিনিস বিক্রি করতে চাইছ তা যদি আমার পছন্দ হয় তা হলে কিনে নিতে পারি। জিনিসটা দেখাও।'

"লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পরিচয় জানতে পারি?'

"বললাম, 'আমার নাম আলাম্বা। আমি লিভিংস্টোন শহরের কাছে থাকি। বিরল জিনিস সংগ্রহ করার শখ আছে বলে দেখতে চাইছি।'

"লোকটা বলল, 'যে জিনিস আপনাকে দেখাব তা খুব মূল্যবান। শহরের লোক এর মূল্য ঠিক বুঝবে না। কিন্তু গ্রাম জঙ্গল, মরুভূমির লোক এই জিনিসকে ভয় যেমন করে, ভক্তিও।'

"সে ব্যাগ থেকে যা বের করল তাকে আমি সহজেই চিনতে পারলাম। ওটা একটা ব্ল্যাক কোবরার মাথা এবং শরীরের অংশ। বাকিটা, লেজের দিকটা নেই। কালো পাথরজাতীয় কোনও বস্তু খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। এক সময় এই অঞ্চলের মানুষের কাছে সাপ, বিশেষ করে এই সাপ ভগবানের প্রতিনিধি ছিল। যখন আমেরিকার জন্যে শ্রমিক সংগ্রহ করতে ক্রীতদাস করে এদের নিয়ে যাওয়া হয় তখন ওই ধারণাটাই চালু ছিল। পরবর্তীকালে স্বাধীন আমেরিকার কিছু কালো মানুষ ওই সাপকে কেন্দ্র করে একটি সঙ্ঘ তৈরি করে বলে শুনেছি। তা লোকটির সঙ্গে দরাদরি করে আমি পাথরের সাপটিকে কিনে ফেললাম। ইঞ্চি আটেকের ওই পাথুরে বস্তুটির ওজন বেশি নয়। বড়জোর দেড় পাউন্ড।

"পরদিন কাগজে দেখলাম সেই লোকটি খুন হয়ে গেছে। যে ডেরায় সে উঠেছিল সেখানে এসে কেউ তাকে খুন করে গেছে। লোকটার ছবি ছাপিয়ে

পুলিশ অনুরোধ করেছে কেউ যদি কোনও হদিস জানে তা হলে অবিলম্বে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। লোকটির মৃতদেহের পাশে একটা কাগজে লেখা ছিল, 'ভগবানকে যে চুরি করে কাছে রাখবে তারই এই দশা হবে।'

"আমি সেদিনই বত্সওয়ানা ছেড়ে জাইরেয় ফিরে এলাম।"

মিস্টার আলাম্বা থামতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওরা কিছু জানতে পেরেছে ?"

"আমি ঠিক জানি না। তবে সেবার দেশের বাড়িতে থাকার সময়েই টের পেলাম অচেনা কিছু লোক গ্রামের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের লোকজন তাদের তাড়িয়ে দিলেও তারা শাসিয়ে গিয়েছে আবার ফিরে আসবে বলে। আমি আর ঝুঁকি নিলাম না। রাতের অন্ধকারে গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে এলাম লুসাকায়। সেখান থেকে হারারে পৌঁছে প্লেন ধরলাম। জাম্বিয়ার কোনও এয়ারপোর্টে যাওয়ার ভরসা পাইনি।"

"সেই সাপটি আপনার এ-ফ্ল্যাটে এখনও আছে ?"

"হ্যাঁ আছে। আমি তোমাদের বিশ্বাস করেছি, কারণ তোমরা হিন্দু, ভারতবর্ষের মানুষ। তা ছাড়া তুমি সত্যসন্ধানী। আশা করি এসব কথা তোমরা গোপনেই রাখবে। আমি খুব বিব্রত হয়ে আছি। কারও সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ পাইনি। তোমাদের এ-কথা বলার কারণ সেটাও। এসো আমার সঙ্গে।"

মিস্টার আলাম্বা তাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকতেই দৃশ্যটি দেখতে পেল ওরা। টেবিলের ওপর একটি কাচের বাক্সে আলো জ্বালা রয়েছে। তার মধ্যে সেই লেজ খসে যাওয়া সাপটিকে রেখেছেন মিস্টার আলাম্বা। সাপের মুখের কাছে একটা ছোট বাটিতে দুধ দেওয়া হয়েছে।

সাপটিকে খুঁটিয়ে দেখছিল অর্জুন। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "পাথরের সাপকে দুধ দিয়েছেন কেন ? ও দুধ খাবে নাকি ? হা হা হা !"

মেজরের হাসি থামলে মিস্টার আলাম্বা বললেন, "বেশ কিছুদিন আগে টিভিতে দেখেছিলাম ভারতবর্ষের এক হিন্দু দেবতা যাকে হাতির মতো দেখতে তাঁর পাথরের মূর্তি নাকি দুধ খেয়ে নিচ্ছে অবলীলায়। এটা কি সত্যি ?"

মেজর হকচকিয়ে গেলেন, "হ্যাঁ, আমিও শুনেছি। তবে ব্যাপারটা বুজরুকি।"

"আপনি বুজরুকি মনে করলেও যারা দুধ খাইয়েছিল তারা মনে করেছে যে, ভগবান তুষ্ট হয়ে দুধ খেয়েছেন। মরুভূমিতে সাপকে যারা ভগবান মনে করে তারা নিয়মিত উটের দুধ দিয়ে পুজো করে। এক বাটি দুধ দিলে যদি তাদের ওই সংস্কারটাকে মান্য করা যায় তাতে কোনও দোষ তো আমি দেখি না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি যে আমেরিকায় থাকেন তা নিশ্চয়ই আপনার গ্রামের মানুষজন জানেন। আপনার আত্মীয়স্বজনের ওপর চাপ দিলে এই

ফ্ল্যাটের ঠিকানা পেতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এই দু' বছরে ওরা এখানে যখন পৌঁছয়নি তখন বোঝা যাচ্ছে সেই ক্ষমতা ওদের নেই।"

"আপনি ভুল করছেন মিস্টার অর্জুন। এই দু' বছরে আমি ঠিক পাঁচবার ফ্ল্যাট পালটেছি। কোথায় কোন ফ্ল্যাটে যাচ্ছি তা বলে আসিনি। এখানে এসেছি মাস পাঁচেক হল। আমি এখন অবসরে আছি। কাগজে প্রবন্ধ লিখে যা পাই আর জমানো টাকার সুদে ভালই চলে যায় আমার। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে যাই না। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় লিফ্‌টে। একটি সাদা ছেলে মাতাল হয়ে আমাকে খারাপ কথা বলছিল লিফ্‌টে ওঠার সময়। উনি সতর্ক করেন তাকে। সে-কথা কানে না নিয়ে আরও খারাপ গালাগাল করলে উনি তাকে উত্তমমধ্যম দেন। শেষপর্যন্ত ছেলেটি ক্ষমা চাইলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই সময় আমাদের পরিচয় হয়। কোনও ভদ্রলোক দীর্ঘকাল এইভাবে প্যাঁচার মতো বাস করতে পারে না। আমরা দু'বার পরস্পরের ফ্ল্যাটে গিয়েছি। উনি অভিযাত্রী। পৃথিবীর রহস্য উদ্ধার করতে এই বয়সেও কত আগ্রহ ওঁর। যাই হোক, ওদের ক্ষমতাকে ছোট চোখে দেখা ঠিক নয়। ধর্মবিশ্বাস যখন অন্ধ হয় তখন মানুষ পারে না এমন কাজ নেই।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি পুলিশকে জানাচ্ছেন না কেন?"

"আমি প্রথমে ভেবেছিলাম জানাব। কিন্তু পরে মনে হল, তাতে কোনও লাভ হবে না। পুলিশ আমাকে কতদিন পাহারা দিয়ে থাকবে? বরং, তারা উদ্যোগী হলে লোকে আমার অস্তিত্ব জেনে যাবে। হ্যাঁ, এখানে যদি ওরা এসে পড়ে তখন পুলিশকে জানাতেই হবে।" মিস্টার আলাম্বাকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

মেজর ভরসা দিলেন, "সেটা কখনওই ঘটবে না মিস্টার আলাম্বা। কালাহারি মরুভূমির কিছু মানুষের পক্ষে এই নিউ ইয়র্ক শহরে এসে আইনবিরুদ্ধ কাজ করা সম্ভব হবে না। এ নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা করবেন না।"

মিস্টার আলাম্বা মাথা নাড়লেন, "ওদের এখানে আসার দরকার নেই। এই আমেরিকায় খ্রিস্টান হয়ে যাওয়া অনেক কালো মানুষের রক্তে ওই ধর্মবিশ্বাস এখনও সক্রিয়। যে-সমস্ত কালো মানুষকে জাহাজে তুলে ক্রীতদাস হিসেবে এখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের উত্তরপুরুষদের কেউ কেউ এখনও মনে করে আফ্রিকাই তাদের দেশ। ক্রীতদাস প্রথা লোপ করে যখন কালোদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া হল তখন অনেকেই পূর্বপুরুষের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করে। এখানকার স্বাচ্ছন্দ্য ওখানে পাওয়া যাবে না, এখানকার রোজগার ওখানে হবে না, তাই আফ্রিকায় ফিরে যেতে অনেকেই চায়নি। যায়ওনি। কিন্তু আফ্রিকানদের যাওয়া-আসা আরম্ভ হয়ে গেল। এবার নিশ্চয়ই আপনারা আমার বক্তব্য বুঝতে পারছেন!"

এবার অর্জুন মাথা নাড়ল, "বুঝলাম। কিন্তু মিস্টার আলাম্বা, আপনি কালাহারি মরুভূমি থেকে বেশি দূরে থাকেন না। ওখানকার মানুষের ধর্মবিশ্বাস

থেকে আপনি মুক্ত হয়ে আছেন কী করে ?”

“আমি পড়াশোনা করেছি বিদেশে। ফিরে গিয়েছিলাম গবেষকের চোখ নিয়ে। যা দেখেছি তা বিশ্লেষণ করেছি বাস্তবের ওপর দাঁড়িয়ে। তারপর এখানে অধ্যাপনা করার সময় বারংবার গিয়েছি সেখানে। কুয়ো থেকে বেরিয়ে এসে পুকুরে স্নান করলেই বোঝা যায় পার্থক্য কী ! সেটা বুঝেছিলাম বলেই ওই অন্ধবিশ্বাস আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি।”

“আচ্ছা, ওই সাপের মূর্তি যাদের সম্পত্তি তাদের কাছে ফেরত পাঠানো যায় না ?”

“আমি সে-কথাই বলতে চাইছি। স্রেফ কৌতূহলে আমি ওটা কিনেছিলাম। ভেবেছিলাম ওটাকে কিউরিও হিসেবে রাখব। পরে যখন পরিস্থিতি এরকম হল তখন ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি। আমার কাছে ওটাকে রেখে জীবনের ঝুঁকি নেওয়া তো বোকামি। কিন্তু সমস্যা হল, কাকে ফেরত দেব ? মরুভূমির কোন উপজাতি ওর সত্যিকারের মালিক ? এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই।”

মেজর বললেন, “আপনি ওটাকে আমেরিকান মিউজিয়ামে দিয়ে দিতে পারেন। ওরা ইতিহাস জানলে সাগ্রহে নেবে।”

মিস্টার আলাম্বা বললেন, “ঠিক। কিন্তু চিরজীবনের জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় আমার ওপর ওদের রাগ আরও বেড়ে যাবে।” ভদ্রলোক হাসলেন, “মিস্টার অর্জুন। আপনার বয়স অল্প। আফ্রিকা সম্পর্কে আপনার কতটুকু ধারণা আছে তা আমি জানি না। কিন্তু আপনি তো সত্যসন্ধানী। আমার জন্যে এই সত্যটির সন্ধান করে দিতে পারেন ? ওই মূর্তির প্রকৃত মালিক কারা ?”

মেজর বললেন, “তার জন্যে তো আফ্রিকায় যেতে হবে ?”

“হ্যাঁ। সে সমস্ত খরচ আমি বহন করব। আর আপনি যদি সফল হন তা হলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হবেন না।”

অর্জুন বলল, “এই মুহূর্তে আপনাকে আমি কোনও কথা দিচ্ছি না। আমাকে ভাবতে হবে। অন্তত একটা দিন আমার সময় চাই।”

“বেশ। তাই হবে। এই নিন আমার কার্ড। আগামীকাল যে-কোনও সময়ে ফোন করবেন। নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি বাইরে যাই না। যাক গে, অনেক কথা বলেছি। এবার বলুন, কী খাবেন ? চা, না কফি ?”

অর্জুন কিছু বলার আগেই মেজর বললেন, “অনেক ধন্যবাদ। অর্জুন আজ প্রথমবার আমার কাছে এসেছে। ওকে আমিই খাওয়াব। ইচ্ছে হলে আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন।”

মিস্টার আলাম্বা বললেন, “আজ থাক। অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু, এই দেখুন, আসল কথাটাই আমি জিজ্ঞেস করিনি। আমার কাছে ওঁকে কীজন্যে নিয়ে এসেছিলেন ? কোনও প্রয়োজন ?”

মেজর বললেন, "সে তো বটেই। কিন্তু আপনার সমস্যা এত তীব্র যে, আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম কথাটা। অর্জুন বলো!"

অর্জুন গলা থেকে লকেটটা খুলে সামনে ধরল, "এরকম জিনিস আগে দেখেছেন?"

মিস্টার আলাম্বার চোখ ছোট হয়ে এল। অর্জুন লক্ষ করল একটু-একটু করে তাঁর ঠোঁটে কাঁপুনি শুরু হল। শেষপর্যন্ত তিনি বলে উঠলেন, "মাই গড!"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

প্রায় ছোঁ মেরে লকেটটা হাতে নিয়ে ঝুঁকে পড়লেন ভদ্রলোক। উলটেপালটে খুঁটিয়ে দেখে তাকিয়ে উঠে গেলেন দেওয়ালজোড়া র‍্যাকে সাজানো বইয়ের সামনে। তিন-চারটে বই হাতড়ে পাতা ওলটাতে লাগলেন। তাঁকে খুব উত্তেজিত দেখাছিল। শেষপর্যন্ত একটি পাতায় তিনি স্থির হলেন। খানিকটা পড়ে আবার লকেট দেখে ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার আলাম্বা, "এই লকেট আপনি কোথায় পেয়েছেন?"

অর্জুন গোরক্ষনাথের ব্যাপারটা বলল। "গোরক্ষনাথের গুরুদেব আফ্রিকার কোনও বন্দর থেকে এই লকেটটি সংগ্রহ করে। সেটা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় লোকটির প্রাণসংশয় হয়। কোনওমতে পালিয়ে জাহাজে ওঠে সে। কিন্তু সেই জাহাজ সমুদ্রে ডুবে যায়। তবে লোকটি কোনওরকমে বেঁচে যায়। ওর শিষ্য গল্প বলেছে যে, কাঠ ভেবে সাপকে জড়িয়ে ভেসে ছিল লোকটা। এটা আমি বিশ্বাস করি না। যা হোক তারপর থেকে এই লকেটটাকে খুব পুজো করেছে লোকটা। এইটুকু আমি জানি।"

মিস্টার আলাম্বা এগিয়ে এলেন বই আর লকেট নিয়ে। "এই দেখুন, এই স্কেচটার সঙ্গে লকেটের কী মিল!"

ওরা দেখল। সত্যি, এই লকেটের সাপের সঙ্গে স্কেচের সাপের পার্থক্য নেই বললেই চলে। মিস্টার আলাম্বা বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার। আমার কাছে যে সাপের মূর্তি রয়েছে সেটাও এই শ্রেণীর সাপ। মুখের গঠন এক। কিন্তু ভঙ্গি আলাদা। এরা অত্যন্ত বিষধর সাপ।"

অর্জুন বলল, "কাল রাত্রে টিভিতে বারংবার সাপের কথা বলা হচ্ছিল। আমি যখন এয়ারপোর্টের কাস্টম্‌সকে লকেটটা দেখাই তখন একটা লোক এটাকে দেখতে পায়। পরে লোকটা কাছে এসে ভাল করে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমি জানি না তার কাছ থেকে খবর পেয়েই হয়তো টিভিতে বারংবার আবেদন করা হয়েছে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।"

"হয়তো। কারণ এই বইতে লেখা হয়েছে আফ্রিকার নীচের দিকের দেশগুলোর উপজাতিরা একসময় এই সাপকে ভগবান বলে মনে করত। ওদের এক দলের সর্দার স্বপ্নে আদেশ পায় সর্পদেবতা মাটিতে পোঁতা আছেন। সেই সাপটিকে তিনি উদ্ধার করেন। অদ্ভুত ধাতব বস্তুতে তৈরি সেই সাপ। ওটা

পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সেই সর্দার এবং তার দলের উন্নতি হতে শুরু করে। অন্য দলগুলো ঈর্ষা করছে বুঝে সর্দার ঠিক এর ডুপ্লিকেট সাপ তৈরি করে। কিন্তু সেটি স্লেট পাথরের তৈরি বলে পার্থক্য বোঝা যায়। মূল সাপের মূর্তির চোখের তলায় একটি গর্ত আছে, যার মধ্যে কোবরার বিষ সঞ্চিত ছিল। ওই আসল মূর্তি চুরি হয়ে যায় সর্দারের মৃত্যুর পর। নকলটির মালিকানা নিয়েও ঝামেলা হয়। কিন্তু আসলটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা তখন আর- একটি বড় পাথরের সাপ তৈরি করে পুজো শুরু করলেও আসলটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।" পড়া শেষ করে লকেটটাকে ওপরে তুলে মিস্টার আলাম্বা বললেন, "এই সেই আসল সাপ।"

॥ ৮ ॥

মেজরের ফ্ল্যাট মাত্র দোতলার ওপরে কিন্তু ওই ফ্ল্যাটে পা দেওয়ামাত্র সমুদ্রের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। নিউ ইয়র্কের গায়ে যে সমুদ্র তার আওয়াজ নীচের ফ্ল্যাটে না গিয়ে ওপরের ফ্ল্যাটে এত জোরে আসছে কী করে?

মিস্টার আলাম্বা মেজরের অনুরোধে সঙ্গে এসেছিলেন। অর্জুনের প্রশ্ন শুনে হেসে বললেন, "ওটা সমুদ্রের আওয়াজ নয়। হাওয়ার শব্দ। এই দিকটায় সারা দিনরাত প্রবল বাতাস বয়ে যায় এই সময়।" একটা সোফায় বসে পড়লেন তিনি।

মেজর অর্জুনকে বললেন, "এই ফ্ল্যাটে আগেরবার আসোনি তুমি। কেমন লাগছে বলো? একজন অভিযাত্রী যখন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম খোঁজে তখন এখানে এসে ক'দিন জিরিয়ে যায়। এখানে আমি সত্যি আনন্দে থাকি। তবে ওই ম্যাক্সিমাম তিন-চার মাস। ওয়েল মিস্টার আলাম্বা, আপনি আপসেট হয়ে পড়ছেন কেন? অর্জুনকে যখন আপনার কেসটা দিয়েছেন তখন নিশ্চিন্তে গল্প করুন।"

"নিশ্চিন্ত আমার পক্ষে হওয়া সম্ভব নয়। ধর্মবিশ্বাস মানুষকে কী ভয়ঙ্কর করে দেয়, তা আমি জানি। যুক্তি লোপ পেয়ে যায়, ভদ্রতা, মানবতাবোধ উধাও হয়ে যায়। সে তখন একটা বীভৎস রোবট মাত্র।" মিস্টার আলাম্বা অসহায় গলায় বললেন।

মেজর বললেন, "আপনার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তা হলে আমার এখানে কিছুদিন থাকতে পারেন।"

"আপনার এখানে? তাতে কী লাভ?"

"ওরা চট করে আপনাকে খুঁজে পাবে না। আর আপনারও একা মনে হবে না।"

"যারা এ-বাড়িতে আমার সন্ধানে একবার আসবে, তারা এখানে পৌঁছতে

পারবে না এমন ভাবা ভুল হবে। তা ছাড়া এখানে আমি কী নিয়ে বাঁচব? আমার সমস্ত বইপত্র ওই ফ্ল্যাটে! আমার প্রিয় সংগ্রহগুলো ওখানে। ওদের ছাড়া আমার পক্ষে থাকা অসম্ভব। না, না। আপনারা যে আমার সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছেন তাতেই আমার ভাল লাগছে। রোজ যদি দয়া করে একবার ফোন করেন তা হলে একটা উপকার হবে। ফোন না তুললে জানবেন আমি মরে গেছি। তখন যা করার— !" হঠাৎ মিস্টার আলাম্বা একদম অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন, "আমি একটু চা খাব !"

"নিশ্চয়ই।" মেজর কিচেনের দিকে চললেন।

"টি-ব্যাগের চা নয়। আমি শুনেছি পূর্ব ভারতের মানুষজন চায়ের পাতা জলে ভিজিয়ে খেতে ভালবাসেন। সেটা তাঁরা এখানে দেশ থেকে আনিয়েও রাখেন।"

মেজর মাথা নোয়ালেন, "ঠিকই শুনেছেন। আমার সংগ্রহে দার্জিলিং জেলার বিখ্যাত চা আছে। একটু সময় দিন, আপনারা কথা বলুন।" মেজর চোখের আড়ালে চলে যেতেই মিস্টার আলাম্বা খপ করে অর্জুনের হাত ধরে বললেন, "আপনি আমার কাছে এসে থাকলে আমার প্রাণের ভয় থাকবে না।"

"আমি?" অর্জুন হকচকিয়ে গেল।

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমার পক্ষে ক'দিন এখানে থাকা সম্ভব ?"

"তা হলে ওই লকেটটা আমাকে দিন। অন্তত কিছুদিনের জন্যে। ওই লকেট আমার গলায় থাকলে ওরা কিছুতেই খুন করতে পারবে না।" মিস্টার আলাম্বার চোখ চকচক করতে লাগল।

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। মিস্টার আলাম্বা যখন কথা বলছিলেন তখন তাঁর চোখ কেবলই চলে যাচ্ছিল কিচেনের দরজার দিকে। অর্থাৎ উনি মেজরকে এ-ঘর থেকে সরিয়ে প্রস্তাবটা দিলেন। কেন?

অর্জুন বলল, "আমি একটু ভেবে দেখি।"

"এতে নতুন কিছু ভাবার নেই মিস্টার অর্জুন। ওই লকেটটা আপনার কাছে কিছু নয়। একটা খেলনা। আপনার ধর্মের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। অথচ এই আমেরিকায় অনেক কালো মানুষ ওটাকে দেবতা বলে এখনও মনে করে। আপনি তো আমার কেস নিয়েছেন। বেশ, আপনার পারিশ্রমিক আমি বাড়িয়ে দেব।" আবার হাত ধরতেই মেজরের গলা পেয়ে নিজেকে সংযত করলেন বৃদ্ধ।

চায়ের ট্রে দু'হাতে নিয়ে এসে টেবিলে রাখলেন মেজর। রেখে বললেন, "এখন আমরা স্বচ্ছন্দে আমার যৌবনের দার্জিলিং শহরকে মনে করতে পারব। কুয়াশা উঠে আসছে গাছ থেকে, ছায়ামাখা সাপের মতো পথ, ঘোড়ার ওপর পাহাড়ি মেয়ে, ক্যাভেন্ডার্স রেস্তরাঁর খোলা ছাদে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে

দেখতে চায়ের কাপে চুমুক—আঃ।" পট থেকে চা ঢেলে দু'জনের হাতে কাপ তুলে দিলেন মেজর। সঙ্গে-সঙ্গে ঘরটা দারুণ মিষ্টি চায়ের গন্ধে ভরে গেল। মেজর বললেন, "মিস্টার আলাম্বা, চুমুক দিন, প্লিজ।"

কাপে ঠোঁট ছুঁইয়েই মিস্টার আলাম্বা বলে উঠলেন, "সত্যি বিউটিফুল।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি চা নিলেন না ?"

"নো। প্রত্যেক মানুষের উচিত তার নিজস্ব নিয়মকানুন মেনে চলা। আমি রোজ ভোর পাঁচটার সময় এক কাপ চা খাই। নো মিল্ক, নো শুগার। একেবারে চা-পাতার নির্যাস। এবং ওই একবারই। আর নয়। তারপর তুমি সন্ধে পর্যন্ত যতবার বিয়ার খেয়ে যেতে বলবে, খাব। কিন্তু সন্ধে নেমে গেলে মরে গেলেও বিয়ার খাব না। তখন হুইস্কি। ওয়েল মিস্টার আলাম্বা। স্টে উইথ আস, ইউ উইল বি হোমলি। আজ অর্জুনের ফোন পাওয়ামাত্র একটা টার্কি এনে জম্পেশ করে প্রসেসিং শুরু করে দিয়েছি। বেশ বড় প্রাণী। আপনি আমাদের সঙ্গে ডিনার করুন। কী, আপত্তি আছে ?"

মিস্টার আলাম্বা কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, "আমার একটু অসুবিধে হবে। সুধামাসিকে বলিনি কিছু। ওঁরা নিশ্চয়ই রান্না করে রাখবেন।"

"ফোন করে দাও। বলো, আজ রাত্রে ফিরবে না।"

"অসম্ভব ! মা জানতে পারলে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেবে।"

"মা ? তোমার মা ? এই নিউ ইয়র্কে ?"

"না। নিউ ইয়র্কে না। আপনি ঠিক বুঝবেন না।"

"নিউ জার্সির নাম্বারটা দাও তো।"

পকেট থেকে নাম-ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার লেখা কাগজটা বের করে এগিয়ে দিল অর্জুন। ছোট্ট তারবিহীন টেলিফোন পকেট থেকে বের করে নাম্বার ডায়াল করে জিজ্ঞেস করলেন, "ভদ্রমহিলার নাম কী বললেন যেন ? কী মাসি ?"

"সুধামাসি। কিন্তু উনি ইংরেজি জানেন না। ওঁর মেয়ে—।"

ততক্ষণে মেজর কথা বলতে শুরু করেছেন, "হেলো। আমি যে নাম্বারটি ডায়াল করলাম সেটি রিপিট করছি। গুড। আমি, লোকে আমাকে মেজর বলে ডাকে, ওটাই এখন নাম হয়ে গিয়েছে, সুধামাসি নামে যিনি এ-বাড়িতে জলপাইগুড়ি থেকে এসেছেন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।" মেজর এতক্ষণ খুব কায়দা করে ইংরেজিতে বলছিলেন। এবার অর্জুনের দিকে একটা চোখ টিপে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "নমস্কার সুধামাসি, আমি মেজর। আরে আপনি কী করে চিনবেন ? জলপাইগুড়িতে যখন গিয়েছি তখন শ্রীমান অর্জুন ভূতের মতো খাটিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, পুরনো বন্ধু তো, নিউ ইয়র্কে এসেই আমার কাছে চলে এসেছে। আজ রাত্রে একটু খাওয়াদাওয়া—। অ্যাঁ, কী বললেন ? সর্ষে ইলিশ, মানে ভাপা ইলিশ ? ভাপা নয় সর্ষে ? চিংড়ি

পোস্ত। ওরে বাবা রে— ! ফুলকপির দিশি কোপ্তা ? আমি যাব ? নিশ্চয়ই যাব ! এখনই যাচ্ছি। হ্যাঁ, অর্জুনকে নিয়েই যাচ্ছি। সেইজন্যে ফোনটা করা। অ্যাঁ, পায়েস আর পাটিসাপটা, মরে যাব। না, না। কিন্তু মাসিমা, আমাদের আর এক বন্ধু মিস্টার আলাম্বা সঙ্গে আছেন। কম পড়ে যাবে না তো ? ঠিক আছে। চলে আসছি।" টেলিফোন অফ্ করে দাড়িতে হাত বোলাতে লাগলেন মেজর। অর্জুন কোনও কথা বলছিল না। মেজরই মৌনতা ভাঙলেন, "আসলে, ওইসব খাবারের নামই ভুলে গিয়েছিলাম। শোনামাত্র নাভিকুণ্ডলীতে টান লাগল যেন। আর রেজিস্ট করতে পারলাম না।"

"বেশ তো, চলুন।" অর্জুন হাসল।

"আরে ওই টার্কিফার্কি তো রোজই খাই। এ খোদ বাংলামায়ের হাতের রান্না। এই যে সার, চলুন।" মিস্টার আলাম্বার দিকে তাকালেন মেজর।

"আপনি একা রাঁধবেন না। আমিও আপনার সঙ্গে আছি।"

"ওখানে রান্নার কথা বলা মানে যিশুকে বাইবেল পড়ানো। আমরা এখানে ডিনার করছি না। অর্জুনের বাড়িতে, ঠিক অর্জুন যদিও নয়, তবে ও নিয়ে মাথা ঘামাতে আর রাজি নই আমি।" মেজর বললেন।

"নো, নো। অসম্ভব। অন্য কোথাও যেতে পারব না আমি।"

"কেন ?"

"তোমরা বুঝতে পারছ না আমার জীবন—।"

মিস্টার আলাম্বাকে থামিয়ে দিল মেজর, "আপনি বুঝতে পারছেন না। আজ যে ডিনার করবেন তা না করে বেঁচে থাকা মানে আপনার জীবন বৃথা। তা ছাড়া আমরা সঙ্গে আছি। অর্জুন আছে ওই লকেট পরে। নো ভয়।"

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। একেই রাস্তা জনমানবশূন্য তার ওপর ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। তবু মুখ-মাথা চাপা দিয়ে মিস্টার এমন ভঙ্গিতে গাড়িতে উঠলেন যে, সাধারণ লোকই তাঁকে সন্দেহ করবে। মেজরের পাশে অর্জুন, পেছনে মিস্টার আলাম্বা।

মিস্টার আলাম্বা জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কোনদিকে যাচ্ছি ?"

"নিউ জার্সি। ক্রোস্টার টাউনে। ওখানে ব্ল্যাক নেই। তাই তো অর্জুন ?"

"আমি আজ দেখিনি।"

মিস্টার আলাম্বা বললেন, "অর্জুন, একটু অনুরোধ করতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই।"

"সামনের উইন্ডস্ক্রিনের ওপরের হুকে তুমি লকেটটা টাঙিয়ে দাও।"

"কেন ?"

"তা হলে লোকে সহজে দেখতে পাবে।"

মেজর এবার গলা তুললেন, "আপনি এত ভয় পাচ্ছেন কেন ? চুপটি করে বসুন। আঃ, আজকের দিনটাই আলাদা। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।" তিনি

pathagar.net

গান ধরলেন, "ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে লাগছে ভারী মিষ্টি।"

অর্জুন সংশোধন করে, "ওটা মেঘলা ভাঙা হবে।"

"একই ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ কী খেতে ভালবাসতেন হে?"

"দুধকলা সন্দেশ একসঙ্গে মেখে খেতে খুব ভালবাসতেন।"

"আমি খেলে ব্লাডশুগার হয়ে যেত। আমরা এখন হাডসনের নীচ দিয়ে যাব। মাথার ওপর নদী আর আমরা যাচ্ছি সুড়ঙ্গ দিয়ে। কেমন লাগছে?"

"দারুণ।" অর্জুন বলল। সুড়ঙ্গ কিন্তু সিনেমার মতো আলো-ঝলমলে। হুহু করে গাড়ির পর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে। এই সময় পেছনে সাইরেন বেজে উঠল। মেজর বললেন, "কোন নির্বোধ আজ ধরা পড়ল কে জানে!"

"ধরা পড়ল মানে?"

"মামার ডাক শুনতে পাচ্ছ না।" মেজরের গাড়ি সুড়ঙ্গ থেকে বের হতেই দুরন্ত গতিতে একটি পুলিশের গাড়ি তাঁকে ওভারটেক করতে গিয়েও পারল না। কোনওমতে সঙ্ঘর্ষ বাঁচিয়ে মেজর চিৎকার করে উঠলেন, "ছুঁচো, ইঁদুর, প্যাঁচা, হিপোপটেমাস! পুলিশ বলে পাবলিকের মাথা কিনে নিয়েছিস নাকি? ডিনার খেতে দেবে না এমন প্ল্যান ছিল। হুঁ।"

পুলিশের গাড়ি পেছনে পড়ে গেছে। বীরদর্পে গাড়ি চালাচ্ছিলেন মেজর। হঠাৎ হাইওয়ের ওপর দাঁড়ানো পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ানো অফিসার হাত বাড়িয়ে দাঁড়াতে বলল। অতএব মেজর পাশের পার্কিং-এর জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি দাঁড় করালেন। অর্জুন দেখল, দু'জন পুলিশ অফিসার রিভলভার উঁচিয়ে ধরে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে। মেজর বললেন, "নোড়ো না। হাত মাথা স্থির রাখো। ওরা এত ভিতু যে-কোনও সময় ভয় পেয়ে গুলি ছুড়তে পারে। আরশোলার ঘিলুও নিউ ইয়র্ক পুলিশের কাছে লজ্জা পাবে।"

ততক্ষণে দু'জন অফিসার দুই জানলায় এসে গেছেন। নির্বিকার গলায় মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়েস অফিসার, আপনাদের জন্যে কী করতে পারি?"

"ডোন্ট মুভ। স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করবেন না। পেপার্স?"

মেজর একটা খাম বের করে দিয়ে দিলেন। অর্জুন দেখল তার দিকে যে পুলিশ অফিসার বন্দুক তাক করে আছে তার নিশ্বাসে রসুনের গন্ধ। এবার প্রথম অফিসার পেছনে তাকাল, "হু ইজ হি?"

"হি ইজ প্রোফেসর; প্রোফেসর আলাম্বা। বিল নোজ হিম।"

"হু ইজ দ্যাট বিল?"

মেজর অফিসারের দিকে তাকালেন, "হাই ম্যান, তুমি তোমার নাম ভুলে যেতে পারো, কিন্তু বিলের নাম ভুলে যাওয়া উচিত নয়।"

"তোমরা পুলিশ স্টেশনে এসো।"

"কেন ? আমাদের অপরাধটা কী ?"

"সেখানে গেলেই জানতে পারবে।"

অগত্যা একটি পুলিশের গাড়িকে অনুসরণ করতে হল। ডেস্কে পৌঁছেই মেজর বললেন, "মিস্টার আলাম্বা, আফ্রিকার লোকশিল্প এক্সপার্ট, একটা ফোন করতে চান অফিসার। তাকে সেটা কি করতে দেওয়া হবে ?"

"নিশ্চয়ই। কাকে করতে চান ?"

মেজর পেছনে এসে দাঁড়ানো অফিসারকে দেখিয়ে বললেন, "ওঁকে বললাম, উনি বুঝতেই পারলেন না। উনি হোয়াইট হাউসে ফোন করে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলতে চান।"

"মাই গড। আপনি বিল বললেন, সেই বিল— !" অফিসার এগিয়ে এলেন সামনে, "এক মিনিট। আমরা একটু আগে একটা কল্ পেয়েছি আপনার গাড়িতে একজন ভয়ঙ্কর লোক যাচ্ছে, যার উদ্দেশ্য আফ্রিকা থেকে আসা কালো মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাধিয়ে দেওয়া। মনে হচ্ছে মিস্টার আলাম্বাই সেই মানুষ। ওয়েল, মিস্টার আলাম্বা, আপনার কিছু বলার আছে ?"

মাথা নাড়লেন মিস্টার আলাম্বা, "হ্যাঁ। ওরা আমাকে মারতে চায়।"

"কারা ?"

"যাদের ধর্মীয় মূর্তি আমি না জেনে সংগ্রহ করেছি।"

"আপনি যদি সেটা মিউজিয়ামে দান করে দেন, তা হলে ?"

"তা হলেও আমি নিষ্কৃতি পাব না। আপনার সঙ্গে যে কালো ছেলেটি ছিল সে কোথায় ? তাকে নিয়ে আসুন।" মিস্টার আলাম্বা বললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যে সেই কালো অফিসার এগিয়ে এসে বলল, "ইয়া।"

"তুমি আফ্রিকায় গিয়েছ ?" মিস্টার আলাম্বা প্রশ্ন করলেন।

"নো। কখনও না।"

"তোমার পূর্বপুরুষ ও-দেশ থেকে এসেছেন ? কোত্থেকে ? নাম বলো।"

"আই ডোন্ট নো। আমি আমেরিকান, সেটাই শেষ কথা।"

"যে ফোন করে পুলিশকে বলে আমাদের আটকাতে, তার নাম কী ?"

"অদ্ভুত। আমি কী করে জানব ?"

মিস্টার আলাম্বা অর্জুনের দিকে তাকালেন, "অর্জুন। ওকে দেখান।"

অর্জুন চট করে ভেবে নিল। নিউ ইয়র্কে কেউ যদি সন্দেহ করে পুলিশকে ফোন করে জানায়, তা হলেও নিউ জার্সির মাটিতে দাঁড়িয়ে কোনও পুলিশ অফিসারের পক্ষে সেটা অনুমান করা সম্ভব নয়।

সে বলল, "দেখিয়ে লাভ হবে না।"

"আমি দেখতে চাই সেটা।"

অগত্যা অর্জুনকে জামার ভেতর থেকে লকেটটাকে বের করতে হল, "দেখুন তো, এই লকেটটা আপনার কাছে অর্থবহ কিনা।"

কালো অফিসার লকেট দেখলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কী ?"

অর্জুন মিস্টার আলাম্বাকে বলল, "তা হলে দেখলেন— !"

"ইয়েস।"

প্রায় মিনিট পনেরো আলোচনা করল অফিসাররা। তারপর সেই প্রথমজন এসে বলল, "আমরা খুব দুঃখিত। তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ?"

মেজর ঠিকানা বললেন।

অফিসার বললেন, "ওখানে রাত্রে থাকবে ?"

"না। ডিনার খেয়ে ফিরে আসার ইচ্ছে ছিল।"

"তা তোমরা আসতেই পারো। আমাদের একটা গাড়ি তোমাদের সঙ্গে থাকবে। তোমরা যখন ফিরে আসবে তখন হাডসন পর্যন্ত এসকর্ট করবে। এটা আমাদের কর্তব্য, বুঝলে ?"

ঠিক তখনই সমস্ত চরাচর কাঁপিয়ে বিস্ফোরণের আওয়াজ হল। সেই আওয়াজে কেঁপে উঠল সবাই। একজন অফিসার ছুটে এসে বলল, "এদের কার উড়ে গেল।"

॥ ৯ ॥

দাউ দাউ করে জ্বলছে মেজরের গাড়ি। থানার বাইরে দাঁড়িয়ে সমানে মেজর চিৎকার করে গেলেন, "ওরে ছুঁচো, ইঁদুর, পেঁচা, হিপো, তোকে যদি হাতের কাছে পেতাম তা হলে, ওঃ, মনের সুখে কিমা বানাতাম।"

রাত দশটা নাগাদ পুলিশ ওদের সুধামাসিদের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল। যাওয়ার আগে মেজর যে কথা পুলিশের লোককে বলেছিলেন তা জীবনে ভুলবে না অর্জুন। মেজর বলেছিলেন, "এই অবধি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে অনেক ধন্যবাদ অফিসার। এর পর আপনাকে থাকতে বলছি না, কারণ সরষে ইলিশ অথবা চিংড়ি পোস্ত শেয়ার করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। গুড নাইট।"

অফিসার কিছুই বুঝতে না পেরে বলেছিলেন, "পার্ডন ?"

"সেটা তো করেই দিয়েছি। গুড নাইট।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বোতাম টিপল।

ভেতর থেকে দেখে নিয়ে অঞ্জনাদি দরজা খুললেন। অর্জুনকে কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিয়ে অত্যন্ত শিক্ষিত গলায় মেজর এবং মিস্টার আলাম্বাকে স্বাগত জানালেন। ওঁদের বসার ঘরে নিয়ে এসে সোফায় বসিয়ে বললেন, "আমি অঞ্জনা, সুধামাসি আমার মা।"

প্রাথমিক পরিচয় হয়ে যাওয়ার পর অঞ্জনাদি জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের বাড়িতে পুলিশের গাড়িতে চেপে কেউ প্রথমবার এল। কোনও অসুবিধে

হচ্ছিল ?”

মেজর তাঁর কাঁচা প্রায় নেই, পাকা দাড়িতে আঙুল ঢোকালেন, “হ্যাঁ। একটু।”

“কী হয়েছিল ? অবশ্য জানাতে যদি আপত্তি না থাকে।”

“বিন্দুমাত্র নেই। না জানানো ছাড়া কোনও উপায় নেই। কী বলো, অর্জুন ? আমার গাড়িটা উড়ে গেছে। মানে টাইমবোম বা ওই জাতীয় কিছু দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে কেউ।”

“সে কী ? কোথায় ? কখন ?”

“একটু আগে। খোদ পুলিশের ডেরায় পার্ক করে রাখা গাড়ি উড়ে গেল। নিজের গাড়ি বলে বলছি না, ঠিক ফিল্মের গাড়ির মতো সিন তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দেখুন, রাত অনেক হয়েছে। আমরাও ক্ষুধার্ত। মিস্টার আলাম্বাও স্বাভাবিক নন। যদি ডিনার পরিবেশন করেন তা হলে এখনই তোড়জোড় করুন। তবে তার আগে ড্রিঙ্ক সার্ভ করতে পারেন।”

“আমাদের ডিনার তৈরি।”

“ও হো। তা হলে একটা স্কচের বোতল চটপট এনে দিন। আপনি যদিও বাঙালি মহিলা, তবে আমেরিকায় বেশ কিছুদিন আছেন বলে কথাটা বলা গেল। গ্লাস নিয়ে আসার দরকার নেই। অর্জুন খায় না, অন্তত আগে খেত না বলেই জানি। মিস্টার আলাম্বার ইচ্ছে হলে বোতল থেকেই চুমুক মারবেন।” মেজর দাড়ি চুলকে যাচ্ছিলেন।

অঞ্জনাদি কিন্তু যেভাবে পরিবেশন করতে হয় সেইভাবেই করলেন। মিস্টার আলাম্বা এক পেগ হুইস্কি নিয়ে গম্ভীর মুখে চুমুক দিলেন। মেজর পুরো গ্লাস ভর্তি করে চুমুক দিতেই সুধামাসি বেরিয়ে এলেন হাত জোড় করে।

অর্জুন আলাপ করিয়ে দিল। গ্লাস টেবিলে রেখে মেজর বললেন, “আপনার রান্নার নাম শুনে ছুটে এসেছি। কিন্তু এই একটা অভ্যেস, অভ্যেসটা বদ, জানি, মানে কিছু খাওয়ার আগে একটু এটা খেয়ে নেওয়া।”

“শুনলাম কে নাকি বোমা মেরে গাড়ি উড়িয়ে দিয়েছে।”

“হ্যাঁ। তবে ক্ষতি তেমন হয়নি। ইনস্যুরেন্স করা ছিল। তবে সরষে ইলিশ—।”

“এক মিনিট, ওসব জিনিসের স্বাদ পেতে গেলে জিভ পরিষ্কার রাখতে হয় যে !” মেজর গ্লাস তুলে চুমুক দিতে গিয়ে কথাগুলো শুনে থমকে গেলেন, “অ্যাঁ ?”

“হ্যাঁ। প্রত্যেকটি জিনিসের আলাদা স্বাদ আছে। চিংড়ির স্বাদ আলাদা, আবার ইলিশের স্বাদ তার নিজের। যে মশলা পড়ছে তার নিজের স্বাদ আছে। আমার শ্বশুরমশাই রায়বাহাদুর সাহেব ওই জিনিস খেতেন। শুনলাম উনি নাকি খাবারে কোনও স্বাদ পাচ্ছেন না।”

সুধামাসি বলামাত্রই গ্লাস টেবিলে নামিয়ে মেজর উঠে দাঁড়ালেন, "চলুন সবাই, ডিনারে যাই। মিস্টার আলাম্বা, এক পেগ মদ তাও শেষ করতে পারছেন না !"

এই রাত্রের খাওয়ার টেবিলের স্মৃতি অর্জুনের অনেককাল মনে থাকবে। একেবারে শিশুর মতো খেয়েছিলেন মেজর। ফুলকপির প্রিপারেশন এত ভাল হয় ? ভাতের সঙ্গে আলু সেদ্ধ সরষের তেলে মেখে দিয়েছিলেন সুধামাসি। কাঁচালঙ্কা পাশে। তাতেই তিনি প্রথমে উদ্বুদ্ধ হন। প্রতিটি খাবার খাচ্ছেন আর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন। এমনকী মিস্টার আলাম্বার হাঁড়িমুখে হাসি ফুটল যখন চিংড়িপোস্ত খেতে লাগলেন। মিষ্টিতে পৌঁছে মেজরকে রোখা গেল না। চিৎকার করে বললেন "এরকম খাবার পেলে আমি মদ্যপান ছেড়ে দিতে পারি। আহা।"

সুধামাসি বললেন, "আজ আমার জামাই-এর জন্মদিন।"

"আচ্ছা ! তিনি কোথায় ? ওহো, অর্জুন," গলা নামিয়ে বললেন, "কী যেন হয়েছে ?"

"অ্যাক্সিডেন্ট। তবে এখন অবস্থা ভাল। হাসপাতালে আছেন।" অঞ্জনাদি বললেন।

"ওঁর স্বাস্থ্য চটজলদি ফিরে আসুক।" জলের গ্লাস ওপরে তুলে বললেন মেজর, "গলা পর্যন্ত খেয়ে ফেললাম। এখন একটা বালিশ না পেলেই নয় !"

অঞ্জনাদি বললেন, "বালিশ কেন ? বিছানাই তৈরি।"

"ওঃ, এর চেয়ে সুখবর আর কী হতে পারে ! এই যে আফ্রিকা বিশেষজ্ঞ, বাঙালি মেয়ের গুণ দেখতে পাচ্ছ ?" বাংলায় প্রশ্নটি করা বলে কিছু না বুঝে পায়েস খেতে-খেতে হাসলেন মিস্টার আলাম্বা।

কিন্তু ডিনার টেবিল থেকে উঠে মিস্টার আলাম্বা রাত্রে এ-বাড়িতে থাকতে চাইলেন না। তাঁকে ওই রাত্রে নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে হবেই। মেজর অনেক বোঝালেন। তাঁর তখন শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। সঙ্গে গাড়ি নেই। যদি থাকত, এত খাওয়ার পর অতদূরে চালিয়ে যেতে ইচ্ছে করত না বলে তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, উড়ে গিয়ে তাঁর ভালই হয়েছে। শেষপর্যন্ত মিস্টার আলাম্বার ইচ্ছাই মান্য করা হল। টেলিফোন করলেন অঞ্জনাদি। মিনিট তিনেকের মধ্যে ট্যাক্সি এসে গেল দরজায়। মিস্টার আলাম্বা ঘড়ি দেখলেন। প্রায় মধ্যরাত। তিনি অর্জুনকে বললেন, "আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন তো ?"

"ও কেন যাবে ?" মেজর আপত্তি করলেন, "ও বাড়ি থেকে আমাদের পৌঁছতে চলল, আমরা একবার ওকে পৌঁছতে আসলাম, সারারাত এই চলুক আর কী।"

কিন্তু মিস্টার আলাম্বার অবস্থা দেখে মায়া হচ্ছিল অর্জুনের। একেবারে

নার্ভাস হয়ে গিয়েছেন। সুধামাসির সঙ্গে কথা বলে গাড়িতে উঠল অর্জুন। মিস্টার আলাম্বাকে মাঝখানে রেখে সে এবং মেজর দু'দিকে বসল। ট্যাক্সিওয়ালা ঠিকানা জানতে চাইলে মেজর সেটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু মিস্টার আলাম্বা দ্রুত বলে উঠলেন, "জ্যাকসন হাইট।"

মেজর অবাক হয়ে ঘুরে তাকাতে ইশারায় জানালেন চুপ করে থাকতে।

দিনের বেলায় যে-পথ নির্জন, রাতের বেলায় সেখানে শব্দ খুঁজেও পাওয়া যাবে না। শুধু হুস-হাস গাড়ি ছুটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। মেজরের চোখ বন্ধ, নাক ডাকছে। মানুষটি কত অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন।

হাডসন পেরিয়ে জ্যাকসন হাইটে ট্যাক্সি পৌঁছে গেলে মিস্টার আলাম্বা ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়লেন। মেজর তখনও ঘুমোচ্ছেন। মিস্টার আলাম্বা বললেন, "ঝটপট ওকে ডাকুন ? এরকম জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।"

মেজরকে ঘুম থেকে তুলে রাস্তায় নামাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কোথায় ?"

"জ্যাকসন হাইটে !" অর্জুন বলল।

"কী ? এই ভিতু লোকটাকে নিয়ে মুশকিলে পড়া গেল।" ট্যাক্সিটা চলে গিয়েছিল, দ্বিতীয় একটা ট্যাক্সি সামনে এসে দাঁড়াতেই মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে শুঁটকি মাছ, তুমি ?"

"আসেন দাদা, কী সৌভাগ্য।" পেছনের দরজা খুলে দিল ড্রাইভার।

"কোথায় ছিলা ভাই ? তোমারে ছাড়াই সরষে ইলিশ খাইলাম আজ।" ট্যাক্সির ভেতর শরীর চালান করে দিয়ে ইশারায় বললেন আলাম্বাকে ডেকে আনতে।

মিস্টার আলাম্বা একটু দূরে ঠিক লাইটপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন গিয়ে তাঁকে বলতেই এদিকে তাকালেন। অর্জুন বলল, "মেজরের চেনা ট্যাক্সিওয়ালা।"

শোনামাত্র দৌড়ে ফিরে এসে ট্যাক্সিতে উঠলেন তিনি। অর্জুন আশেপাশে তাকিয়ে দেখল, দৃশ্যটি দেখার মতো কেউ এখানে নেই।

ট্যাক্সি চলছিল। ড্রাইভারের সামনে রেডিয়োতে সমানে খবরাখবর এবং নির্দেশ ঘোষিত হয়ে চলেছে। ট্যাক্সিওয়ালা জিজ্ঞেস করল, "এই রাইতে জ্যাকসন হাইটে কী করতে ছিলেন ? দাওয়াত ছিল নাকি ?"

মেজর বললেন, "হ। মরণের বাসায়।"

"আপনি কী যে কন !" ট্যাক্সিওয়ালা একটু জোরেই বলল।

হঠাৎ মিস্টার আলাম্বা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সাইলেন্স, সাইলেন্স প্লিজ।"

কয়েক সেকেন্ড সব চুপচাপ। শুধু রেডিয়ো বেজে যাচ্ছে। ট্যাক্সিওয়ালা বলল, "অ। ওই সাপের কথা। বিকাল থিকা প্রায়শই বলতেছে। পাগল।"

মিস্টার আলাম্বা মেজরকে বললেন, "বাড়ির সামনে ট্যাক্সি ছাড়বেন না।

দূরে রেখে হেঁটে যাব আমরা। বুঝতে পারছেন?"

"কোনও চান্স নেই। এই ছোকরা আমার ফ্ল্যাট পর্যন্ত জানে। তবে বিশ্বস্ত।" মেজর হাত নাড়লেন, অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি বাংলাদেশের?"

"হ। দাদার লগে অনেকবার পরিচয় হইছে। আমার নাম রতন রহমান।"

"এখানে ট্যাক্সি চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না?"

"প্রথম-প্রথম হইত। তবে পুলিশ তো খুব ভাল, তাদের সাহায্য পাওয়া যায়। দাদারে কইছিলাম শুঁটকি খাওয়ামু, লইট্যা শুঁটকি, উনি সেটা ভোলেন নাই।"

রাস্তাটা চিনতে পারছে অর্জুন। এই পথেই মেজর তাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। মেজরের ফ্ল্যাট যে অট্টালিকায়, তার সামনে পৌঁছেই সে দুটো গাড়ি দেখতে পেল। গাড়িদুটো অদ্ভুতভাবে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ট্যাক্সি থামতেই দুটো গাড়ির দরজা প্রায় একসঙ্গে খুলে গেল। অর্জুনের মনে হল বিপদ সামনে। সে রতন রহমানকে বলল, "বিপদ। তাড়াতাড়ি গাড়ি চালিয়ে ওদের মাঝখান দিয়ে বেরিয়ে যান।"

রতন যে এত দ্রুত সেটা করবে, অনুমান করেনি অর্জুন। যারা গাড়ি থেকে নেমেছিল তারাও ভাবতে পারেনি। ছিটকে রাস্তার দু'পাশে সরে গেল ওরা। ট্যাক্সিটা সোজা চলে এল আর-একটি বড় রাস্তায়। রতন বলল, "বলেন?"

অর্জুন মেজরের দিকে তাকাল। তিনি তখন ঘুমোচ্ছেন। মিস্টার আলাম্বা সিঁটিয়ে বসে আছেন। অর্জুন বলল, "ভাই রতন, ওরা আমাদের শত্রু, ওদের হাত থেকে আমাদের বাঁচান।"

"তাই কন। অরা বাঙ্গালিরে চেনে না। জয় বাংলা।" কী দুরন্ত গতিতে গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ছুটে গেল রতন রহমান, তা বিশ্বাস হত না চোখে না দেখলে। দুটো গাড়ি তখন সবে চলা শুরু করেছিল, ওই গতিতে ট্যাক্সিকে ছুটে আসতে দেখে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগে নিজেরাই রেলিং-এ ধাক্কা খেল। বেরিয়ে এল ট্যাক্সিটা। মেজর চোখ মেলে বললেন, "কতদূর?"

"একটুও চিন্তা করবেন না দাদা, আমি আছি। এইসব ফাইটিং সিন আমি হিন্দি সিনেমা দেইখ্যা শিখছি।"

"আরে, আরে! তুমি ছুটছ কেন?" মেজর উঠে বসলেন। অর্জুন দ্রুত তাকে ঘটনাটা জানিয়ে দিল। মেজর বললেন, "যাঃ বাবা! এর মধ্যে টের পেয়ে গেল!"

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দুটো গাড়ি প্রবল গতিতে ছুটে আসছে তাদের পেছনে। রতন তখন তার ওয়্যারলেসে বলছিল, "ক্যাব নাম্বার এক্স ওয়াই জেড থ্রি নট থ্রি, হেল্প হেল্প প্লিজ।" বলেই সেটা বন্ধ করে বলল, "আমি লেফ্‌টে টার্ন নিয়া থামাব। আপনারা জলদি গাড়ি থিকা নামতে পারবেন?"

"শিওর। কিন্তু আমি ওদের ফেস করতে চাই।"

"ওনারা আর আসতেছেন না। পুলিশের বাঁশি শুইন্যাই ভাগছেন। পুলিশে ছুঁইলে কীসব হয় না, তাই নামতে কইলাম।"

বাঁ দিকে ঘুরে গাড়ি দাঁড়াতেই ওরা দ্রুত নেমে পড়তেই রতন ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে গেল। ওরা দৌড়ে একটা কাফের মধ্যে ঢুকে পড়তেই শুনল, "গুড মর্নিং সার। আপনাদের বসতে অনুরোধ করছি।"

মেজর বললেন, "আই অ্যাম সরি সার। কিন্তু আপনাদের টয়লেটের জন্যে এখানে ঢুকতে হল, অবশ্য যদি আপত্তি থাকে—।"

"ওঃ, নো, নো। প্লিজ।" ভদ্রলোক ডান দিকে হাত প্রসারিত করলেন। অর্জুন দেখল রাত প্রচুর হলেও কাফে একেবারে খালি নয়। ওরা তিনজনেই টয়লেটে পৌঁছলেন। একসঙ্গে দু'জনের বেশি যাওয়া যাবে না। বয়স্কদের যেতে দিয়ে অর্জুনের মনে হল, তার প্রয়োজন নেই, খামোকা যাচ্ছিল। সে কাফের বাইরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতে সেই মালিক অথবা ম্যানেজারের খপ্পরে পড়ল, "ইটস আ নাইস মর্নিং সার। হাউ অ্যাবাউট এ কাপ অব কফি উইদ লিকার ?"

"সরি। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট।"

"লুক সার, ইফ ইউ স্টার্ট দ্য ডে উইথ কফি—।"

"ইট্স নট ডে, ইট্স মিডনাইট।"

"ইট্স ওয়ান থার্টি এ এম। সো উই ক্যান কল ইট মর্নিং।"

ঠিক তখনই দরজা ঠেলে একটি লোক এবং একজন মহিলা ঢুকলেন। দু'জনেরই বেশ নেশা হয়ে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। লোকটি মহিলার হাত ধরে একটা খালি টেবিলের দিকে যেতে-যেতে বলল, "আমি জানি আমি মারা যাব। আর আমি যে এটা জানি তা কেউ জানে না।"

ম্যানেজার বা মালিক হাত নাড়ল, "হাই জিম, আফটার আ লং গ্যাপ।"

লোকটা তার বান্ধবী বা স্ত্রীকে ছেড়ে এগিয়ে এল ম্যানেজারের কাছে, "মেড মানি, লট অব মানি, ডু ইউ নো ?" চলতে চলতে লোকটা অর্জুনের দিকে তাকাতেই অর্জুন চমকে উঠল। লোকটা বলল, "হেই ম্যান, আই হ্যাভ সিন ইউ সামহোয়ার। হু আর ইউ ?"

"আই অ্যাম ইওর ফ্রেন্ড।" অর্জুন হাসার চেষ্টা করল।

"ওঃ। দেন জয়েন আস। কাম, কাম প্লিজ।" হাত ধরে টানতে-টানতে জিম অর্জুনকে নিয়ে গেল সেই টেবিলে, যেখানে মহিলা একা বসে ছিলেন। এই সময় মেজর এবং মিস্টার আলাম্বা টয়লেট থেকে বেরিয়ে আবার ম্যানেজার বা মালিকের খপ্পরে পড়লেন। মেজর হাত তুলে চালিয়ে যেতে বলে মিস্টার আলাম্বাকে নিয়ে অন্য একটি টেবিলে গিয়ে বসলেন।

মহিলা বললেন, "ইউ আর অলরাইট, জিম ?"

"অ্যাবসোলিউটলি। লুক, ডার্লিং, হি ইজ মাই ফ্রেন্ড।"

মহিলা মাথা নাড়লেন, "গ্ল্যাড টু মিট ইউ? তোমরা অনেকদিনের পরিচিত?"

"না, না। তিনদিন আগে আলাপ হয়েছে।"

"তিনদিন?" মহিলা অবাক হয়ে জিমের দিকে তাকালেন, সে চোখ বন্ধ করে আছে। মহিলা বললেন, "তিনদিন আগে জিম বিদেশে ছিল, তাই না জিম?

"ইয়েস ডার্লিং।"

"আমার সঙ্গে এয়ারপোর্টে আলাপ হয়। প্রথমে হিথরোতে, পরে জে এফ কে-তে। উনি আমাকে চিনতে পারছেন না। দাঁড়ান, মিস্টার জিম? আমি যদি কাস্টমস অফিসারকে বলে দিতাম যে আপনি দাঁতের নীচে লুকিয়ে কিছু নিয়ে আসছেন তা হলে কী হত? জেলে থাকতেন এই সময়, তাই না? তা হলে না বলে বন্ধুর কাজ করেছি আমি, তাই না?"

জিম ছোট চোখে তাকে কিছুক্ষণ দেখল। হঠাৎ শরীরের সব রক্ত তার মুখে উঠে এল। এয়ারপোর্টের স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় সে বোধ হয় চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল কিন্তু অর্জুন বলল, "একটা শব্দ করলে তুমি খুন হয়ে যাবে। আমার সাপ তোমাকে মারবে।"

সঙ্গে-সঙ্গে ভেঙে পড়ল জিম, "নো, নো। প্লিজ। আমাকে বাঁচাও। প্লিজ।"

"তুমি খুব খারাপ লোক। তাই না?"

"আমি মানছি। আমি খুব খারাপ।"

"এয়ারপোর্টে তোমাকে ধরিয়ে দিইনি কেন জানো? আমি বলার পর যদি ওরা তোমার মুখে ব্যাগ না পেত তা হলে আমি বেইজ্জত হয়ে যেতাম।" অর্জুন বলল।

"আমি ভেবেছিলাম, তুমি বলবে। তাই পেটে চালান করে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভাগ্যিস করিনি। ওরা আমার পেটের ভিতরটা পরীক্ষা করেছে, দাঁতের নীচটায় কেউ দ্যাখেনি। এক লাখ ডলারের মাল। আমি পেয়েছি দশ হাজার।"

"আমার কথা ক'জনকে বলেছ?"

কাঁধ নাচাল জিম, উত্তর দিল না।

"তুমি কি আফ্রিকান?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"ইয়েস। আমি মুল্যাটো। বাবার সাদা চামড়া নাকমুখ পেয়েছি।"

"ক'জনকে বলেছ আমার কথা?"

"শুধু বস্‌কে। আর কাউকে বলিনি।"

"কে তোমার বস্?" অর্জুন গলা নামাল।

"প্লিজ, ডোন্ট আস্ক মি।" লোকটা সরে গেল কিছুটা।

অর্জুন পকেট থেকে লকেটটা বের করে জিজ্ঞেস করল, "এটার দিকে তাকিয়ে বলো, কে আমাদের খুন করতে আজ এত ব্যস্ত হয়েছে ? বলো ?"

॥ ১০ ॥

লকেটটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকমে জিমের মুখের চেহারা অবিশ্বাস্য রকমের বদলে গেল। সে দ্রুত মাথা নাড়তে লাগল, "জানি না। জানি না।"

"তুমি মিথ্যে কথা বলছ।"

"নো। মিথ্যে বলছি না।" তারপর জিম খুব জোরে মাথা নেড়ে বলল, "বসকে একটা ফোন করলেই জানতে পারব।"

"তুমি তোমার বসকে বলবে না আমি এখানে আছি।"

"ঠিক আছে।"

পকেট থেকে ছোট্ট রিসিভার বের করে নাম্বার ডায়াল করল জিম। কয়েক সেকেন্ড বাদে বলল, "আমি জিম। বস-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

ওপাশ থেকে বোধ হয় নেতিবাচক কিছু বলা হয়েছিল, জিম রেগে গেল, "ইউ পিপল ডোন্ট নো হোয়াট ইজ হোয়াট। দিস ইজ মি হু গেভ ইনফরমেশন দ্যাট দ্য লকেট হ্যাজ অ্যারাইভ্ড অ্যাট লাস্ট অ্যাট ইউ এস এ। ডু ইউ নো ? ও, থ্যাঙ্ক ইউ ! হ্যালো, ও বস, দিস ইজ জিম। ডিড ইউ ফাইন্ড জিম ? নো ! আই হার্ড সামথিং, অ্যাঁ, আই অ্যাম টকিং ফ্রম এ কাফে !" ছোঁ মেরে ওর হাত থেকে যন্ত্রটা কেড়ে নিয়ে অফ করে দিল অর্জুন, "এমন কথা ছিল না।"

মহিলা বললেন, "হ্যাঁ, জিম, এখানকার ঠিকানা বসকে না বলার কথা ছিল।"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চেয়েছিলাম, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টায় ছিলে। এর জন্যে তুমি ঠিক সময়ে শাস্তি পাবে।" অর্জুন জামার তলা থেকে লকেট বের করে দেখাল।

সঙ্গে-সঙ্গে টেবিলের ওপর শুয়ে পড়ল জিম, "ওঃ নো। প্লিজ আমাকে ক্ষমা করো। সাপের দেবী আমাকে মেরে ফেলবে। উনি তোমার বুকে আছেন, তোমার কথা শুনবেন।"

"তা হলে আমাকে সাহায্য করো।" লকেটটাকে আবার জামার তলায় ঢুকিয়ে দিল অর্জুন।

"কী সাহায্য চাও ?"

"তোমার বসকে আবার ফোন করে জিজ্ঞেস করো আমার খবর সে পেয়েছে কিনা !"

"বস নিশ্চয়ই খেপে গেছে। আগেরবার কথা বলতে দাওনি তুমি !"

"একটা কিছু বানিয়ে বলবে।" যন্ত্রটা ফেরত দিল অর্জুন।

আবার জিম নাম্বার টিপল। তার পরের কথাবার্তা এইরকম, "হেলো। হ্যাঁ, জিম বলছি। সরি বস। একটা বাজে লোক সামনে এসে গিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই লোকটার খবর পেয়েছেন ? ওঃ। না তবে শুনলাম আফ্রিকার কোনও একটা ব্যাপার নিয়ে মার্ডার হবে আজ-কালের মধ্যে। না, না। আমার কোনও দরকার নেই। আমি কথা বলছি রাস্তা থেকে—।" এই সময় কাফের ম্যানেজার অথবা মালিক এগিয়ে এসে বললেন, "ইয়েস লেডি অ্যান্ড জেন্টলম্যান, আপনাদের কী ড্রিঙ্ক দেব তা যদি অনুগ্রহ করে বলেন ?"

জিম চট করে অফ করে দিল যন্ত্রটা। তারপর চিৎকার করে বলল, "তুমি আর এখানে আসার সময় পেলে না গাধা ? এর কথা শুনে বস বুঝে যাবে আমি মিথ্যে কথা বলছি। আর গলা যদি চিনতে পারে— ! উঃ। এখনই ঠিক খবর নিয়ে নেবে কোত্থেকে ফোন করেছি। চলো কেটে পড়ি। এখানে থাকলে মারা পড়ব আমি।" মহিলাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জিম। তারপর মালিক অথবা ম্যানেজারকে বলল, "এই যে, কেউ যদি এসে তোমাকে প্রশ্ন করে জিম এসেছিল কিনা তা হলে বলবে এক মাস দ্যাখোনি। ডু ইউ অ্যান্ডারস্ট্যান্ড ? ওকে বয়। নইলে মরার আগে তোমাকে মারব।"

অর্জুন ওদের পেছন পেছন কাফের বাইরে চলে এল। মেজর আর মিস্টার আলাম্বাও বেরিয়ে এলেন। অর্জুনকে দেখে জিম বিরক্ত হল, "আঃ, তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"তোমার সঙ্গে ?"

"কেন ?"

"তোমার বসকে জিজ্ঞেস করব কেন আমাদের খুন করার চেষ্টা হয়েছে ?"

"ওঃ। বস এখনও তোমার সন্ধান পায়নি। হয়তো অন্য কাউকে মারতে গিয়ে, বুঝতেই পারছ, অ্যাকসিডেন্টালি— ! আমাদের ছেড়ে দাও।"

"তুমি কোথায় থাকো ? আমি তোমার ক্ষতি করব না, প্রমিস।"

"ক্ষতি তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পারো।"

এই সময় মেজর একটা ট্যাক্সি ডাকলেন, "অর্জুন, এবার বাড়ি যাব !"

অর্জুন জিমকে বলল, "তুমি, তোমরা আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।"

জিম মহিলার দিকে তাকাতেই মহিলা তাঁর ব্যাগ খুলে একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিল অর্জুনকে, "এটা আমার ঠিকানা। আমাকে ফোন করলেই আপনি জিমের খবর পেয়ে যাবেন। ও ওর বসকে ভয় পাচ্ছে। আমাদের আলাদা যাওয়াই উচিত।"

কার্ড নিয়ে অর্জুন ট্যাক্সিতে উঠল। গাড়িটা সামান্য গতি নিয়েছে কি নেয়নি, পেছনে গুলির আওয়াজ হল। অর্জুন দেখল জিম মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, মহিলা হতভম্ব। রাজপথ শূন্য। দৃশ্যটা চোখের আড়ালে চলে গেল ট্যাক্সি বাঁক নিতেই।

মেজর বললেন, "কী হল ?"

মিস্টার আলাম্বা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন কোনও গাড়ি অনুসরণ করছে কিনা ! নিঃসন্দেহ হয়ে তিনি বললেন, "আমরা প্রধান দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকব না !"

"তা হলে ?" মেজর অবাক হলেন ।

"পেছনের দরজাটা দিয়ে দোতলায় আসা যায় । ওখানে লিফ্‌ট, ওঃ, ওখানে আবার লিফ্‌ট থামে না । দোতলা থেকে তিনতলায় ওঠার সিঁড়িও নেই । কী হবে ?"

"আপনি চিন্তা করবেন না । আমি আছি ।"

"কিছু মনে করবেন না মেজর, এই সময়টুকু যদি দয়া করে না ঘুমোন !"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে ।"

একেবারে বাড়ির দরজায় এসে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হল । এই মুহূর্তে যে-কোনও দিক থেকে গুলি ছুটে আসতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে ওরা দ্রুত চলে এল বাড়িটির সিঁড়িতে । অর্জুন দেখল, আগে মিস্টার আলাম্বা, তাঁর পেছনে মেজর, ভূতে তাড়া করলে মানুষ যেভাবে ছোটে বলে গল্পে পাওয়া যায়, সেইভাবে ছুটছেন । কাচের দরজা ঠেলে লিফ্‌টের সামনে পৌঁছে মেজর একটু ধাতস্থ হলেন চেনা পরিমণ্ডল পেয়ে, "হ্যাঁ, কত রাত হল ? হুঁঃ অনেক হয়েছে । অ্যাদ্দিন কোনও চার্ম ছিল না লাইফে । বুঝলে অর্জুন ? মাংসের ঝোল উইদাউট সল্ট ! ওহো, সর্ষে-ইলিশটা দারুণ ছিল হে । তা আজ রাত্রে বেশ জমকালো ব্যাপার ঘটল । লোকটা মরে গেল নাকি ?"

"কোন লোকটা ?"

"ওই যে কাফের ভেতর যার সঙ্গে কথা বললে । বেরিয়ে এসেও— ।"

"বুঝতে পারছি না ।"

লিফ্‌ট এসে গেল । মেজর বললেন, "চলো, যতক্ষণ ঘুম না আসছে এ-নিয়ে গল্প করা যাক ?"

কিন্তু নিজের ফ্লোরে লিফ্‌ট দাঁড়ানোমাত্র মিস্টার আলাম্বা অর্জুনের হাত চেপে ধরলেন, "প্লিজ, আমার সঙ্গে এসো । আমি একা থাকতে সাহস পাচ্ছি না ।"

মেজর বললেন, "এখানে কে আসতে সাহস পাবে ?"

"পেতে কতক্ষণ ? ওরা কী করে জানল আপনার গাড়িতে আমি বসে আছি ?"

"তা অবশ্য । কিন্তু এ-বাড়ির সিকিউরিটি, লিফ্‌টে উঠবে কী করে কার্ড পাঞ্চ না করলে ? তবু বলছেন যখন, আচ্ছা, অর্জুন গুড নাইট ।" মেজর নিষ্প্রভ গলায় বললেন ।

অর্জুন বলল, "আপনিও আসতে পারেন মেজর ।"

"না, না । আমার অত ভয়ডর নেই । সেবার একদল ম্যানইটারের সঙ্গে পাঁচ ঘণ্টা একা ছিলাম । ডু ইউ নো ? তা ছাড়া যার ফ্ল্যাট তিনি না বললে যাই

কী করে ?"

"তা ঠিক। আচ্ছা, গুড নাইট।" অর্জুন লিফ্ট থেকে নেমে দাঁড়াতেই লিফ্‌ট ওপরে চলে গেল। মিস্টার আলাম্বা জিজ্ঞেস করলেন গলা নামিয়ে, "সঙ্গে অস্ত্র আছে ?"

"না নেই। কেন ?"

"আমার সঙ্গে আছে। কিন্তু উত্তেজিত হলেই আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি, হাত কাঁপে ? ডান দিক বাঁ দিক হয়ে যায়।" পকেট থেকে একটা ছোট পিস্তল বের করে অর্জুনকে দিলেন তিনি, "আমার ভয় হচ্ছে, ওরা আগেভাগে ফ্ল্যাটে ঢুকে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তুমি কি ভারতবর্ষে জেম্‌স বন্ডের কোনও ছবি দেখেছ ?"

"দেখেছি।" অর্জুন হাসল।

"ফলো হিম। জেম্‌স যেমন করে সতর্ক ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকত ঠিক তেমনিভাবে তুমি ঘরে যাও। পরীক্ষা করো কেউ আছে কি না।" মিস্টার আলাম্বা দরজা নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে খুলে দিলেন।

কোথাও কোনও শব্দ নেই। অর্জুনের মনে হচ্ছিল মিস্টার আলাম্বার সন্দেহ করা নিরর্থক নয়। দেওয়াল ঘেঁষে ভেতরে ঢুকে সে যখন আলো জ্বালতে পারল তখন কয়েক মিনিট চলে গিয়েছে। ফ্ল্যাটে নেউ নেই। দরজা ভাল করে বন্ধ করে মিস্টার আলাম্বা বললেন, "আর কোনওদিক থেকে খুনি এখানে ঢুকতে পারবে না, শুধু বাথরুমের ওই জানলাটা ছাড়া। বড্ড পলকা, জোরে ধাক্কা দিলেই ভেঙে যাবে।"

অর্জুন সেদিকে উঁকি মেরে দেখল অনেক নীচে রাস্তা। অর্থাৎ এদিক দিয়ে ওপরে উঠে আসার কোনও পথ নেই। মিস্টার আলাম্বাকে আশ্বস্ত করল সে।

বাইরের ঘরের সোফায় শুয়ে পড়া পছন্দ করল অর্জুন। মিস্টার আলাম্বার এতে আপত্তি ছিল। শেষ পর্যন্ত তর্ক না করে বালিশ চাদর এনে ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর গুডনাইট বলার আগে পিস্তল ফেরত চাইলেন, "আসলে ওটা বালিশের নীচে না নিয়ে আমি ঘুমোতে পারছি না।"

আলো নিভিয়ে নিজের ঘরে মিস্টার আলাম্বা ফিরে গেলেন। এই ফ্ল্যাটের সর্বত্র আফ্রিকার শিল্পনিদর্শন ছড়ানো। অন্ধকারেও মনে হচ্ছিল সে আজ আফ্রিকাতেই আছে। অর্জুনের খেয়াল হল মিস্টার আলাম্বা অনেকক্ষণ আর লকেট নিয়ে কোনও কথা বলছেন না। এটা চাইবার সময় ওঁর মধ্যে যে আকৃতি দেখতে পেয়েছিল তা উধাও হয়ে যাবে এত সহজে ? হয়তো এই ভয় পাওয়ার কারণে তাকে এখানে শুতে বলা এটার পেছনে ওই লকেট-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা কাজ করছে ? কোনও বিশেষ কিছু সংগ্রহ করা যাদের নেশা তারা খুব খ্যাপাটে হয়। না-হলে রাজার চারমাথাওয়ালা একটা কয়েন ভুল করে মিন্ট থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল আর সেটির দর উঠেছিল এক কোটি পাউন্ড ?

অর্জুন লকেটটাকে গলা থেকে খুলে বের করল। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের একপাশে দাঁড় করানো কাঠখোদাই করা একটি আফ্রিকান কলসির মধ্যে সেটা ঢুকিয়ে রাখল। গলা থেকে সেটাকে খুলতেই কীরকম অস্বস্তি আরম্ভ হল। অর্জুন হেসে ফেলল, তার মধ্যেও ওই আদিম ভাবনাচিন্তা ঢুকে পড়েছে নাকি লকেট পরার পর ? সোফায় শুয়ে তার মনে পড়ল জিমের কথা। লোকটা মরে গেল নাকি ? এত তাড়াতাড়ি ওকে বিশ্বাসঘাতক চিহ্নিত করে খুঁজে পেয়ে গেল ওরা ? কী এফিশিয়েন্ট অর্গানাইজেশন। জিম এই লকেটটাকে প্রবল ভক্তি করেছে। ওর বান্ধবী সাদা মেয়ে, তার মধ্যে ওসব ভক্তিটক্তি দেখা যায়নি। কিন্তু এই আমেরিকার কিছু মানুষ যে লকেটটার ব্যাপারে ক্রমশ উন্মাদ হয়ে উঠছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন কী করা যায় ? সুধামাসিকে পৌঁছে দিতে এসেছিল সে। এখনও হাসপাতালে গিয়ে ওঁর জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করা হয়নি। খুব অভদ্রতা হয়েছে এটা। সুধামাসিকে সময় না দিয়ে এসব গোলমালে না জড়িয়ে পড়ে লকেটটাকে নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামে জমা দিয়ে দেওয়াই ভাল।

হঠাৎ নিশ্বাসের কষ্ট হতে আরম্ভ করল। বাতাস ভারী হয়ে গেছে খুব। এ-ঘরের ভেন্টিলেশন কি এত খারাপ ? অর্জুন ওঠার চেষ্টা করতে লাগল। তীব্র একটা গন্ধ নাকে ঢুকছে। কীসের গন্ধ ! তার মাথা ঘুরতে লাগল। অন্ধকারে চারপাশে তাকিয়ে সে কিছুই দেখতে পেল না। এবং এই দেখার সক্রিয় ভাবনাটাও আচমকা মাথা থেকে বেরিয়ে গেল। অর্জুন শুয়ে পড়ল সোফায়। তার জ্ঞান ছিল না।

pathagar.net

টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। ভাঙল বটে, কিন্তু সমস্ত শরীরে তীব্র আলস্য এবং মাথায় টিপটিপে যন্ত্রণা অর্জুনকে কাহিল করে দিচ্ছিল। সে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলতেই অজানা অচেনা ভাষায় একটি নারীকণ্ঠ কিছু বলল। একবর্ণ না বুঝতে পেরে অর্জুন ইংরেজিতে বলল, “আপনি কাকে চাইছেন ?”

এবার মেয়েটি জানতে চাইল, “এটা মিস্টার আলাম্বার ফ্ল্যাট, আশা করি।”

“হ্যাঁ।”

“ওঁকে বলুন সিম্বা এসেছে।”

অর্জুন টেলিফোন রেখে ভেতরের ঘরে গেল। দুটো ঘর। একটি ঘরে শিল্পসংগ্রহের প্রদর্শনী, অন্যটিতে মিস্টার আলাম্বা থাকেন। তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে সে বলল, “মিস্টার আলাম্বা, ফোন আছে আপনার ?”

“ফোন ? অসম্ভব। আমাকে কেউ ফোন করবে না।”

“মেয়েটি বলছে ওর নাম সিম্বা।”

“ও, সিম্বা। সিম্বা আমার মেয়ে। ও বোধহয় নীচ থেকে ফোন করছে। দেখছি আমি।” মিস্টার আলাম্বাকে খুশি-খুশি দেখাল।

কেউ নীচের গেটে এসে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের বোতাম টিপলেই রিসিভার আওয়াজ করে। তখন ফোনে নিজের পরিচয় দিলে যার কাছে এসেছে সে রিমোট টিপলে নীচের দরজা খুলে যায়। লিফ্‌ট চালু হয়। দ্বিতীয়বার বোতাম টিপলে যে-ফ্লোরে লিফ্‌ট দাঁড়াবে তার দরজা খোলে। কত সহজে ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পারছে ওরা। আমাদের দেশে হলে বলতে হত, দ্যাখ তো কে বেল বাজাচ্ছে। অর্জুন ভাবল, বেশিদিন নেই, এ-ব্যবস্থা চালু হল বলে!

মিস্টার আলাম্বাই দরজা খুললেন। প্রায় অর্জুনের মাথায় লম্বা ছিপছিপে একটি কালো মেয়ে ঘরে ঢুকল। তার কাঁধে দুটো স্ট্র্যাপ দেওয়া ব্যাগ, পরনে জিন্‌স। বাবা মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন। মেয়ে ঘুরে তাকাল, "আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ।"

মিস্টার আলাম্বা মেয়ের সঙ্গে অর্জুনের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

সিম্বা জিজ্ঞেস করল, "কীরকম লাগল বাবার ফ্ল্যাট?"

"ভাল। বেশ ভাল।"

"রাত্রে ঘুম হয়েছিল?"

"হ্যাঁ। কিন্তু— !"

"কিন্তু? মনে হয়নি ওইসব আফ্রিকান মূর্তিগুলো জীবন্ত হয়ে আপনাকে ঘিরে ফেলছে। বিশেষ করে ওই সাপটা— !" সিম্বা চোখ বড় করল।"

"না। তা হয়নি। কারণ শোয়ার কিছুক্ষণ পরেই একটা তীব্র গন্ধে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।" অর্জুন হাসল।

"জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন?" সিম্বা অবাক, "গন্ধে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে এটা বাবার কীর্তি। আফ্রিকার জঙ্গলের অনেক কিছু বাবার সংগ্রহে আছে, মাঝে-মাঝে বাবা সেগুলো ঠিক আছে কিনা যাচাই করেন। আমি হস্টেলে থাকি। এখানে থাকলে পাগল হয়ে যেতাম।" ব্যাগ টেবিলে রেখে ভেতরে চলে গেল সিম্বা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তা হলে আপনি পরীক্ষা করেছিলেন কাল রাত্রে?"

"ঠিক পরীক্ষা নয়। একটা গাছের কাঠ কিছুক্ষণ ঘষলে গন্ধ বের হয়। অনেকটা চন্দনের মতো গন্ধ, কিন্তু হাতিকেও অজ্ঞান করে ফেলে। কেনিয়াতে পাওয়া যেত আগে। কাল ভাবলাম দেখি, ওগুলো কেমন আছে!"

"আপনি নাকে মাস্ক পরে নিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ!"

"আর আমার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, তাই তো?"

"একদম ঠিক।"

"আর তারপর যখন দেখলেন আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছি তখন আমার বুক

থেকে লকেটটা খুলে নিতে কোনও অসুবিধে হয়নি, তাই না ?”

“না। ভুল হল।”

“তার মানে ?”

“তোমার গলায় লকেটটা ছিল না।”

“সে কী !”

“হ্যাঁ ছিল না। হয় তুমি খুলে রেখেছ, নয় কোথাও পড়ে গেছে।”

“খুলে কোথায় রাখতে পারি ? আমি তো আপনার সঙ্গেই এসেছি।”

“হ্যাঁ। তাই খুব অবাক হয়ে গিয়েছি আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমাকে অজ্ঞান করে লকেট নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা আমার ছিল না। আর কাঠ আমি ঘষেছিলাম পাশের ঘরে। এখানে ওটা করলে তুমি মারা যেতে।”

“অনেক ধন্যবাদ মিস্টার আলাম্বা। আমি একটা ফোন করতে পারি ?”

“নিশ্চয়ই।”

অর্জুন কার্ড বের করে নাম্বার টিপল। সেকেন্ড চল্লিশেক বাদে একটি নারীকণ্ঠ জানান দিল, “ইয়েস।”

“মিসেস স্মিথ ?”

“ইয়েস।”

“কাল রাত্রে কাফেতে আলাপ হয়েছিল। জিম কেমন আছে ?”

“ওঃ। ও মারা গিয়েছে। আপনি কোথায় ? আমার খুব দরকার। আপনি একবার আসতে পারবেন ? এক্ষুনি ?” মহিলা কাতর গলায় বললেন।

॥ ১১ ॥

অর্জুন বলল “আমাকে মাফ করবেন, এই মুহূর্তে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।” “প্লিজ !” মহিলা কাতর গলায় বললেন। “দেখুন আপনি আমাকে চেনেন না, আমার সমস্ত জানেন না। একই কথা আপনার সম্পর্কে প্রযোজ্য। তাই না ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“ঠিকই। কিন্তু মরার আগে জিম আমাকে বলেছে আপনাকে সব বলতে। যেহেতু লকেটটা আপনার কাছে আছে তাই আপনাকে ও গুরুত্ব দিয়েছে।”

“কী বলতে চেয়েছে, তা আপনি জানেন ?”

“হ্যাঁ। জানি।”

“আপনি পুলিশের কাছে যাচ্ছেন না কেন ?”

“গেলে আমিও খুন হয়ে যাব।” মহিলা বললেন, “আমি এই ফ্ল্যাটে থাকতে ভরসা পাচ্ছি না। কীভাবে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব ভেবে না পেয়ে অপেক্ষা করছিলাম যদি জিমের খবর জানতে আপনি এখানে ফোন করেন। আমি এখনই আমার এক মাসির বাড়িতে চলে যাচ্ছি।”

pathagar.net

"আমার নাম অর্জুন। কোথায় যেতে হবে আমাকে?"

"জ্যাকসন হাইটে যে অফ ট্র্যাক বেটিং সেন্টার আছে সেটা ছাড়িয়ে গেলেই বাঁ দিকে একটা সিঁড়ি নীচে চলে গেছে। সেখানে নেমে একটা কাগজের স্টল দেখতে পাবেন। সেই স্টলে আমার নাম জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন মাসির ফ্ল্যাটটা কোথায়! আমার নাম তো কার্ডেই পেয়ে যাবেন।"

"ঠিক আছে। আমি ভেবে দেখি।" অর্জুন ফোন নামিয়ে রাখল।

মিস্টার আলাম্বা জিজ্ঞেস করলেন "কী ব্যাপার?"

"জিম মারা গিয়েছে। ওর সঙ্গে যে মহিলা ছিলেন তাঁকে বলে গেছে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে।"

সিম্বা অর্জুনের হাত থেকে কার্ড নিয়ে নামটা পড়ল, "গ্যাব্রিয়েলা! শি ইজ স্প্যানিশ। ব্যাপারটা কী?"

"অনেক ঘটনা। মিস্টার আলাম্বার কাছে শুনে নেবেন। আমাকে এখন মেজরের ফ্ল্যাটে যেতে হবে।" অর্জুন বলল।

"কিন্তু তোমার লকেটটা কোথায় গেল?" মিস্টার আলাম্বা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল, "তোমার সঙ্গে নেই যখন, তখন কি রাস্তায় পড়ে গেছে? ওইরকম লকেট তুমি অবহেলায় হারিয়ে ফেললে?"

অর্জুন তাকাল। সোফার পাশে সেই খোদাই করা কাঠের কলসির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে লকেটটাকে বের করে গলায় পরে নিল, "আমি খুব দুঃখিত মিস্টার আলাম্বা। এখানে যদি এটাকে না রাখতাম তা হলে আপনার সংগ্রহশালা আরও মূল্যবান হত এবং আমি কখনওই এটাকে ফেরত পেতাম না। বাই—।" অর্জুন সোজা দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

মেজরের ফ্ল্যাটের দরজার বেলের বোতাম টিপতেই সেটা খুলল না, তিনবার বাজানোর পর ঘুম-ঘুম চোখে দরজা খুলে মেজর হাই তুললেন, "এই মাঝরাতে না এসে ভোর হলে আসতে পারলে না?"

অর্জুন ফ্ল্যাটে ঢুকে দেখল সবক'টা জানলায় ভারী পরদা টানা থাকায় বাইরের আলো একফোঁটা ঢুকছে না। সে বলল, "এখন সকাল আটটা। আপনার কাছে স্পেয়ার টুথব্রাশ আছে?"

"আটটা? মাই গড! ওঃ, কালকের ডিনারটা আমাকে—! এইজন্যেই রাত্রে লাইট ডিনার করা উচিত। আছে। টুথব্রাশ কেন, এক্সট্রা সাবান, দাড়ি কামাবার স্টিক সব পেয়ে যাবে ওখানে।" মেজর দাড়ি চুলকোতে লাগলেন।

আটঘণ্টা বাদে দু'জনে পরিষ্কার হয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে টোস্ট, ডিমের পোচ আর চা খাচ্ছিল। মেজর চোখ বড় করে বললেন, "এ তো স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাকে অজ্ঞান করে লকেট চুরি করবে আলাম্বা, এটা আমি ভাবতে পারছি না। এই পৃথিবীতে দেখছি কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না!"

"ওঁর লোভ হওয়া স্বাভাবিক।"

"হুম্। মাঝে-মাঝে এমন ভঙ্গিতে কথা বলো যে, মনে হয় তুমি, কোনও তিব্বতি লামা। হাঁটুর বয়সী ছেলে তুমি অথচ একেবারে জ্ঞানবৃদ্ধ।" মেজর মচমচ করে টোস্টে কামড় দিলেন, "আর এইজন্যেই তোমার ফ্যান আমি।"

অর্জুন বলল, "আমি ভাবছি গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে দেখা করব।"

"নিশ্চয়ই করবে। ওই ব্যাটা জিম মরার আগে কী বলে গেছে সেটা না শুনলে এই টোস্ট হজম হবে না আমার।"

"আপনি সঙ্গে যাবেন ?"

"তুমি তো নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাট কিছুই চেনো না। আমি না নিয়ে গেলে কীভাবে পৌঁছবে ?"

"তা ঠিক। তবে আপনার বাড়ির পাশেই কাল টিউব স্টেশন দেখেছি, জ্যাকসন হাইটে, যেতে নিশ্চয়ই সমস্যা হবে না।"

"তারপর ?"

"ওখান থেকে নিউ জার্সিতে ফিরবে কী করে ? ওখানে তো টিউব নেই।"

"তা অবশ্য। কিন্তু আপনার সব কাজ ফেলে আমার সঙ্গে যেতে কী করে বলি ? আপনার নিশ্চয়ই অসুবিধা হবে।"

"তা হবে।" দাড়ি চুলকোলেন মেজর, "আজ মিস্টার স্টিভেনসনের সঙ্গে ব্যাপারটা ফাইনাল করার কথা। ওঁর ইচ্ছে আফ্রিকার জঙ্গলে এক মাস থেকে মাকড়সাদের লাইফ ভিডিওতে তুলে আনা। আর আমি বলছি আর একবার ইয়েতি খুঁজতে হিমালয়ে যেতে। হিলারী সাহেব খুঁজে পাননি মানে এই নয় হিমালয়ে ইয়েতি নেই। না থাকলে ইয়েতি শব্দটার জন্মই হত না।"

"আপনার মিটিং কখন ?"

"দুপুরে।"

"তা হলে চলুন এখনই বেরিয়ে পড়ি।"

"সঙ্গে অস্ত্র আছে ?"

"না তো !"

"যদি এটা ট্র্যাপ হয় ? কিছুই বলা যায় না। তুমি বরং, ওই লকেটটা আমার ফ্ল্যাটে রেখে যাও। ওটা হারানো উচিত হবে না।"

অর্জুন হেসে বলল, "এটার কোনও মূল্য আমার কাছে নেই। তবে যেসব আফ্রিকান একে ভয় বা শ্রদ্ধা করেন তাঁদের অসম্মান আমি করছি না। অবশ্য সঠিক জায়গায় যদি এটা পৌঁছয় তার চেষ্টা করা উচিত।"

"কারেক্ট। এক কাজ করি। ওর ডুপ্লিকেট বানিয়ে নিই।"

"কোথায় পাবেন ?"

"চলো।"

তৈরি হয়ে ওরা যখন বেরোতে যাচ্ছে তখন দরজার ওপারে সিম্বাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। সিম্বা অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল, "আমি আমার বাবার

হয়ে ক্ষমা চাইতে এসেছি। আসলে কোনও বিরল জিনিস দেখলে ওঁর মাথায় ন্যায়-অন্যায় বোধ কাজ করে না।"

মেজর বললেন, "এটা উনি নিজে না বলে তোমাকে কেন পাঠিয়েছেন ?"

"বাবা আসতে লজ্জা পাচ্ছেন।" সিম্বা ম্লান হাসল।

অর্জুন বলল, "ওঁকে বলবেন সমস্যাটা আমি বুঝেছি। কিন্তু এখন আমরা বের হচ্ছি। আপনাকে তাই ভেতরে আসতে বলতে পারছি না।"

সিম্বা বলল, "আমি স্প্যানিশ জানি।"

"তার মানে ?" অর্জুন অবাক !

"যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে তখন টেলিফোনে কথা বললেন তাঁর কাছে যদি যান তা হলে আমি সঙ্গে থাকলে উপকার হবে।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন। ভদ্রমহিলার সঙ্গে আমি ইংরেজিতে কথা বলেছি।"

"ও, তাই তো !" সিম্বা মাথা নাড়ল।

"আর মেজর স্প্যানিশ ভালই জানেন।"

সিম্বা আর কথা না বাড়িয়ে ওদের সঙ্গে লিফ্‌টে নীচে নেমে এল। বাড়ির বাইরে এসে মেজর বললেন, "চলো হে, টিউব নিতে হবে।"

টিউব শব্দটি কানে যেতে সিম্বা জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? আপনারা গাড়ি নিচ্ছেন না ?"

"মাই ডিয়ার বেবি, আমার গাড়িটাকে তোমার বাবার বন্ধুরা কাল রাত্রে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।" মেজর ঘুরে বললেন।

"ও মাই গড !" সিম্বা বলল।

"তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে ?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।"

"আমাদের জ্যাকসন হাইটে নামিয়ে দিতে পারবে ? টিউবে উঠতে আমার খুব খারাপ লাগে।" মেজর বললেন।

"স্বচ্ছন্দে। আসুন।" সিম্বা যেন খুশি হল।

নিউ জার্সির রাস্তায় লোকজন দেখা যায় না, কিন্তু কুইন্সের চেহারাটা আলাদা। এখন সকাল। গাড়ির ভিড় এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু যা আছে তা কলকাতাতেও দেখা যাবে না। অর্জুনের মনে পড়ল কোনও একটা কাগজে পড়েছিল, শুধু নিউ ইয়র্কে যত গাড়ি চলে তার সংখ্যা সমস্ত ভারতবর্ষের গাড়ির সংখ্যা ছাপিয়ে গিয়েছে।

জ্যাকসন হাইটে যেখানে গাড়ি পার্ক করল সিম্বা, সেটাকে ভারতীয় পাড়া বলে মনে হল অর্জুনের। কিন্তু গাড়ি থেকে নামতেই ফুটপাথে হেঁটে যাওয়া মানুষদের বাংলায় কথা বলতে শুনে সে আরও অবাক হল। মেজর বললেন,

"যখনই বাংলা শুনতে ইচ্ছে করে তখনই চলে আসি এখানে। বাংলাদেশিরা এই পাড়াটা প্রায় দখল করে ফেলেছে। ওদের কম্পিটিটার হল কিছু গুজরাতি ব্যবসায়ী। ওই দ্যাখো, রয়াল বেঙ্গল রেস্টুরেন্ট, দারুণ ইলিশ মাছ রাঁধে।" মুখ তুলে একটা সাইনবোর্ড দেখে অর্জুনের মন জুড়িয়ে গেল। বাংলা হরফে লেখা রয়েছে, 'মুক্তধারা। সমস্ত বাংলা বই এবং বাংলা গানের ক্যাসেট পাওয়া যায়।'

ও টি বি অথবা অফ ট্র্যাক বেটিং সেন্টার হল জুয়া খেলার কেন্দ্র। এই পূর্ব-উপকূলে যত রেসকোর্স আছে তার রেসের ছবি এখানকার ভিডিওতে দেখানো হয়। এখন অবশ্য দোকানটি বন্ধ। ও টি বি-র পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই চোখে পড়ল সিঁড়িটাকে। বাঁ দিক দিয়ে নীচে নেমে গেছে। অর্থাৎ গ্যাব্রিয়েলা টেলিফোনে যা বলেছে তা মিলে যাচ্ছে। মাথার ওপর দুমদুম শব্দ করে ট্রেন চলে গেল। অর্জুন বলল, "এদিকে যেতে হবে।"

সিম্বা ওদের সঙ্গে আসেনি। গাড়ি পার্ক করে সেখানেই থেকে গেছে। অর্জুন চেয়েছিল মেয়েটাকে ছেড়ে দিতে কিন্তু মেজর ওকে অনুরোধ করেছেন ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। মেয়েটার কথাবার্তা খারাপ নয়। অন্তত ও কোনও ক্ষতি করবে না বলেই অর্জুনের মনে হয়। অর্জুন হেসে ফেলল। সে ক্ষতির কথা ভাবছে, এখন পর্যন্ত মেয়েটা তো তাদের উপকার করেই যাচ্ছে।

নীচে নামতেই কাগজের স্টলটাকে দেখতে পেলে অর্জুন। একটি বয়স্কা মহিলা কাগজ বিক্রি করছেন। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বলল, "এক্সকিউজ মি!"

মহিলা ফিরেও তাকাল না। আর একজন খদ্দেরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। লোকটা কাগজ নিয়ে চলে যেতেই মহিলা আঙুল তুলে কাগজগুলো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল। "ওয়ান্ট পেপার?"

"নো।"

"দেন গেট লস্ট।" মহিলা অন্যদিকে তাকাল।

এবার মেজর এগিয়ে এল, হাই। হি ইজ আস্কিং ফর গ্যাব্রিয়েলা।" মেজরের উচ্চারণ আমেরিকানদের মতো জড়ানো। মহিলা চট করে তাকাল, "হোয়াট ইজ হিজ নেম?"

"অর্জুন।" মেজর একই গলায় উচ্চারণ করলেন।

মহিলা চট করে পকেট থেকে একটা কাগজের টুকরো বের করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "সরি। শি ইজ নট হেয়ার।"

"হোয়ার ইজ শি?"

"গ্যাবি আটলান্টিক সিটিতে গিয়েছে।"

"হতেই পারে না। ও ওর মাসির বাড়িতে থাকবে বলেছিল।"

"তাই ইচ্ছে ছিল ওর। কিন্তু জানোই তো, পরিস্থিতি পালটায়। ও অর্জুনের জন্যে তাজমহল ক্যাসিনোতে অপেক্ষা করবে।"

"আমরা ওখানে যে যাব তা ও আশা করল কী করে ? ননসেন্স !"

"আমি জানি না। ও বলেছে দুপুর একটা থেকে দুটো তাজমহলের এক ডলারের স্লট মেশিনের সামনে বসে থাকবে। এখন কেটে পড়ো।"

"এই খবরটা তুমি কতজনকে দিয়েছ ?"

"তুমি কী বলতে চাও ? আমি কাগজ বিক্রি করি, বন্ধুত্ব নয়। গ্যাবি আমার খুব ভাল বন্ধু। ও ওই ছেলেটার চেহারার বর্ণনা দিয়ে গিয়েছিল।"

মেজর হাঁটতে শুরু করলেন, "অদ্ভুত ব্যাপার !"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জায়গাটা কোথায় ? কীভাবে যাওয়া যায় ?"

"সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল এখানে দেখা করতে বলে মেয়েটা পালাল কেন ? তোমাকে জ্বালাচ্ছে না তো।"

"তাতে ওর কী লাভ ?"

"তা ঠিক। তুমি যদি না যাও তা হলে ওর কী লাভ হবে ? আর গেলেই বা কী লাভ করবে ও, তাও বুঝতে পারছি না।" মেজর দাড়ি চুলকে বললেন, "জায়গাটা অতলান্তিক সমুদ্রের ধারে। লোকে জুয়ো খেলতে যায় কিন্তু দেখার মতো জায়গা। লস ভেগাসের নাম শুনেছ ? লস অ্যাঞ্জেলিসের কাছে মরুভূমির ওপর আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের জিন যেন একটা শহর বানিয়ে দিয়েছে যা দিনে ঘুমোয় রাত্রে জাগে। তারই মিনি সংস্করণ এই ইস্টকোস্টে আটলান্টিক সিটি। যেতে ঘণ্টা আড়াই লাগবে।"

"তাজমহল কি কোনও হোটেলের নাম ?"

"না। ক্যাসিনোর। জায়গাটা জুড়ে শুধু ক্যাসিনো। মুশকিল হল, আমার গাড়ি নেই। বাসে অবশ্য যাওয়া যায়, কিন্তু— চলো দেখি।"

পার্কিং প্লেসে ফিরে আসামাত্র সিম্বা হাসল, "কাজ হয়েছে ?"

"না।" মেজর দাড়ি চুলকোলেন, "আমাদের একটু আটলান্টিক সিটিতে যাওয়া দরকার। দিনটা অবশ্য যাবে। তোমার কি মনে হয়, যেতে পারবে ?"

॥ ১২ ॥

সিম্বা যে এককথায় রাজি হয়ে যাবে কে জানত ! মেজরের প্রশ্ন শুনে বলল, "গ্রেট। আমি অনেকদিন আটলান্টিক সিটিতে যাইনি। চলো, মজা করে আসা যাক।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমার কোনও কাজ ছিল না ?"

"ছিল। একটা টেলিফোন করে দিতে হবে। কাজটা খুব জরুরি নয়।"

এখানে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করলে মেশিনে পয়সা ফেলতে হয়। মেশিনের কাঁটা বলে দেয় কতক্ষণ গাড়ি দ্বিতীয়বার পয়সা না ফেলে রাখা যাবে। ব্যবস্থাটা বেশ ভাল। তবে ফুটপাথের পাশে সর্বত্র গাড়ি রাখা যাবে

না। দমকল যেখান থেকে জলের কানেকশন নেয় অথবা প্রতিবন্ধীদের জন্যে যে পার্কিং চিহ্ন রয়েছে সেখানে সুস্থ লোকের গাড়ি রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। এই দ্বিতীয় জিনিসটা গতবারেও দেখেছিল, এবারেও চোখে পড়ছে। আমেরিকায় প্রতিবন্ধীদের জন্যে যে সুযোগসুবিধে রয়েছে তা সারা পৃথিবীর অনুকরণ করা উচিত। একটা রেস্টুরেন্টও শুধু সিঁড়ি বানিয়ে দায়িত্ব শেষ করতে পারে না। তাদের প্রতিবন্ধীদের হুইল চেয়ার সহজে ওঠার জন্যে মসৃণ ঢালু প্যাসেজ তৈরি করে রাখতে হবে। বাসে ট্রেনে তো বটেই, পার্কিং লটে প্রতিবন্ধীদের জন্যে আলাদা পার্কিং-এর ব্যবস্থা আছে। সুস্থ মানুষ গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজে না পেলেও সেই বরাদ্দ জায়গায় গাড়ি রাখার কথা ভাবতেও পারে না।

সিম্বা গাড়ি চালাতে-চালাতে বলল, "আমার বাবা জানতে পারলে খুব রেগে যাবেন। উনি কিছুতেই খুশি নন। এই যে আমি একা গাড়ি চালিয়ে শহরে ঘুরি, এটাও ওঁর অপছন্দ। উনি যাদের শত্রু বলে মনে করেন তারা নাকি আমারও ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু কেন? আমার সঙ্গে তো তাদের শত্রুতা নেই।"

মেজর বললেন, "জন্তুজানোয়াররা এই ভদ্রতাটা মেনে চলে খুবই, কিন্তু মানুষ বড় ভয়ানক জীব। তারা সন্তানকে মেরে বাপকে শাস্তি দিতে চায়। কিন্তু মিস্টার আলাম্বা যদি পছন্দ না করেন তা হলে তোমার আটলান্টিক সিটিতে যাওয়া উচিত নয়।"

"ওঃ নো! আমার বয়স আঠারো অনেকদিন আগে হয়ে গিয়েছে। বাবার কথা শুনলে আমাকে বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিন কাটাতে হয়। আমি ওটা করতে পারব না। সত্যি কথা বলছি, এখন পর্যন্ত কেউ আমাকে ভয়ও দেখায়নি।" সিম্বা বলল।

হঠাৎ বাঁ দিকের একজিট নিতে বললেন মেজর। ওরা এতক্ষণ হাইওয়ে দিয়ে চলছিল। এখানকার হাইওয়েগুলো একেবারে নিয়মে বাঁধা। ড্রাইভার কতটা স্পিডে গাড়ি চালাবে সেটা পুলিশ নিয়ন্ত্রণ করছে। সেটা না মানলে মোটা ফাইন দিতে হবে। হাইওয়ে ধরে এগোলে কোন-কোন জায়গা পড়বে তা রাস্তার ওপরে হোর্ডিং-এ লেখা আছে। এ ছাড়া সামনের রাস্তায় গাড়ির ভিড় জমে গেছে কিনা তাও জানিয়ে দেওয়া হয় ইলেকট্রনিক বোর্ডের মারফত। এ ছাড়া চা খাবার অথবা হোটেলের সন্ধান দেওয়া বোর্ড প্রায়ই চোখে পড়ে। আর তার গায়ে একজিট সাইন। ওই পথে তুমি হাইওয়ে থেকে বেরিয়ে যেতে পারো। মজার কথা, হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় দু'পাশে বাড়ি আছে বলে টেরই পাওয়া যায় না। এই যে সিম্বা একজিট দিয়ে খানিকটা ভেতরে ঢুকল, অমনই একটা শহর দেখতে পেল ওরা।

গাড়ি থামাতে বলে মেজর অর্জুনকে বলল, "চলো আমার সঙ্গে। আর সিম্বা, ওখানে বুথ আছে, তোমার টেলিফোনের কাজটা সেরে নিতে পারো।"

সিম্বা মাথা নাড়ল।

দরজা খুলে ভেতরে পা দিতেই একজন সাদা আমেরিকান কাউন্টারের ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "গুড মর্নিং ! অনেকদিন পরে দেখা হল !"

মেজর কাঁধ ঝাঁকালেন, "গুড মর্নিং মিস্টার টমসন। আমার হাতে সময় খুব কম। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি পুরো আমেরিকায় আপনিই এই উপকারটা করতে পারেন।"

"ব্যাপারটা কী ?"

মেজর অর্জুনকে বললেন, "লকেটটা দাও।"

অর্জুনের মনে পড়ল। সে লকেট খুলে কাউন্টারের ওপর রাখল। টমসন সেটা তুলে বলল, "বাঃ। বেশ ভাল। মেটালটা কী ? পাথর ? পাথর বলে মনে হচ্ছে না। এত হালকা হবে না। কী ব্যাপার ?"

মেজর বললেন, "এটা কী জিনিস আমারও জানা নেই। আপনি এর ডুপ্লিকেট বানিয়ে দিন।"

"কিন্তু এটা কী জিনিস না জানলে হুবহু হবে কী করে ? অবশ্য এর রঙের এফেক্ট গালা দিয়ে আনা যায়।"

"তাই আনুন। আর একটা কথা, আপনার ফ্যাক্টরিতে কোনও আফ্রিকার মানুষ কি কাজ করে ?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"না, কেন ?"

"তা হলে ঠিক আছে।"

"কিন্তু সার, আপনি ছাঁচ তৈরি করার সময় দেবেন তো ! একটাই লকেট যখন হবে তখন মোম ব্যবহার করলেই চলবে। অন্তত এক ঘণ্টা সময় দিন।"

টমসন বোতাম টিপল, "আর হ্যাঁ, পঞ্চাশ ডলার দিতে হবে এর জন্যে।"

মেজর রাজি হয়ে অর্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দূর থেকে দেখা গেল সুদৃশ্য টেলিফোন বাক্সের পাশে দাঁড়িয়ে সিম্বা কথা বলে যাচ্ছে। মেজর চাপা গলায় বললেন, "আজকাল আমার সব ব্যাপারেই সন্দেহ হয়।"

"কীরকম ?"

"এই যে মেয়েটা টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে কে জানে !"

"ওর সঙ্গে যার কাজ ছিল তাকে জানিয়ে দিচ্ছে আজ যাবে না।"

"তার জন্যে এতক্ষণ কথা বলতে হয় না। ধরো, ও কাউকে জানাচ্ছে যে আমাদের নিয়ে আটলান্টিক সিটিতে যাচ্ছে গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে দেখা করতে। খবরটা যাকে দিচ্ছে সে হয়তো গ্যাব্রিয়েলার খোঁজে আছে। অতএব সে পেছন-পেছন গিয়ে হাজির হবে।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন যারা গ্যাব্রিয়েলার সন্ধানে আছে তারা ওর বাবার শত্রু। ও নিশ্চয়ই তাদের সাহায্য করবে না।"

"সেটা অবশ্য ঠিক। হয়তো ও ওর বাবাকে বলছে।"

"মিস্টার আলাম্বা নিশ্চয়ই সেখানে যেতে সাহস পাবেন না।"

"তাও ঠিক। কিন্তু ওঁর ফোন যদি ট্যাপ করে ওরা ?"

"এখানে এসব হয় ?"

"এদেশে কী হতে পারে আর হয় না তা আমি আজও বুঝতে পারলাম না। এরা প্রেসিডেন্টের শোয়ার ঘরের ছবিও তুলে আনতে পারে।"

কথা বলতে-বলতে ওরা গাড়ির কাছে পৌঁছেছিল। ওদের দেখে টেলিফোন রেখে দিয়ে সিম্বা এগিয়ে এল, "আমার বান্ধবী খুব রেগে গেছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

"ওকে ফেলে আমি আপনাদের সঙ্গে আটলান্টিক সিটিতে যাচ্ছি।"

"আপনার বান্ধবী কী করেন ?"

"ও ডক্টরেট করছে। জাপানের মেয়ে।"

মেজর বললেন, "বাঁচা গেল !"

সিম্বা জানতে চাইল, "কী বললেন ?"

মেজর ইংরেজিতে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই আর কাউকে এ-কথা বলোনি ?"

"না। কেন ?"

"আমরা চাই না এই যাওয়ার কথা পাঁচজনে জানুক। তোমার বন্ধু যেহেতু জাপানি তাই তাকে নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। আচ্ছা, এখন একটু কফি খাওয়া যাক। সামনেই ম্যাকডোনাল্ড, চলো, ওখানে যাই।"

ঝকঝকে রেস্টুরেন্টে এখন একটুও ভিড় নেই। চমৎকার সাজানো কাউন্টারের পেছনে রঙিন বোর্ডে ছবির সঙ্গে খাবারের মেনু লেখা আছে। মেজর তিনটে কফি নিয়ে জানলার পাশের টেবিলে চলে এলেন। অর্জুন দেখল একটা সাদা মেয়ে দু'পায়ে চাকা লাগিয়ে পাখির মতো উড়ে যাচ্ছে ফুটপাথ দিয়ে।

সিম্বা কফির গ্লাসে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আমি কি জোর করে আপনাদের সঙ্গে এসেছি ?"

মেজর কফিতে চুমুক দিতে গিয়ে তাকালেন, "এ-কথা কেন ?"

"কারণ আমি কথা বলতে খুব ভালবাসি। অথচ আপনারা প্রয়োজন না হলে কথা বলছেন না বলে আমাকে চুপ করে থাকতে হচ্ছে। আপনারা জ্যাকসন হাইটে আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন না, এখানেও তাই। কেন জানি না, আমার মনে হচ্ছে আমি জোর করে আপনাদের সঙ্গে এসেছি অথবা আপনারা আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।" সিম্বা কথাগুলো বলে ব্যাগ খুলল, "আমি একটা সিগারেট খেতে পারি ?"

মেজর বললেন, "খাও।"

অর্জুন দেখল টেবিলে একটা চ্যাপটা টিনের অ্যাশট্রে আছে। সে শুনেছিল আমেরিকায় কেউ সিগারেট খায় না। সত্যি বলতে কি, সিগারেট খাচ্ছে এমন

কাউকে চোখে পড়েনি তার। সে নিজে মাঝে-মাঝে সিগারেট খেলেও ঠিক করেছিল ইচ্ছে হলেও সিগারেট কিনবে না। কিন্তু সিম্বা এখানে স্বচ্ছন্দে সিগারেটে টান দিচ্ছে ? ওর বয়স তো খুবই কম। সিম্বা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে মেজর বললেন, "দ্যাখো আমরাই তোমার কাছে লিফ্ট চেয়েছিলাম। আটলান্টিক সিটিতে যেতে চাও কিনা সেটা আমরাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। অতএব তুমি জোর করে সঙ্গে যাচ্ছ এমন ভাবার তো কোনও কারণ নেই। কী বলো অর্জুন ?"

"নিশ্চয়ই। তা ছাড়া তুমি নিশ্চয়ই তোমার বাবার কাছে শুনেছ কেন আমি গ্যাব্রিয়েলার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। জিমকে যারা মেরেছে তারা ভয়ঙ্কর লোক। আমাদের সঙ্গে দেখলে তুমিও ওদের শত্রু হয়ে যেতে পারো। তাই তোমাকে দূরে রাখা ভাল।"

"এটা কীরকম কথা হল ? গাড়িতে আমার সঙ্গে আপনারা যাচ্ছেন এটা তো ওরা দেখতেই পাবে, অবশ্য দেখতে যদি চায়। আসলে আমার বাবার ব্যবহারের জন্যে আপনারা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছেন না। ঠিক কি না ?" সিম্বা তাকাল।

অর্জুন হাসল, "আমার জায়গায় থাকলে তোমার কী মনে হত ?"

"সরাসরি বলতাম।"

এবার মেজর বললেন, "ঠিক আছে। সিম্বা, একটু তো মনে দ্বিধা ছিলই। কিন্তু তোমার কথা শোনার পর সেটা চলে গেছে।"

"বাবা বলেছে আপনার কাছে এমন একটা লকেট আছে যার দাম নাকি ডলার দিয়ে মাপা যায় না। আর সেই লকেটটা আফ্রিকানদের।"

"এদেশে আসার আগে ওই লকেটের কোনও মূল্য আমার কাছে ছিল না। ওটা আমার পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাগানে গাছের নীচে পুঁতে রেখেছিল একজন বুজরুক। এখানে এসে শুনছি এটা খুব মূল্যবান। একদল আফ্রিকান এটা ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছে। অথচ তারা এর মালিক নয়। বেশিরভাগ সরল আফ্রিকান যারা বাপঠাকুর্দার কাছে ওই লকেটের গল্প শুনে এসেছে তাদের কব্জা করতে এই লোকগুলো লকেটের দখল চাইছে। আর তোমার বাবা যেহেতু একজন সংগ্রাহক তাই তিনি আমাকে অজ্ঞান করে এটা পেতে চেয়েছিলেন।"

"লকেটটা কি আপনার সঙ্গে আছে ?"

"হ্যাঁ। তবে এখানে দেখতে চেয়ো না। গাড়িতে বসে দেখতে পারো।"

"কেন ? এখানে তো কোনও লোকজন নেই।"

"না। কাউন্টারে যে ছেলেটি অর্ডার নিচ্ছে সে কালো ছেলে।"

সিম্বা ঘাড় ঘুরিয়ে কাউন্টারের দিকে তাকাল, "দুর। ওর বাবা মায়ের কেউ স্প্যানিশ নিশ্চয়ই। কোনওদিন আফ্রিকায় গিয়েছে বলে মনে হয় না।"

"হতে পারে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না।"

এর পর মেজর অন্য প্রসঙ্গ তুললেন। ওঁর বিভিন্ন অভিযানের গল্প শুনলে সময় চমৎকার কেটে যায়। অর্জুনের সেসব শুনলেই মনে হয় ঘনাদা বা টেনিদার মুখে গল্প শুনছে। এমন সব উদ্ভট ঘটনা যে মেজর ঘটাতে পারেন বিশ্বাসই হয় না!

ঠিক এক ঘণ্টা বাদে ওরা ম্যাকডোনাল্ড থেকে বেরিয়ে দোকানটার দিকে এগোল। সিম্বা বলল, "তোমরা একটু অপেক্ষা করবে? আমি টয়লেটে যাব।"

মেজর বললেন, "তা হলে তুমি গাড়ির কাছে চলে এসো, আমরা ওই দোকানটা থেকে ঘুরে আসছি।"

সিম্বা চলে যেতে মেজর বললেন, "বাঁচা গেল! লকেটের ব্যাপারটা তৃতীয় কারও না জানাই ভাল। ওকে অবিশ্বাস না করেও বলছি।"

মিনিটপাঁচেক অপেক্ষা করতে হল। টমসন দুটো লকেট কাউন্টারের ওপর রেখে বললেন, "দ্যাখো, কাজ দ্যাখো। আর কেউ এমন কপি করতে পারবে না।"

অর্জুন দেখল নতুনটা অবিকল আগেরটার মতো। শুধু একটু বেশি চকচকে। সে দুটো লকেট হাতে তুলেই পার্থক্যটা বুঝতে পারল। নতুনটা বেশি হালকা। কথাটা বলতেই টমসন মাথা নাড়লেন, "ইম্পসিবল। ওটা এক ধরনের পাথর। ওই পাথর আমি কোথায় পাব? ওজনের পার্থক্য তো হবেই। কিন্তু হাতে না নিলে কেউ ওই তফাতটা বুঝতে পারবে কি?"

অর্জুনের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও মেজর পঞ্চাশ ডলার পেমেন্ট করলেন। অর্জুন লক্ষ করল টমসন এর জন্যে কোনও রসিদ দিল না। এদেশে এটা চলে? মেজর বললেন, "টমসনের লকেটটা তুমি গলায় পরে নাও।"

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অর্জুন আসল লকেটটাকে পকেটে ঢোকাল।

গাড়ির দিকে যাওয়ার সময় মেজর বললেন, "ওটা পকেটে রাখা বোধ হয় ঠিক হবে না। গাড়িতে উঠে তোমার মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখো।"

"মোজার মধ্যে?"

"আপাতত ওটাই নিরাপদ জায়গা।"

সিম্বা স্টিয়ারিং-এর সামনে বসে ছিল। এবার মেজর সামনে বসলেন। পেছনের সিটে বসে অর্জুন গলা থেকে লকেটটাকে খুলে সিম্বাকে দিল, "সাবধানে দ্যাখো। কেউ যেন টের না পায়।"

সিম্বার চোখ বড় হয়ে গেল, "আঃ। ফ্যান্টাস্টিক। এর দাম অনেক।"

"তোমার মনে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না?"

"না তো। আমি তো ওসব গল্প শুনিনি। লকেটটা আমি পরতে পারি?"

"না। ওটা ঠিক হবে না।"

"প্লিজ। আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছবার আগেই ফিরিয়ে দেব।"

অর্জুন কিছু বলল না। গাড়ি চলতে শুরু করলে সে পকেট থেকে আসল লকেট বের করে সন্তর্পণে ডান পায়ের মোজার মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। একজিট দিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছতেই কাণ্ডটা ঘটল। পেছন থেকে একটা গাড়ি এমন জোরে ছুটে এল যে, সিম্বা কোনওমতে বাঁ দিকে সরে না গেলে ভয়ঙ্কর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেত। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে সিম্বা বলল, "মাই গড! লোকটা কি পাগল? আর একটু হলে...!" তারপর বুক থেকে লকেটটা বের করে বলল, "এটা আমাদের বাঁচিয়ে দিল বোধ হয়, তাই না?"

॥ ১৩ ॥

আটলান্টিক নগর। এমন বিস্ময়কর জায়গা এর আগে দ্যাখেনি অর্জুন। আসার পথে, নগর যখন এসে পড়েছে তখন রাস্তার দু'পাশে ছোট-ছোট মোটেল অথবা হোটেলের বিজ্ঞাপনে যে আমন্ত্রণ, তা এমন কিছু আকর্ষক নয়। কিন্তু দূর থেকে সারি-সারি রঙিন উঁচু বাড়িগুলো পলকেই চোখ টেনে নেয়। মেজর বলছিলেন, "সন্ধের পর এখানে আলোর খেলা শুরু হয়ে যায়। নানা রঙের আলোর ফোয়ারা আকাশে ছিটকে-ছিটকে ওঠে হে! কিন্তু জায়গাটা ভয়ঙ্কর।"

সিম্বা গাড়ি চালাচ্ছিল। বাংলা ও বুঝতে পারছে না এবং মেজর তা নিয়ে একটুও মাথা না ঘামিয়ে মাতৃভাষায় বলে যাচ্ছিলেন।

"ভয়ঙ্কর কেন?" অর্জুন জানতে চাইল।

"ওই যে বাড়িগুলো দেখছ, ওগুলো হল ক্যাসিনো। প্রতিটি ক্যাসিনোর বিভিন্ন তলায় জুয়ো খেলার ব্যবস্থা আছে। হরেকরকম জুয়ো। লোকে এখানে তাই আসে। যে কখনও জুয়ো খেলেনি সে-ও এখানে এলে লাক ট্রাই করে। কিন্তু দশ হাজারে একজন হয়তো হাজার ডলার জিতে ফিরে যায়। তা হলে বাকি ন'হাজার নিরানব্বই জনের পকেট খালি হয়ে যায় এখানে। বুঝতে পারছ?" মেজর নড়েচড়ে বসলেন।

তাজমহলের কথা বলা হয়েছিল সিম্বাকে। সে পেছনের রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে এল যেখানে, সেখানেই পার্কিং লটে ঢোকার পথ। ওদের ওখানেই গাড়ি ছেড়ে দিতে হল। গেটের মুখের গুমটি থেকে সিম্বাকে একটা রসিদ দিয়ে ওদের লোক গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চলে গেল। সিম্বা বলল, "এখানে পার্কিং ফি লাগে না।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"ওরা ধরে নেয় যে গাড়ি রাখছে সে এখানেই গ্যাম্বলিং করবে। তাই এটুকু সুবিধে তাকে দেওয়া দরকার।" সিম্বা হাসল, "কিন্তু আমরা আগে ক্যাসিনোতে ঢুকব, না সমুদ্র দেখব? সমুদ্র দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সমুদ্র এখান থেকে কতদূরে ?"

মেজর বললেন, "দু'পা হাঁটলেই দেখতে পাবে।"

ওরা ক্যাসিনোর পাশ দিয়ে এগিয়ে আসতেই একটু উঁচু চওড়া রাস্তা দেখতে পেল। রাস্তাটা নির্জন। আর সেই রাস্তায় পা দিতেই অর্জুন বলে উঠল, "বাঃ !"

সামনেই সমুদ্র। রাস্তার ঠিক উলটোদিক থেকে বালি নেমে গিয়েছে জলে। স্থির সবুজ জল চুপচাপ নিঃসাড়ে পড়ে রয়েছে যেন। একটুও ঢেউ নেই, কোনও গর্জন নেই। তাই এত কাছে এসেও এই সমুদ্রের অস্তিত্ব টের পায়নি অর্জুন। সে জিজ্ঞেস করল, "এই অতলান্তিক ?"

"ইয়েস মাই বয়।" মেজর গদগদ গলায় বললেন।

"কিন্তু আমি পড়েছিলাম অতলান্তিক খুব ভয়ঙ্কর। প্রচণ্ড ঢেউ। এ তো দেখছি একেবারে দিঘির মতো শান্ত।" অর্জুনের গলায় বিস্ময় চাপা ছিল না।

মেজর বললেন, "এখন বোধ হয় ভাটার সময়। রাত্রে একবার দেখেছি প্রচণ্ড গর্জন করছে ঢেউগুলো। সমুদ্রের তো অনেক রূপ থাকে।"

অর্জুন দেখল, রাস্তা থেকে কাঠের লম্বা একটা প্ল্যাটফর্ম চলে গিয়েছে সমুদ্রের গায়ে। সেখানে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নৌকোয় চড়ার ব্যবস্থা আছে। সিম্বা জিজ্ঞেস করল, "আমি যদি একটু বোটিং করি তা হলে নিশ্চয়ই তোমরা আপত্তি করবে না ?"

অর্জুনেরও ইচ্ছে করছিল কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে মাথা নাড়ল, "ঠিক আছে। তুমি যাও। আমরা পরে তোমাকে ডেকে নেব।"

সঙ্গে-সঙ্গে সিম্বা পাখির মতো পা ফেলে হাঁটতে শুরু করল প্ল্যাটফর্মের দিকে।

তাজমহল ক্যাসিনোর সঙ্গে সাজাহানের তাজমহলের কোনও মিল নেই। কিন্তু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে অর্জুনের মনে হল কুবেরের বাড়িতে চলে এসেছে। চারপাশে বৈভবের ছড়াছড়ি। নানা রঙের আলোয় ভেতরটায় হাজার দেওয়ালি একত্রিত। পরপর স্লট মেশিনগুলো লাইন দিয়ে সাজানো। তাদের সামনে টুলে বসে এইসময়েও টুরিস্টরা খেলে যাচ্ছেন। সে একটি মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে খেলা দেখল। মেশিনটির ওপর লেখা রয়েছে, পঁচিশ সেন্ট। যিনি খেলছিলেন তিনি একটা চাকতি গর্তে ফেলে হ্যান্ডেল ধরে টানছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে সামনের কাচের নীচে নম্বরগুলো বাঁই বাঁই করে ঘুরতে-ঘুরতে স্থির হয়ে গেল। পাশের ফ্রেমে ছবি টাঙানো রয়েছে। কোনও-কোনও নম্বর অথবা ছবি যদি পাশাপাশি আসে তা হলে ওই এক চাকতির বিনিময়ে কত ডলার পাওয়া যাবে তা ওখান থেকে জানা যাচ্ছে। পঁচিশ সেন্টের মেশিন যখন, তখন এক ডলার দিলে চারটে চাকতি পাওয়া যাবে এদের কাউন্টার থেকে। অর্জুন দাঁড়িয়ে দেখল, লোকটা দশটা চাকতি ফেলল

কিন্তু কোনও ডলার পেল না।

ওরা আর একটু পা ফেলতেই চারধার থেকে ঝনঝন শব্দ ভেসে এল। জলতরঙ্গের সুর বাজছে বিভিন্ন মেশিন থেকে। ঝনঝনিয়ে কয়েন পড়ছে মেশিন থেকে। কেউ এক ডলার, কেউ পঞ্চাশ। অর্জুন দেখল প্রাপ্তিতে উল্লসিত নয় অনেকেই। কী নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কয়েন পড়া শেষ হলে সেগুলোকে একটা ছোট প্লাস্টিকের বাকেটে ঢেলে আবার নতুন করে খেলা শুরু করছে তারা। এদের বোধ হয় অল্পে খুশি হওয়ার দিন চলে গিয়েছে। লোকগুলোর জন্যে কীরকম মায়া হচ্ছিল অর্জুনের। পেয়েও যারা আনন্দ করতে ভুলে যায় তারা কীজন্যে বেঁচে থাকে?

ক্যাসিনোর বিশাল হলঘরটিতে অনেক ধাপ। স্লট মেশিনে যেমন খেলা চলছে, তেমনই বসেছে তাসের আসর। সেখানে চড়া হারে জুয়ো খেলা হচ্ছে। সেদিকটায় গেল না অর্জুন। একটা বড় বোর্ডকে ঘিরে বেশ ভিড়। বোর্ডের ভেতর চাকা ঘুরছে। চাকার গায়ে একটা লম্বা হাতল। ঘুরতে ঘুরতে চাকাটা স্থির হলে হাতলটি যে নম্বরের ওপর পৌঁছবে সেই নম্বরে যারা বাজি ধরেছিল তারা ডলার পাবে। মেজর অর্জুনের হাত ধরে টেনে ইশারা করতে সে দেখল বিশাল লম্বা একটি লোক ময়লা পাজামা আর ঝুল পাঞ্জাবি ধরনের জামা পরে কোনওদিকে না তাকিয়ে হেঁটে আসছে। তাঁর দু'পাশে সুট পরা দুটো লোক এবং পেছনে ব্যাগ হাতে একটি মানুষ হেঁটে আসছে তাল রেখে। কোনওদিকে না তাকিয়ে লোকটা যে মেশিনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল তার ওপর লেখা একশো ডলার। অর্থাৎ ওখানে এক-একটি একশো ডলারের চাকতি ফেলতে হবে। লোকটি হাত বাড়াতেই ব্যাগ হাতে সহকারী কয়েকটা চাকতি বের করে সেই হাতে রাখল। লোকটি সেই চাকতি মেশিনে ফেলে হ্যাণ্ডেল ঘোরাল। ভেতরের নাম্বারগুলো পাক খেল কিন্তু কোনও লাভ হল না। অর্জুন দেখল দশবার চাকতি দেওয়ার পরও যখন মেশিন থেকে কিছু বেরিয়ে এল না, তখন লোকটি অন্যদিকে এগিয়ে গেল। বাকিরা যে তার দেহরক্ষী এবং সেক্রেটারি তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। কয়েক মুহূর্তে হাজার ডলার চলে গেলেও লোকটির কোনও বিকার হল না, অথচ ওর পোশাক মোটেই ধোপদুরস্ত নয়।

মেজরও ভদ্রলোককে দেখছিলেন। চলে যাওয়ার পর বললেন, "সত্যিকারের ধনী মানুষেরা পোশাক সম্পর্কে কীরকম উদাসীন হয়, দেখলে?"

"দেখলাম।"

"এইজন্যেই বলে শূন্য হাঁড়ি থেকে বেশি শব্দ হয়।"

অর্জুন এসব কথায় কান দিচ্ছিল না। একশো ডলারের মেশিন আছে মানে সেখানে খেলার লোকও আছে। জলপাইগুড়িতে কালীপুজোর রাত্রে ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ কাঁচা টাকা হাতে পেয়ে জুয়ো খেলে। বিশ পঞ্চাশ

হাজার টাকা খেলতে তাদের দ্বিধা হয় না। এই লোকটার কাছে একশো ডলারের মূল্য একশো টাকার বেশি নয়। তবে যারা কষ্ট করে রোজগার করে তারা অবহেলায় টাকা ওড়ায় না। এই লোকটার রোজগার নিশ্চয়ই সাদা পথে নয়। এটুকু ভেবেই হেসে ফেলল অর্জুন। অন্যের ব্যাপারে অযথা সে মাথা ঘামাচ্ছে। সে এই ক্যাসিনোতে এসেছে যে কাজে, সেটাই এখনও করা হয়নি।

মেজরকে সে-কথা মনে করিয়ে দিতেই খোঁজা আরম্ভ হয়ে গেল। স্লট মেশিনের ভিড়ে খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। শেষপর্যন্ত ওরা এক ডলারের মেশিনগুলোর সারিতে ভদ্রমহিলাকে টুলের ওপর বসে থাকতে দেখল। দূর থেকে তাদের দেখেই মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর মুখ দেখে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না যে, উনি একটু ধন্দে আছেন।

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে বলল, "আমি অর্জুন, আপনি নিশ্চয়ই গ্যাব্রিয়েলা ?"

ভদ্রমহিলার মুখে হাসি ফুটল, "হ্যাঁ। আপনাদের আমি খুব কষ্ট দিলাম। এই এতদূরে টেনে আনা খুব অন্যায়। কিন্তু আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আপনাদের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছে !"

মেজর বললেন, "তা তো হয়েছেই। আপনি টেলিফোনে অর্জুনকে বললেন জ্যাকসন হাইটে যেতে, সেটা আমার বাড়ির কাছে। কিন্তু আটলান্টিক সিটি ইজ টু ফার।"

অর্জুন বলল, "না, না। এখানে না এলে এসব ব্যাপার অজানাই থেকে যেত। এখন গ্যাব্রিয়েলা, আপনি কী বলতে ডেকেছেন সেটা বলতে পারেন।"

গ্যাব্রিয়েলা চারপাশে তাকালেন। তারপর বললেন, "এখানে নয়। সমুদ্রের ধারে একটা রেস্টুরেন্টে বসে কথা বলব, চলুন।"

ভদ্রমহিলা আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। মেশিনগুলোর পাশ কাটিয়ে মূল দরজার দিকে এগোনোর সময় মেজর বললেন, "আবার বাইরের রেস্টুরেন্টে যাচ্ছি কেন ? ক্যাসিনোর ভেতরের রেস্টুরেন্টে অর্ধেক দামে খাবার পাওয়া যায়।"

অর্জুন বলল, "সে কী !"

"শুধু তাই ? এদের হোটেলে থাকলে একশো ডলারের ঘর চল্লিশ ডলারে পাওয়া যায়। এমনি এমনি এত শস্তা কেউ দেয় ? দিচ্ছে তুমি এখানে জুয়ো খেলবে বলে।"

"কিন্তু জুয়ো খেলে কেউ যদি জিতে যায় ?"

"এইসব মেশিন কম্পিউটারের নির্দেশে চলে। কম্পিউটার ঠিক করে রাখে কখন কত ডলার মেশিন থেকে বের হবে। ভাগ্যবানদের সংখ্যা ধরে নাও কুড়ি হাজারে একজন, যে বড়জোর হাজার ডলার পেতে পারে। এখানে ঢুকলে জিতে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলো তো ? ভদ্রমহিলা

বললেন আর আমরা এতদূরে চলে এলাম। ওঁর হাবভাবে কীরকম রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।" মেজর নাক টানলেন।

"উনি কী বলবেন তা না শুনলে ব্যাপারটা বুঝব কী করে?"

ক্যাসিনো থেকে বেরিয়ে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছিলেন গ্যাব্রিয়েলা। পাশের ক্যাসিনোর নাম সিজার। জুলিয়াস সিজারের বিরাট মার্বেল মূর্তি বসানো আছে ক্যাসিনোর সামনে। সেটার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেলেন মহিলা। ওঁকে অনুসরণ করার সময় অর্জুন লক্ষ করছিল, ভুলেও ভদ্রমহিলা একটিবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছিলেন না। ব্যবধানটা হাতদশেকের বলে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না ওঁদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক আছে।

বালির ওপর বেশ উঁচুতে রেস্টুরেন্ট। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে জানলার পাশে বসল গ্যাব্রিয়েলা। ওরা উল্টো দিকে বসতেই সমুদ্র দেখতে পেল। শান্ত সমুদ্রে প্রচুর নৌকো ভাসছে। সিম্বা নিশ্চয়ই ওর একটায় রয়েছে।

গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "জায়গাটা বেশ সুন্দর। তাই না?"

মেজর বললেন, "তা তো বটেই। কিন্তু আমি ভাবছি ওই নৌকোগুলোর কোনটায় আমাদের সিম্বা আছে! তুমি দেখতে পারছ অর্জুন?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "না, সেই চেষ্টা করা বোকামি।"

"সিম্বা কে?"

"আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে যে মেয়েটি, তার নাম সিম্বা।"

"নাম শুনে মনে হচ্ছে আমেরিকান নয়।"

"না। ওর বাবা মেজরের প্রতিবেশী। আফ্রিকার মানুষ। বিশেষজ্ঞ।"

"সর্বনাশ।"

"সর্বনাশ কেন বলছেন?"

"মেয়েটি নিশ্চয়ই লকেটটার কথা জানে।"

"জানে।"

"আপনারা এখানে কেন এসেছেন তাও কি জানে?"

"বিস্তারিত কিছু ওকে বলা হয়নি।"

"কিছু মনে করবেন না, এই লকেটটার ব্যাপারে আমি কোনও কালো মানুষকে বিশ্বাস করি না।" গ্যাব্রিয়েলা কথা শেষ করতেই ওয়েটার এল অর্ডার নিতে।

মেনুকার্ড হাতে নিয়ে গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "আপনাদের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে। আমি লাঞ্চের অর্ডার দিচ্ছি।"

মেজর কাঁধ ঝাঁকালেন। ভঙ্গি দেখে অর্জুন বুঝল মেজর খুব খুশি হলেন। অর্ডার নিয়ে লোকটি চলে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি ফোনে বললেন, আমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনাকে খুন করা হতে পারে বলে ভয় পাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী?"

গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "হ্যাঁ, কথাটা সত্যি। জিমের বান্ধবী হিসেবে আমি চিহ্নিত হয়ে গিয়েছি। ওরা জিমকে গুলি করামাত্র সে মারা যায়নি। মরার আগে আমাকে কিছু কথা বলেছিল। আর ওরা সেটা অনুমান করেছে। আজ সকালে আপনার টেলিফোনের পর আমার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসার একটু পরেই ওরা সেখানে হাজির হয়। আমাকে না পেয়ে খারাপ গালাগাল দেয়। আমি তখন জ্যাকসন হাইটে এক মাসির বাড়িতে চলে গিয়েছিলাম। আমার পাশের ফ্ল্যাটের মহিলা সেখানে ফোন করে ওই ঘটনা জানানো মাত্র আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ওখানে আপনার সঙ্গে দেখা করব না। ওরা ঠিক খুঁজে বের করবে আমি কোথায় আছি। যে কাগজের স্টল থেকে আপনারা আমার খবর পেয়েছেন সেটা আমার মাসতুতো বোন চালায়। সে আমাকে পরামর্শ দিল এই আটলান্টিক সিটিতে চলে আসতে।"

"কেন ?"

"কারণ, এখানে পুলিশ থাকলেও শহরটাকে নিয়ন্ত্রণ করে মাফিয়া নেতারা। টুরিস্টরা যাতে বেশি আসে তাই কোনও গোলমাল ওরা এখানে বরদাস্ত করে না। এখানে কেউ কাউকে ছিনতাই করলে মাফিয়াদের জানালে সঙ্গে সঙ্গে তারা ব্যবস্থা নেয়। দোষীকে শাস্তি দেয়। এই জায়গায় তাই চট করে কেউ গুণ্ডামি করতে সাহস পায় না। আপনাদের এইজন্যেই এখানে ডেকেছি।"

"জিমের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ ?"

"বেশিদিনের নয়। ও কালো হলেও খুব হাসিখুশি মানুষ ছিল। আমার ওকে সরল বলে মনে হত। কিন্তু সে স্মাগলার তা আমার জানা ছিল না। সেসব কথা আমাকে কখনও বলেনি। মাঝে-মাঝে সে উধাও হয়ে যেত। কখনও কখনও খুব মনমরা হয়ে থাকত। তখন ওর হাতে টাকা থাকত না। আমার সঙ্গে সে-সময় দেখা করত না ও। আমরা নেহাতই বন্ধু ছিলাম, তার বেশি কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এবারে বিদেশ থেকে ফিরে সে মাঝে-মাঝেই বলত সাপের দেবতার জন্যে এ-যাত্রায় বেঁচে গেছে। নাহলে সে এয়ারপোর্টে বিপদে পড়ত। রাত্রে প্রচুর ড্রিঙ্ক করে সে নিজের কথা বলতে আরম্ভ করে। আমি তখন জানতে পারলাম ওর ব্যবসা কী। প্রথমে ভেবেছিলাম, ছেড়ে চলে যাই। সেটা করলেই ভাল ছিল। কিন্তু আমি ওর উপকার করতে চেয়েছিলাম। ওকে ওই লাইন থেকে ফিরিয়ে আনতে সঙ্গে থেকে গেলাম। তারপর তোমার সঙ্গে আলাপ হল। উঃ।" গ্যাব্রিয়েলা দু'হাতে মুখ ঢাকল।

"তারপর ?"

"মরে যাওয়ার আগে জিম বলেছিল পুলিশকে বোলো ওর টেলিফোন নাম্বার হল টু ওয়ান টু ফাইভ জিরো ফাইভ টু।"

"কার নাম্বার এটা ?"

"যে লোকটা তোমাকে খুন করতে চায়। যার সাপের লকেট দরকার। যে আমার কাছে জানতে চায় মরার আগে জিম কী বলেছিল।" কথা বলতে বলতে জানলা দিয়ে বালির দিকে তাকিয়ে গ্যাব্রিয়েলার মুখ নীরক্ত হয়ে গেল।

॥ ১৪ ॥

গ্যাব্রিয়েলার মুখের চেহারা দেখে অর্জুন চোখ ফেরাল। বালির ওপরে নারী-পুরুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। ভদ্রমহিলার নজর যার দিকে সে দাঁড়িয়ে আছে পেছন ফিরে। যেন সমুদ্রের ঢেউ দেখতেই ব্যস্ত মানুষটি।

"আপনি ওকে চেনেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। জিমের কাছে আসত ও।" ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন গ্যাব্রিয়েলা।

"জিমের বন্ধু?"

"না। জিম ওকে সহ্য করতে পারত না। কারণটা প্রথমে আমাকে বলেনি জিম। তবে ওরা যে একসঙ্গে কাজ করে এটা বুঝতে পারতাম। আর এখন জানি ওরা একসঙ্গে কী কাজ করত। কিন্তু ও এখানে কী করছে?"

"হয়তো বেড়াতে এসেছে।"

"অসম্ভব। ধান্দা ছাড়া এরা এক পা-ও বাড়ায় না। আমার খুব ভয় করছে। জ্যাক নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে আমি এখানে এসেছি।"

ইতিমধ্যে লাঞ্চ এসে গেল। জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে সমুদ্রের গা ঘেঁষে। ওখান থেকে তার পক্ষে এত উঁচু রেস্টুরেন্টের ভেতরটা দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু ওই ভঙ্গি বলছে রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে ও আদৌ কৌতূহলী নয়। আর তা না হলে গ্যাব্রিয়েলার অস্তিত্ব ও জানে না।

খাবার খেতে মন্দ লাগছে না। সামুদ্রিক চিংড়িকে ঝাল ছাড়া মশলা প্রায় না দিয়ে রান্না করা হয়েছে। কিন্তু খেতে-খেতেও নজর রাখছিল অর্জুন। লোকটা এবার একটু-একটু করে কাঠের ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে। তখনই সিম্বাকে দেখতে পেল ওরা। সিম্বা তার নৌকো নিয়ে ফিরে আসছে। নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সিম্বাকে ছিপছিপে কালো বেতের মতো দেখাচ্ছিল। খুশিতে হাসছে সিম্বা। এত দূর থেকেই তার দাঁতগুলো মুক্তোর মতো ঝকঝকে দেখাচ্ছে।

অর্জুন দেখল লোকটা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এখন আর সমুদ্র নয়, তার নজর সিম্বার দিকে। তার মানে লোকটা সিম্বাকে অনুসরণ করে এখানে এসেছে নিউ ইয়র্ক থেকে? না। তা হলে ওদের পেছনেও লোক লেগে যেত। সিম্বাকে ও দেখেছে এখানেই। কিন্তু লোকটার মতলব কী? মিস্টার আলাম্বার ওপর প্রতিশোধ নিতে যদি সিম্বার ক্ষতি করতে চায় তা হলে—!

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "এক্সকিউজ মি। আমাকে উঠতে হচ্ছে।"

"কেন?" মেজর জানতে চাইলেন।

"আমার মনে হচ্ছে সিম্বা এখনই বিপদে পড়বে। জ্যাক মিস গ্যাব্রিয়েলার জন্যে এখানে আসেনি। দেখুন ও কাঠের প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওই পথেই সিম্বা ফিরে আসবে।" অর্জুন বলল।

গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "এত ব্যস্ত হবেন না। আমি তো বলেছি এই শহরটাকে কন্ট্রোল করে মাফিয়ারা। জ্যাকের সাহস হবে না ওই মেয়েটির কোনও ক্ষতি এখানে প্রকাশ্যে করার। উলটে ওখানে গিয়ে আপনি নিজেকে জাহির করে বিপদ ডেকে আনবেন।"

"কিন্তু রাস্তায় নেমে মেয়েটা তো আমাদের খুঁজবে।"

"এখানে কাউকে খুঁজে পেতে চাইলে পাঁচ মিনিটেই পাওয়া যায়, অবশ্য, যাকে খুঁজছেন সে যদি সহযোগিতা করে। খাবারটা শেষ করুন, প্লিজ।"

খেতে-খেতে অর্জুন দেখল সিম্বা কাঠের প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছে বেশ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে। এবং তখনই ওর মনে পড়ল নকল লকেটটা যেটা আজই বানানো হয়েছিল সেটা সিম্বার কাছেই রয়ে গেছে। ওই লকেট যদি জামার বাইরে ঝুলিয়ে রাখে তা হলে জ্যাক সহজেই দেখে ফেলবে। এতদূর থেকে লকেটটাকে দেখার কোনও উপায় নেই। অর্জুন ঝটপট জল খেয়ে বলল, "আমি যাচ্ছি, আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন।" সে দ্রুত রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এল।

এই সময় সমুদ্রের ধারের এই উঁচু রাস্তায় কিছু টুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে। হাওয়া বইছে এখন। তাই সমুদ্রের বুক জুড়ে ভাঙা-ভাঙা ঢেউ উঠছে। যেন জলের ওপর আঁচড় কাটছে বাতাস। প্ল্যাটফর্মের যেখানে শুরু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। সিজারের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিল অর্জুন। সিম্বা এগিয়ে আসছে। মুখোমুখি হতেই জ্যাক তাকে কিছু বলল। সেটা শুনে সিম্বা হাত নেড়ে হেসে কিছু জবাব দিল। এত দূর থেকে কথা না শোনা গেলেও অর্জুন দেখতে পেল সিম্বার জামার ওপরে লকেটটা নেই। সে স্বস্তি পেল। কিন্তু জ্যাক সিম্বার সঙ্গে কথা বলছে কেন? ওদের ভাবভঙ্গিতে বোঝাই যাচ্ছিল এর আগে কখনও পরিচয় ছিল না।

অর্জুন দেখল ওরা কথা বলতে-বলতে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। এবার সিম্বা ঘাড় নাড়ছে। যেন জ্যাকের কোনও প্রস্তাবে অসম্মতি জানাচ্ছে। সে হাত তুলে ক্যাসিনোগুলো দেখিয়ে দিল। জ্যাক দূরের রেস্টুরেন্টটাকে দেখাল। মরেছে! ওখানে এখনও গ্যাব্রিয়েলা এবং মেজর রয়েছেন!

কিন্তু সিম্বা রাজি হচ্ছে না। ওরা কথা বলতে-বলতে হাঁটছিল। সিম্বা খুব কায়দা করে কথা বলছে। বলতে-বলতে হঠাৎ তার আঙুল চলে গেল জামার নীচে। এবং অর্জুন আতঙ্কিত হয়ে দেখল কথা বলার সময় অন্যমনস্কভাবে

সিম্বা আঙুলে লকেটের চেন ঘোরাচ্ছে। জ্যাক কিছু বলতে গিয়ে মুখ তুলে সেটা দেখতে পেয়েই দাঁড়িয়ে গেল। তারপর একটু ঝুঁকে কিছু বলতেই সিম্বা দ্রুত লকেটটাকে জামার মধ্যে চালান করে দিল।

এর পরেই ওদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। জ্যাক যা বলছে সিম্বা তা শুনতে রাজি নয়। সে কিছুতেই জ্যাকের সঙ্গে যাবে না। রেগেমেগে সিম্বা তাজমহল ক্যাসিনোর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে সেলুলার টেলিফোন বের করে বোতাম টিপে কথা বলতে লাগল জ্যাক।

অর্জুন দৌড়ল। যে করেই হোক জ্যাকের আগে সিম্বার কাছে পৌঁছতে হবে। খবরটা পাঠিয়ে জ্যাক নিশ্চয়ই সিম্বার খোঁজে ক্যাসিনোতে ঢুকবে। ক্যাসিনোতে পৌঁছেই সিম্বাকে দেখতে পেল অর্জুন। কাছে গিয়ে বলল, "যত তাড়াতাড়ি পারো পার্কিং থেকে গাড়ি বের করে রাস্তায় নিয়ে এসো। আমরা ওখানে যাচ্ছি।"

"কেন?" সিম্বা জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে।

"খুব বিপদ আসছে। কথা না বলে বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও।" অর্জুনের কথা শেষ হতেই সিম্বা বাধ্য মেয়ের মতো ছুটল। ও চোখের আড়াল হতেই জ্যাক ডান দিকের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকাতে লাগল। অর্জুন দ্রুত একটা স্লট মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখার ভান করতে লাগল।

জ্যাককে একটু বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তার চোখ তন্নতন্ন করে সিম্বাকে খুঁজল। একটু-একটু করে জ্যাক এগিয়ে যাচ্ছে ক্যাসিনোর মধ্যে। তারপর পকেট থেকে সেলুলার বের করে কিছু বলল। এখন অর্জুন ওর পেছনে। নিশ্চয়ই জ্যাক দলের লোকদের সাহায্য চাইছে। অর্জুন খুব নিরীহ ভঙ্গিতে ক্যাসিনোর বাইরে চলে এল।

মেজর এবং গ্যাব্রিয়েলা ততক্ষণে রেস্টুরেন্ট থেকে রাস্তায় নেমে এসেছেন। অর্জুন ইশারা করল দ্রুত তাকে অনুসরণ করতে। যে পথ দিয়ে তারা সমুদ্রের দিকে এসেছিল সেই পথে সে জোরে হাঁটতে লাগল। মাঝে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে মেজর তাকে অনুসরণ করছেন, গ্যাব্রিয়েলাও সঙ্গে রয়েছেন।

পার্কিং-এর গেটে পৌঁছনো মাত্র সিম্বা তার গাড়ি নিয়ে চলে এল সামনে। অর্জুন ঝটপট সামনের সিটে উঠে বসে বলল, "ঝটপট এখান থেকে বেরিয়ে চলো।"

"কেন? আমি তো কোনও কারণ বুঝতে পারছি না।" সিম্বা খুব অবাক হচ্ছিল।

"যে-লোকটার সঙ্গে কথা বলছিলে সে খুব মারাত্মক দলের লোক। তোমার ওই লকেটটার জন্যে খুন করতেও দ্বিধা করবে না।" অর্জুন কথা শেষ করা মাত্র মেজররা চলে এলেন। পেছনের সিটে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে মেজর

জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল হে ? এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ ?"

সিম্বা গাড়ি চালাচ্ছিল। অর্জুন সংক্ষেপে বাংলায় ঘটনাটা বলতে মেজর ইংরেজিতে সেটার তর্জমা করলেন। গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "সর্বনাশ। আমি এই ভয়টাই করছিলাম। আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি ?"

"নিউ ইয়র্ক।"

"অসম্ভব ! আমরা পৌঁছতে পারব না।"

গাড়ি তখনও ক্যাসিনোগুলোর পেছনের পথ দিয়ে ছুটছিল। গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "ওই ফাঁকা হাইওয়ে দিয়ে ঘণ্টা ছয়েক যেতে হবে। তার মধ্যেই ওরা আমাদের শেষ করে দেবে। মাই গড !"

মেজর বললেন, "তা হলে পুলিশস্টেশনে চলো।"

গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "যেতে পারবেন কিন্তু ওখান থেকে যখন বের হবেন তখন কে আপনাকে সিকিউরিটি দেবে ? গাড়িটা ডান দিকে ইউ-টার্ন নিলে ভাল হয়।"

অর্জুন সিম্বাকে বলল, "উনি যা বলছেন তাই করো।"

সিম্বা ইউ টার্ন নিতেই রেসিডেন্স এলাকায় গাড়ি ঢুকে পড়ল। দু'পাশে ছোট-ছোট কটেজ প্যাটার্নের বাড়ি। সেগুলো ছাড়াতেই রাস্তাটা সমুদ্রের গা ঘেঁষে চলতে থাকল। মাঝে-মাঝে বাংলো বাড়ি চোখে পড়ছে বাঁ দিকে, ডান দিকে সমুদ্র। এরকম একটি বাড়ির গেটে গাড়ি থামালেন গ্যাব্রিয়েলা।

এ-বাড়ির সামনে কোনও বাগান নেই। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সিঁড়ির মতো লম্বা কতগুলো ধাপ নীচে নেমে এসেছে। গ্যাব্রিয়েলা গাড়ি থেকে নেমে গেটের গায়ে লাগানো একটা বোতাম টিপলেন। তিরিশ সেকেন্ড বাদে সেখান থেকেই আওয়াজ ভেসে এল। বেশ জড়ানো গলায় আমেরিকান ইংরেজি যা অর্জুনের কাছে স্পষ্ট নয় তবে আন্দাজ করা যায়। গ্যাব্রিয়েলা বললেন, "আমি গ্যাব্রিয়েলা। আপনার মেয়ের সঙ্গে আমি একবার এই বাড়িতে এসেছিলাম। ও আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর গেট খুলে গেল। সমস্ত ব্যাপারটি চমকপ্রদ ভারতীয়দের কাছে কিন্তু ইলেকট্রনিক সিস্টেমের কল্যাণে এদের কাছে জলভাত। ডান দিক দিয়ে ওপরের ওঠার রাস্তা ধরে গাড়ি নিয়ে গেল সিম্বা। বাড়িটার সামনে গাড়ি থামতেই একজন স্বাস্থ্যবান লোক বেরিয়ে এল। লোকটার চেহারায় বেশ কাঠখোট্টা ভাব রয়েছে।

গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা জিজ্ঞেস করল, "গ্যাব্রিয়েলা কে ?"

"আমি।"

"কেন এসেছেন ?"

"মিস্টার মরিসন আমার বন্ধুর বাবা, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"কিন্তু কেন ?"

"সেটা ওঁকেই বলব।"

"নো ম্যাডাম, আপনাকে এখনই বলতে হবে।"

গ্যাব্রিয়েলা ইতস্তত করলেন, "আমরা একটা বিপদে পড়েছি।"

"কীরকম বিপদ ?"

"কিছু লোক আমাদের চেজ্ করছে।"

"কারা ?"

"তাদের আমরা জানি না।"

"এঁরা কারা ?"

"আমার বন্ধু।"

লোকটা কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, "তোমার বন্ধুদের নেমে আসতে বলো।"

গ্যাব্রিয়েলা ইশারা করতে ওরা গাড়ি থেকে নামল। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কারও কাছে কোনও ধরনের অস্ত্র আছে ?"

মেজর বললেন, "অস্ত্র থাকবে কেন ?"

লোকটা এগিয়ে গিয়ে মেজরের কোমর এবং পকেট ওপর থেকে হাতড়ে দেখে অর্জুনের কাছে গেল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আশা করি মহিলারা আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলছে না। এবার ভেতরে এসো।" মেজর চাপা গলায় বললেন, "ইনসাল্টিং।"

ওরা যে-ঘরে বসল তার চারপাশে কাচের দেওয়াল। লোকটি চলে গেলে মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার বন্ধুর বাবা কী করেন ?"

"আমি ঠিক জানি না। এর আগেরবার যখন এসেছিলাম তখন এমন কড়াকড়ি ছিল না। এর মধ্যে বেশ পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার বন্ধু এখন কোথায় ?"

"অনেকদিন তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই।"

এই সময় পাশের দরজা খুলে গেল। সিল্কের পোশাক পরা এক বৃদ্ধ এগিয়ে আসতেই ওরা উঠে দাঁড়াল। গ্যাব্রিয়েলার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ। আমি তোমাকে আগে একবার দেখেছি। বোসো।"

ওরা বসতেই দেখল সেই লোকটা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে সতর্ক ভঙ্গিতে। উলটোদিকের চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করলেন, "কারা চেজ করছে ?"

গ্যাব্রিয়েলা অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন চুপচাপ বসে ছিল। গ্যাব্রিয়েলা যতটুকু পারলেন গুছিয়ে ঘটনাটা বললেন।

বৃদ্ধ চুপচাপ শুনছিলেন। ওঁর সাদা চুল, চুপসে যাওয়া গাল সত্ত্বেও একটা ঋজু ব্যাপার বসার ভঙ্গিতে ছিল।

কথা শোনার পর বৃদ্ধ বললেন, "লকেটটা দেখি !"

সিম্বা গলায় হাত দিল। লকেটটাকে খুলে সে গ্যাব্রিয়েলাকে দিল। গ্যাব্রিয়েলা ওটা বৃদ্ধের দিকে নিয়ে যাওয়ার আগেই সেই লোকটা এগিয়ে এসে

ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বৃদ্ধের হাতে তুলে দিল।

লকেটটাকে দেখতে-দেখতে বৃদ্ধ বললেন, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এটি মহামূল্যবান বস্তু। এটা থাকার কথা এই ইন্ডিয়ান ছেলেটির কাছে। কিন্তু তা না থেকে এই আফ্রিকান মেয়েটির গলায় ছিল কেন?"

সিম্বা বলল, "আমি দেখতে নিয়েছিলাম।"

"দেখতে নিয়েছিলে, দেখে ফেরত দাওনি কেন?"

"মনে ছিল না। পরে ছিলাম— !"

"তোমার মনে না থাকতে পারে কিন্তু যার জিনিস তার তো এটাকে হাতছাড়া করার কথা নয়। তাই না?"

অর্জুন বলল, "আমি ভেবেছিলাম ওর কাছে থাকলে কেউ ওকে সন্দেহ করবে না। এখান থেকে যাওয়ার আগে আমি ফেরত নিয়ে নিতাম।"

"কিন্তু ও যদি না দিত!"

"তার মানে?"

"ও একজন আফ্রিকান মেয়ে, ওর সমর্থন স্বদেশিদের ওপর থাকবেই। অবশ্য এটা যদি ওরিজিন্যাল লকেট না হয় তা হলে এমন ঝুঁকি নেওয়াই চলে। যাকগে, আমার মেয়ের বন্ধু তুমি। কিন্তু তুমি কি জানো আমার মেয়ে মরে গেছে?" বৃদ্ধের কথায় হতভম্ব হয়ে গেলেন গ্যাব্রিয়েলা।

॥ ১৫ ॥

গ্যাব্রিয়েলা খুব অবাক হয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকালেন। তাঁর বান্ধবী যে মারা গিয়েছে এ-খবর যে জানতেন না সেটা মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন, "তোমরা বিশ্রাম করো। খবরাখবর পাওয়ার পর কী করতে হবে তা তোমাদের জানানো হবে।"

বৃদ্ধ চলে গেলে সেই লোকটি তাদের অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করল। ঘর থেকে বেরিয়ে, খানিকটা প্যাসেজ দিয়ে হাঁটার পর ওরা যে ঘরে ঢুকল সেটা দিয়ে ভেতরের আর একটা ঘরে যাওয়া যায়। ওদের পৌঁছে দিয়ে লোকটা দরজা বন্ধ করে চলে গেল। মেজর বললেন, "বাঃ, তোফা আরাম করা যাবে। মেয়েরা ভেতরের ঘরে চলে যান, এখানে আমরা একটু বিশ্রাম নিই।"

গ্যাব্রিয়েলা চিন্তিত মুখে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। অর্জুন চারপাশে তাকাল। হোটেলের ঘরের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। একপাশে ভারী পরদা। সে পরদা সরাতেই বন্ধ কাচের জানলার ওপারে সমুদ্র দেখতে পেল। এই জানলা সম্ভবত খোলা হয় না। পরদাটা আগের মতো করে দেওয়ার সময় তার চোখে বস্তুটা ধরা পড়ল। পরদার পেছনে ছোট্ট মাইক্রোফোন লাগানো আছে। তারবিহীন। খুব দ্রুত, যেন সে কিছুই দ্যাখেনি এমন ভান করে ঘুরে

pathagar.net

দাঁড়াতেই দেখল সিম্বা তখনও মাঝখানের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তার দৃষ্টি অর্জুনের ওপর।

অর্জুন হাসল, "কী হল, ও-ঘরে গেলে না ?"

"লকেটটা কি ডুপ্লিকেট ?" সরাসরি প্রশ্ন করল সিম্বা।

অর্জুন শক্ত হল, "হঠাৎ এই প্রশ্ন ?"

"কারণ আমি সরলভাবে নিয়েছিলাম। ওই ভদ্রলোক বলার পর মনে হয়েছে আপনি আমার সারল্য নিয়ে খেলা করেছেন। বলুন, ঠিক কি না ?" সিম্বার মুখ শক্ত।

অর্জুন বলল, "উনি বলেছেন লকেটটা যেহেতু এখানকার কারও কারও কাছে খুব মূল্যবান তাই ওটা আমি তোমার হাতে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দিতে পারি না। তাই তো ?"

"কথাটা তো ঠিকই।"

"দ্যাখো, লকেটটা আর কারও কাছে মূল্যবান হতে পারে, আমার কাছে তো নয়। তা ছাড়া তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম বলেই ওটা দেখতে বা রাখতে দিয়েছিলাম এমন ভাবতে পারছ না কেন ?"

"আপনি আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন ?"

"অবিশ্বাস করার মতো কোনও কাজ কি তুমি করেছ ? উলটে নিজের সব কাজ ফেলে আমাদের সাহায্য করার জন্যে এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে এসেছ।"

অর্জুনের কথা শুনে একটু সহজ হল সিম্বা। তার মুখে সামান্য হাসি ফুটল। পাশের ঘরে চলে গেল সে।

মেজর ততক্ষণে বিছানায় শরীর ছেড়ে দিয়েছেন। বাংলায় বললেন, "তুমি ওকালতি করলে নাম করতে হে। কীরকম লাঠি না ভেঙে সাপ মেরে ফেললে। যাকগে, শুয়ে পড়ো। একটু আরাম করা যাক।"

অর্জুন বলল, "যে ব্যক্তি অকারণে নিদ্রামগ্ন হয় তাহার ভাগ্যও জাগ্রত হয় না।"

মেজর চোখ বড় করলেন। দাড়ির জঙ্গলে আঙুল বুলিয়ে বললেন, "একেবারে পৌরাণিক ভাষায় কথা বলছ। ব্যাপারটা কী ?"

অর্জুন বলল, "এই কক্ষে অনেক কর্ণ সংস্থাপন করা হইয়াছে। চক্ষু আছে কিনা তাহা এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই।"

মেজর বললেন, "মাই গড !"

"ফিরিঙ্গি ভাষায় বাক্য বলিবেন না।"

"অ। কিন্তু মুশকিল হল, তোমার ওই ভাষা আমি বলতে পারব না।" মেজর উঠে বসলেন, "এরা বাংলা জানে বলে মনে হয় না।"

"উহাই স্বাভাবিক। বাঙালি কর্মচারী এই প্রাসাদে না থাকিবার সম্ভাবনাই বেশি। যাহোক, আমরা ডাঙার বাঘকে এড়াতে গিয়ে জলে নেমে কুমিরের

কাছে পৌঁছে গিয়েছি বলে মনে হচ্ছে।"

"তার মানে, গ্যা—, না নাম বলব না, বড় দিদিমণি আমাদের প্ল্যান করে এখানে নিয়ে এসেছেন নাকি ? ওই যা ! প্ল্যান শব্দটা তো ইংরেজি। আমরা কথায় কথায় এত ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকি যে, বাদ দেওয়া মুশকিল।"

"আমার মনে হয় না উনি ইচ্ছে করে এখানে নিয়ে এসেছেন।" অর্জুন বলল।

"উঁহুঁ। এটা ঠিক কথা হল না। তোমার উচিত সবকিছুকে সন্দেহ করা। এত জায়গা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা জ্যাকসন হাইট থেকে আটলান্টিক সিটিতে আমাদের নিয়ে এলেন কেন ? আমরা আসামাত্র জ্যাক কী করে এখানে হাজির হবে ? আর তার ভয়ে উনি আশ্রয় নিতে এই বাড়িতে যে চলে এলেন এটা আগে থেকে প্ল্যা—, না, পরিকল্পনা করা নয় তাই-বা ভাবব না কেন ?"

"হ্যাঁ। আপনার কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু ওভাবে ভাবতে আমার ভাল লাগছে না। তা হলে তো সিন্থাকেও সন্দেহ করতে হয়। সব কাজ ফেলে সে কোন স্বার্থে আমাদের এতদূরে নিয়ে এল ?"

"হুঁ। আচ্ছা, এই যে আমরা কথা বলছি এটা ওরা শুনতে পাচ্ছে ?"

"হ্যাঁ। শুনতে পাচ্ছে তবে বুঝতে পারছে কিনা তা জানি না।"

"তা হলে তো এরা ডে-ডে, না, ভয়ঙ্কর লোকজন !"

"একটু আগের কথাবার্তা শুনে আপনার তা মনে হয়নি ? আমি শুধু খুঁজছি এই ঘরে কোথাও ক্যামেরা লুকনো আছে কিনা। যাকগে, এখন কথা হল, কতক্ষণে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে !" অর্জুন দেখল সিন্থা আবার এসে দাঁড়িয়েছে ভেতরের ঘরের দরজায়, "আপনারা কি এখানেই থেকে যাবেন ?"

অর্জুন বলল, "কখনওই নয় !"

"কিন্তু আমাকে এখনই নিউ ইয়র্কে ফিরতে হবে।"

"গ্যাব্রিয়েলা কী করছেন ?"

"ওঁর বান্ধবীর মারা যাওয়ার খবর শুনে খুব আপসেট হয়ে পড়েছেন ?"

"ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই।" অর্জুন বলল।

সিন্থা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেল। অর্জুন পকেট থেকে কলম বের করে এক টুকরো কাগজে লিখল, "অনুগ্রহ করে মুখে উত্তর না দিয়ে ইশারায় জবাব দেবেন।"

একটু বাদেই গ্যাব্রিয়েলা সিন্থার সঙ্গে এই ঘরে এলে ও ইশারায় চুপ করতে বলে চিরকুটটা এগিয়ে দিল। গ্যাব্রিয়েলা সেটি পড়ে ইশারায় কারণ জানতে চাইলেন। অর্জুন নিঃশব্দে পরদাটা সরিয়ে মাইক্রোফোন দেখাল। ওটা দেখতে পেয়ে গ্যাব্রিয়েলা এবং সিন্থার মুখের চেহারা পালটে গেল।

অর্জুন কাগজটা ফিরিয়ে নিয়ে লিখল, "আপনার বান্ধবীর বাবাকে আপনি অনেকদিন থেকে চেনেন ?" গ্যাব্রিয়েলা সেটা পড়ে মাথা নাড়লেন, না।

এই সময় দরজায় শব্দ হতেই অর্জুন ইশারা করল মেয়েদের পাশের ঘরে চলে যেতে। তারা যাওয়ামাত্র সেই লোকটাকে দরজায় দেখা গেল, "আপনাকে একটু আসতে হবে।"

"কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"সেটা গেলেই জানতে পারবেন।" ঠোঁট কামড়াল লোকটা।

অর্জুন এগোতেই মেজর ধড়মড়িয়ে উঠে ওকে অনুসরণ করলেন। লোকটা ঝটপট বলে উঠল, "না। আপনাকে আমাদের প্রয়োজন নেই।"

অর্জুন বলল, "আমি ওঁকে ছাড়া কোথাও যাই না।"

"এবার যাবেন।"

"সরি। আপনারা আমাদের ওপর জোর খাটাতে পারেন না।" অর্জুন বেঁকে বসল। লোকটা পকেট থেকে টেলিফোন বের করে চাপা গলায় দুটো কথা বলে কাঁধ ঝাঁকাল, "ঠিক আছে, চলুন।"

বৃদ্ধ বই পড়ছিলেন। ওরা ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা তো ইন্ডিয়ান। ইংরেজরা কি আপনাদের মাতৃভাষা কেড়ে নিয়েছে?"

মেজর বললেন, "তার মানে?"

"আপনারা চমৎকার ইংরেজি বলেন। আগাথা ক্রিস্টির নাম শুনেছেন?"

"যে-কোনও শিক্ষিত লোক শুনেছে।"

"না। শোনেনি। একজন শিক্ষিত ফরাসি, স্প্যানিশ, জাপানি, চিনা, ইতালিয়ান ওঁর নাম না শুনেও চমৎকার শিক্ষিত থাকতে পারেন। অথচ আপনি যেভাবে বললেন তাতে মনে হচ্ছে আপনার ভাষায় ভদ্রমহিলা এই বইগুলো লিখেছেন।" বৃদ্ধ হাসলেন।

অর্জুন বলল, "আমরা বাঙালি। আমাদের মাতৃভাবা বাংলা। কিন্তু পৃথিবী সম্পর্কে খবরাখবর রাখতে আমরা ইংরেজিও শিখি। আর আমরা যে নিজেদের মধ্যে বাংলা বলি না সেটা আপনিও জানেন।"

"কীরকম?"

"ঘরে আমরা দু'জনে যেসব কথা বলেছি তা আপনার কানে গিয়েছে কিন্তু আপনি তার কিছু আগে বুঝতে পারেননি। তাই না?"

বৃদ্ধ অর্জুনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, "তুমি দেখছি সত্যি বুদ্ধিমান। তোমার প্রয়োজন কী?"

মেজর বললেন, "ও সত্যসন্ধানী।"

"তাই নাকি!" বৃদ্ধের ঠোঁটের কোণে হাসি চলকে উঠল।

ওদের বসতে বলা হয়নি। অর্জুন এবার বিরক্ত হল, "আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। এই শহরে এসে আমরা বিপদে পড়েছিলাম বলে গ্যাব্রিয়েলা আপনার বাড়িতে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে আমাদের এখানে এনেছিলেন। কিন্তু

আপনাদের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে আমরা কোনও আন্ডারওয়ার্ল্ডের নেতার বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। ওই লোকটা যেভাবে আমাদের সঙ্গে কথা বলছে তাতে নিজেদের বন্দি ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যাচ্ছে না।"

বৃদ্ধ হাসলেন, "আচ্ছা, বলুন তো, আপনাদের আশ্রয় দিয়ে আমার কী লাভ হবে ? বিশেষ করে কিছু লোক তো আমার শত্রু হয়ে যাবে !"

অর্জুন বলল, "আমরা নিজের ইচ্ছেয় এখানে আসিনি। গ্যাব্রিয়েলা ভেবেছিলেন ওঁর বান্ধবীর বাড়িতে আশ্রয় পাওয়া যাবে।"

বৃদ্ধ বললেন, "শোনো, জীবন আমাকে একটা সত্যি শিখিয়েছে। কোনও কিছু পেতে গেলে তার দাম দিতে হয়। আমি কিছু না দিয়ে যেমন কিছু নিই না, তেমনই কিছু না পেলে দেওয়ার কথাও ভাবতে পারি না।"

"আপনি কী চাইছেন ?"

"লকেটটা।"

"ওটা নিয়ে কী করবেন ?"

"খুব সহজ উত্তর। যারা এটা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের কাছে বিক্রি করে দেব। যে লকেটটা ওই কালো মেয়েটি পরে ছিল সেটা জাল।"

"ওটা আপনার অনুমান।"

"যখন তোমরা প্রথম এলে তখন অনুমান করেছিলাম। এখন জেনে গেছি অনুমানটাই সত্যি। দ্যাখো, আমার বাজে কথা বলার সময় নেই। দাও।"

"আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।"

তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধের মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কিন্তু সেটা লহমার জন্যে। তারপরেই সহজ গলায় বললেন, "নিউ ইয়র্ক থেকে এখানে আসার পথে মাত্র একটি দোকান আছে। ওই দোকানে আমার লোক গিয়েছিল। দোকানদারের নাম টমসন। সে বলেছে নতুন লকেটটা একটু বেশি চকচকে আর কিঞ্চিৎ হালকা। আশা করি আমার কথা বুঝতে পারছ।"

মেজর বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার লোক এর মধ্যেই টমসনের দোকানে পৌঁছে গেছে। কী কাণ্ড ! কিন্তু টমসন কি বলেনি আমাদের এক বন্ধু সঙ্গে ছিল, যে আসল লকেটটাকে নিয়ে ফিরে গেছে নিউ ইয়র্কে।"

"তোমাদের সঙ্গে আর একজন ছিল ?"

"হ্যাঁ।" মেজর মাথা নাড়লেন।

"কী নাম তার ?"

"মিস্টার আলাম্বা।"

"আলাম্বা ? আফ্রিকার লোক ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু দেশের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।"

"কোথায় থাকে সে ?"

"কুইন্সে।"

"তোমরা মিথ্যে কথা বলছ।"

"ঠিক আছে, একটা টেলিফোন দিন!"

বৃদ্ধ ইশারা করতে লোকটি একটা কর্ডলেস ফোন এগিয়ে দিল। মেজর খুব স্বচ্ছন্দে নাম্বার টিপলেন। অর্জুন বুঝতে পারছিল না মেজর কী করতে চাইছেন। মিস্টার আলাম্বা তো সরাসরি অস্বীকার করবেন।

মেজর খানিকক্ষণ রিসিভারটা কানে চেপে এগিয়ে ধরলেন, "সরি। মিস্টার আলাম্বা তার ফ্ল্যাটে নেই।"

লোকটি রিসিভার নিয়ে রিডায়াল টিপল। রেকর্ডেড মেসেজ শুনে বলল, "মিস্টার আলাম্বা বলছে যে সে লাঞ্চে গিয়েছে।"

"লোকেট করো।" বৃদ্ধ বলতেই লোকটি পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ হাসলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমার শত্রুতা নেই। কিন্তু যারা তোমাদের পেছনে লেগেছে তারা খুব ভয়ঙ্কর মানুষ। আমার সাহায্য ছাড়া তোমরা এই আটলান্টিক সিটি থেকে বের হতে পারবে না। অবশ্য শহরের মধ্যে যতক্ষণ আছ ততক্ষণ কোনও ক্ষতি হবে না তোমাদের।" কথা শেষ হওয়ামাত্র বৃদ্ধের পাশে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। চাপা গলায় কিছু কথা বলে বৃদ্ধ রিসিভার রাখলেন, "জল দেখছি অনেকদূরে গড়িয়েছে। ওরা বোর্ডের কাছে অ্যাপিল করেছে তোমাদের জন্যে।"

"অ্যাপিল করেছে মানে?"

"যেহেতু এই শহরের প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সমস্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করে তাই কাউকে আক্রমণ করলে বোর্ড তাকে নিরাপত্তা দিতে বাধ্য। বোর্ডের কাছে ওরা অ্যাপিল করেছে যাতে তোমাদের এই শহর অথবা আমার বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে বোর্ড মিটিং-এ বসছে। আমি একজন মেম্বার। আমাকে যেতে হবে ওখানে। তোমরা এ-বাড়িতে নিশ্চিন্তে থাকো। আমি তোমাদের হয়ে কথা বলব। আশা করি তার মধ্যে ওই মিস্টার আলাম্বা তাঁর লাঞ্চ সেরে ফিরে আসবেন।" বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন।

॥ ১৬ ॥

ওদের আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। খানিক বাদেই গাড়ির শব্দ কানে আসতেই বোঝা গেল বৃদ্ধ বেরিয়ে গেলেন বোর্ডের মিটিং-এ যোগ দিতে। মেজর বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার! এতকাল আমেরিকায় আছি, জানতাম পুলিশই শেষ কথা। এক-একটা শহরের ভার একজন শেরিফের ওপর থাকে, পুলিশ তাঁর নির্দেশে চলে। কিন্তু এই আটলান্টিক সিটিতে শান্তিশৃঙ্খলা দেখার জন্যে গুণ্ডাদের একটা বোর্ড আছে তা জানতাম না। পুলিশ কী করে অ্যালাউ করছে।" কথাগুলো বলেই তিনি জিভ কাটলেন, "যাচ্চলে, অ্যালাউ

boierpdf.net

বলে ফেললাম, ইংরেজি শব্দ।"

মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে জিভ বের করলে মানুষকে যে কিম্ভূত দেখায়, তা অর্জুনের জানা ছিল না। মেজরের এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে। বললেন, "অবশ্য এখন ওরা নেই এ-বাড়িতে, শুনতে পাচ্ছে না।"

"টেপ রেকর্ডার চালিয়ে যেতে পারে।" অর্জুন বলল।

সিম্বা চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে ছিল। তাকে খুব বিরক্ত এবং উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। হঠাৎ সে ঝুঁকে পড়ল, "তোমাদের মতলবটা কী ?"

"মতলব ?" অর্জুন অবাক হল।

"তখন থেকে তোমরা নিজেদের ভাষায় কথা বলে যাচ্ছ। আমরা বুঝতে পারছি কিনা তা নিয়ে একটুও ভাবছ না তোমরা। কিন্তু আমি কোনও অন্যায় করিনি। তোমরা অনুরোধ করেছিলে বলে তোমাদের এই আটলান্টিক সিটিতে নিয়ে এসেছিলাম। এখন আর আমার পক্ষে এখানে থাকা সম্ভব নয়। আমি চলে যাচ্ছি। দরকার হলে আমি পুলিশকে ফোন করব।" কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল সিম্বা।

অর্জুন বলল, "তুমি কি বুঝতে পারছ না ? আমরা এখানে বন্দি হয়ে আছি।"

"আই ডোন্ট কেয়ার। আমি কোনও অন্যায় করিনি যে, কেউ আমাকে বন্দি করে রাখবে। আমি এখান থেকে সোজা বেরিয়ে যাব। তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় আমার সঙ্গে আসতে পারো।" সিম্বা এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দরজা ঠেলতে বুঝতে পারল ওটা বাইরে থেকে বন্ধ। "স্ট্রেঞ্জ ! ওরা ভেবেছে কী ?" সে ঘুরে দাঁড়াল গ্যাব্রিয়েলার দিকে মুখ করে, "তুমি ! তুমি তোমার বান্ধবী মারা গিয়েছে বলে কাঁদছিলে, কিন্তু কোথায় নিয়ে এসেছ আমাদের ?"

গ্যাব্রিয়েলা খুবই দুঃখিত হয়ে বললেন, "আই অ্যাম সরি। সত্যি আমি জানতাম না আমার বান্ধবীর বাবা একজন মাফিয়া নেতা। এখানে না জেনে তোমাদের নিয়ে এসে খুব অন্যায় করেছি আমি।"

সিম্বা কাঁধ ঝাঁকাল। তারপর অর্জুনকে বলল, "কিন্তু এখানে বসে থাকব না আমরা। এসো, চেষ্টা করি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে।"

ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। পরদা সরিয়ে জানলা দেখা হল। সেগুলো গ্রিলে বন্দি। এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পথ নেই। পাশের ঘরের অবস্থা একই রকম ! মেজর কাঁধ দিয়ে বেরোবার দরজায় আঘাত করলেন। দরজাটায় শব্দ হল, দেওয়াল কাঁপল। অর্জুনের খেয়াল হল। এখানকার বাড়ির দেওয়াল ইটের নয়। কাঠের। মেজর ধাক্কা দেওয়ায় সেই কাঠে কাঁপন লেগেছে। অর্জুন মেজরকে আর একবার ধাক্কা দিতে বলল। এবার আর একটু জোরে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরে আওয়াজ হল। সিম্বা ছুটে গেল সেখানে, গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। অর্জুন দ্রুত সেখানে পৌঁছে দেখল একটা

কাঠের বিমের মধ্যে ঢোকানো আর একটি কাঠ ঈষৎ খুলে এসেছে। তিনজনের মিলিত চেষ্টায় সেটাকে খুলে ফেলার পর দেওয়ালের একটা অংশকে সরানো সম্ভব হল। বাইরের আলো ভেতরে ঢুকল। গ্যাব্রিয়েলা গালে হাত দিয়ে এতক্ষণ দেখছিলেন, বললেন, "থ্যাঙ্ক গড !"

ফাঁক দিয়ে বাইরে পা বাড়াতেই অর্জুন দেখল সে বারান্দায়। লন থেকে অনেক উঁচুতে এই বারান্দা। বাড়িতে কেউ নেই নাকি ? এতটা শব্দ হল অথচ কাউকে ছুটে আসতে দেখা যাচ্ছে না। চারজন বাইরে আসতেই সিম্বা প্রথমে তার গাড়িটাকে দেখতে পেল। সে চাপা গলায় বলল, "লেট্স গো !"

ঠিক তখনই অর্জুন কুকুরটাকে এগিয়ে আসতে দেখল। তারপর আরও তিনটে। চারটেরই লেজ কাটা। হিংস্র চোখে বারান্দার দিকে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে। একজন মুখ খুলতে বোঝা গেল, ওই দাঁত একটা বাইসনের ঠ্যাং চিবিয়ে ফেলতে পারে। এরা যে ভয়ঙ্কর শিকারি তা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। পুরো বাড়িটা এদের জিম্মায় ছেড়ে ওরা চলে গেছে নিশ্চিন্তে। বারান্দা থেকে মাটিতে পা দিলে আর দেখতে হবে না।

বাকি তিনজনের নজর কুকুরগুলোর ওপর পড়েছিল। মেজর বললেন, "ডেঞ্জারাস। তবে আফ্রিকায় আমি এই ধরনের বুনো কুকুরের মোকাবিলা করেছি।"

অর্জুন বলল, "মালিক আর যে খাবার দেয় তারা ছাড়া পৃথিবীর সব মানুষ ওদের শত্রু। কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। ওদের ট্রেনিং নেই, তাই এই বারান্দায় উঠে আসছে না।"

মেজর হতাশ গলায় বললেন, "তা হলে আমরা এখান থেকে যাব কী করে ?"

"ওদের না সরালে কোনও উপায় নেই।" অর্জুন বলল।

মেজর একটু ঝুঁকে গলায় চু চু শব্দ তুললেন। কুকুর চারটে নড়ছে না। মেজর আরও একটু ঝুঁকলেন, "কাম অন ব্রাদার্স। তোদের সঙ্গে আমাদের কোনও শত্রুতা নেই। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গী ছিল তোদের পূর্বপুরুষ। প্রায় স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছিল। অর্জুন, আমি ঠিক বলছি তো ?" সেই অবস্থায় ঘুরে তাকাতে গিয়ে মেজর নীচে পড়ে যাচ্ছিলেন ব্যালান্স হারিয়ে, কিন্তু অর্জুন শেষ মুহূর্তে তাঁকে ধরে ফেলতে তিনি রক্ষা পেলেন। আর তিনি বারান্দা থেকে মাটিতে পড়ছেন দেখে চারটে কুকুর বিদ্যুতের মতো ছুটে এসেছিল সামনে।

উঠে দাঁড়িয়ে পেছনে সরে এলেও থরথরিয়ে কাঁপছিলেন মেজর, "ইম্পসিব্ল।" অর্জুন চারপাশে তাকাল। তারপর খানিকটা হেঁটে দরজার হুড়কো বাইরে থেকে খুলে ভেতরে ঢুকল। দরজার পাশেই একটা ছোট শেল্ফ রয়েছে। সে মেজরকে অনুরোধ করল সাহায্য করতে। মেজর হাত লাগালে সেটাকে ঠেলতে ঠেলতে বারান্দায় বের করে সদ্য-ভাঙা কাঠের ফোকরের পাশে

নিয়ে এল। তারপর বলল, "আপনারা ঘরের ভেতর চলে যান। দরজাটা বন্ধ রাখুন। আমি বলামাত্র ছুটে বেরিয়ে আসবেন বারান্দায়।"

কথাগুলো ইংরেজিতে বলায় সিম্বা জিজ্ঞেস করল, "তুমি কী করতে চাও?"

"কুকুরগুলোকে বারান্দায় তুলতে চাই। তোমাদের প্রত্যেকের রুমালগুলো আমাকে দাও।" সে হাত বাড়াতে প্রত্যেকেই রুমাল দিল।

"কারও কাছে নেল কাটার আছে?"

গ্যাব্রিয়েলা ব্যাগ খুলে সেটা এগিয়ে দিতেই অর্জুন নেলকাটারের ভেতরে ঢোকানো ছোট্ট ছুরির ফলা বের করে বাঁ হাতের ওপর দিকে চাপ দিতেই কয়েক ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে এল। মেজর চেঁচিয়ে উঠল, "কী করছ?"

"কয়েক ফোঁটা রক্ত। কিস্যু হবে না। আপনারা ঘরের ভেতর ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিন। কুইক। আমি বলামাত্রই দরজা খুলে বাইরে চলে আসবেন।" অর্জুনের কথায় বিস্মিত মুখ নিয়ে তিনজন ভেতরে চলে যেতে অর্জুন চারটে রুমালে রক্তের ফোঁটাগুলো মাখিয়ে নিতেই নতুন রক্ত বের হওয়া বন্ধ হল। ছুরির ডগায় রক্ত লেগে রয়েছে তখনও। সে নেলকাটারটা উঠোনে ছুড়ে ফেলতেই চারটে কুকুর একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওটার ওপর। প্রথমজন গন্ধ শুঁকে জিভ দিয়ে ছুরিটা চাটল। অর্জুন এবার প্রথম রুমাল গোল করে পাকিয়ে ওদের কাছাকাছি ছুড়তেই কুকুরটা ছুটে গেল। রুমালে নাক ঢুকিয়ে গন্ধ শুঁকতেই সে গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলল। বাকি তিনজন তখন রুমাল শুঁকছে। এবার দ্বিতীয় রুমাল ছুড়ল বারান্দার সিঁড়িতে। কুকুরটা লাফিয়ে সেখানে পৌঁছে রুমালের ঘ্রাণ নিতে শুরু করতেই তৃতীয়টিকে বারান্দার ওপর ছুড়তেই ওরা সমস্ত শিক্ষা ভুলে লাফিয়ে উঠে এল বারান্দার ওপর। অর্জুন আর এক মুহূর্ত নষ্ট না করে কাঠের ফোকর দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় চতুর্থ রুমালটি ভাঙা কাঠের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে দৌড়ে বাইরের ঘরে চলে আসতেই কুকুরগুলো হুড়মুড়িয়ে ফোকর দিয়ে ঢুকতে লাগল। অর্জুনের চিৎকারে ওরা তিনজন দরজা খুলে বাইরে যেতেই অর্জুন অনুসরণ করল। এক ইঞ্চির জন্যে প্রথম কুকুরটা ওকে ধরতে পারেনি। একেবারে ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতেই সে দেখল মেজর শেল্‌ফটাকে ঠেলছেন ফোকর বন্ধ করতে। ওকে সাহায্য করছে সিম্বা। কিছু না বলতেই ওঁরা বুঝে গিয়েছেন বলে ভাল লাগল অর্জুনের। সে ছুটে গিয়ে হাত লাগাতে ফোকরটা শেল্‌ফের আড়ালে চলে গেল।

ওপাশের বন্ধ দরজা থেকে ফিরে এসে কুকুরগুলো ফোকর দিয়ে বেরোবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। ওদের চাপে শেল্‌ফ নড়ছে। অর্জুন বলল, "জলদি।"

ওরা দ্রুত নীচে নেমে গাড়ির কাছে ছুটে গেল। চাবিটা যে ড্যাশবোর্ডে ঝুলতে দেখবে, ভাবেনি অর্জুন। ওরা গাড়িতে উঠে বসতেই সিম্বা এঞ্জিন চালু করল। আর তখনই শেল্‌ফটা সামান্য সরে যেতে কুকুরগুলো বারান্দায় নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ল নীচে। অর্জুন চিৎকার করল, "কাচ তুলুন, কাচ তুলুন।"

দ্রুত কাচ তুলে দিতে সিম্বা গাড়ি ঘুরিয়ে গেটের দিকে নিয়ে গেল। গেট বন্ধ। গাড়ি থেকে নেমে গেট খোলার চেষ্টা করা এখন পাগলামি করা হবে। অর্জুন বলল, "স্পিড বাড়াও, সোজা গেটে ধাক্কা মারো।"

ধাক্কা লাগতেই যেমন গেট খুলে গেল তেমনই কান ফাটিয়ে সাইরেন বেজে উঠল। গ্যাব্রিয়েলা আতঙ্কিত গলায় বললেন, "এখনই পুলিশ চলে আসবে। ওরা বার্গলার অ্যালার্ম লাগিয়ে গিয়েছে।"

গাড়ি তখন রাস্তায় পড়ে তীব্রভাবে ছুটছে। মেজর বললেন, "নিজেরা মাফিয়া গুণ্ডা হয়ে গেট অ্যালার্ম লাগিয়েছে। চলো, সোজা থানায় গিয়ে রিপোর্ট করি।" ওরা কিছুটা এগিয়ে যেতেই পুলিশের গাড়ি আসতে দেখল পরপর দুটো। ওদের পাশ কাটিয়ে গাড়িদুটো বেরিয়ে গেল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে আছে?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু কেন?" মেজর তাকালেন।

"আমি আর সিম্বা নেমে যাচ্ছি। যারা আমাদের খোঁজ করছে তারা নিশ্চয়ই জানে সিম্বা আমাদের গাড়ি চালিয়ে এখানে এনেছে। আমরা যে চারজন আছি তাও নিশ্চয়ই ওদের জানা হয়ে গিয়েছে। তাই আপনি আর গ্যাব্রিয়েলা সোজা নিউ ইয়র্ক চলে যান।"

"অসম্ভব! তোমরা এখানে পড়ে থাকবে আর আমি চলে যাব, এ হতে পারে না।" মেজর গ্যাব্রিয়েলার দিকে তাকালেন, "ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে আছে? বাঃ, বেশ। আপনি চালান, সিম্বা আপনার সঙ্গে চলে যাক। বাঁ দিকে গাড়ি দাঁড় করাও।"

সিম্বা গাড়ি থামাতে মেজর নেমে পড়লেন, "কুইক অর্জুন। গ্যাব্রিয়েলা, আপনি সামনে এসে স্টিয়ারিং-এ বসুন।"

গ্যাব্রিয়েলা দরজা খুলে এগিয়ে আসতেই সিম্বা আসন পরিবর্তন করতে করতে বলল, "তোমরা ফিরবে কী করে?"

মেজর বললেন, "আমাদের নিয়ে ভেবো না। যদি পারো রাস্তা থেকে ফোনে তোমার বাবাকে বোলো, অচেনা কোনও লোকের সঙ্গে আমাদের ব্যাপারে কথা না বলতে। উইশ ইউ হ্যাপি রিটার্ন।"

গাড়িটা বেরিয়ে গেল। মেজর বললেন, "এইজন্যে এ-দেশের মেয়েদের আমার ভাল লাগে। যে-কোনও বিপদের সামনে ওরা সাহস করে দাঁড়াতে পারে।"

সামনেই একটা রেস্টুরেন্ট। পাশে পেট্রল পাম্প। অর্জুন লক্ষ করেছে এখানকার পাম্পের গায়ে দাম লিখে বোর্ড ঝুলিয়ে রাখা হয়। পাম্পের শোরুমে রুটি থেকে সিগারেট সবকিছু পাওয়া যায়।

ওরা রেস্টুরেন্টে ঢুকল। এখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এখানে রাত নামে অনেক দেরিতে। দরজার পাশেই টেলিফোন বুথ। অর্জুন মেজরকে

বলল, "টু ওয়ান টু ফাইভ জিরো ফাইভ টু নাম্বারটা ধরে দেবেন ?"

"কার নাম্বার ?" মেজর চোখ ছোট করলেন।

"নাম্বার কার তা আমি জানি না। গ্যাব্রিয়েলা বললে মারা যাওয়ার আগে ওই নাম্বার জিম তাকে বলেছে পুলিশকে দিতে।"

"ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমার তো বেশ স্মরণশক্তি, আমার মনেই ছিল না। এটা লং ডিসট্যান্স কল হবে।" মেজর টেলিফোন তুললেন।

আমেরিকার পাবলিক টেলিফোনের সিস্টেম খুব মজার। পকেটে কার্ড থাকলে সাধারণ একটা বুথ থেকে পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্তে ফোন করা যায়। কিন্তু ওটা না থাকলে বিপদ। নিউ ইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলিস ফোনে কথা বলতে গেলে কোয়ার্টার দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। পঁচিশ সেন্টে ভারতীয় সিকির মতো ওদের কোয়ার্টার হয়। অত কোয়ার্টার কেউ পকেটে রাখে না। ফলে কার্ড ছাড়া ফোন করা ঝকমারি।

মেজর বললেন, "কুইক, রিং হচ্ছে।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল। ওপাশ থেকে কেউ সেই মুহূর্তে গম্ভীর গলায় বলল, "হেলো ? কে বলছ ?"

"বস-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

"কে বলছ। তোমার নাম এবং কোড নাম্বার বলো।"

"আমি জিমের বন্ধু, আমার কোড নাম্বার হল সাপের লকেট।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর প্রশ্ন ছুটে এল, "কে ?"

"একটু আগে পরিচয় দিয়েছি বস।"

"কোত্থেকে বলছ ?"

"সেটা বলা যাবে না। আপনি জিমকে খুন করলেন কেন ? ও তো কোনও অন্যায় করেনি। আপনার দলের লোকের ওপর এমন অকারণে অত্যাচার করলে ওরা তো আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে।"

"তুমি কে ?"

"আমি সেই সাপের মালিক, যে সাপ আপনাকে ধ্বংস করতে পারে। শুনুন, গাড়িটা ফিরে যাচ্ছে নিউ ইয়র্কে। আপনার লোকজনকে এখনই নির্দেশ দিন যাতে কেউ ওদের ক্ষতি করতে না পারে।"

"কোন গাড়ি ?"

"দেখুন, আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। শুধু দেখতে চাই হাইওয়েতে কোনও অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে না।" রিসিভার নামিয়ে রাখতেই অর্জুন দেখল একটা পুলিশের গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল দুটো বিশাল চেহারার পুলিশ। দু'জনেই কালো। অর্জুন দ্রুত মেজরকে নিয়ে একটা থামের আড়ালে চলে যেতে পুলিশ দুটো এগিয়ে এল।

॥ ১৭ ॥

পুলিশদুটো হেলতেদুলতে খানিকটা তফাতে এসে দাঁড়াল। এত বড় শরীরের পুলিশ অর্জুন কখনও দ্যাখেনি। প্রথমজন বলল, "রেস্টুরেন্টের ভেতরটা একবার দেখে এসো।"

দ্বিতীয়জন পা বাড়াতেই বিপ বিপ শব্দ বাজল। প্রথম পুলিশ কানে রিসিভার তুলল, "মাইক স্পিকিং। নো, নো ট্রেস। বাট এভরিথিং ইজ ফাইন হিয়ার। ওকে!"

দ্বিতীয় পুলিশটি ফিরে আসতেই প্রথমজন বলল, "লেটস গো।"

পুলিশের গাড়িটা বেরিয়ে যেতেই মেজর কথা বললেন, "আমি বুঝতে পারছি না, মাফিয়াদের হয়ে পুলিশ আমাদের খোঁজ করছে নাকি?"

"গেট ভেঙে বেরিয়েছি, সাইরেন বেজেছে, পুলিশ তো চারপাশে খোঁজ করবেই। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।"

রেস্টুরেন্টের যে দিকটায় বসলে রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায় সেদিকের টেবিল নিল ওরা। দুপুরে যা খাওয়া হয়েছিল, এতক্ষণের উত্তেজনায় তা কখন হজম হয়ে গিয়েছে। মেজর নিজের জন্যে একটা বিগম্যাক, অনেকটা লম্বা আলুভাজা আর বেশ বড় গ্লাসের চকোলেট মিল্ক কেক নিলেন। ওই মিল্ক কেক খেতে খুব ভাল। চকোলেটের গন্ধমাখা ঘন ক্ষীরের মতো। কিন্তু খেলেই পেট ভারী হয়ে যায়। ওজন বাড়বেই। কথাটা মনে করিয়ে দিলে মেজর বললেন, "সমুদ্রে দু'বালতি জল ঢাললে কী এমন ক্ষতি হবে?" অর্জুন চিকেন ফ্রাই আর কফি নিল।

খাওয়ার সময় মেজর কথা বলা পছন্দ করেন না। শেষপর্যন্ত তৃপ্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলে?"

"কোনটা?"

"আরে টেলিফোনে কথা বলে কী মনে হল?"

"বুঝতে পারলাম না। তবে ওরা নাড়া খাবে।"

"হুঁঃ। মুশকিল। গাড়িটাকে ছেড়ে দেওয়া হল, এখন এখান থেকে বের হবে কী করে? এই শহর থেকে ওদের চোখ এড়িয়ে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব।"

"এখান থেকে বাস বাইরে যায় না?"

"যায়।" মেজর বললেন, "বাসে ওঠার জন্যে টার্মিনালে যেতেই তো ওদের নজরে পড়ে যাবে।"

"রাস্তায় হাত দেখালে বাস থামবে না?"

"নো, নো, নো।" মাথা নাড়লেন মেজর।

অর্জুন হতাশ ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে রেস্টুরেন্টের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রোগা শীর্ণ চেহারার একটি লোক তাদের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই লোকটি হাসবার চেষ্টা করল। অর্জুন গম্ভীর হয়ে আছে দেখে এবার বাঁ হাত সামান্য উঁচুতে তুলে নাড়ল। অর্জুন ইশারায় লোকটাকে কাছে ডাকতেই সে প্রায় লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে এল।

"আপনারা খুব বিপদে পড়েছেন, তাই না ?" ফিসফিসিয়ে বলল লোকটা। বলছে ইংরেজিতে কিন্তু আমেরিকানদের মতো ইংরেজি নয়। কিন্তু এর গায়ের রং সাদা, চোখ কটা, চুল বাদামি।

"তোমাকে কে বলল ?" মেজর সন্দিগ্ধ হলেন।

"হুঁ হুঁ বাবা। আমি টের পাই। কেউ বিপদে পড়তেই বুঝতে পারি।"

"তুমি মেক্সিকান ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে একটা মিল্ক কেক খাওয়াবে ?"

মেজর কিছু বলার আগেই অর্জুন ডলার বের করে লোকটাকে দিল। লোকটা সুড়ুত করে কাউন্টারের দিকে চলে যেতে মেজর বলল, "না, না, এদের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ভিখিরি দলের একজন। পয়সা নষ্ট।"

অর্জুন হাসল, "মিল্ক কেকটা তো আপনার মতো আমিও খেতে পারতাম।"

ইতিমধ্যে গ্লাস নিয়ে লোকটা ফিরে এল টেবিলে। চেয়ার টেনে বসে স্ট্র ঢুকিয়ে বিরাট একটা টান দিয়ে চোখ বন্ধ করে গিলল। তারপর বলল, "প্রব্লেমটা কী ? পুলিশ দেখে থামের আড়ালে লুকোলে কেন ?"

অর্জুন মেজরকে এক পলক দেখে নিয়ে বলল, "আমরা চোর-ডাকাত নই।"

"সেটা তো চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছি।" আবার স্ট্র ঠোঁটে নিয়ে টানল লোকটা, "পুলিশের হাত থেকে বাঁচা খুব মুশকিল ব্যাপার। এক, কোনওক্রমে যদি আমেরিকা ছেড়ে যেতে পারো। এখান থেকে সেটা সম্ভব নয়। অবশ্য যদি রাতারাতি কানাডা বর্ডার পার হতে পারো !"

"আমেরিকা ছাড়ার দরকার নেই। এই আটলান্টিক সিটি থেকে কী করে চুপচাপ বেরিয়ে যাওয়া যায় বলতে পারো ?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

লোকটা তাকাল। ওর মুখ হাঁ হয়ে গেল। তারপর নিচু গলায় সে বলল, "তার মানে পুলিশ নয়। তোমরা ভয় পাচ্ছ ওদের ?"

"ওদের মানে ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"যারা এই শহরটাকে চালায়। মাই গড। আগে জানলে এটা খেতাম না। আমি ঠিক বলছি, তাই না ?"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কী করো ?"

"কিছু না। আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। ওরা সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।"

"কারা ?"

"না। আমি মুখ খুলব না। তোমরা কারা?"

অর্জুন বলল, "আমরা ভারতবর্ষের লোক। ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার নাম শুনেছ?"

"তোমরা তোমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে গুলি করে মেরেছিলে। তাই না?"

"আমরা মারিনি। কয়েকজন নির্বোধ মেরেছিল।"

"হ্যাঁ, শুনেছি। এখানে কী করতে এসেছ তোমরা?"

"বেড়াতে।"

"কী করে বিশ্বাস করব?"

অর্জুন পাশপোর্ট বের করে দেখাল। আমেরিকার ইমিগ্রেশনের স্ট্যাম্প দেখে লোকটা যেন চিন্তায় পড়ল। মেজরের কাগজপত্র দেখতে চাইল না সে। তারপর চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এখানে কথা বলা ভুল হবে।"

"তা হলে?"

"আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি। তোমরা কিছুটা দূরত্বে থেকে আমাকে ফলো করো। যদি বিপদে পড়ো তা হলে চেঁচিয়ে দয়া করে ডেকো না।" লোকটা উঠে দাঁড়াতেই মেজর বলল, "ওহে, তোমার নামটা এখনও বলনি।"

"আমার নাম মারিও।" গ্লাস শেষ করে লোকটা ওটাকে গারবেজ বাক্সে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কী করবে? ওরকম বাউন্ডুলে লোকের কথায় বিশ্বাস করবে?"

"বিশ্বাস না করা ছাড়া কোনও উপায় নেই।"

"কিন্তু ও যদি ওদের লোক হয়?"

"কিছু করার নেই।" অর্জুন উঠে পড়ল।

মারিও হেলতে-দুলতে আগে-আগে যাচ্ছে। অর্জুন মেজরের পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে লক্ষ করল মারিও গলি বা নির্জন রাস্তা ধরে এগোচ্ছে। এসব রাস্তায় গাড়ি তেমন নেই, মানুষজনও কম। মিনিট সাতেক হাঁটার পর পেছনদিকে না তাকিয়ে মারিও হাত নাড়ল এগিয়ে যেতে। ওরা কাছে পৌঁছতে মারিও বলল, "বাঁ দিকের বাড়িটা জনসনের। ব্যাটা এখন নেশা করে আউট হয়ে আছে। দরজা খোলা। তোমরা ওর বসার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমি দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।" পাখির মতো উড়ে গেল লোকটা।

অর্জুন দেখল পাশের বাড়ির দরজা আধা-ভেজানো। সেখানে কোনও লোক আছে বলে মনে হচ্ছে না। মেজর বললেন, "নো অর্জুন। আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ট্র্যাপ। ওই বাড়িতে আমাদের ঢুকিয়ে দিয়ে ও মাফিয়াদের খবর দিতে গিয়েছে।"

অর্জুন বলল, "আমার তা মনে হয় না।"

"অত ভালমানুষি এখন কাজ দেবে না অর্জুন!"

"দেখুন, ও যদি মাফিয়াদের খবর দিতে চাইত তা হলে আমাদের রেস্টুরেন্টে

বসিয়েই সেটা করতে পারত। চলুন, দেখা যাক।”

দরজা ঠেলে ভেতরে পা বাড়াতেই নাক ডাকার আওয়াজ কানে এল। কোনও মানুষ এমন বীভৎস শব্দে নাক ডাকতে পারে তা না শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন। ঘরটি সাধারণ। জরাজীর্ণ একটি সোফা আর টিভি রয়েছে দেখল। অর্জুন ভেতরের ঘরে উঁকি মারল। সেই ঘরে খাটে চিত হয়ে শুয়ে একটি প্রৌঢ় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশের টেবিলে হুইস্কির বোতল, গ্লাস।

ভেতরের দরজা বন্ধ করে সোফায় বসতেই অর্জুনের পাশে এসে বসে মেজর বললেন, “সর্বনাশ, আমাকেও দেখছি হারিয়ে দিচ্ছে।”

অর্জুন হেসে ফেলল। মেজরও সশব্দে নাক ডাকেন। কিন্তু সে-কথা বলতে ইচ্ছে হল না।

“তুমি বলছ মারিওকে বিশ্বাস করা যেতে পারে?”

“না করে উপায় কী?”

“আমি নিউ ইয়র্কে ফিরে গিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইম্‌সে চিঠি লিখব। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জানা উচিত মাফিয়ারা কীরকম বেড়ে উঠেছে। ডেঞ্জারাস।” বলতে-বলতে টিভির দিকে তাকালেন মেজর। তারপর উঠে গিয়ে সেটাকে চালু করলেন। নব ঘোরাতেই খবর চালু হল। পাকিস্তানে উগ্রপন্থী আততায়ীদের হাতে মার্কিন নাগরিকরা নিহত হয়েছেন। পাক প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, যত শিগ্‌গির সম্ভব খুনিদের গ্রেফতার করা হবে। আজ বিকেলে এক সড়ক দুর্ঘটনায় দু'জন মহিলা নিহত হয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে তাঁরা আটলান্টিক সিটিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার সময় তাঁদের গাড়িকে একটি ভারী ট্রাক পেছন থেকে ধাক্কা মারে। গাড়িটি ঘটনাস্থলেই চুরমার হয়ে যায়। মহিলা দু'জনকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ট্রাকের ড্রাইভার ট্রাক নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ট্রাকটিকে পরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ড্রাইভারের সন্ধান পাওয়া যায়নি। ঘোষকের কথার পাশাপাশি ছবি দেখানো হল।

মেজর চিৎকার করে উঠলেন, “মাই গড!”

অর্জুন ঠোঁট কামড়াল। তার চোখের সামনে সিম্বা এবং গ্যাব্রিয়েলার মুখ ভেসে উঠল। সে ফোন করে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ওরা ওদের খুন করল। সিম্বা আজই ফিরতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে। ওদের অনুরোধে বেচারা এসেছিল আটলান্টিক সিটিতে। গ্যাব্রিয়েলার কোনও প্রয়োজন ছিল না, শুধু জিমের কথা ভেবে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন, এখানে এসেছিলেন, অর্জুন দেখল ঘরের এক কোণে টেলিফোন রয়েছে।

সে উঠে ডায়াল করল। ওপাশ থেকে কেউ বলল, “হেলো।”

“আমি বস-এর সঙ্গে কথা বলতে চাই?”

"তোমার কোড নাম্বার ?"

"লকেটের সাপ।"

বলামাত্র সব চুপচাপ হয়ে গেল। তারপর ভারী গলা শুনতে পেল অর্জুন, "হেলো !"

"আমি তোমাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও মেয়েদের খুন করলে কেন ?"

"আমি খুন করিনি।"

"কিন্তু এর পরিণাম খুব খারাপ হবে।"

"আমি যার জন্যে দায়ী নই তা কেন আমার খারাপ করবে।"

"আমি এখনও লকেটটার মালিক।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ। তারপর লোকটা বলল, "হে ম্যান, তোমার মতো আমিও জানি ওইসব সাপের গল্প অর্থহীন। কবে কখন যে গল্প তৈরি হয়েছিল তা আফ্রিকার নির্বোধ মানুষ বিশ্বাস করে চলেছে এখনও এবং তা থেকে তুমি ফায়দা লুঠতে চাইছ। আমারও একই ধান্দা। তোমরা বোর্ডের একজন রেসপেক্টেড মেম্বারের বাড়ি ভেঙে পালিয়ে গেছ। ওই গাড়িতে তোমরা আছ মনে করে অ্যাকসিডেন্ট করানো হয়েছে। এর পেছনে আমার কোনও ভূমিকা নেই। আমার ওই লকেটটা চাই। তার বদলে কী চাও তুমি ?"

"ওয়েল। এ নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু তুমি আটলান্টিক সিটি থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারবে না। ওখানে তোমার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার শত্রু বেড়ে যাবে। দ্যাখো, যদি বেরিয়ে আসতে পারো তা হলে আগামীকাল সকাল দশটায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সামনে অপেক্ষা কোরো।" হঠাৎ রিসিভার হাতছাড়া হয়ে গেল। অর্জুন ঘুরে দেখল মারিও লাইনটা কেটে দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখছে।

"কী হল ?" অর্জুন রেগে গেল।

"তুমি কি ওদের সঙ্গে কথা বলছিলে ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমরা যে এত নির্বোধ তা ভাবিনি। কথা বলে সময় নিয়ে ওরা এতক্ষণে ট্রেস করে ফেলেছে কোন টেলিফোন থেকে কলটা গিয়েছিল। পালাতে চাও তো ফলো মি, কুইক।" মারিও দরজার দিকে এগোল।

সরু গলি দিয়ে খানিকটা হাঁটতেই ওরা সমুদ্র দেখতে পেল। তীর থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা ছোট বজরা ভাসছে। দূরে প্রচুর লোক নৌকো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নৌকোগুলো শৌখিন। মারিও জিজ্ঞেস করল, "সাঁতার কাটতে পারো ?"

মেজর বললেন, "সাঁতার ? হ্যাঃ। একবার প্রশান্ত সাগরের নীচে— !"

মারিও তাকে থামিয়ে বলল, "এখানে জল কম। সাঁতরে ওই বজরায় উঠতে হবে। কুইক।" বলে লোকটা জামা-জুতো সুদ্ধু জলে নেমে পড়ল।

জলপাইগুড়ির করলা নদীতে একসময় সাঁতার শিখেছিল অর্জুন। কিন্তু জুতো-প্যান্ট পরে সে কখনও সাঁতার কাটেনি। কিন্তু বিপদ যখন পেছনে তাড়া করে আসছে তখন আর দ্বিধা করে লাভ নেই। সে প্রায় স্থির জলে সাঁতার কাটতে-কাটতে শুনল জলে বিকট শব্দ হল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মেজর জল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলছেন, "হেঁটেই যাওয়া যায়। জল বেশি নেই।" ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত বেশ নাকানিচুবুনি খেয়ে বজরায় উঠলেন। ভিজে জামা-প্যান্টে শীত করছে। এই সময় ভেতর থেকে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এল, "মারিও ওদের ভেতরে আসতে বলো। আমি চাই না কেউ বাইরে থেকে ওদের দেখতে পাক।"

॥ ১৮ ॥

মারিও ওদের বজরার ভেতরে নিয়ে গেল।

একটা সুন্দর সাজানো ঘর। কার্পেটে মোড়া। ঘরের এক কোণে সোফায় যে মহিলা বসে আছেন তিনি অত্যন্ত স্ফীতকায়া। এককালে যে সুন্দরী ছিলেন, তা মুখের আদলে বোঝা যায়। পরনে দামি স্কার্ট, চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। এই সময় একটা শব্দ পেছন থেকে কানে আসতে অর্জুন অবাক হয়ে ফিরে তাকাল। শব্দটা বেরিয়েছে মেজরের দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা মুখ থেকে, "হা! ম্যাডাম মন্টেগোমারি।"

মহিলার চোখ ছোট হল। তারপর বিচিত্র অভিব্যক্তি ফুটে উঠল মুখে। একগাল হেসে তিনি সস্নেহে চিৎকার করলেন, "ও মাই ডিয়ার মেজর! হোয়াট এ সারপ্রাইজ!" বলতে-বলতে তিনি দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন সোফায় বসেই।

সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে গেলেন মেজর, "আই কান্ট বিলিভ। পৃথিবীটা কি ঠিকঠাক ঘুরছে?" বলতে বলতে মহিলার হাত দুটো ধরে নিজের দাড়ি-গোঁফের ওপর চেপে ধরলেন। সঙ্গে-সঙ্গে মহিলা খিলখিল করে হেসে উঠলেন। সে হাসি আর থামতে চায় না। মেজর একটু হকচকিয়ে বললেন, "ওঃ, আপনি ঠিক আগের মতো আছেন।"

"সুড়সুড়ি— ওঃ— কী সুড়সুড়ি— মরে যাব। আমার দুষ্টু তপসে মাছ। হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হলেন মেজর?" হাসি শেষপর্যন্ত সামলাতে পারলেন তিনি।

মেজর বললেন, "বলছি, বলছি। এই বজরা আপনার?"

"আর কার হবে? আমাদের মন্টেগোমারি ফ্যামিলির ফ্ল্যাগ দ্যাখেননি? ওটা নিশ্চয়ই ওপরে উড়ছে।" ম্যাডাম সোজা হয়ে বসলেন।

"ওহো। লক্ষ করিনি। আসলে জলে ভিজে—।"

"হ্যাঁ, বিশ্রীরকমের ভিজে গিয়েছেন আপনারা।" ম্যাডাম হাততালি দিতেই

ভেতরের দরজায় একটি প্রৌঢ় এসে দাঁড়াল, "জন, এদের দু'জনকে শুকনো পোশাক দাও। আর বজরা ছেড়ে দিতে বলো।"

"আমরা কোনদিকে যাব ম্যাডাম ?"

"নিউ জার্সি।"

জনের পেছন-পেছন ওরা পোশাক ছাড়ার ঘরে এল। জন বলল, "স্যার, আমার স্টকে আপনাদের মানাবে এমন কোনও শার্ট-প্যান্ট নেই। তবে দুটো আলখাল্লা আছে। আপনাদের জামা প্যান্ট যতক্ষণ না শুকোচ্ছে ততক্ষণ কি ওটা পরে থাকতে অসুবিধে হবে ?"

মেজর বললেন, "আলখাল্লা ? চমৎকার !"

আলখাল্লা দুটো দিয়ে জন চলে গেলে বজরা দুলে উঠল। অর্জুন পোশাক পালটাতে-পালটাতে জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ ?"

"অফ কোর্স। নাইনটিন সেভেনটি টু। আমি স্থির করেছিলাম প্রশান্ত মহাসাগরের তলায় যেসব ঝিনুকে মুক্তো পাওয়া যায় তাদের মুভমেন্ট দেখব। বুঝতেই পারছ বেশ খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। আমাদের অভিযাত্রী সঙ্ঘ থেকে আবেদন করা হয়েছিল সাহায্যের জন্যে। সেই সময় এডওয়ার্ড আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে।"

"এডওয়ার্ড কে ?"

"ওঃ। এডওয়ার্ড হল ম্যাডামের ভাই। যেমন মোটা তেমনই জমাটি লোক। বলল, টাকা-পয়সা নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না, তবে ও আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। উটকো লোককে সঙ্গে নেওয়া ঠিক নয় বলে প্রথমে আমি রাজি হইনি। তারপর অন্য সবার চাপে রাজি হতে হয়। তা আমরা যখন প্রশান্ত মহাসাগরে জাহাজ দাঁড় করিয়ে রেখে কাজ শুরু করেছি ঠিক তখন আর-একটা বড় লঞ্চে সেখানে হাজির হন ম্যাডাম। এডওয়ার্ড তাঁর একমাত্র ভাই, যদি জলে কোনও বিপদ হয় তাই তিনি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। অথচ এডওয়ার্ড ফিরে যাবে না। শেষপর্যন্ত সদ্য তোলা একটা ঝিনুকের বুক থেকে পাওয়া দারুণ মুক্তো আমি ম্যাডামকে উপহার দিই। সেটা পেয়ে উনি খুব খুশি হন। আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নেন যে আমি ওঁর ভাই-এর দেখাশোনা করব। তারপর আমাদের বেশ দেখাশোনা হত। হঠাৎ কাগজে পড়ি এডওয়ার্ড অতি ওজনের জন্যে মারা গিয়েছে। মনখারাপ হয়ে গিয়েছিল। আমি আর যোগাযোগ রাখিনি।"

"কিন্তু উনি তো আজ ভাইয়ের কথা কিছু বললেন না ?"

"তাই তো দেখলাম। উনি বললেন না বলে আমিও জানতে চাইলাম না। হয়তো ওই প্রসঙ্গ উঠলে ওঁর মনখারাপ হয়ে যাবে।"

সাজগোজ করে ওরা আবার ম্যাডামের সামনে গিয়ে বসল। তখন বজরা চলছে। দূরে স্থলভূমি সরে-সরে যাচ্ছে। মেজর অর্জুনের পরিচয় দিলেন।

মাদাম চোখ তুললেন, "তাই নাকি ? তুমি এই বয়সে ওসব করো ?"

মেজর বললেন, "ও কিন্তু অনেকদিন ধরেই করেছে। এখন বিখ্যাত।"

"আমি তোমাকে একটা কেস দিতে পারি।"

"বলুন।"

"কেসটা শুনে হয় বলবে পারবে, নয় পারবে না। আমি স্পষ্ট শুনতে পছন্দ করি।" ম্যাডাম জানলা দিয়ে জলের দিকে তাকালেন। তীরভূমি দূরে সরে যাচ্ছে। অর্থাৎ তারা আটলান্টিক সিটি থেকে বেরিয়ে আসছে। অর্জুন কাছেপিঠে মারিওকে দেখতে পেল না। সে বলল, "আপনি স্পষ্ট উত্তরই পাবেন।"

"আমার ভাইয়ের নাম এডওয়ার্ড। মেজর তাকে চেনেন। গত বছর কাগজে বেরিয়েছিল বেশি খেয়ে ওজন বেড়ে যাওয়ায় এডওয়ার্ড মারা গিয়েছে।"

"হ্যাঁ। আমি খবরটা পড়েছি।" মেজর বললেন।

"কিন্তু সে মারা যায়নি।" ম্যাডাম গম্ভীর মুখে বললেন।

"সে কী !" মেজর অবাক !

"তাকে বাঁচিয়ে রাখতে মেরে ফেলতে হয়েছে। ব্যাপারটা খুলে বলি। আমার ভাইয়ের সমস্যা হল সে কিছুতেই ওজন কমাতে পারছে না। অবশ্য সে তার জন্যে ব্যায়াম বা ডায়েটিং করতে নারাজ। বিভিন্ন রকম ওষুধ খেয়ে সে ওজন কমাবার চেষ্টা করছিল। এই সময় তাকে কেউ বলে আফ্রিকায় একধরনের প্রাকৃতিক চিকিৎসা আছে যা করালে হু হু করে ওজন কমে যায়। সেই শুনে সে আফ্রিকায় গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে একজন আফ্রিকান ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওই ভদ্রলোক নাকি তাকে রোগা করে দেবেন। কিন্তু আমরা দেখলাম লোকটার দেওয়া শেকড় খেয়ে ওর মস্তিষ্ক স্থির থাকছে না। ভদ্রলোক ওকে দিয়ে যা ইচ্ছে করাতে পারতেন। এমনকী আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিও ওকে লিখে দিতে বলেন। আমি ভদ্রলোককে শাসানোর পর ওর ওপর দু'বার হামলা হয়। টেলিফোনে শাসানো তো ছিলই। শেষপর্যন্ত ও আমাকে প্রস্তাব দেয় ওকে মৃত বলে ঘোষণা করতে। ফিনল্যান্ডে গিয়ে আমরা ওকে একটা নির্জন স্যানাটোরিয়ামে রেখে আসি। ও মারা গেছে জানার পর ওরা শান্ত হয়ে যায়। আমার ভয় ওরা ওকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিয়েছে। এখন পর্যন্ত কেউ কোনও দাবি করেনি কিন্তু আমি স্বস্তি পাচ্ছি না। তুমি কি সত্যিটা জানতে পারবে ?"

"আমি চেষ্টা করব।"

"বেশ। খরচের কথা ভেবো না। আমি সেই লোকটার নাম ঠিকানা দেব।"

"কিছু মনে করবেন না, ওই আফ্রিকান বিশেষজ্ঞের নাম কি মিস্টার

আলাম্বা ?" অর্জুন সরাসরি প্রশ্ন করল।

"মাই গড ! তুমি জানলে কী করে ?" চোখ বড় হয়ে গেল ম্যাডামের।

মেজর তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ওরা যে প্রাণ হাতে করে মারিও-র সঙ্গে পালিয়ে এসেছে তা জানার পর ম্যাডাম বললেন, "তোমরা খুব ভাগ্যবান। মাফিয়াদের ভয় করে না এমন কেউ আমেরিকায় নেই। ওদের ওপর মারিও-র রাগ আছে। তাই তোমরা বেঁচে গেলে। কিন্তু মিস্টার আলাম্বার সঙ্গে ওদের কোনও সম্পর্ক নেই বললে ?"

"হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তা ছাড়া আমরা গাড়িতে আছি ভেবে ওরা মিস্টার আলাম্বার মেয়ের গাড়িটাকে টার্গেট করেছিল। নিরপরাধ মেয়েটি আর এক ভদ্রমহিলা সেই দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন।"

ম্যাডাম কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কী চাও ? ওদের সঙ্গে লড়াই করতে তোমরা পারবে না।"

মেজর বললেন, "কিন্তু ওদের শাস্তি দেওয়া উচিত।"

ম্যাডাম বললেন, "ওপাশে একটা শোয়ার ঘর আছে। তোমরা ওখানে বিশ্রাম করো। একটা মোটরবোটের আওয়াজ পাচ্ছি। তোমাদের কেউ দেখে ফেলুক তা আমি চাই না।"

জন ওদের নিয়ে গেল ভেতরে। ততক্ষণে জামাপ্যান্ট শুকিয়ে ভাঁজ করে রেখেছে বজরার লোকজন। পোশাক বদলে নিল ওরা। এমনকী যে জুতোজোড়া ভিজে সপসপ করছিল তা এখন খটখটে।

মেজর বললেন, "আর চিন্তা করে কোনও লাভ নেই। আমি একটু বিশ্রাম নিচ্ছি।" ভদ্রলোক সরু বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন।

অর্জুন শুনল মোটরবোট বজরার পাশে এসে থামল। কে এসেছে জানার কৌতূহল হচ্ছিল খুব। কিন্তু এখান থেকে বের হলে বিপদ ডেকে আনবে সে। কী করা যায় ? অর্জুন ভাবছিল। সুধামাসি যদি এখন মেয়ের কাছে আরও কিছুদিন থেকে যান তা হলে সে স্বচ্ছন্দে দেশে ফিরে যেতে পারে। লকেটটা হাতছাড়া না করে জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে ওটাকে না হয় অমলদার বাগানের মাটিতে পুঁতে দেবে সে। এখানে তার কোনও সমস্যা সমাধানের দায় নেই। দায়ের কথা ভাবতেই মনে হল সে একটু আগে ম্যাডামকে কথা দিয়েছে তাঁর ভাইয়ের ব্যাপারটা সমাধান করতে চেষ্টা করবে। কী করা যায় ?

হঠাৎ তার খেয়াল হল। ভেজা জামাপ্যান্ট ছাড়ার সময় সে মোজা খুলেছিল। মোজার মধ্যে লকেটটাকে রেখেছিল সে। সে দেখল জুতো আছে কিন্তু মোজা নেই। মেজরের মোজা কিন্তু ঠিকঠাক রয়েছে।

সে দ্রুত দরজা খুলে প্যাসেজে উঁকি মারল। কোনও লোকজন নেই যেখানে ওরা জামাপ্যান্ট বদলেছিল, সেখানে পৌঁছে দেখল মোজা বা লকেট পড়ে নেই। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজের ওপর রেগে যাচ্ছিল অর্জুন। সে

ওপাশে উঁকি মারল। এটা রান্নাঘর। সেখানে একজন কোরিয়ান যুবক রান্না করছে। আর তার বুকে লকেটটা ঝুলছে। খাবার ট্রেতে সাজিয়ে লোকটা ঘুরে দাঁড়াতেই চোখাচোখি হল। যুবকটি বলল, "ফর দি নিউ গেস্ট সার।"

অর্জুন হাত বাড়াল। যুবক অবাক! অর্জুন এগিয়ে এসে ওর গলা থেকে লকেটটাকে খুলে নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে গেল। এবং তখনই মারিয়া এল, "ওরা এসেছে!"

"কারা?"

"মাফিয়াদের লোক। জিজ্ঞেস করছে তোমাদের ম্যাডাম দেখেছেন কিনা! ম্যাডাম অস্বীকার করেছেন। ওরা খেতে চাইল, খাবার দেওয়া হয়েছে।"

অর্জুনের মনে হল সে বেঁচে গেছে। আর একটু পরে লকেটের খোঁজ করতে গেলে ওরা কোরিয়ান যুবকের গলায় ওটাকে দেখতে পেত। ব্যস। কয়েক মুহূর্ত লাগত ওদের আবিষ্কার করতে।

একটু বাদে মোটরবোটের শব্দ হল। ওরা যে চলে গেল তা বোঝা যাচ্ছে। মারিয়া বেরিয়ে গেলে অর্জুন খাটে শুয়ে পড়ল। মেজর এখন প্রচণ্ড শব্দে নাক ডেকে চলেছেন।

নিউ জার্সির এক স্টিমারঘাটায় বজরা যখন পৌঁছল তখন মধ্যরাত। ম্যাডাম প্রচণ্ড সাজগোজ করে বজরা থেকে নামলেন। জন এবং মারিয়া ওঁর জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে পেছনে। অর্জুন আর মেজর সবশেষে। একটি লিমুজিন দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ম্যাডাম বললেন, "আমার মনে হয় এখান থেকে একসঙ্গে যাওয়াই ভাল।"

ওরা গাড়িতে উঠল। ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা এখন কোথায় যাবেন?"

মেজর বললেন, "কুইন্স।"

"কিন্তু ওখানে তো আপনাদের জন্যে ওরা অপেক্ষা করতে পারে।"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন বলল, "ঠিকই। ক'দিন আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকা উচিত। ওরা একটু ভাবুক।"

ম্যাডাম বললেন, "আমার একটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে কুইন্সে। ওয়েল ফার্নিস্‌ড। সেখানে থাকতে পারো তোমরা। পোশাক নিয়ে সমস্যা হতে পারে। ক্রেডিট কার্ড দেখিয়ে মেজর সেসব কিনে নিতে পারেন।"

মিনিট পঁয়তাল্লিশ পরে ম্যাডাম মারিয়ার হাতে চাবি দিয়ে একটা সম্ভ্রান্ত অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে ওঁর কার্ড অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "টাকার জন্যে ভেবো না। কাজটা যদি করতে পারো ওটার সমস্যা হবে না।"

রাত তখন আড়াইটে। মেজর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা ঝামেলায়

পড়া গেল ! চলো জামাপ্যান্ট কিনে আনি ।"

"সে কী ? এই রাতে !"

"এখানে একটা দোকান সারারাত খোলা থাকে ।"

"ওটা আগামীকাল করবেন । প্লিজ ।"

ম্যাডামের এই খালি অ্যাপার্টমেন্ট বেশ সুন্দর । গোটা পাঁচেক ঘর এবং ফ্রিজভর্তি খাবার আছে । যদিও ওরা ডিনার বজরাতেই করে গিয়েছিল । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে আপনার ফ্ল্যাট কতদূর ?"

জামা ছাড়তে-ছাড়তে মেজর বললেন, "এক কিলোমিটার ।"

"মারিয়াকে ঠিকানাটা বলে দিন । আর চাবিটা ।"

"কেন ? তুমি কি সেখানে যাবে ?"

"আপনার ফ্ল্যাটে যাব না ।"

"সর্বনাশ ! শুনলে না, ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করতে পারে ।"

"ওরা দেখতে পাবে না ।"

"আমি তোমার সঙ্গে যাব ?"

"না । আপনি সঙ্গে থাকলে ধরা পড়ে যেতে পারি ।"

"তুমি আমাকে আন্ডার এস্টিমেট করছ অর্জুন !"

"না । আপনার চেহারা লুকোতে পারবেন না । বরং এখন এখানে বিশ্রাম নিন । আমি ভোরের আগে ঘুরে আসব ।"

pathagar.net

ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে অর্জুন মারিয়াকে বলল, "তুমি এখানে অপেক্ষা করো । আমি জায়গাটা চিনতে পেরেছি ।"

॥ ১৯ ॥

নিউ ইয়র্ক শহরের যেসব অঞ্চলে দিনের বেলায় ফুটপাথে মানুষকে হাঁটতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে কুইন্সের নাম করা যায় । ম্যানহাটান যেমন সকাল ন'টা থেকে বিকেল ছ'টা পর্যন্ত কলকাতার এসপ্ল্যানেড হয়ে থাকে এবং তার আগে ও পরে শ্মশানের শূন্যতা, কুইন্স তেমন নয় । তবু রাত আটটার পর লোকজন গোনা যায় । আর অর্জুনরা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন হুসহাস গাড়ির ছুটে যাওয়া ছাড়া কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই ।

নিউ ইয়র্কের রাতের রাস্তায় হাঁটলেই ছিনতাই হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা । স্প্যাস্কি, সংকর রক্তের মানুষ এবং অবশ্য কালোদের রাজত্ব তখন । পুলিশের গাড়ি দেখলেই তারা গলির মধ্যে গা ঢাকা দেয়, নইলে ফুটপাথ ওদের দখলে । মারিওর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন দেখল, দুটো বিশাল চেহারার কালো লোক সামনের লাইট পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে আছে । ওদের পাশ দিয়ে তাদের যেতে

হবে। লোক দুটোর উচ্চতা এবং স্বাস্থ্যের কাছে টাইসন, প্যাটার্সন ইত্যাদি বিখ্যাত বক্সারদের শিশু বলে মনে হবে।

অর্জুন চাপা গলায় মারিওকে কথাটা বলতেই সে মাথা নাড়ল। তারপর নিচু গলায় বলল, "জাস্ট ফলো মি।"

ওদের এগিয়ে আসতে দেখে লোক দুটো ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। মারিও একটু এগিয়ে গিয়ে দু'জনের সামনে হাত পাতল, "গিম মি এ ডলার মিস্টার, নো ফুড, ভেরি হাঙরি। গিম মি এ ডলার।"

অর্জুন হতভম্ব হয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে দু'বার মাথা নেড়ে মারিওর বক্তব্য সমর্থন করার চেষ্টা করল। লোকদুটো জুলজুল করে মারিওকে দেখল, তারপর অর্জুনকে। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই একসঙ্গে হো হো করে হাসতে লাগল। ওই বিশাল চেহারার দুটো মানুষ যে কী মজা পেয়েছে বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু হাসতে-হাসতে একজন অন্যজনের হাতে চাঁটি মারছে, ফুটবলে গোল করে যেভাবে খেলোয়াড়রা মেরে থাকে। তারপর ওরা রাস্তা পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

মারিও হাসল, "দেখলে তো। ওরা নিজেদের আমাদের চেয়ে বড়লোক ভাবল।"

অর্জুন মারিওর বুদ্ধির প্রশংসা করল।

বাকি পথটুকু আসতে কোনও অসুবিধে হল না। মেজরের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে অর্জুন বলল, "আমি একশো ভাগ নিশ্চিত ওরা ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। বাড়িটার সামনে যেতে পারলে ভাল হত।"

মারিও মাথা নাড়ল, "তাতে ওদের চোখে পড়ে যাবে তুমি। দাঁড়াও।" তখন ফুটপাথের লাগোয়া দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা নিয়ন সাইন জ্বলে-নিভে জানাচ্ছিল সেখানে এখনও প্রাণ আছে। মারিও অর্জুনকে নিয়ে সেখানে ঢুকল। দোকানটা একটা ফ্যামিলি পাব। অর্থাৎ এ-পাড়ায় যারা থাকে তারা সন্ধের পর এখানে এসে পানভোজন করে, একটু আড্ডা মারে। এদের অবস্থা সাধারণ। অর্থবানরা এরকম জায়গায় আসে না।

লম্বা বার কাউন্টারের সামনে টুলের ওপর কয়েকজন বসে পান করছে। সামনের গোটাদশেক টেবিলে খদ্দেররা কথা বলছে, খাচ্ছে। মারিও সেই কাউন্টারের সামনে পৌঁছে অর্জুনকে একটা টুলে বসতে ইঙ্গিত করে নিজে আর একটায় বসল। তৎক্ষণাৎ কাউন্টারের উলটো দিকে একটি তরুণ এসে হেসে বলল, "কল মি চার্লি। কী দেব তোমাদের?"

মারিও বলল, "তার আগে বলো তোমরা কতক্ষণ খোলা রাখো।"

চার্লি বলল, "রাত একটা পর্যন্ত।"

মারিও বলল, "ভালই হল। আমার এই ইয়ং বন্ধু একটু বসবে। আমি তাড়াতাড়ি ঘুরে আসছি। তারপর খাওয়াদাওয়া করব।"

চার্লি মাথা নাড়ল, "ওকে। ততক্ষণ তুমি একটা বিয়ার খেতে পারো।"

অর্জুন মাথা নাড়ল। এরকম জায়গায় ঢোকার কথা সে জলপাইগুড়িতে বসে কল্পনাও করতে পারত না। ইচ্ছেও হত না। পানীয়ের গন্ধ পাবের বাতাসে ভাসছে আর তাতেই তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে। গা গুলোচ্ছে। মারিও অর্জুনের দিকে তাকাল, "তুমি ড্রিঙ্ক করো না ?"

অর্জুন বলল, "আমাদের দেশের নব্বই ভাগ মানুষই করে না।"

চার্লি বলল, "তা হলে তুমি একটা আইসক্রিম সোডা খেতে পারো।"

চার্লি চলে যেতে মারিও বলল, "আমি চট করে দেখে আসছি। মনে হয় এখানে যদি কেউ থাকে সে আমাকে চিনতে পারবে না।"

মারিও বেরিয়ে গেলে অর্জুন দেখল কাউন্টারের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় চরকির মতো ঘুরে চার্লি ড্রিঙ্কের গ্লাস এগিয়ে দিচ্ছে। এই সময় পাবের দরজা ঠেলে একজন মহিলা ঢুকলেন। মহিলার শরীর বেশ ভারী, পঞ্চাশের কাছে বয়স, মাথায় রুমাল বাঁধা। চারপাশে তাকিয়ে মহিলা অর্জুনের পাশের টুলে এসে বসলেন। তারপর ব্যাগ খুলে প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটার জ্বেলে ধরালেন। চার্লি ছুটে এল, "গুড ইভিনিং ম্যাডাম, বেশ কিছুদিন পরে আপনাকে দেখতে পেলাম!"

"আমি এখানে ছিলাম না।" ধোঁয়া ছাড়লেন মহিলা।

"আপনাকে জ্যামাইকান রাম দেব, তাই তো ?"

"তোমার স্মরণশক্তি ভাল।"

চার্লি দু'হাতে দুটো গ্লাস নিয়ে ফিরে এল। অর্জুন দেখল তার গ্লাসে আইসক্রিম সোডার মধ্যে বরফের টুকরো রয়েছে কয়েকটা। এভাবে সে কখনও আইসক্রিম সোডা খায়নি। চুমুক দিতে আরাম লাগল।

"ওয়াটার প্লিজ।" ভদ্রমহিলার কথা শুনে অর্জুন অবাক হয়ে দেখল তিনি গ্লাসে পানীয় শেষ করে ফেলেছেন এক চুমুকে। চার্লি সেই গ্লাসে জল দিতেই সেটা গলায় ঢাললেন। চার্লি বলল, "এবার জল মিশিয়ে দেব, তাই তো ?"

"তুমি খুব ভাল ছেলে।"

চার্লি হাসল, "আপনার পাশে বসে আমাদের নবাগত অতিথি আইসক্রিম সোডা খাচ্ছেন। এই পাবে এরকম খদ্দের খুব কম আসে।"

চার্লি চলে যেতে মহিলা অর্জুনের দিকে তাকালেন, "তুমি এশিয়ান ?"

"ইন্ডিয়ান।"

"ইন্ডিয়ার লোকেরা তো ড্রিঙ্ক করে।"

"সবাই করে না। আমার নাম অর্জুন।"

"আমি লুসি।"

"আপনি এ-পাড়ায় থাকেন ?"

"না। তুমি ?"

"আমি টুরিস্ট। এখানে একটা কাজে এসেছি।"

"তা কাজটা না করে পাবে বসে আছ কেন?"

"একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে।"

"অপেক্ষা! সেটা তো আমি রাতের পর রাত করে যাচ্ছি।"

"আপনার কথা বুঝলাম না।"

ভদ্রমহিলা জবাব না দিয়ে চার্লির দেওয়া দ্বিতীয় গ্লাসটি ধরলেন।

অর্জুন লক্ষ করেছিল অপেক্ষার কথা বলার সময় ভদ্রমহিলার মুখ-চোখ কীরকম শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এখনও গ্লাস হাতে নিয়ে তিনি ওই মুখ নিয়ে কিছু ভেবে চলেছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার দেশ নিশ্চয়ই আফ্রিকায়?"

লুসি তাকালেন, "আমার গায়ের চামড়াই তো সে-কথা বলছে।"

"আফ্রিকার কোথায়?"

"জাম্বিয়া। লিভিংস্টোনে আমি জন্মেছি। নাম শুনেছ?"

"নিশ্চয়ই। জিম্বাবোয়ে, অ্যাঙ্গোলা, জাইরে আর তানজানিয়ার মাঝখানে জাম্বিয়া। তাই তো?" অর্জুনের মাথার ভেতর একটা আলো চলকে উঠল।

ভদ্রমহিলা চোখ বড় করে দেখলেন, "আশ্চর্য! তুমি আফ্রিকার এত খবর রাখো? এদেশে বেশিরভাগ মানুষই এইসব নাম জানে না।"

অর্জুন হাসল, "আরও জানি। পাশেই বত্সওয়ানা। তার ছোট্ট শহর গ্যাবর্ন থেকেই প্রায় কালাহারি মরুভূমি শুরু। সেখানে মরুভূমির উপজাতিরা এসে কেনাবেচা করে। ঠিক বলেছি?"

লুসি ঘুরে বসলেন, "তুমি এসব জানতে গেলে কেন?"

"আমাদের স্কুলে এসব পড়ানো হয়।"

"তুমি কী করো?"

একজন বয়স্কা মহিলার এই প্রশ্নের জবাবে মিথ্যে কথা বলতে পারল না অর্জুন। উত্তরটা শোনামাত্র ভদ্রমহিলার চোখ ছোট হল, "গ্যাবর্ন সম্পর্কে তুমি আর কী জানো? আমার মন বলছে তুমি সেখানে গিয়েছিলে?"

"না। বিশ্বাস করুন আমি কখনওই আফ্রিকায় যাইনি।"

কথাটা বিশ্বাস করলেন লুসি। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললেন, "ওকে যদি একবার গ্যাবর্নে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত তা হলে আমার চেয়ে খুশি কেউ হত না। ওর শরীরটাকে ওরা মরুভূমিতে পুঁতে ফেলত।"

"কেন?"

"ওদিকের মানুষরা অনেক বছর আগে মাটির তলা থেকে একটি ধাতব বস্তুতে তৈরি সাপকে উদ্ধার করেছিল। সেই সাপটি ওদের ভাগ্য খুলে দিয়েছিল। তার অধিকার নিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই হত। একদিন সেই সাপ চুরি হয়ে যায়। সেটাকে আর পাওয়া যায়নি। তখন ওরা আর

একটি অবিকল ওই সাপ তৈরি করে। কিন্তু সেটা একটা ব্ল্যাক কোবরার মাথা আর খানিকটা শরীর। এই সাপটিকেও একজন চুরি করে বিক্রি করেছে কিছু বছর আগে। যে বিক্রি করেছে সে মারা গিয়েছে কিন্তু যে কিনেছে সে এদেশে আছে।"

"আপনিও কি ওই সাপকে ভগবান বলে মনে করেন ?"

"না। আমি খ্রিস্টান। ওসব আমি মানি না। কিন্তু যে ওটা কিনে এদেশে পালিয়ে এসেছে সে আমার সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও আমাকে ত্যাগ করে আর একজনকে বিয়ে করেছিল সে।"

"আপনি কি এখানে প্রতিশোধ নিতেই আসেন ?"

মাথা নাড়ালেন লুসি, "কীভাবে নেব ? এর মধ্যে ও যে ক'টা ফ্ল্যাট পালটেছে আমি তার সন্ধান পেয়েছি। একদিন এই পাব থেকে বেরোতে দেখেছিলাম তাকে। তারপরই মাঝে-মাঝে চলে আসি। যদি সামনাসামনি দেখতে পাই... !" লুসি কথা শেষ করলেন না।

"আপনি ওঁর কথা দেশে জানিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?"

"কাকে জানাব ? ভেবেছিলাম কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ওর ঠিকানা জানিয়ে দেব। ওদের ভয়ে সে অনেককাল নিজের দেশে যায় না।"

এই সময় মারিও পাবে ফিরে এল। লুসিকে দেখে নিয়ে অর্জুনের এ-পাশের টুলে বসে চার্লিকে বলল, "বিয়ার।"

চার্লি বিয়ার দিয়ে গেলে তাতে চুমুক দিয়ে চাপা গলায় মারিও বলল, "বাড়ির সামনে পার্ক করা গাড়িতে পাঁচজন বসে আছে।"

"ভেতরে ঢোকা যাবে না ?"

"না। অন্তত ওদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।"

"কিন্তু আমাদের সেই চেষ্টা করতে হবে।"

"দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

অর্জুন ঘুরে বসল, "আপনি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন ?"

"কীরকম ?"

অর্জুন লকেটটা বের করল। করে টেবিলে রাখল, "চিনতে পারেন ?"

হঠাৎ ভদ্রমহিলা প্রায় পাথর হয়ে গেলেন, "এটা— এটা— ?"

"সেই সাপের লকেট, যেটা বহু বছর আগে হারিয়ে গিয়েছিল।"

"মাই গড !"

"আমরা এখন মিস্টার আলাম্বার ফ্ল্যাটে যাচ্ছি। মাফিয়ারা ওর ফ্ল্যাট আবিষ্কার করে ফেলেছে। মিস্টার আলাম্বার বাড়ির সামনে পাহারা দিচ্ছে ওরা। আপনি শুনে নিশ্চয়ই দুঃখিত হবেন ওঁর মেয়েকে ওরা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে মেরে ফেলেছে। বেচারা নির্দোষ, কিছুই জানত না।"

"তুমি মিস্টার আলাম্বাকে চেনো ?" লুসির মুখে বিস্ময় !

"হ্যাঁ। এটা খুব কাকতালীয় ব্যাপার যে, আপনার দেখা পেয়েছি।"

"তোমরা কী করতে চাও ?"

"মিস্টার আলাম্বাকে বাঁচাতে চাই। আমাদের এক বন্ধু ওঁর ফোন নাম্বার ওদের দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। নইলে ওরা ওঁকে ধরতে পারত না।"

"কিন্তু আমি তো ওঁকে বাঁচাতে চাই না।"

"কিন্তু উনি মারা গেলে আপনি প্রতিশোধ নেবেন কী করে ?"

"বেশ। কী করতে হবে আমাকে ?"

"আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। কাছেই।"

"তার মানে তুমি যে কাজটা করতে এসেছ সেটা...।"

"হ্যাঁ, এই ব্যাপার। ইনি আমাদের বন্ধু, মারিও।"

মারিও মাথা নেড়ে বিয়ার শেষ করল।

॥ ২০ ॥

পাব থেকে বেরিয়ে খানিকটা এগিয়ে মারিও একটা টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়িয়ে কাউকে ফোন করল। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল, "একটু আড়ালে অপেক্ষা করতে হবে। এখনই পুলিশ আসবে।"

"পুলিশ কেন ?" লুসি জিজ্ঞেস করল।

"না হলে ওদের সরানো যেত না।"

এই সময় সাইরেনের আওয়াজ হতেই ওরা দ্রুত একটা থামের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। একসঙ্গে গোটা তিনেক গাড়ি দ্রুত ছুটে গিয়ে মেজরের বাড়ির সামনে দাঁড়াল। ঝটপট পুলিশ অফিসাররা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল বাড়িটার দিকে। তৎক্ষণাৎ একটি গাড়ি তীব্রগতিতে বেরিয়ে এসে রাস্তায় পড়ল। দুটো গুলির শব্দ হল। তারপর পুলিশের গাড়িগুলো ছুটল ওটার পেছনে। মারিও হাসল, "কীরকম প্ল্যান করেছিলাম বলো, চলো।"

এখন সব সুনসান। মেজরের বাড়ির সামনে কেউ নেই। অর্জুন মেজরের কাছ থেকে নেওয়া চাবি দিয়ে দরজা খুলল, ভেতরে ঢুকল। তারপর ওরা তিনজনে লিফ্‌টে উঠে প্রথমে দশতলার বোতাম টিপল। দরজা খুলে ওরা ধীরে-ধীরে মেজরের ফ্ল্যাটের সামনে পৌঁছল। দরজা বন্ধ থাকার কথা, আছেও। অর্জুন চাবি দিয়ে দরজা খুলে দেখল ভেতরে আলো জ্বলছে। ফ্ল্যাটে কেউ নেই, কিন্তু তাণ্ডব হয়ে গিয়েছে এখানে। জিনিসপত্র ভাঙা, ছড়ানো। ফ্ল্যাটটা তছনছ করে গিয়েছে কারা। মেজর সঙ্গে থাকলে চিৎকার করতেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় গালাগালি উগরে দিতেন।

লুসি জিজ্ঞেস করলেন, "এরকম হল কেন ?"

"আমাদের না পেয়ে রাগ দেখিয়ে গিয়েছে ওরা।"

"কারা?"

"আটলান্টিক সিটির মাফিয়ারা।"

"তারা কেন রাগ দেখাবে?"

"সে অনেক বড় গল্প। মিস্টার আলাম্বা বেঁচে আছেন কিনা কে জানে?"

মারিও বলল, "ওঁকে একটা ফোন করতে পারো?"

"আমি ওঁর নাম্বার জানি না। মেজর জানেন। উনি থাকেন দশতলায়। নেমে গিয়ে দেখা যেতে পারে।" অর্জুন বলল।

দরজা বন্ধ করে ওরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে আসছিল। দশতলার করিডোরে পড়ার আগেই লিফ্‌টের আওয়াজ হল। তিনজন লোক কথা বলতে বলতে লিফ্‌ট থেকে নেমে দরজার দিকে এগোল। শেষ ধাপে পা দেওয়ার আগেই অর্জুন এবং বাকি দু'জন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সিঁড়িতেই। মিস্টার আলাম্বা দরজা খুলতে খুলতে বললেন, "তোমরা আমার যে ক্ষতি করলে...উঃ। আমি সহ্য করতে পারছি না। গাড়িতে কে আছে, কে চালাচ্ছে তা দেখার প্রয়োজন হল না?"

লোকগুলো ঢুকে গেল, দরজা বন্ধ হল।

লুসি বলল, "ও তা হলে ওই ফ্ল্যাটে থাকে?"

"হ্যাঁ। মারিও, বাকি দু'জনকে চেনা গেল?"

"হ্যাঁ। ওরা দু'জনেই আটলান্টিক সিটির বোর্ডের মেম্বার।"

"অদ্ভুত ব্যাপার তো!" অর্জুন বিড়বিড় করল।

মারিও বলল, "ওদের দেখে তো মনে হল না মিস্টার আলাম্বার কোনও ক্ষতি করতে এসেছে। তাই না?"

অর্জুন লুসির দিকে তাকাল, "আপনি বেল টিপুন। দরজা খুলে বলবেন মিস্টার আলাম্বার সঙ্গে কথা বলতে চান। প্লিজ, মাথা গরম করবেন না। সময় নিয়ে যতক্ষণ পারেন ওঁর সঙ্গে কথা বলে যাবেন।"

"তোমরা?"

"আমরা একটু পরে আসছি।"

বেল টেপার পর মিস্টার আলাম্বা দরজা খুলে খুব অবাক হয়ে বললেন, "তুমি? এখানে? কী চাই তোমার?"

লুসি বললেন, "তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

"সরি। আমি এখন খুব ব্যস্ত।"

"কিন্তু কথা তো বলতেই হবে।"

"আমি বলেছি এখন ব্যস্ত। আমার একমাত্র মেয়ে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছে। এই মুহূর্তে তোমার সঙ্গে কথা বলার মতো অবস্থায় আমি নেই। তা ছাড়া তুমি এখানে ঢুকলে কী করে? এ বাড়ির সিকিউরিটি সিস্টেম নষ্ট হয়ে

গেছে নাকি ! ডোন্ট ডিস্টার্ব মি লুসি !"

"সরি। আমাকে কথা বলতেই হবে।" লুসির গলা চড়ল।

"আমি যদি শুনতে না চাই ?"

"তা হলে তোমার ঠিকানা ওদের হাতে পৌঁছে যাবে।"

"আচ্ছা। তা হলে তো তোমাকে ভেতরে আসতে বলতে হয়।"

লুসি ভেতরে ঢুকে গেলে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

অর্জুন মারিওকে বলল, "ভদ্রমহিলার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে। কোনওভাবে পুলিশকে ফোন করা যায় ?"

"ওপরের ফ্ল্যাটের চাবিটা আমাকে দাও।"

চাবি নিয়ে মারিও চলে গেলে অর্জুন এক মুহূর্ত চিন্তা করল। মিস্টার আলাম্বাকে মোটেই ভীত বা সন্ত্রস্ত বলে মনে হচ্ছে না। অথচ মাফিয়া-বাহিনী যদি তাঁর পেছনে লাগে তা হলে সেটাই ওঁর হওয়া উচিত ছিল।

সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বেল টিপল।

দরজা খুললেন মিস্টার আলাম্বা। অর্জুনকে দেখে প্রচণ্ড অবাক যে হয়েছেন তা বোঝা গেল। কিন্তু সামলে নিলেন ঝটপট, "আরে ! আপনি ?"

"আমি খুব দুঃখিত, আপনার মেয়ে আমার নির্দেশ শুনে মারা গিয়েছে।"

সঙ্গে-সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল আলাম্বার মুখ, "ও একটা ইডিয়ট। নইলে আপনাদের আটলান্টিক সিটিতে নিয়ে যেত না। কী চান ?"

"আমি আপনাকে বলতে এসেছি যে আপনার জীবন বিপন্ন।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। মেজর বাধ্য হয়ে আপনার ফোন নম্বর মাফিয়াদের দিয়েছেন। ভেতরে গিয়ে কথা বলতে পারি ?"

মাথা নাড়লেন আলাম্বা, "আসুন।"

ভেতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল অর্জুন। ঘরের মাঝখানে একটি চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছেন লুসি। তাঁর ঠোঁটের কোণ থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ঘরের একপাশে সোফায় বসে আছেন দু'জন লোক।

আলাম্বা বললেন, "আপনাদের ভাগ্য খুব ভাল ভদ্রমহোদয়রা। ইউনাইটেড স্টেটকে যে লোকটি সেই হারানো সাপ দিতে এসেছে সে এখন এই ঘরে আপনাদের সামনে।"

লোক দুটি উঠে দাঁড়াল। আলাম্বা বললেন, "অর্জুন, লকেটটা দেখি।"

"কোন লকেট ?"

"যেটার ডুপ্লিকেট আপনি করিয়েছেন।"

"আপনি কী করে ভাবলেন ওটা নিয়ে আপনার কাছে আসব ?"

"কেন এসেছেন ?"

"আপনাকে সতর্ক করতে।"

"অনেক ধন্যবাদ।" আলাম্বা ইশারা করতেই দু'জন লোক এগিয়ে এল। একজন তার হাত পেছন মুড়ে ধরল। অন্যজন তার শরীরে খুঁজতে লাগল। লকেট পেতে দেরি হল না তার। আলাম্বার গলা থেকে যুদ্ধজয়ের আনন্দ ছিটকে বের হল। লকেটটা হাতে নিয়ে বললেন, "দ্যাট্‌স ইট। এত সহজে যে এটা পাব, ভাবতে পারিনি। আমার মনে হচ্ছে লুসি তুমি অর্জুনকে চেনো। তোমরা একই সঙ্গে এসেছ। তাই না?"

"তুমি মরো। তুমি মরলে আমি খুশি হব।"

হা হা করে হাসলেন আলাম্বা। তারপর অর্জুনের সামনে এসে বললেন, "তুমি ইন্ডিয়ান। এই সাপে তোমার দরকার নেই। কিন্তু তোমায় নিয়ে কী করি? আমার সন্দেহ হচ্ছে পুলিশ ডেকে আমার বন্ধুদের তুমি এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য করেছ।"

"যারা নীচে ছিল তারা আপনার বন্ধু?"

"হ্যাঁ, বন্ধু। এই মহিলার সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হল?"

"হয়েছে।"

আলাম্বা তখন বাকি দু'জনের দিকে তাকালেন, "বন্ধুগণ, এই লোকটিকে নিয়ে কী করা যায়?"

"ওর জন্যে যা বরাদ্দ হয়েছে তাই হবে।"

"তবে তাই হোক।"

এই সময় আবার বেল বাজল। আলাম্বা খুব বিরক্ত হয়ে দরজার দিকে তাকালেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন। অর্জুন মারিওর গলা পেল, "অর্জুন এসেছেন এখানে?"

"আপনি কে?"

"ওর বন্ধু।"

"না। নেই।"

"আপনি মিথ্যে বলছেন।"

"কী চান আপনি?"

"অর্জুনকে।"

অর্জুন দেখল মারিওর শরীরটাকে মুঠোয় ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন আলাম্বা, "এই তিনটেকে একই জায়গায় পাঠাও।"

দু'জনের একজন বলল, "আরে! এ তো মারিও।"

উঠে দাঁড়িয়ে মারিও বলল, "তুমি! তুমি! তুমি আমার বউকে মেরেছ। আমার ছেলেকে মেরেছ! আই উইল কিল ইউ!" ছুটে গেল মারিও। লোকটা অবলীলায় তাকে ধরে আছাড় মারল।

মারিওর শরীরটা মাটিতে পড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

আলাম্বা বললেন, "এদের এমন জায়গায় ফেলে দাও যাতে পুলিশ চব্বিশ

pathagar.net

ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে না পায়।"

দ্বিতীয় লোকটি বলল, "ব্রঙ্কসের গারবেজ ড্রেনে ফেলে দেব।"

আলাম্বা লকেটের সাপের মুখটা সামনে ধরলেন। পরীক্ষা করে চোখের পাথরে চাপ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর মুখে হাসি ফুটল। আলাম্বা বললেন, "ইয়েস। এটাই সেই সাপ।"

আলাম্বা এগিয়ে এলেন, "জিভ বের করো।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "আমার ইচ্ছে নেই।"

দ্বিতীয় লোকটি ঝটপট এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে অর্জুনকে এমনভাবে ধরল যে, সে নড়তে পারল না। প্রথম লোকটি এবার অর্জুনের গাল এমনভাবে টিপে ধরল যে, অর্জুন জিভ বের না করে পারল না। এবার মিস্টার আলাম্বা সাপের চোখের গর্তের বিষ অর্জুনের জিভে ঘষতে গেলেন। অর্জুন প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। শেষ পর্যন্ত সে বাঁ পা শূন্যে তুলে আলাম্বার হাতে আঘাত করতে পারল। সঙ্গে-সঙ্গে সাপের লকেট ছিটকে আলাম্বার হাত থেকে দরজার সামনে গিয়ে পড়ল। আলাম্বা দৌড়ে সেটাকে তুলে নিতে যেতেই বেল বাজল। সাপটাকে তুলে দরজা খুলতেই দু'জন পুলিশ অফিসার ঘরে ঢুকলেন।

boiRboi.net

সুধামাসি মেয়ের কাছে আরও কিছুদিন থেকে যাবেন। তাঁর জামাই এখন সুস্থ। অর্জুন একাই জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছিল। সুধামাসির মেয়ে অঞ্জনাদি তাকে হিথরো এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। ভেতরে ঢোকার আগেই অর্জুন দেখতে পেল মারিও এবং লুসি এগিয়ে আসছেন।

মারিও বলল, "তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।"

"অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন বলল।

"আমাদের ভুলে যেয়ো না।"

"কখনও নয়।"

এবার লুসি বললেন, "আমি তোমাকে একটা কথা বলতে পারি? আমি খুব সিরিয়াস।"

"বলুন।"

"আমি তোমার দিদি হতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। যদি কখনও ভাইফোঁটায় দেখা হয় আপনি আমাকে ফোঁটা দেবেন। ব্যাপারটা আপনি বুঝবেন না কিন্তু সুযোগ পেলে বুঝিয়ে দেব।"

লুসি বললেন, "আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

প্লেনে বসে দেশের পথে ফিরতে ফিরতে অর্জুনের মনে হল, কে ভেবেছিল, আলাম্বাই যত নষ্টের গোড়া। আসলে বদ মানুষ কখনওই ভাল হয় না।

pathagar.net

ইয়েতির আত্মীয়

ভানুদা বলেছিলেন, "আজকের রাতটা থেকে যাও অর্জুন। রাস্তাটা ভাল নয়, দু' ঘণ্টাব রাস্তা তিন ঘণ্টাতে যেতে হয়। তা ছাড়া মেঘ জমেছে খুব।"

তখন সবে সন্ধে নেমেছে। কথা হচ্ছিল সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সামনে দাঁড়িয়ে। রাতে চা-বাগানের কারখানা, অফিস, রাস্তা বিদ্যুতের কল্যাণে দিনের আলোর মতো আলোকিত। কিন্তু পেছনের চা-বাগান অন্ধকারে ঝিম মেরে পড়ে আছে। অর্জুন আমাদের দিকে তাকাতেই চটপটি আলো ছড়িয়ে ছুটে গেল এপাশ থেকে ওপাশে।

অর্জুন বলল, "আপনি যখন জিপ দিচ্ছেন তখন যেতে তো সমস্যা হবে না। ওরা যদি পরশু সকালে যাত্রা শুরু করে তা হলে আজই আমার ওখানে পৌঁছনো দরকার। তা হলে কাল গোটা দিনটায় ওদের সঙ্গে থেকে তৈরি হওয়া যাবে।"

ভানুদা আর আপত্তি করেননি। ড্রাইভারকে ডেকে উপদেশ দিয়েছিলেন, যেন ঠিকভাবে জিপ চালায়। সাহেবের যেন কোনও অসুবিধে না হয়।

ছুটন্ত জিপে বসে কথাটা ভাবতেই হাসি পেল অর্জুনের, ভানুদা তাকেও সাহেব বানিয়ে ছাড়লেন। অবশ্য চা-বাগানের ম্যানেজারদের অধস্তনরা 'সাহেব' বলে থাকেন। অতএব সাহেবের বন্ধু বা ঘনিষ্ঠরা সাহেব হয়ে যাচ্ছেন। তা ছাড়া ভানুদা মনেপ্রাণে বাঙালি হলেও আদব-কায়দায় পুরোদস্তুর সাহেব। কখনও বিদেশে যাননি, কিন্তু একজন ব্রিটিশের জীবন যাপন করেন। আজ সকালে ফোন করে ঘুম থেকে তুলেছিলেন ভানুদা। সুভাষিণী চা-বাগান থেকে জলপাইগুড়ির দূরত্ব আড়াই ঘণ্টার পথ। ঘুমজড়ানো চোখে রিসিভার তুলতেই ভানুদার গলা শুনতে পেয়েছিল, "গুড মর্নিং, অর্জুনভাই। ঘুম ভাঙালাম মনে হচ্ছে।"

"না, না। কেমন আছেন ভানুদা?" অর্জুন চেঁচিয়েছিল।

"তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত? হাতে কোনও কেস আছে?"

"না। একদম বেকার। কেন?"

"তা হলে চটপট সুভাষিণীতে চলে এসো। ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, তোমার খুব ভাল লাগবে। লাঞ্চের মধ্যেই আসতে পারবে?"

"চেষ্টা করছি।"

কিন্তু কিছু কাজ সেরে সুভাষিণীতে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে গেল। এতটা পথ সে তার লাল বাইক চালিয়ে এসেছে। ভানুদা তখন অফিসে বসে কাজ করছেন। তিনি যতক্ষণে কাজ সেরে এলেন ততক্ষণে সুভাষিণী চা-বাগানটা একপাক ঘুরে দেখে নিয়েছে অর্জুন। চা-বাগানের মধ্যে একটা ফাঁদ পেতে রাখা হয় যাতে হিংস্র জানোয়াররা সেখানে ধরা পড়ে। অর্জুন দেখে এল ফাঁদটা রয়েছে কিন্তু কেউ সেখানে পা রাখেনি।

চায়ের সঙ্গে উপাদেয় জলখাবার খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। ভানুদা বললেন, "তুমি তো জানো, আমি এডমন্ড হিলারির টিমে জায়গা পেয়েছিলাম যখন তিনি হিমালয়ে ইয়েতি খুঁজতে গিয়েছিলেন।"

"জানি। ওই অভিযানের স্লাইডগুলোর কথা এখনও মনে আছে।"

"এডমন্ড হিলারিসাহেব মারা গিয়েছেন। কিন্তু নিউজিল্যান্ড থেকে একটা টিম এখন কলকাতায় এসেছে। হিলারিসাহেবের টিমের একজন ইয়ং মেম্বার জন বেইলি এই দলের নেতা। জনের বয়স আমার মতনই। কাল রাত্রে কলকাতা থেকে জন আমাকে টেলিফোন করেছিল। ও আমার সাহায্য চাইছিল। কিন্তু ভাই, আমার বয়স হয়েছে। তা ছাড়া চা-বাগানের এত সমস্যা যে, ম্যানেজার হয়ে এসব ছেড়ে আমি কোনও অভিযানে যেতে পারি না। আমার কোম্পানি খুশি হবে না, আমারও খারাপ লাগবে। তোমাকে ফোন করার পর আমি জনকে তোমার কথা ফোনে বললাম। আমি বলছি বলে ওর কোনও আপত্তি নেই তোমাকে দলে নিতে।" ভানুদা বললেন।

"এটা কীসের অভিযান হচ্ছে?"

"হিলারিসাহেব প্রমাণ করেছিলেন ইয়েতি বলে কিছু নেই। একধরনের তুষার-ভালুক মাঝে-মাঝে মানুষের মতো দু'পায়ে হাঁটাচলা করে। পাহাড়ের লোকজন তাদেরই ইয়েতি বলে থাকে। আমরা একটা গুম্ফায় ইয়েতির মাথা আছে শুনে দেখতে যাই। সেই মাথাটা আর ইয়েতির গায়ের চামড়া বলে ওরা যা দেখিয়েছিল তা লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওগুলো ভালুকের মাথা এবং চামড়া। কিন্তু এই ভালুকগুলোর চরিত্র অদ্ভুত। মানুষ যা করে তাই ওরা অনুকরণ করার চেষ্টা করে। মানুষের মতো হাঁটতে, ওপরের দুটো পা-কে মাঝে-মাঝে হাতের মতো ব্যবহার করতে ওরা খুব ওস্তাদ। জন এই ভালুকগুলোর ওপর ডকুফিল্ম তৈরি করতে এসেছে।" ভানুদা ঠাট্টা করে বলেছিলেন, "কে বলতে পারে, তুষার-ভালুক খুঁজতে গিয়ে তোমরা হয়তো তুষারমানবকে খুঁজে বের করতে পারো।"

অর্জুনের মনে হয়েছিল ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু একটা কথা ভেবে

সে হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "কিন্তু ভানুদা, আমি তো কোনওদিন পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নিইনি। ছবিতে যা দেখেছি সেটা খুব কঠিন কাজ। দীর্ঘদিন ট্রেনিং না নিলে একদমই সম্ভব নয়। জনসাহেব আমাকে নেবেন কেন ?"

ভানুদা বলেছিলেন, "ঠিকই। যদি অভিযানটা আমাদের মতো পায়ে হেঁটে পাহাড় ভেঙে করা হত তা হলে আমি তোমার কথা জনকে বলতাম না। ওরা ঠিক করেছে কাঠমণ্ডু থেকে হেলিকপটারে চড়ে চোদ্দো হাজার থেকে ষোলো হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে গিয়ে বেসক্যাম্প করবে। সময় বাঁচানোর জন্যেই এটা করবে ওরা। তোমাকে কাঠমণ্ডু যেতে হবে কালকেই।"

"কলকাতা হয়ে গেলে কাল কী করে কাঠমণ্ডুতে পৌঁছব ?"

"তুমি কলকাতায় যাচ্ছ না। আগামীকাল সকাল এগারোটায় ভদ্রপুর থেকে প্লেনে উঠবে। শিলিগুড়ি থেকে জিপে ভদ্রপুর পৌঁছতে ঘণ্টাদুয়েক লাগবে। ভদ্রপুরে পৌঁছে মানিকলাল আগরওয়ালার ডিপার্টমেন্টাল শপে গিয়ে আমার নাম বলবে। আমি ফোন করে দিচ্ছি, টিকিট কাটা থাকবে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু অত উঁচুতে যে ঠাণ্ডা হবে তার মোকাবিলা করার মতো পোশাক তো আমার নেই। যা আছে তাতে দার্জিলিং-এর শীতকে ম্যানেজ করা যায়। ওখানে কী করব ?"

"এ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। জন সব ব্যবস্থা করবে।"

জিপ অন্ধকার চিরে এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যতটা জোরে যাওয়ার কথা ততটা গতি উঠছিল না। রাস্তা এবড়ো-খেবড়ো। বড়-বড় গর্ত বাঁচিয়ে যেতে হচ্ছিল ড্রাইভারকে। এখন ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অথচ মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে না তেমন। আর একটু পরেই জলদাপাড়ার জঙ্গল। অর্জুন ভাবছিল কোথা থেকে কী হয়ে গেল। আগামীকাল সে প্লেনে চেপে কাঠমণ্ডু যাবে তা আজ বিকেলেও ভাবেনি। কিন্তু কাঠমণ্ডুতে গিয়ে জনসাহেবকে কোথায় খুঁজে পাবে সেটা তো ভানুদাকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। কাঠমণ্ডুতে সে আগে কখনও যায়নি। তারপরেই সে নিজেকে বোঝাল, একটা অভিযান যখন হবে তখন নিশ্চয়ই নেপাল গভর্নমেন্ট সেটা জানবে ? খোঁজ পেতে অসুবিধে হবে না।

এখন সত্যি বেকার বসে ছিল সে। সত্যসন্ধানকে জীবিকা হিসেবে নেওয়ার পর তার খাওয়া-পরার অভাব হয়নি। যদিও কলকাতা-দিল্লির অনেক গোয়েন্দা-সংস্থা তাকে ভাল টাকা মাইনে দিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। সে যায়নি। মূলত মা এবং জলপাইগুড়ির ওপর টান এর কারণ। এই যে সে কাঠমণ্ডু যাচ্ছে, এর জন্যে কোনও অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। কোনও কেস নিয়ে সে যাচ্ছে না। কিন্তু জীবনে অর্থ রোজগার করাই তো সব নয় ! এমন সুযোগ তো সহজে পাওয়া যাবে না।

জলদাপাড়ার জঙ্গলে না ঢুকে ডানদিকের রাস্তা ধরে মাদারিহাটের মধ্যে জিপ

ঢুকে পড়ল। এবং তখনই বৃষ্টি নামল। এত বড়-বড় ফোঁটা বৃষ্টি অনেকদিন দ্যাখেনি অর্জুন। রাস্তা ফাঁকা। দু'পাশের বাড়িঘর, দোকানপাট সন্ধে পার না হতেই ঘুমন্ত। কোনওমতে জিপ যখন হাইওয়েতে গিয়ে উঠল, তখন ড্রাইভার বলল, "সাব, কুছ দেখাই না যাতা হ্যায়।"

হেডলাইট ফগলাইট জ্বালিয়েও কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই অবস্থায় গাড়ি চালালে দুর্ঘটনা ঘটবেই। অর্জুন বলল, "রাস্তা ছেড়ে একপাশে সাইড করে রাখো।"

বৃষ্টি পড়ছে, সঙ্গে শিল। জিপের টিনের ছাদে যেন দুরমুশ চলছে।

ডুয়ার্সে বৃষ্টি একবার শুরু হলে সহজে থামতে চায় না। অথচ কাল ভোরে বেরোতে গেলে আজ রাত্রেই তাকে জলপাইগুড়িতে পৌঁছতে হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, জামাপ্যান্ট, শীতবস্ত্র নেওয়া ছাড়া মাকে রাজি করাতে হবে। সে অবশ্য টেলিফোনে মাকে বলেছে ওগুলো একটা সুটকেসে গুছিয়ে রাখতে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে তা বলেনি। পাহাড়ে ওঠার কায়দা না জানা ছেলেকে মা সহজে যেতে দেবেন বলে মনে হয় না।

ঘণ্টাদুয়েক কেটে গেল কিন্তু বৃষ্টি একই তেজে পড়ে চলেছে। শিলা-বৃষ্টি আর হচ্ছে না, এই রক্ষে। প্লাবন না হলে এইসব রাস্তায় জল জমে না। হাওয়া শুরু হতে অর্জুন স্বস্তি পেল। ওই ঝোড়ো হাওয়া নিশ্চয়ই মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে। সঙ্গে শব্দ হল প্রচণ্ড জোরে। ড্রাইভার হেডলাইট জ্বালাতেই দেখা গেল একটু দূরে একটা বড় গাছ রাস্তার ওপর পড়ে আছে। তার ডালপালায় রাস্তা ঢাকা। ওই গাছের নীচে যদি এই জিপটাকে পার্ক করা হত তা হলে...। কল্পনা করতেই শিউরে উঠল অর্জুন। ড্রাইভার বলল, "সাব, এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়ি ব্যাক করে গয়েরকাটা দিয়ে চলে যাই।"

লোকটা হিন্দিতে কথা বলছিল। যদিও ওটা ঘুরপথ হবে তবু তা ছাড়া তো কোনও উপায় নেই। বৃষ্টির জোর কমে এসেছিল। ড্রাইভার জিপ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় রাস্তা ধরল।

বৃষ্টি পড়েই চলেছে, তবে তার জোর কমে এসেছে। চারধার নিঝুম। অন্ধকার। কিন্তু অর্জুন জানে দু'পাশে চা-বাগান ছাড়া কোনও মানুষজন নেই। ঘুরপথে যেতে হচ্ছে বলে সময় বেশি লাগবেই। তার ওপর জিপের গতি বাড়ানো যাচ্ছে না, এত গর্ত। মিনিট চল্লিশ যাওয়ার পর হঠাৎ নজরে পড়ল, হেডলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল মোটর সাইকেলটাকে। রাস্তার পাশে গাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মুচড়ে পড়ে আছে। আর তার ঠিক তিন হাত দূরে একটি মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে, মোটরবাইকটা জব্বর অ্যাকসিডেন্ট করেছে। বৃষ্টির জল লোকটির শরীর ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল ড্রাইভার স্পিড বাড়িয়ে দিল। শরীরটাকে কাটিয়ে গর্ত উপেক্ষা করে এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন ভূতে তাড়া করেছে। অর্জুন

চিৎকার করল, "আরে ! গাড়ি থামাও। লোকটা তো বেঁচে থাকতে পারে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত। গাড়ি থামাও।"

অনেকটা দূরে চলে এসে ড্রাইভার বলল, "নেহি সাব। ওরা ডাকাত হতে পারে। আমাদের ম্যানেজারসাহেব হুকুম দিয়েছেন, রাত্রে কেউ হাত দেখালে অথবা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বলে পড়ে থাকলে কখনও যেন গাড়ি না থামাই।"

"কিন্তু এমন ঝড়বৃষ্টির রাত্রে অ্যাকসিডেন্ট হওয়াই তো সম্ভব।" অর্জুন রেগে গেল।

ড্রাইভার জিপ থামাল না। মাথা নেড়ে বলল, "সাব, লোকটা যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে তা হলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না। চোট পেলে নিশ্চয়ই রক্ত বের হত। আমি কোনও রক্তের চিহ্ন দেখতে পাইনি। আর যদি অ্যাক্টিং হয় তা হলে আমরা এতক্ষণে শেষ হয়ে যেতাম। এসব রাস্তায় এইরকম ডাকাতি প্রায়ই হয়।"

অর্জুন কিছু বলল না আর। ভানুদা তাকে তার লাল বাইকটা ওঁর ওখানে রেখে জিপে করে পাঠিয়েছেন। অর্জুন চেয়েছিল নিজের বাইকে জলপাইগুড়িতে ফিরে যেতে। ভাগ্যিস যায়নি, নইলে এই ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার রাস্তায় তার অবস্থা যে ওরকম হত না তা কে বলতে পারে ? কিন্তু লোকটার যদি সত্যি দুর্ঘটনা ঘটে থাকে, যদি এখনও ওর শরীরে প্রাণ থেকে থাকে, তা হলে প্রচণ্ড স্বার্থপরের মতো সে চলে এসেছে পাশ কাটিয়ে। বিবেকের দংশন ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠল অর্জুনের কাছে। কিন্তু কিছু করার নেই।

ভারতবর্ষ থেকে নেপালে যেতে পাশপোর্ট এবং ভিসার প্রয়োজন হয় না। সীমান্ত আছে, সন্দেহজনক ব্যাপার ঘটলে দু'দেশের পুলিশ এবং কাস্টমস সক্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্জুনের ক্ষেত্রে কিছুই ঘটল না। শিলিগুড়ি থেকে জিপ তাকে ঠিক ন'টায় পৌঁছে দিল ভদ্রপুরে। ভদ্রপুর একটি সাধারণ শহর। মানিকলাল আগরওয়ালার দোকান খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। বেশ বড় দোকান। প্রচুর বিদেশি জিনিস সাজানো। অর্জুন শুনেছিল নেপালে বিদেশি জিনিস প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়, এখন চোখে দেখল ক্যামে সাবান, জার্মান নিভিয়া, ফরাসি পারফিউম, কী নেই ! কিন্তু এখানে এসব জিনিস কেনে কারা ?

মানিকলাল আগরওয়ালা দোকানেই ছিলেন। মধ্যবয়সী স্মার্ট মানুষ। পরনে সাফারি সুট। ভানুদার নাম বলার আগেই বললেন, "গুডমর্নিং অর্জুনবাবু। মিস্টার ভানু ব্যানার্জির ফোন পেয়ে আপনার জন্যে টিকিট বুক করে রেখেছি। আজ কোনও সিট ছিল না। একজনকে ক্যানসেল করাতে হল।"

"সে কী !"

"আরে, এ-নিয়ে ভাববেন না। এখানে এরকম হয়। আসুন, ভেতরে

আসুন। আপনার নিশ্চয়ই সকালে নাস্তা করা হয়নি।" মানিকলাল সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন।

অস্বস্তি হচ্ছিল কিন্তু খিদেও পেয়েছিল। ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে সংকোচ কমে গেল। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে মানিকলাল ওকে একটা খাম দিলেন, "আপনার টিকিট। ফেরারটা ওপেন আছে। এখানে এসে আমি থাকি বা না থাকি, দোকানে বললেই আপনাকে শিলিগুড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আচ্ছা, আপনি কাঠমণ্ডুতে ক'দিন থাকবেন ?"

"আমি জানি না। ওখানে যাওয়ার পর জানতে পারব।"

"আপনি ডোমেস্টিক ফ্লাইটে যাচ্ছেন। কোনও অসুবিধে হবে না। একটা ছোট প্যাকেট দিলে নিয়ে যেতে পারবেন ?"

"কাউকে দিতে হবে ?"

"হ্যাঁ। আসলে যাকে প্যাকেটটা পৌঁছে দিতে পাঠাচ্ছিলাম তার টিকিট ক্যানসেল করতে হল তো ! কোন হোটেলে উঠছেন ?"

"সেটাও ওখানে গেলে জানতে পারব।"

"জানা থাকলে আমার লোকই আপনার হোটেল থেকে নিয়ে যেতে পারত। ঠিকানা লিখে দিলে পৌঁছে দেওয়ার সময় হবে আপনার ? দেখুন।"

লোকটা এত উপকার করছে দেখে না বলতে পারল না অর্জুন। ভানুদার জিপ ছেড়ে দেওয়া হল। মানিকলাল তাঁর গাড়িতে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিলেন। বেরোবার আগে একটা চৌকো সাদা পিসবোর্ডের বাক্স এগিয়ে দিয়েছিলেন, "না, আপনাকে কষ্ট করে পৌঁছে দিতে হবে না। এয়ারপোর্টে আমার লোক এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে। আমি ফোন করে দিচ্ছি।"

"কিন্তু তিনি আমাকে চিনবেন কী করে ?"

"এই ফ্লাইটে আপনিই একমাত্র বাঙালি প্যাসেঞ্জার। তবু আপনার নাম-লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে ও বাইরে বেরোনোর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।"

"লোকটার নাম কী ?"

"এস. কে. গুপ্তা।"

সাদা প্যাকেটটা সুটকেসে ঢুকিয়ে নিয়েছিল অর্জুন।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে প্লেন দেখে সে অবাক ! কয়েকবার বিদেশ ভ্রমণের কারণে প্লেন সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হয়েছিল, তার সঙ্গে কোনও মিলই নেই। এমনকী, বাগডোগরা থেকে দমদমে যেসব প্লেন উড়ে যায় তার আভিজাত্য অনেক বেশি। ছোট্ট প্লেন। সাকুল্যে জনাআটেক প্যাসেঞ্জার বসতে পারে। প্রায় খেলনা-খেলনা মনে হয়। একজন বিমানসেবিকা আছেন। তাঁর স্থান পেছন দিকে। প্লেনটা যখন আকাশে উড়ল তখন বুক কাঁপছিল অর্জুনের।

কিন্তু ঠিকমতো পৌঁছে গেল ওরা। কাঠমণ্ডু শহরটা ভ্যালির মধ্যে বলে

পাহাড়ি শহর থেকে একটু আলাদা। অথচ পাহাড় চারপাশে। এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার আগে মানিকলালের কথা মনে পড়ল। কিন্তু তার নাম প্ল্যাকার্ডে লিখে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। মিনিটদশেক দাঁড়িয়ে রইল অর্জুন। কেউ তার দিকে এগিয়ে আসছে না। এস. কে. গুপ্তার তো এখানেই আসার কথা। হতাশ হয়ে বাইরে বের হতেই ট্যাক্সিওয়ালারা ঘিরে ধরল অর্জুনকে। সবাই তাকে পৌঁছে দিতে চায়। ওদের মধ্যে একজন বাংলায় কথা বলল, "সার, কোথায় যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি!"

অর্জুন বলল, "আমাকে ভাই আর-একটু অপেক্ষা করতে হবে। একজন এয়ারপোর্টে আসবে।"

"আপনার কোনও বন্ধু?"

"না।" লোকটার কৌতূহল অর্জুনের পছন্দ হল না! কিন্তু ভিড়টা সরে গেল। তাকে ছেড়ে ট্যাক্সিওয়ালারা অন্য যাত্রী নিয়ে পড়েছে। এখানে কি ট্যাক্সিওয়ালারা বেশি প্যাসেঞ্জার পায় না? অর্জুন দেখল বাঙালি ড্রাইভারটি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করে যাচ্ছে। অর্জুন ঠিক করল আর অপেক্ষা করবে না। ফেরার সময় ভদ্রপুরে পৌঁছে মানিকলালকে তার প্যাকেট ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু এখন জন বেইলিকে খুঁজে বের করা তার প্রথম কাজ। নিউজিল্যান্ডের লোকজন নিয়ে এসেছেন অভিযান করতে, খবরটা এখানকার পর্বত-অভিযান বিষয়ক দফতর নিশ্চয়ই জানবে। অর্জুন লোকটিকে ডাকল। বাঙালি হওয়ায় ওর কাছে সমস্যাটা বলা সহজ হবে।

লোকটি হাসল, "যাবেন সার? দাঁড়ান। গাড়ি নিয়ে আসছি।"

পার্কিং লট থেকে গাড়ি চালিয়ে এনে দরজা খুলে দিল ড্রাইভার, "কোথায় যাব বলুন?"

"এখানকার মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট কোথায়?"

"কেন সার?"

"নিউজিল্যান্ড থেকে কয়েকজন অভিযাত্রীর আসার কথা। তাঁরা কোথায় উঠেছেন সেটা আগে জানতে হবে।"

"ও, তাই বলুন।" লোকটা একগাল হাসল, "এই গোপালকে জিজ্ঞেস করলেই সেটা জেনে যাবেন সার, কোথাও যেতে হবে না। কাল সন্ধের প্লেনে ওরা এসেছে সার। উঠেছে ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে। আমি তখন এয়ারপোর্টে ছিলাম সার। ওই সাহেবদের সঙ্গে যদি দরকার থাকে তা হলে আপনাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি সার।"

"বাঃ। আপনি দেখছি বেশ চৌকস লোক। ওখানেই চলুন।"

"তা সার, কাঠমণ্ডুর কোথায় কী হচ্ছে তার সব খবর আপনি এই গোপালের কাছে পাবেন। এই তো, কলকাতার একটা ছেলে পালিয়ে এসেছিল এখানে। তার বাবা আমার ট্যাক্সিতে ওঠায় আমি তাঁকে খবরটা দিয়ে দিলাম। এখানে

তো আমার কম দিন হল না। ওই যে গাড়িটা দেখছেন, উলটে আছে, এক ঘণ্টা আগে অ্যাকসিডেন্টে ওর ড্রাইভার মারা যায়। যে জিপটা ওকে ধাক্কা দিয়েছিল তার পাত্তা পুলিশ কখনও পাবে কিনা জানি না। কিন্তু আমি জানি ওটা একটা ভাড়া-করা জিপ।"

"এত কথা জানলেন কী করে ?"

"আরে আমি তো তখন প্যাসেঞ্জার নিয়ে এয়ারপোর্টে আসছি। পুলিশ ভাববে অ্যাকসিডেন্টে গুপ্তাসাহেব মারা গেছেন। কিন্তু অন্তত দিব্যি করে বলতে পারি সার, জিপটা গুপ্তাসাহেবের গাড়িটাকে পাশ থেকে এমনভাবে ধাক্কা মেরেছে যে, উনি কন্ট্রোল রাখতে পারেননি।"

অর্জুন সোজা হয়ে বসল, "এই গুপ্তাসাহেবের নাম কী ?"

"সেটা এখনই বলতে পারব না সার। খোঁজ নিলেই, তা কেন, কালকের পেপারে পেয়ে যাবেন।" ড্রাইভার মাথা নাড়ল।

"লোকটার টাইটেল যে গুপ্তা তা আপনি জানলেন কী করে ?"

"আরে বাপ। অতবড় ব্যবসায়ী। নেপাল, বুঝলেন, দু'নম্বরি ব্যবসায়ীর কাছে স্বর্গের মতো। কিন্তু এই গোপালের ট্যাক্সিতে দু'নম্বরি জিনিস সাপ্লাই করতে পারে না কেউ। গুপ্তাসাহেবের লোককেও আমি ফিরিয়ে দিয়েছি।"

এ হতে পারে না। অর্জুন আবার সিটে হেলান দিল। এস. কে. গুপ্তা একঘণ্টা আগে এয়ারপোর্টে আসতে যাবেন কেন ? আর এই গোপালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে অন্য লোক তাঁকে দুর্ঘটনায় জড়িয়ে মেরে ফেলবে কেন ? তার তো জানার কথা নয় উনি এখনই এয়ারপোর্টে আসছেন। কারণ সে ভদ্রপুর থেকে রওনা হওয়ার পর গুপ্তাসাহেব ফোনে জানতে পেরেছেন তাকে এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এ নিশ্চয়ই অন্য লোক।

ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসের সামনে গাড়ি থামিয়ে গোপাল জিজ্ঞেস করল, "ক'দিন থাকবেন সার ? দরকার হলেই বলবেন !"

"আমি তো বললাম এখনও কিছুই জানি না। কত দিতে হবে ?"

"দুশো দিয়ে দিন সার।"

"দুশো ? রাস্তা তো বেশি নয়।"

"অন্য কেউ হলে আরও বেশি চাইত। তা ছাড়া আপনার ঘোরাঘুরির ঝামেলা বাঁচিয়ে দিয়ে ঠিক জায়গায় যে পৌঁছে দিল সেই গোপালকে একটু দেখবেন না সার।" হাসল গোপাল।

রিসেপশনে পৌঁছে অর্জুন জন বেইলির খোঁজ করল।

"আপনি কি ইন্ডিয়া থেকে আসছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"অর্জুন ?"

"হ্যাঁ।"

“এনি আইডেন্টিটি কার্ড, প্লিজ ?”

অর্জুন পাশপোর্ট সঙ্গে নিয়ে এসেছিল কিছু না ভেবেই। সেটা বের করে দেখাল। রিসেপশনিস্ট সেটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “রুম নাম্বার টু হান্ড্রেড সেভেন। মিস্টার বেইলি কাজে বেরিয়েছেন।”

“আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?”

“মিস্টার বেইলি আপনার নামে ঘর বুক করেছেন।”

ঘরটি সুন্দর। জুতো পরেই খাটে শুয়ে ছিল অর্জুন। নিউজিল্যান্ডের মানুষরা ইংরেজি বলেন। কিন্তু অমল সোম বলেছিলেন ওদের উচ্চারণ বুঝতে বেশ অসুবিধে হয়। জনসাহেবের সঙ্গে তেমন সমস্যা হলে মুশকিলে পড়বে সে। এখন ভরদুপুর। ভাগ্যিস মানিকলাল তাকে প্রচুর খাইয়েছিল, নইলে...। অর্জুন তার সুটকেসের দিকে তাকাল। এবং তখনই এস. কে. গুপ্তার কথা মনে এল। তার কাছে মানিকলালের টেলিফোন নম্বর নেই যে, ভদ্রপুরে জানিয়ে দেবে যে কেউ আসেনি বাক্সটা নিতে। কিন্তু গোপাল যা বলল...।

অর্জুন ঘরের এক কোণে রাখা টিভিটা চালিয়ে দিল। রাজা এবং মন্ত্রীর খবরাখবর দেওয়া হচ্ছে স্থানীয় কেন্দ্র থেকে। পোখরাতে আরও টুরিস্ট যাতে যান তার জন্যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বিরাটনগরের একটা কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটেছে। তারপরেই পরদায় ভেসে উঠল সেই দুর্ঘটনায় পড়া গাড়িটির ছবি, যা অর্জুন এখানে আসার পথে দেখে এসেছে। সংবাদপাঠক বললেন, “আজ সকাল সাড়ে এগারোটার সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এস. কে. গুপ্তা নিহত হয়েছেন। জানা গেছে, তিনি এয়ারপোর্টে যাচ্ছিলেন।” তারপরেই অন্য খবর এসে গেল। অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। ভদ্রপুর থেকে তার প্লেন ছাড়ার আগেই মানিকলাল ফোনে এস. কে. গুপ্তাকে এয়ারপোর্ট যেতে বলেন। সময় যখন সাড়ে এগারোটা তখন বোঝা যাচ্ছে গুপ্তা একটুও সময় নষ্ট করেননি। গোপালের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে আততায়ী গুপ্তাকে পথেই মেরে ফেলতে চেয়েছে। অর্থাৎ আততায়ী গুপ্তার ওপর নজর রাখছিল। এমন হতে পারে গুপ্তার ফোনে সে আড়ি পেতেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় একটা পুরনো শত্রুতা এদের মধ্যে ছিল। কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে আততায়ী গুপ্তাকে খুন করে এয়ারপোর্টে গিয়ে তাকে বলতে পারত যে সে-ই এস. কে. গুপ্তা। অর্জুনের পক্ষে সন্দেহ করা সম্ভব ছিল না। বাক্সটা তখনই সে দিয়ে দিত। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে বাক্সটার প্রতি আততায়ীর কোনও মোহ নেই। তা হলে খুন করল কেন ?

অর্জুন হেসে ফেলল। তার স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সে এখানে এসেছে সম্পূর্ণ অন্য কারণে। কে কাকে খুন করল তা নিয়ে সে ভাবছে কেন ? সে সুটকেস খুলে সাদা পিসবোর্ডের বাক্স বের করল। গোপাল যা বলল তাতে

বোঝা যাচ্ছে এস. কে. গুপ্তা বড় ব্যবসায়ী। তিনি কত বড় ব্যবসা করেন তা নিয়ে প্রশ্ন করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু মারা গেলে যার কথা টিভিতে বলা হয় তিনি একেবারে সাধারণ মানুষ নন। তা এইরকম লোক মানিকলালের ফোন পেয়ে নিজে কেন এয়ারপোর্টে এই বাক্সটা আনতে যাচ্ছিলেন। যে-কোনও লোককে পাঠালেই তো পারতেন।

অর্জুনের মনে হল কথাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কী এমন বিশেষ জিনিস মানিকলাল পাঠিয়েছেন যে, কর্মচারীদের ওপর বিশ্বাস করতে পারেননি এস. কে. গুপ্তা? এই সময় টেলিফোন বাজল। অর্জুন রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশে কেউ গ্যাঁক গ্যাঁক করে কিছু বলে উঠল।

অর্জুন বুঝতে না পেরে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "কে বলছেন?"

"আঃ। দিস ইজ জন। জন বেইলি। তুমি নীচের রেস্টুরেন্টে চলে এসো। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।"

সব কথা পরিষ্কার নয়। একটা আনুনাসিক ধ্বনি জড়িয়ে আছে প্রতিটি শব্দের সঙ্গে। কিন্তু অর্জুন অপেক্ষা করল না।

নীচের রেস্টুরেন্টে যেতেই ওদের দেখতে পেল সে। পাঁচজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা টেবিলে বসে আছেন। ও কাছে গিয়ে বলল, "আমি অর্জুন।"

সঙ্গে-সঙ্গে লম্বা, একমাথা টাক, রোগা এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে ওর হাত জড়িয়ে ধরলেন, "আমি জন। কখন এসেছ তুমি?"

"এই তো একটু আগে।"

"আমার বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।" একে-একে সবার নাম এবং কে কী কারণে এসেছেন জানিয়ে দিলেন জন বেইলি। অর্জুন শুনল দু'জন মহিলার একজন ক্যামেরা চালাবেন। অন্যজন ডাক্তার।

ওঁদের সঙ্গে বসার পর লাঞ্চ এল। কন্টিনেন্টাল খাবার। অর্জুন লক্ষ করল কেউ জল খেলেন না। খাওয়ার পর কোল্ড ড্রিঙ্কের টিন খুললেন। জন এবার বললেন, "ভানু আমার বন্ধু। সার হিলারির টিমে আমরা ছিলাম। ওকে রেফার করেছিল ডেসমন্ড ডয়েগ। ডাক্তার অসুস্থ হওয়ার পর ভানু প্রয়োজন হলে ইঞ্জেকশন দিত। খুব ভাল হাত ছিল। পরে জানা গেল সে ওই অভিযানে যাওয়ার আগে কোনওদিন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ধরেনি। সার হিলারি তাঁর বইয়ে এই ব্যাপারটা লিখেছিলেন। তুমি আমাদের এই অভিযানে কীভাবে সাহায্য করতে পারো?"

কথাগুলো বুঝতে পারল অর্জুন। সে বলল, "আপনারা একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপারের ছবি তুলতে যাচ্ছেন। আপনাদের সঙ্গী হতে আমি আগ্রহী। আমি জানি না ঠিক কীভাবে সাহায্য করতে পারব!"

"পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা তোমার নেই?"

"না।"

"তুমি ডাক্তার নও ?"

"না।"

"ওখানকার গ্রামের মানুষদের ভাষা তুমি কি জানো ?"

"নেপালি হলে জানি। তবে সম্ভবত ওরা নেপালি বলে না।"

"তা হলে তোমাকে নিয়ে আমার কী উপকার হবে ?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। আসলে মিস্টার ভানু ব্যানার্জি...।"

"ইয়েস। সেখানেই তুমি আসছ। আচ্ছা, বন্ধুরা, তোমরা এখন বিশ্রাম নিতে পারো। আমি আর অর্জুন একটু ঘুরে আসছি।" জন উঠে দাঁড়ালেন।

বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। জন এবং অর্জুন সেটায় উঠলে ড্রাইভারকে সরকারি হাসপাতালে যেতে বলা হল। কাঠমণ্ডু খুব সুন্দর সাজানো শহর নয়। অন্তত দার্জিলিং-এর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। রাস্তায় এত ভারতীয় মুখ যে, বিদেশ বলে ভাবতে অসুবিধে হয়। জন বললেন, "এবার নিয়ে চারবার আমি এখানে এলাম। শহরটা তেমন বদলায়নি।"

হাসপাতালে যে আগেই খবর দেওয়া ছিল তা বুঝতে পারল অর্জুন। ততক্ষণে সে ভেবে নিয়েছে আগামীকালই তাকে ফেরত যেতে হবে। খামোখা পয়সা এবং সময় নষ্ট করে এখানে এল। বিশ্রী লাগছিল তার।

হাসপাতালের সিঁড়িতে স্মার্ট চেহারার এক তরুণ ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওদের দেখে এগিয়ে এসে হাত বাড়ালেন, "মিস্টার জন বেইলি..."

"ইয়েস। কেমন আছ ডাক্তার ?"

"আমি ঠিক আছি।"

"মিট মাই ইয়ং ফ্রেন্ড, অর্জুন।"

ডাক্তার করমর্দন করলেন অর্জুনের সঙ্গে। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিজের চেম্বারে নিয়ে গেলেন। জন বললেন, "অর্জুন, এই হ্যান্ডসাম ডাক্তারকে আমি জন্মাতে দেখেছি। ইয়েস ! পাহাড় থেকে আমরা নামছিলাম। একটু পেছনে ছিলেন ওঁর বাবা আর মা। হঠাৎ ওঁর মায়ের শরীর খারাপ হল। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে চারপাশে ঘিরে দেওয়া হল। একটু বাদেই আমরা কান্না শুনতে পেলাম। ওঁর বাবা জানালেন, ছেলে হয়েছে। তারপর কী করা হল জানো ? ওই সদ্যোজাত সন্তানকে ওঁরা নিয়ে গেলেন পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদীর কাছে। অত ওপরে বরফগলা সেই জল তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আচমকা সেই জলে ওঁকে চুবিয়ে পরিষ্কার করে গরম কম্বলে মুড়ে দেওয়া হল। আমরা বাধা দিতে গিয়েছিলাম। হিলারিসাহেব চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। মনে হয়েছিল সদ্যোজাত শিশুটিকে ওঁরা খুন করছেন। কিন্তু যে পাহাড়ি গ্রামে ওঁরা থাকেন তার আচার-অনুষ্ঠান হয়তো ওইরকমই। নইলে যে মহিলার সন্তান যে-কোনওদিন হবে তিনি স্বামীর সঙ্গে দশ হাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে নেমে কাঠমণ্ডুতে আসতে চাইবেন কেন ? এই আসাটা যে কীরকম কষ্টকর তা পাহাড়ে

ওঠানামায় অভ্যেস যাঁদের আছে তাঁরাই জানেন। কিন্তু কাঠমণ্ডুতে পৌঁছবার আগেই শিশুটির মা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায় দু'মাস তাঁকে শুয়ে থাকতে হয়েছিল কাঠমণ্ডুর হাসপাতালে। শিশুটির কিছু হয়নি। অবাক হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা। সেই শিশুটিই ইনি, আজকের তরুণ ডাক্তার।"

ডাক্তার হাসলেন, "আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।"

"ওঃ, নো, আমরা কিছুই করিনি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তোমার দায়িত্ব নিয়েছিল।"

জনের কথায় অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন ?"

জন বললেন, "সেবার সার হিলারি আমাদের নিয়ে ইয়েতির সন্ধানে আপার হিমালয় প্রায় চষে ফেলছিলেন। ক্রমশ আমরা যখন হতাশ হয়ে পড়ছি তখন খবর এল এক পাহাড়ি গ্রামে ইয়েতির মাথা আর চামড়া সযত্নে রাখা আছে। আমরা সেখানে গেলাম। মন্দিরে ওগুলো রাখা হয়েছে খুব যত্ন করে। ইয়েতির মাথা বলে যেটা ওরা দেখাল তা দেখে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল। অথচ অস্বীকারও করতে পারছিলাম না। মাথাটা শুকিয়ে কিছুটা ছোট হয়ে গেলেও তার সুঁচলো মুখ মানুষের মতো নয়। তবে গায়ের চামড়া ইয়েতির হতে পারে। ওই বরফের ওপর থাকতে হলে যতটা লোম থাকা উচিত তা ঠিক আছে। কেউ ইয়েতি দেখেছে কিনা জানতে চাইলে সবাই বলতে লাগল, সে দ্যাখেনি, কিন্তু যে দেখেছে তার কাছ থেকে শুনেছে। আর ওই বস্তুগুলো সংগ্রহ করেছে ওদের পূর্বপুরুষেরা। সার হিলারি ওগুলোকে পরীক্ষা করাতে লন্ডনে নিয়ে যেতে চাইলেন। গ্রামপ্রধানরা আপত্তি জানালেন। ওগুলো দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত, স্থানচ্যুত করলে গ্রামের মানুষরা বিপদে পড়বে। হয়তো ইয়েতিরা আক্রমণ করবে। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম। ভাষা খুব সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। ওই গ্রামের মানুষরা কাঠমণ্ডুর নাম শুনেছে কিন্তু সেই শহরটাকে দ্যাখেনি। কলকাতা-লন্ডন সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। শেষপর্যন্ত ওরা নিয়ে এল একজন মানুষকে, যিনি চার হাজার ফুট নীচের এক মিশনারির স্কুলে একবছর পড়েছিলেন। ভদ্রলোক ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলতে পারেন। ইয়েস, নো, ভেরি গুড, ব্যাড। তাঁকে ধরে শেষপর্যন্ত গ্রামপ্রধানদের রাজি করালাম। শর্ত হল দু'বছরের মধ্যে ওই দুটি বস্তু ফিরিয়ে দিতে হবে। আর সেই ভদ্রলোক আর-একজন গ্রামপ্রধান ওই পবিত্র বস্তু দুটো বয়ে নিয়ে যাবেন।

"লন্ডনে পৌঁছে ওঁরা অবাক হয়ে গেলেন। পৃথিবীতে কত জায়গা জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তবু সেখানে না গিয়ে এত লোক এক জায়গায় ঠাসাঠাসি হয়ে বাস করছে কী করে ? ওঁদের ধাতস্থ করতে সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করছেন ওগুলো। সেই অল্প ইংরেজি জানা ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, তিনি যে দেশে এসেছেন তার

প্রধানের জন্যে উপহার নিয়ে এসেছেন। সেটা নিজের হাতে তুলে দিতে চান। কুইন তখন বাকিংহাম প্যালেসে নেই। দেশের বাইরে শুভেচ্ছা-সফরে গিয়েছেন। কোনও দেশের প্রধান মহিলা এ-কথা বোঝাতে গলদঘর্ম হতে হল। তবু বিশেষ ব্যবস্থা করে তাঁকে বাকিংহাম প্যালেসে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে সব দেখে মুগ্ধ হয়ে উপহার রেখে ফিরে এলেন তিনি। পরীক্ষার ফল পাওয়া গেল। ওগুলো ভালুকজাতীয় কোনও প্রাণীর মাথা এবং চামড়া। তবে প্রায় দু'শো বছরের পুরনো। অতএব জিনিসগুলো সমেত ওঁদের যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তার কিছুকাল বাদে কুইন ভারত এবং নেপাল ভ্রমণে এলেন। সেবার কুইন বিদেশ ভ্রমণ সেরে ফিরে গিয়ে উপহার এবং ঘটনাটা জানতে পেরেছিলেন। তাই কাঠমণ্ডুতে যাওয়ার আগে তিনি ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করার অভিলাষ জানালেন। খবরটা অত ওপরের দুর্গম গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হল। সেই সময় আমরা দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম ওই গ্রামে। আমাদের সঙ্গেই ওঁরা যাত্রা করলেন। যেহেতু কুইন তাঁর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কাঠমণ্ডুতে এসেছেন তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে নিলেন। সে-সময় ভদ্রমহিলার সন্তান আসন্ন। অথচ পাহাড় ভেঙে নামতে তিনি পিছপা হননি। তার পরের ঘটনাটা আগেই বলেছি। স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করে ভদ্রলোক কুইনের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। কুইন সব শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়ে ঘোষণা করলেন, 'ওই শিশুর পাঁচ বছর বয়স হলেই তার সব দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকার নেবে। তাকে পড়াশুনো করিয়ে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়ানো হবে।' অতএব ডাক্তার, আপনি যদি কৃতজ্ঞতা জানাতে চান তা হলে কুইনের কাছে জানাতে পারেন। এসব গল্প তোমাকে শোনালাম অর্জুন, কারণ এক্ষেত্রে তোমার সাহায্য দরকার। ভানু জানিয়েছে তুমি সাহায্য করতে পারবে।"

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাল।

ডাক্তার বললেন, "আমাদের গ্রামের মন্দির থেকে ওই পবিত্র বস্তু দুটো চুরি গিয়েছে। তার পরেই গ্রামের মানুষের মধ্যে নানান অশান্তি আরম্ভ হয়েছে। কেউ-কেউ প্রচার করছে সাহেবরা ওগুলোকে বিদেশে নিয়ে গিয়েছিল বলে চুরি হল। এটা বলার সময় কেউ মনে রাখছে না এর মধ্যে তিন দশকের ওপর সময় চলে গিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে মিস্টার জন বেইলি তাঁর দল নিয়ে ওখানে গেলে আতিথ্য পাবেন না। বরং উলটোটা হওয়ারই সম্ভাবনা।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে ?"

ডাক্তার হাসলেন, "পুলিশ ? মিস্টার অর্জুন, ওখান থেকে খুব কাছের পুলিশ স্টেশন অন্তত দেড়দিনের হাঁটা-পথ। গাড়ি যাওয়ার রাস্তা নেই। খবর দিলেও কোনও পুলিশ সেখানে যাবে না। কারণ গিয়ে কিছুই করতে পারবে না।"

"কাউকে কি সন্দেহ করছেন ?"

"না। তিরিশ বছর আগে কেউ কাঠমণ্ডুতে আসত না। এখন অবস্থা

বদলেছে। কিছু-কিছু ছেলে এখানে আসা-যাওয়া করে। তারা লোভের ফাঁদে পা দিতে পারে। আমার জন্ম হওয়ার আগে থেকেই সার হিলারির দৌলতে সবাই জেনে গিয়েছে ওখানে ইয়েতির মাথা এবং চামড়া আছে। বিজ্ঞানীরা যতই বলুন ওগুলো নীল রঙের ভালুকের, কেউ-কেউ এখনও সেটা বিশ্বাস করেন না।" ডাক্তার বললেন।

"কিন্তু এগুলো চুরি করে এনে বিক্রি করবে কোথায় ?"

"নেপালে যেমন পৃথিবীর সব দেশের জিনিস আসছে তেমনই বাইরেও যাচ্ছে। কিছু মনে করবেন না, ভারতীয় ব্যবসায়ীরা এই বাজারটা কন্ট্রোল করছে।" ডাক্তার বললেন, "এসব আমার অনুমান। এমন হতে পারে যে চুরি করেছে সে এখন পর্যন্ত কাঠমণ্ডুতে আনতে পারেনি জিনিসগুলো।"

জন বললেন, "লুক অর্জুন। আমরা এসেছি ওই নীল ভালুকের ছবি তুলতে। কিন্তু পাহাড়ের মানুষরা যদি বাধা দেয় তা হলে সেটা সম্ভব নয়। ভানু তোমার কথা আমাকে বলেছে। তোমার ওপর ওর খুব বিশ্বাস। তুমি যদি ওই হারানো ভালুকের মাথা আর চামড়া খুঁজে দিতে পারো তা হলে আমরা গ্রামবাসীদের সেটা ফেরত দিয়ে আসব। ওই কারণেই যে আমরা যাচ্ছি সেটা এদের বুঝিয়ে বলব। তুমি আমার দলের সদস্য হয়ে ওই কারণেই যাচ্ছ। বুঝতে পারলে ?"

"কিন্তু আমি যদি খুঁজে না পাই ?"

"তুমি নাকি এখনও ব্যর্থ হওনি ?"

"তার মানে এই নয় যে, কখনও হব না। জিনিসগুলো যদি দেশের বাইরে চলে গিয়ে থাকে তা হলে আমার কিছুই করার নেই।"

"লেট্‌স ট্রাই। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী ? অ্যান্ড ওয়েল, ওগুলো যদি খুঁজে বের করতে পারো তা হলে আমি তোমাকে পাঁচ হাজার ইউ. এস. ডলার পারিশ্রমিক হিসেবে দেব। ডান ?" হাত বাড়ালেন জন।

হাত মেলাল অর্জুন। তারপর ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, "চুরি কতদিন আগে হয়েছে ? আপনি জানলেন কী করে ?"

"ঠিক দশদিন আগে। গ্রাম থেকে লোক এসেছিল খবর দিতে।" ডাক্তার বললেন, "দশদিন আগে এক সকালে চুরি ধরা পড়ে।"

"তা হলে তো গ্রামের লোক এখানে আসার আগেই চোর পৌঁছে গেছে।"

"না। লোকটি রওনা হয়েছিল সেই দুপুরেই। পথে চার রাত ওকে বিভিন্ন গ্রামে কাটাতে হয়। ও খোঁজ নিয়ে দেখেছে গত এক সাল ওপর থেকে কেউ নামেনি। এইসব বরফ-জমা পাহাড়ি পথে রাতের বেলায় কোনও গ্রামে আশ্রয় না নিয়ে কেউ আসতে পারে না। তবে হ্যাঁ, পরে আসতে পারে। তার খোঁজ নেওয়া হয়নি।"

"যে লোকটি খবর দিতে এসেছিল সে এখানে আছে ?"

"না। গ্রামে ফিরে গেছে।"

"লোকটার নাম কী ?"

"উঘি।"

"কাঠমণ্ডুতে যারা কিউরিওর ব্যবসা করে, বিদেশি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ আছে, তাদের কাউকে চেনেন ?"

"না। তবে নাম জানি। যেমন, হরিকিষেন রুংতা, শেঠ বাবুলাল আর এস. কে. গুপ্তা। এঁদের অন্য ব্যবসার সঙ্গে কাঠমণ্ডুতে কিউরিওর দোকানও আছে।"

"এস. কে. গুপ্তা ?" নামটা উচ্চারণ করল অর্জুন।

"হ্যাঁ। এরা খুব প্রতাপশালী মানুষ। আমার জগতের নয়।"

"আজ একজন এস. সে. গুপ্তা দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছেন। ওঁর মৃতদেহ পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। তিনি যদি ইনি হন তা হলে তো আপনি খবর পেতেনই। তাই না ?"

"দাঁড়ান। আমি আজ লাঞ্চের পর ডিউটিতে এসেছি। এসেই আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। মিস্টার বেইলি নিউজিল্যান্ড থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁকে চুরির কথা ফ্যাক্স করে জানিয়ে দিই। তবু তিনি আসছেন বলে আমি একটু টেনশনে ছিলাম।" ডাক্তার টেলিফোন তুললেন। স্পষ্ট ইংরেজিতে কাউকে জিজ্ঞেস করলেন, "শুনলাম আজ অ্যাকসিডেন্টে কেউ মারা গিয়েছে। বডি আইডেন্টিফাই হয়েছে ?" উত্তরটা শুনে রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, "মাই গড ! হ্যাঁ, একই লোক। যদি এটা সাধারণ অ্যাকসিডেন্ট হয় তা হলে অন্য কথা। নইলে আরও কিছু খুনের জন্যে আমাদের তৈরি থাকতে হবে।"

গাড়িতে উঠে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা কবে রওনা হচ্ছি ?"

"কাল সকালে। আজ কারগো ফ্লাইটে মালপত্র আসার কথা। আটজন শেরপাকে বুক করেছি। একটা হেলিকপটার দু'বারে সবাইকে পৌঁছে দেবে। আমরা তোমার ব্যবস্থা যাতে গ্রামেই করা যায় সেই চেষ্টা করব। পাহাড়ে ওঠানামা করতে হবে না তোমাকে।" জন বললেন।

অর্জুন চুপচাপ রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল। এস. কে. গুপ্তা যদি অপরাধ জগতের লোক হন তা হলে মানিকলালও একই গোত্রের। এ-কথা নিশ্চয়ই ভানুদার জানা নেই। জানলে তিনি মানিকলালকে অনুরোধ করতেন না। এস. কে. গুপ্তা খুন হলেন কেন ? ওই ইয়েতির মাথা নিয়ে গোলমাল ?

গেস্ট হাউসে ফিরে জন নিজের ঘরে যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "সন্ধে সাতটার সময় সবাই আমার ওখানে আসছে। তুমিও এসো। জুতো, পোশাক দেখে নিয়ে যাবে। নিজস্ব জিনিসপত্র যতটা সম্ভব কম সঙ্গে নেবে। বাই।"

পাঁচ হাজার ডলার ! তার মানে দু'লক্ষ টাকা ! পাওয়ার কোনও চান্স নেই।

অথচ সামনে প্রলোভন রয়েছে। কী কাণ্ড !

ঘরে ঢুকে বিছানায় শুয়ে অর্জুন বাক্সটার দিকে তাকাল। কী আছে ওর মধ্যে ? গাঁজা, চরস, অথবা অন্য কোনও ড্রাগ ? সঙ্গে-সঙ্গে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার। এয়ারপোর্টে যদি কাস্টমস তাকে বাক্স খুলতে বলত এবং ওইসব নিষিদ্ধ জিনিস পেত তা হলে কত বছর কাঠমণ্ডুর জেলে কাটাতে হত তা ঈশ্বরই জানেন। ওটা যে তার বাক্স নয় এ-কথা কাউকে বিশ্বাস করাতে পারত না সে। এই কারণেই বলা হয়, 'কখনও অজানা বা অচেনা লোকের দেওয়া জিনিস প্যাকেট খুলে না দেখে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো না।'

বাক্সটা খুলে দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল অর্জুনের। তার পরেই মনে হল মানিকলাল জানে সে ভানুদার লোক। জেনেশুনে সে বিপদে পড়ে এমন জিনিস কি সঙ্গে দেবে ? এমন হতে পারে ভানুদার লোক বলেই সে এস. কে. গুপ্তাকে নির্দেশ দিয়েছিল অন্য কাউকে না পাঠিয়ে নিজে এয়ারপোর্টে গিয়ে যেন অর্জুনকে রিসিভ করে। হয়তো তাই। বাক্সটা খুলে যদি দেখা যায় কোনও নিরীহ জিনিস রয়েছে তা হলে লজ্জার শেষ থাকবে না। ওটা এমনভাবে প্যাক করা যে, খুললেই বোঝা যাবে।

অর্জুন উঠল। টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুলে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই নামটা পেয়ে গেল, শেঠ বাবুলাল অ্যান্ড সন্স। একবার গেলে হয় লোকটার কাছে। তার মন বলছে কথা পাড়লে কিছু কাজের কথা কানে আসবে।

এখন প্রায় বিকেল। এই শহরে বোধহয় তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামে। একটা জ্যাকেট চড়িয়ে অর্জুন বেরিয়ে এল। আসার আগে পিসবোর্ডের বাক্সটাকে তার সুটকেসে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে রাখল।

লবি পেরিয়ে বাইরে বের হতেই সে শুনতে পেল, "হ্যালো !"

সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল লাঞ্চ টেবিলের দুই মহিলার একজন তার দিকে এগিয়ে আসছে। মহিলার পরনে নীল জিন্স আর সাদা শার্ট। কাঁধে ব্যাগ। জন বলেছিলেন, "ইনি ক্যামেরায় ছবি তুলবেন।"

মহিলা কাছে আসতেই অর্জুন বলল, "হ্যালো। কেমন আছেন ?"

"ফাইন। যে-কোনও নতুন জায়গায় প্রথম দিন আমার ভাল লাগে। ঘরে বসে বোর হচ্ছিলাম। জুডি, ডাক্তার, ওষুধের লিস্ট মেলাচ্ছে। আমি ডানা।"

"ডায়না ?"

"ও নো। ডানা। কোথায় যাচ্ছেন ?

"এই একটু ঘুরে বেড়াতে। কাঠমণ্ডুতে আমি আজ প্রথম এসেছি।"

"তাই ? চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাক। আপত্তি নেই তো ?"

"না না। চলুন।"

অর্জুনের মনে হল এটা ভাল হল। সঙ্গে বিদেশিনী থাকলে তাকেও টুরিস্ট ছাড়া কিছু ভাববে না এখানকার মানুষ। ওরা ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যান।" বলেই তার খেয়াল হল, "সরি! আমি ক্যামেরাম্যান বলে ফেললাম!"

"দ্যাটস ওকে! এইসব ব্যাপার পুরুষদের একচেটিয়া ছিল বলে শব্দগুলোর দখল তারা নিয়ে নিয়েছে। হ্যাঁ। আমি তিনটে ফিল্মে স্বাধীনভাবে কাজ করেছি। আপনার মতোই আমি পাহাড়ে চড়ার ট্রেনিং নিইনি। কী হবে জানি না। তবে ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর। আপনি তো প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

"না।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"না মানে?" ডানা অবাক!

"আমি সত্যান্বেষী। সত্য অন্বেষণ করাই আমার কাজ।"

"আই সি। কিন্তু পার্থক্যটা কী?"

"পার্থক্য আছে। একজন স্টিল ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ভিডিও ক্যামেরাম্যানের পার্থক্য আছে। আবার ফিল্মের ক্যামেরাম্যানরাও আছেন। তাই না?"

"ও। আচ্ছা।" ডানা বলল, "জন যখন বলল একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর দলের সঙ্গে যাচ্ছে, তখন ভেবেছিলাম খুব ভারী চেহারার বয়স্ক মানুষের কথা। আপনাকে দেখে কিন্তু মনেই হয় না।"

অর্জুন এত জোরে হেসে উঠল যে, ডানা কথা শেষ না করে হাসিতে যোগ দিল। তারপর বলল, "আমি কিন্তু একই বেটা ক্যামেরায় ছবি তুলব।"

"সেটা কী?"

"হাইসেন্সেটিভ ভিডিও ক্যামেরা।"

অর্জুন একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাল, "চলুন, ট্যাক্সিতে শহরটা চক্কর দিই। তা হলে তাড়াতাড়ি সব দেখা হয়ে যাবে।"

ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করলে ডানা বলল, "ক্যামেরাটা সঙ্গে নিয়ে এলাম না বলে খুব আফসোস হচ্ছে। শহরটা সত্যি সুন্দর।"

অর্জুন হিন্দিতে ড্রাইভারকে রাস্তাটার নাম বলল।

ডানা জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখানকার ভাষা জানেন?"

"এখানে ভারতীয় ভাষাগুলো চলে। দু'দেশের কিছু মানুষ একই ভাষায় কথা বলে।"

সাইনবোর্ডে রাস্তার নাম দেখল অর্জুন। তারপরই শেঠ বাবুলাল অ্যান্ড সন্স দোকানটা চোখে পড়ল।

ট্যাক্সি থামাতে বলল সে। তারপর ডানাকে বলল, "চলুন নামি। এই দোকানটার কথা আমি শুনেছি। কিউরিও শপ। বিখ্যাত দোকান!"

"ইজ ইট?" ডানা উৎসাহী হল।

দোকানটার বাইরের সাজগোজ বলে দিচ্ছে বিদেশি খদ্দেরদের আকর্ষণ করার চেষ্টা আছে। ওরা ভেতরে ঢুকল। দরজায় দু'জন দ্বাররক্ষী তাদের সম্ভাষণ

করল। বিরাট হলঘর। তাতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বস্তু শিল্পসম্মতভাবে সাজানো রয়েছে। একজন সুন্দরী নেপালি এগিয়ে এল, "গুড আফটারনুন। আমি কি আপনাদের সাহায্য করতে পারি ?"

ডানা বলল, "ধন্যবাদ। আমরা কি একটু ঘুরে দেখতে পারি ?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু কোন ব্যাপারে আপনাদের আগ্রহ যদি বলেন...।"

অর্জুন বলল, "পাহাড়ের দেশে এসেছি। পাহাড়ের যে-কোনও জিনিস...!"

"আসুন আমার সঙ্গে।"

ওরা সুন্দরীকে অনুসরণ করে যে ঘরটিতে পৌঁছল সেখানে কাচের বাক্সে সাজানো রয়েছে মুগ্ধ হওয়ার মতো সামগ্রী। সুন্দরী বলল, "এই যে অ্যাশট্রে বলে যা মনে হচ্ছে এটা কিন্তু প্রকৃতি করেছে। আট হাজার ফুট ওপরে এক ঝরনার মধ্যে পড়ে ছিল সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। পাথরটির বিশেষত্ব হল মাঝখানের গর্তটা কালো, কিন্তু এর চারপাশে চারটে রঙের সমন্বয়।"

ডানা জিজ্ঞেস করল, "কত দাম ?"

সুন্দরী একগাল হাসল, "মাত্র দু'হাজার পাঁচশো ডলার।"

ডানা চোখ বড় করল।

সুন্দরী বলল, "যে অভিযাত্রী এটিকে সংগ্রহ করে এনেছেন তার নাম শুনলে অবাক হয়ে যাবেন এবং এটিকে নিজের সংগ্রহে রাখতে ওই দামকে খুব অল্পই মনে হবে আপনাদের। অভিযাত্রীর নাম তেনজিং নোরগে।"

অর্জুন বলল, "দেশে ফিরে গিয়ে পাঁচজনকে এ-কথা বলে কতখানি বিশ্বাস করাতে পারব জানি না। আচ্ছা, এমন কোনও জিনিস নেই, এই ধরুন ইয়েতির কোনও অঙ্গ বা তাদের ব্যবহৃত কোনও জিনিস পেতে পারি কি ?"

"ইয়েতি !" সুন্দরীর চোখ স্থির।

"হ্যাঁ।"

"সরি। আমি এ-ব্যাপারে আপনাদের কোনও সাহায্য করতে পারছি না।"

"আচ্ছা, এ-কথা তো বলতে পারবেন, তেমন কিছু কি খুব দামি হবে ?"

"অবশ্যই।"

অর্জুন ডানাকে বলল, "দেখুন, তেমন কোনও জিনিস পেয়ে যান কিনা। পেলে বিক্রি করলে বড়লোক হয়ে যাবেন।"

ডানা হাসল, কিছু বলল না।

সুন্দরী বলল, "কাঠমণ্ডুতে আপনারা পাবেন না।"

অর্জুন বলল, "না, না। আমরা কাল এক অভিযানে রওনা হচ্ছি। ওই যেসব জায়গা ইয়েতিদের এলাকা বলে বলা হয়ে থাকে সেখানেই যাব।"

অর্জুন ডানাকে নিয়ে এগোচ্ছিল, সুন্দরী পাশে চলে এল, "এক্সকিউজ মি। আপনারা কোথায় উঠেছেন ?"

"ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউস।"

"আপনার নামটা জানতে পারি ?"

"অর্জুন।"

সন্ধে সাতটায় জনের ঘরে সবাই চলে এল। অর্জুনকে নিয়ে আটজন। এই ঘরটি বেশ বড়। বেডরুম ওপাশে। শীতবস্ত্র হিসেবে অর্জুনকে যা দেওয়া হল তার ওজন কম নয়! কাঁধে ঝুলিয়ে নেওয়ার ব্যাগ, যাতে সমস্ত সম্পত্তি থাকবে এবং নিজেকেই বইতে হবে। বরফের ওপর হাঁটার জুতো, চশমা, স্টিক, গ্লাভ্‌স। সবই ঠিকঠাক মিলে গেল শরীরের সঙ্গে। জন বললেন, "প্রত্যেকে ব্যক্তিগত জিনিস যা ওপরে নিয়ে যাচ্ছি না তা এই ঘরে রেখে যাব। এনি কোশ্চেন ?"

ডানা জিজ্ঞেস করল, "আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই। এসব বহন করে ক্যামেরা স্ট্যান্ড, ফিল্ম নিয়ে কি আমি হাঁটতে পারব ?"

"সরি ডানা। তোমাকে বলা হয়নি, একজন লোক ওগুলো তোমার হয়ে বইবে। সবসময় তোমার পাশে-পাশে সে থাকবে। যখনই প্রয়োজন হবে তুমি ক্যামেরা ব্যবহার করতে পারবে। ওয়েল, আজ আমরা তাড়াতাড়ি ডিনার করে নেব। কাল সকাল আটটায় সবাই যেন লবিতে চলে আসি।" জন বললেন।

ডিনার শেষ করে ঘরে ফিরে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল অর্জুন। এই অভিযানে জন সঙ্গে কোনও অস্ত্র নিচ্ছেন কিনা জিজ্ঞেস করেনি সে। নিরাপত্তার ব্যাপারটা কি একটুও ভাবছেন না তিনি! অর্জুন সঙ্গে কোনও অস্ত্র আনেনি। বিদেশে অস্ত্র এনে কী বিপদ হবে কে জানে! এখন ঘটনা যেদিকে গড়াল তাতে মনে হচ্ছে সঙ্গে কিছু থাকলে ভাল হত। সুটকেসটাকে রেখে যেতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল সেই বাক্সটার কথা। বাক্সটাও সুটকেসে থেকে যাবে।

এইসময় টেলিফোন বাজল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল অর্জুন, "হ্যালো।"

একটি পুরুষকণ্ঠ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি অর্জুন ?"

"হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন ?"

"আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার সঙ্গে বসে কথা বলা যেতে পারে ?"

"কী ব্যাপারে বলুন তো ?"

"সেটা টেলিফোনে না বলাই ভাল।"

"আপনি গেস্ট হাউসের লাউঞ্জে আসতে পারেন ?"

"না। আমি যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আপনার ঘরে পৌঁছে যাই তা হলে কি আপনার আপত্তি হবে ?"

"আসুন।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন হাসল। শেষপর্যন্ত মানিকলাল তাকে খুঁজে বের করেছে। মানিকলালের পক্ষে আজ কাঠমণ্ডুতে আসার কোনও সম্ভাবনা নেই, কারণ একমাত্র ফ্লাইটে সে চলে এসেছে। তা হলে এস. কে. গুপ্তার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই মানিকলাল সুদূর ভদ্রপুর থেকে কাঠমণ্ডুর কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছে তাকে খুঁজে বের করতে। এর অর্থ হল, বাক্সটায় খুব দামি কিছু রয়েছে। যে-ই আসুক, মানিকলাল অথবা এস. কে. গুপ্তার লিখিত নির্দেশ সঙ্গে না নিয়ে এলে সে বাক্সটা হস্তান্তর করছে না। দ্বিতীয়টা অবশ্য সম্ভব নয়। এস. কে. গুপ্তা লেখার সুযোগ আর কখনওই পাবেন না।

দরজায় শব্দ হল। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে সেটা খুলতেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভদ্রলোক হাত বাড়ালেন, "অর্জুন ?"

"ইয়েস ?"

ভদ্রলোক চট করে হিন্দিতে চলে এলেন, "আমার মনে হচ্ছে আপনি যখন ভারতীয় তখন আমরা হিন্দিতেই কথা বলতে পারি। ভেতরে আসব ?"

দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক চেয়ার টেনে বসলেন, "আমার নাম প্রবীণলাল। আজ বিকেলে আপনারা আমার দোকানে দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়েছেন।"

"আপনার দোকানে ?"

"আজ্ঞে। শেঠ বাবুলাল অ্যান্ড সন্স আমারই দোকান। শেঠ বাবুলাল আমার বাবা। তিনি গত হয়েছেন বছরপাঁচেক হল। কিন্তু এখানকার মানুষের মুখে তিনি এখনও বেঁচে আছেন। আমি যা কিছু করছি সবই তাঁর আশীর্বাদে।"

ভদ্রলোক দুটো হাত কপালে ঠেকিয়ে পিতৃদেবকে শ্রদ্ধা জানালেন।

অর্জুন কল্পনাই করেনি তার খেলাচ্ছলে ঘুরে আসা এতটা কার্যকর হবে। সে গম্ভীর গলায় বলল, "বলুন।"

"আমার ছোট্ট দোকান আপনি দেখে এসেছেন। এখানেই জন্ম, কর্ম আমার। কাঠমণ্ডুতে কোথায় কী হচ্ছে, কী পাওয়া যাচ্ছে তার খবর রাখতে হয় এই ব্যবসা বানাতে গেলে। মিস্টার জন বেইলির নেতৃত্বে একটা অভিযান হচ্ছে এই খবরটা জানতাম। এরকম তো কতই হয়! মাথা ঘামাইনি তাই। আপনি চলে আসার পর খবর নিয়ে জানলাম অভিযানটা হচ্ছে ইয়েতিদের ছবি তুলতে। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন হিলারিসাহেব পাহাড় থেকে ঘুরে এসে বলেছিলেন ইয়েতি বলে কিছু নেই। নীল রঙের একধরনের ভালুককেই লোকে ইয়েতি বলে ভুল করছে। কিন্তু এ-কথা পাহাড়ের মানুষ বিশ্বাস করে না। তারা মনে করে ইয়েতি আছে। আপনিও তাই মনে করেন জেনে ভাল লাগল।" প্রবীণলাল পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরলেন।

অর্জুন মাথা নেড়ে না বলে, "কী করে মনে হল ?"

"আরে, ইয়েতি আছে বিশ্বাস না করলে আপনি দোকানে খোঁজ করবেন কেন ?" প্রবীণলাল বললেন, "এই দলে আপনিই একমাত্র ভারতীয়। আরে আমিও তাই। এখানে পড়ে আছি পেটের দায়ে। আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি করতে চাই।"

"কীরকম ?"

"যদি সত্যি ইয়েতির কোনও নিদর্শন খুঁজে পান তা হলে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিক্রি করবেন না। দামের জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।"

"প্রস্তাবটা আপনি আমাদের নেতা জনসাহেবকে দিচ্ছেন না কেন ?"

"সাহেবদের আমি বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু আমি দলের সঙ্গে যাচ্ছি। নেতা যা বলবেন তাই করতে হবে। আপনি বলছেন ওগুলোর ভাল দাম হবে। তা হলে লোক পাঠিয়ে নিজেরাই নিয়ে আসছেন না কেন ?"

"সম্ভব না। নেপাল সরকারের অনুমতি ছাড়া ওখানে যাওয়া যায় না।"

"কিন্তু বরফের ওপরের গ্রাম থেকে লোকজন এখানে আসে বলে শুনেছি।"

"ওখানকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে ওই আইন চালু নেই। আরে মশাই, সেই চেষ্টা যে করা হয়নি তা নয়। কিন্তু কাজ হয়নি। আর আপনি যদি সাহায্য করতে চান তা হলে নেতাকে না জানালেই হল।"

"এখন পর্যন্ত কেউ আনতে পারেনি ?"

"না। বাজারে একটা খবর চালু হয়েছে যে, ইয়েতির মাথা নাকি কাঠমণ্ডুতে এসেছে। আমি বিশ্বাস করি না।" মাথা নাড়লেন প্রবীণলাল।

"আর কেউ কি এসবের ব্যবসা করেন এখানে ?" বলেই যেন মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে অর্জুন বলল, "হ্যাঁ, কী নাম যেন, এস. কে. গুপ্তা, তাই না ?"

আচমকা প্রবীণলালের চোখ ছোট হয়ে গেল, "ওকে আপনি চেনেন ?"

"না। টিভিতে নাম শুনলাম। অ্যাকসিডেন্টে মারা গিয়েছেন। তখন পরিচয় দেওয়ার সময় বলা হল উনি কিউরিও নিয়ে ব্যবসা করতেন।" অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলল অর্জুন।

প্রবীণলালের টানটান মুখ আস্তে-আস্তে সহজ হল। হাসি ফুটল মুখে। মাথা নেড়ে বললেন, "তাই বলুন। আমি একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আরে মশাই, অন্যায় করলে ভগবান ঠিক শাস্তি দিয়ে দেন।"

"ওকে আপনি চিনতেন ?"

"বিলক্ষণ। কেউ মারা গেলে দুর্নাম করতে নেই, কিন্তু যা সত্যি তা চিরকালই সত্যি। হিটলার যে খুনি ছিলেন তা মারা গেছেন বলে কি বলব না ? ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার ছিল মশাই। ওই ইয়েতির মাথার গল্পটা ওই চালু

করেছিল। যাক গে, আপনার সঙ্গে সব কথাবার্তা ফাইনাল হয়ে গেল। আমি নিশ্চিত।" উঠে দাঁড়ালেন প্রবীণলাল। তারপর পকেট থেকে একটা খাম বের করে সামনে ধরলেন, "এটা নিয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করুন। এটা অ্যাডভান্স।"

"কী এটা?"

"সামান্য টাকা। রাস্তায় খরচ করবেন।"

"আপনি হয়তো জানেন না আমরা এখান থেকে হেলিকপটারে যাচ্ছি। যেখানে নামব সেখানে বরফ আর ফাঁকা পাহাড়। মানুষ যেখানে হাতে গোনা সেখানে দোকান কোথায় পাব খরচ করার! ইয়েতিরা নিশ্চয়ই দোকান খোলেনি?" অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আপনাকে তো আগেই বলেছি আমাদের দলনেতার সঙ্গে কথা বলতে। ঠিক আছে, যদি ইয়েতিদের কিছু খুঁজে পাই তা হলে কাঠমণ্ডুতে ফিরে আপনাকে ফোন করব। আপনার সঙ্গে কার্ড আছে?"

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে পার্স থেকে কার্ড বের করে দিলেন। তারপর বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। কয়েক সেকেন্ড বাদে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এল। ওপর থেকে দেখতে পেল প্রবীণলাল হেঁটে গাড়িতে উঠলেন। দু'জন লোক গাড়ির সামনের সিটে উঠে পড়ল। তার মানে ভদ্রলোক দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। একজন কিউরিও ব্যবসায়ীর দেহরক্ষীর কখন প্রয়োজন হয়?

সকালে জন বেইলির ঘরে সবাই জিনিসপত্র রাখার পর তিনি একটা ম্যাপ দেখিয়ে বোঝাতে লাগলেন ঠিক কোন জায়গায় আজ হেলিকপটার নামছে। দলের অন্য সবাই এর আগেই ম্যাপের সঙ্গে পরিচিত। তাঁরা একবার নজর বুলিয়ে মাথা নেড়ে সরে যাচ্ছিলেন। এ-ধরনের ম্যাপ অর্জুন আগে কখনও দ্যাখেনি। তার বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল। পাশে দাঁড়ানো ডানা যখন হেসে বলল, "ম্যাপ দেখে আমি কী করব। আপনি যখন যেমন বলবেন তাই করব।"

জন মাথা নাড়লেন, "নো। নট অ্যাট অল। ধরো, তুমি ওখানে গিয়ে পথ হারালে। কাউকে খুঁজে পাচ্ছ না। তখন এই ম্যাপ, কম্পাস তোমার জীবন বাঁচাবে। বুঝলে মাই লিটল লেডি!"

পর্বত অভিযানের কাহিনী অনেক পড়েছে অর্জুন। পাহাড়ে ওঠার আগে যে প্রস্তুতি নিতে হয় তা সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। প্রচুর মালপত্র, খাবার, এলাহি ব্যাপার। কুলির মাথায় চাপিয়ে সেসব নিয়ে আসা হয় বেসক্যাম্পে। সেখান থেকে মূল অভিযান শুরু হয়। কুলিরা ফিরে যায় আর শেরপারা দায়িত্ব নেয়। তখন যে-যার জিনিস বহন করে। রীতিমতো গলদঘর্ম হওয়ার ব্যাপার।

এয়ারপোর্টের যে প্রান্তে হেলিকপটার দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে কাঠের বাক্সের পাহাড় দেখতে পেল অর্জুন। বাক্সের ওপর জিনিসগুলোর নাম লেখা। জন

পাইলটের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আটজন শেরপা আর আটজন সদস্য। এখন সবাই হালকা পোশাক পরে আছে। অর্জুন লক্ষ করল শেরপারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। নিউজিল্যান্ডের মানুষগুলো গম্ভীর মুখে হেলিকপটার দেখছে। ডানাকে বাদ দিলে এঁদের প্রত্যেকেই পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। অর্জুন জুডির দিকে তাকাল। এই মহিলা ডাক্তার। সঙ্গে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ আর রুকস্যাক নিয়ে এসেছেন। ইনিও বোধহয় কথা কম বলেন। জন ফিরে এলেন, "তিনটে ট্রিপ দিতে হবে। প্রথম ট্রিপে জিনিসপত্রের সঙ্গে আটজন যাবে। ছ'জন শেরপা আর আমাদের দু'জন।" তিনি একজন স্বাস্থ্যবান সদস্যকে ডেকে নিলেন। হেলিকপটারের পেছন দিকটায় অনেক জিনিস ধরল। জন বাকি সাতজনকে নিয়ে উড়ে গেলেন।

এখন সকাল সাড়ে আটটা। সাড়ে ন'টার আগে হেলিকপটারের ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। সবাই ফিরে গেল এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর ভেতর। যে দু'জন শেরপা থেকে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে ভাব জমাল অর্জুন। এরা দু'জনেই এভারেস্টের অ্যাডভান্স ক্যাম্প পর্যন্ত উঠেছে। পিকে ওঠার সুযোগ এখনও পায়নি। ওরা আক্ষেপ করে বলল মাঝখানে যেমন ঘন-ঘন অভিযান হত এখন তেমন হয় না। অভিযান হলেই তাদের রোজগার বেড়ে যায়।

অর্জুন ওদের কফি খাওয়াচ্ছিল। ডানা এসে যোগ দিল। অর্জুন বলল, "দ্যাখো ভাই, আমি এতকাল সমান জমিতে হেঁটে এসেছি। পাহাড়ে চড়ার কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই। তোমরা আমাকে সাহায্য কোরো।"

একজন শেরপা মিটিমিটি হেসে জিজ্ঞেস করল, "সাহেব কি সত্যি সাহায্য চাইছেন?"

"সত্যি। একশোবার সত্যি।"

"তা হলে আপনার ভার আমরা নিলাম।" তরুণ শেরপাটি হাসল।

হেলিকপটারে চেপে পায়ের তলায় পাইনগাছের মাথা দেখতে ভারী ভাল লাগছিল। দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে গাছগাছালি। এতদিন যেসব প্লেনে অর্জুন উঠেছে তারা উড়ে গেছে তিরিশ হাজার বা তার বেশি ফুট উঁচু দিয়ে। নীচে তাকালে শুধু মেঘের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। মাঝে-মাঝে সেখানে কুয়ো এবং পুকুর দেখা যায়। কিন্তু এইভাবে প্রায় গাছের মাথা ছুঁয়ে পাহাড়ের ঔদ্ধত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা কখনওই হয়নি। এইসব জায়গা দিয়ে যদি হেঁটে যেতে হত তা হলে পাহাড়ের পর পাহাড় ভাঙতে হত। অর্জুন মাথা নাড়ল।

পেছন থেকে ডানা জিজ্ঞেস করল, "এনি প্রব্লেম?"

"ওই পাহাড়টায় একটাও গাছ নেই। শুধুই পাথর।"

ডানা বলল, "আমাদের তো উঠতে হচ্ছে না।"

পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে-মাঝে এক-একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। চাষের খেত। পাহাড়ের ঢালু জমিতে ফসল ফলাবার চেষ্টা হয়েছে। আর তারপরেই হেলিকপটার যেই ঘুরে গেল অমনই বরফ নজরে এল। সামনের পাহাড়টা অন্যদের চেয়ে বেশ উঁচু। তার গায়ে ছোপ-ছোপ বরফ লেগে রয়েছে। সেটাকে পাশ কাটাতেই বরফের পৃথিবী শুরু হয়ে গেল।

হেলিকপটারে ওঠার আগে যতটা সম্ভব শীতের পোশাক পরে নিয়েছিল সবাই। এখন চোখে বড় গগল্‌স উঠল। ওপর থেকে বরফ দেখতে কী মায়াময় লাগে। ওপর থেকেই ওরা জনসাহেবদের দেখতে পেল। প্রথম ফ্লাইটে নিয়ে আসা জিনিসপত্রগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পাহাড়ের গায়ে। জনসাহেব হাতে একটা পতাকা নিয়ে নাড়ছেন। পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছেন কোথায় নামতে হবে। যে-কোনও জায়গায় হেলিকপটার নামানো যায় না। যে বরফকে ওপর থেকে শক্ত বলে মনে হয়, সামান্য চাপ পড়তেই সেটা ফাঁক হয়ে যাবে। অর্জুন পরে শুনেছিল আগের হেলিকপটার থেকে দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জন এবং শেরপারা তাই বেয়ে নীচে নেমে অনেক পরীক্ষার পর স্থির করেছিল জায়গাটা, যেখানে হেলিকপটার নামতে পারে।

হেলিকপটার স্থির হতেই ওরা নেমে এল। জিনিসপত্র নামানো হলে হেলিকপটার আবার আর-একটা ট্রিপ দেওয়ার জন্যে ফিরে এল। পরনে পর্বতারোহীর পোশাক, চোখে চশমা, মাথায় টুপি। অর্জুনের মনে হল এখানে তেমন শীত নেই। বরফের ওপর দাঁড়িয়েও শরীর কনকন করছে না। সে দেখল শেরপারা অনেক হালকা শীতবস্ত্র পরে কাজ করছে। সমস্ত জিনিসপত্র পাহাড়ের গায়ে নিয়ে যাওয়ার পর শেরপাদের সঙ্গে কথা বলে তাঁবু টাঙাবার হুকুম দিলেন জনসাহেব। পাহাড়ের আড়াল বাতাস আটকে রেখেছে। শেরপাদের সঙ্গে সাহেবদের হাত লাগাতে দেখে অর্জুন এগিয়ে গেল। কিন্তু জনসাহেব হাত নেড়ে নিষেধ করলেন, "তোমাকে ওসব করতে হবে না।"

"কেন?" অর্জুন জানতে চাইল।

"কারণ, তুমি জানো না কীভাবে টেন্ট টাঙাতে হয়। তাই না?"

কথাটা সত্যি। কিন্তু মেয়েরা ছাড়া সবাই যখন পরিশ্রম করছে তখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগে। অর্জুন দেখল, ডানা একটা বাক্স খুলে ফেলেছে এর মধ্যে। সেখানে ছবি তোলার নানান সরঞ্জাম। ক্যামেরা ডানা হাতছাড়া করেনি কখনও। দেখা গেল আর একটি ক্যামেরাকে প্রচুর যত্নে বাক্সে রাখা হয়েছে। বাক্স পড়ে গেলে অথবা ধাক্কা লাগলেও যেন ক্যামেরার কোনও ক্ষতি না হয়, তার ব্যবস্থা রয়েছে।

ক্যামেরায় ক্যাসেট ঢুকিয়ে ফোকাস ঠিক করছিল ডানা। তারপর অর্জুনকে ক্যামেরায় ধরল। অর্জুন হেসে বলল, "ছবি দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কার ছবি তোলা হয়েছে।" সে টুপি আর গগল্‌স দেখাল। ডানা চিৎকার করে

বলল, "একটু হাঁটো।" অর্জুন হাঁটল। তার ছবি তুলে ভানা কাছে এসে বলল, "এবার যারা তোমাকে চেনে তারা বুঝতে পারবে। প্রত্যেক মানুষের হাঁটার ভঙ্গিটা তার নিজস্ব।"

আজকের দিনটা জিনিসপত্র গোছাতেই গেল। শেরপাদের জন্যে দুটো বড় তাঁবু, আর দলের সদস্যদের জন্যে চারটে। মেয়ে দু'জন এক তাঁবুতে, জনের সঙ্গে অর্জুন। পায়ের তলায় বরফের ওপর নাইলনের কার্পেট। একটা টেবিল, দুটো চেয়ার, দুটো হ্যামক, অর্জুন নামকরণ করল ঝুলন্ত বিছানা। এ ছাড়া রান্না, স্টোর এবং বেশ কিছুটা দূরে ল্যাট্রিন এবং টয়লেটের জন্যে আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা হল। টিনের খাবারে হাত না দিয়ে প্রথম দিন শেরপাদের রান্না-করা খিচুড়ি আর ডিমভাজা দিয়ে লাঞ্চ সারা হল।

লাঞ্চের পর জনসাহেব বললেন, "এখান থেকে খুব কাছে যে গ্রামটা সেটা মাত্র কুড়ি মিনিটের রাস্তা। হেলিকপটার আসা-যাওয়া করছে ; আমরা এসেছি তবু কেউ খোঁজখবর করতে এল না। বুঝতেই পারছ আমাদের আপ্যায়ন করার কোনও ইচ্ছে ওদের নেই। এখন শত্রুতা করলে কতটা করবে সেটা জানতে হলে অপেক্ষা করতে হবে। তাই কখনওই ক্যাম্প ফাঁকা করে আমরা বেরিয়ে যাব না। অন্তত দু'জন পাহারায় থেকে যাবে।"

একজন সদস্য জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র ব্যবহার করতে পারি?"

জন মাথা নাড়লেন, "না। কখনওই নয়। কোনও মানুষের বিরুদ্ধে আমরা অস্ত্র ব্যবহার করব না। শুধু হিংস্র জন্তুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ওগুলোর প্রয়োজন।"

অধিনায়কের এই আদেশ খুবই পছন্দ হল অর্জুনের। কিন্তু সেইসঙ্গে অস্বস্তিও হল। এঁরা সবাই নিউজিল্যান্ডের মানুষ। নিশ্চয়ই কলকাতা বা কাঠমণ্ডু থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেননি। অথচ বোঝাই যাচ্ছে এঁদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। কী করে নিয়ে এলেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসা কি বেআইনি নয়?

বিকেলের মধ্যে জায়গাটাকে একটা ছোট্ট বসতি বলে মনে হচ্ছিল। শেরপারা বেরিয়েছিল খোঁজখবর নিতে। তারা ফিরে এসে জানাল আশপাশের বরফ বেশ শক্ত হয়ে আছে। হাতে লাঠি নিয়ে সহজেই গ্রামের দিকটায় যাওয়া যেতে পারে। আর এই খোঁজাখুঁজির সময় তুষার-ভালুকের পায়ের চিহ্ন তাদের চোখে পড়েনি।

জনসাহেব এতে হতাশ হলেন না। সবাইকে নির্দেশ দিলেন ভোর ছ'টার মধ্যে তৈরি হতে।

সন্ধে নামল ঝুপ করে। সূর্য ডুবে গেলেও একধরনের আলো নেতিয়ে রইল বরফের ওপর। আর আকাশটা কী চমৎকার নীলে ভরে গেল। এমন পরিষ্কার

আকাশ কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ল না অর্জুনের। লোকালয়ে মানুষের তৈরি নোংরা ধোঁয়া যে আকাশের চেহারা কতটা বদলে দিতে পারে তা এখানে এলেই বোঝা যায়। ঝটপট খাওয়াদাওয়া সেরে যে-যার তাঁবুতে ঢুকে গেল।

জনসাহেব টেবিলে একটা ব্যাটারিচালিত আলো জ্বেলে লেখা শুরু করলেন। ঝুলন্ত বিছানায় মানিয়ে নিতে সময় লাগল অর্জুনের। সন্ধের পর ঠাণ্ডা বাড়তে শুরু করেছে। ভারী শীতবস্ত্র খুলে রেখে পুলওভার পরে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে পড়েছে অর্জুন। শরীর গরম হতে একটু সময় লাগল।

লিখতে-লিখতে জনসাহেব মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আলো জ্বললে ঘুমোতে অসুবিধে হবে না তো?"

"না, না। তবে এই সময়ে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই তো, তাই ঘুম কখন আসবে জানি না।" শুয়ে-শুয়ে অর্জুন কথা বলল।

"অভ্যেস। অভ্যেস হয়ে গেলেই অসুবিধে হবে না।" জনসাহেব বললেন, "ওয়েল, তুমি নিশ্চয়ই চিন্তা করছ কীভাবে কাজ শুরু করবে!"

"চিন্তা করার মতো কিছু পাইনি।"

"তার মানে?"

"আজ এখানে আসার পর চারপাশে শুধু বরফ ছাড়া কিছুই দেখতে পাইনি। এই বরফের ভেতর যদি কেউ লুকিয়ে রেখে থাকে জিনিসগুলো, তা হলে সূত্র না পেলে খুঁজে বের করা অসম্ভব।"

"ঠিক কথা। তা হলে কাল কীভাবে শুরু করবে?"

"শেরপাদের কাছে জেনেছি তিনটে গ্রাম আছে আমাদের কাছাকাছি। যে-গ্রামের মন্দির থেকে ওগুলো চুরি গিয়েছে, সেটি খুব কাছেই। আমি প্রথমে ওখানেই যাব। তারপর দেখা যাক।"

"কিন্তু মনে রেখো ওরা আমাদের এখন বন্ধু বলে ভাবছে না।"

"দেখা যাক।" অর্জুন কথাটা বলতেই জনসাহেব আবার লেখার দিকে মন দিতে চাইলেন। অর্জুন সেটা লক্ষ করে একটু সময় নিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার বেইলি, আপনি এই দলের নেতা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

জনসাহেব মাথা নাড়লেন, "শিওর।"

"দলের কার-কার সঙ্গে অস্ত্র আছে?"

"অস্ত্র?"

"হ্যাঁ। তখন আপনি নিষেধ করলেন সেগুলো ব্যবহার করতে।"

"ও, হ্যাঁ। অভিযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্যে আমরা একটা শক্তিশালী রিভলভার আর রাইফেল এনেছি। ভারত এবং নেপালের গভর্নমেন্টের অনুমতি নিয়েই ওই দুটো অস্ত্র আনা হয়েছে।"

"ওগুলো কোথায় আছে?"

"এখানে। এই তাঁবুতে। ওই বাক্সে।" জনসাহেব অবাক হলেন, "কেন বলো তো ?"

"আপনি নিশ্চিত, অন্য সদস্যরা কেউ নিজের অস্ত্র নিয়ে আসেননি ?"

জনসাহেব বললেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, কাঠমণ্ডুতে হয়নি, কিন্তু কলকাতায় আমাদের কাস্টম্‌স করতে হয়েছিল। ওখানকার সিকিউরিটি আমাদের ভালভাবে চেক করেছে। কেউ যদি সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে আসতে চেষ্টা করে তা হলে তখনই তার ধরা পড়ে যাওয়ার কথা। তাই না ?"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। কিন্তু তার অস্বস্তি হচ্ছিল। অস্ত্র তো ইচ্ছে করলে কাঠমণ্ডু থেকেও কেনা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, যারা শুধু ভালুকের ছবি তুলতে এসেছে তারা অস্ত্র কেন কিনবে ? কিন্তু যে লোকটি জনসাহেবকে প্রশ্ন করেছিল, তার ভাবভঙ্গি ভাল লাগেনি অর্জুনের।

একসময় আলো নিভিয়ে জনসাহেব তাঁর ঝুলন্ত বিছানায় উঠে পড়লেন। পৃথিবীর কোথাও কোনও শব্দ নেই। তারপর হঠাৎই শব্দটা শুরু হল। নেই-টাকে মিথ্যে করতে সে যেন জানান দিল। প্রথমে শব্দটা কী তা বুঝতে পারছিল না অর্জুন। তারপর আওয়াজ বাড়তেই বুঝতে পারল, হাওয়া বইছে। সোঁ-সোঁ শব্দটা যেন ছুটে চলেছে পাগলের মতো। অথচ তাদের তাঁবুতে কোনও কম্পন নেই। অর্থাৎ পাহাড় তাদের আড়াল করে রেখেছে। শব্দটা একসময় কমে গিয়ে মিলিয়ে গেল। আর তখন থেকে টুপটাপ তুষার পড়তে লাগল তাঁবুর ওপর। এক রাত্রে কত তুষার পড়ে ?

সকালটা চমৎকার। দু'জন শেরপা ছাড়া আর কাউকে ক্যাম্পে দেখতে পেল না অর্জুন। ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সবাই বেরিয়ে গেছে। এই তুষারের রাজ্যে কোথায় ভালুকমশাইরা আস্তানা গেড়েছেন তাই খুঁজে দেখবে সবাই। বেরিয়ে যাওয়ার আগে জনসাহেব তাকে ডাকেননি। অভিযাত্রীদের মধ্যে মিলিটারির শৃঙ্খলা থাকে বলে পড়েছিল অর্জুন, দেখা যাচ্ছে কথাটা খাঁটি।

একজন শেরপা তাকে এক মগ চা আর বিস্কুট এনে দিল। ধোঁয়া ওঠা চা মুখে দিতে-দিতেই তেজ হারাচ্ছে। অর্জুন দেখল আর একজন শেরপা ঝুলঝাড়ার মতো একটা কিছু দিয়ে তাঁবুর গায়ে রাতে পড়া তুষার সরিয়ে দিচ্ছে।

চা শেষ করে মগটা কিচেনে পৌঁছে দিয়ে আসার সময় অর্জুন দেখল জুডি তাঁবু থেকে বের হচ্ছে। তা হলে জুডিও যায়নি। সে হেসে বলল, "গুড মর্নিং।" জুডি গম্ভীর মুখেই বলল, "ইয়েস, গুড মর্নিং।"

"তুমি ওদের সঙ্গে গেলে না কেন ?"

জুডি তাকাল। তার চশমার বড় কাচে আলো পড়ল, ভোরের আলো। বলল, "আমার কাজ ছবি তোলা নয়, কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করা। আর সেটা ক্যাম্পেই করা সহজ।"

"তোমার কি মনমেজাজ ঠিক নেই ?"

"বাজে কথা বলতে বা শুনতে আমি পছন্দ করি না।"

জুডি অন্যদিকে তাকাল। ডাক্তার-মহিলাকে চটিয়ে লাভ নেই, অর্জুন শেরপাদের কাছ থেকে স্টিক চেয়ে নিয়ে হাঁটতে বের হল। হাল্কা ধাতব সরু স্টিকের মাথায় ইংরেজি 'টি' অক্ষর বসানো। সামনে চাপ দিলে বোঝা যায় তুষারে পা কতখানি ডুববে।

হাঁটতে ভাল লাগছিল অর্জুনের। এখনও পায়ের তলায় হাল্কা তুষারে ঢাকা শক্ত বরফ পাওয়া যাচ্ছে। শেরপারা যেদিকে বলেছিল সেদিকে মিনিট পনেরো হাঁটার পর গ্রামটাকে দেখতে পেল সে। পাহাড়ের ওদিকটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বরফ পড়েছে। কালো মাটি বা পাথর দেখা যাচ্ছে তাই। খুব ছোট গ্রাম নয়। দূর থেকেই মানুষের চলাফেরা নজরে এল। পাহাড়ের আড়ালে তাঁবু ফেলেছেন বলে জনসাহেব হাওয়ার দাপট থেকে দলকে বাঁচাতে পেরেছেন। আর এই গ্রামটা তৈরি হয়েছে পাহাড়ের আর-একটা দিকে যাতে হাওয়া বা তুষার-ঝড় পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে। এবং সেই কারণেই মাটি দেখা যাচ্ছে, তুষার সর্বত্র ছড়িয়ে যেতে পারেনি।

গ্রামের সীমানায় পা রেখে অর্জুন প্রথমে কাউকে দেখতে পেল না। যেটুকু নেপালি ভাষা তার জানা ছিল তাই সম্বল করে সে চিৎকার করে নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে চাইল।

এইসময় চারজন লোক পাহাড়ের আড়াল ছেড়ে এগিয়ে এল তার দিকে। পাহাড়ের মানুষের মুখে আপাত সারল্য সবসময় থাকে। এদের দেখে শত্রু বলে মনে হল না অর্জুনের। এরা কোন ভাষায় কথা বলে তা অর্জুনের জানা নেই। নেপালি হলে সে কাজ চালিয়ে দেবে। কিন্তু তাকে অবাক করে একজন হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "কোত্থেকে এসেছ ?"

"আমি জলপাইগুড়িতে থাকি।" অর্জুন সত্যি কথাই বলল।

লোকগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে। বোঝাই যাচ্ছে নামটা তারা কখনওই শোনেনি। এদের সম্পর্কে যা জেনেছে তাতে তো পৃথিবীর বেশিরভাগ জায়গার নাম এদের শোনার কথা নয়।

অর্জুন বলল, "আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।"

"তুমি কি কাঠমণ্ডু থেকে হেঁটে আসছ ?"

"না। ওই অভিযাত্রীদের সঙ্গে হেলিকপ্টারে এসেছি।"

"ও। তা হলে তোমার সঙ্গে আমাদের কোনও কথা নেই।"

"কেন ?"

"কারণ ওই সাদা চামড়ার লোকদের আমরা বিশ্বাস করি না।"

"কিন্তু আমার চামড়া তো সাদা নয়।"

লোকগুলো আবার নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর ইশারা করল

অর্জুনকে। ওদের অনুসরণ করে এগোতে গিয়ে অবাক হল অর্জুন। ট্রানজিস্টার বাজছে। বিদেশি গানের সুর। এই গ্রামে বিদ্যুৎ থাকার কথা নয়। কিন্তু ব্যাটারিচালিত রেডিয়ো এসে গিয়েছে। যারা ইদানীং কাঠমণ্ডুতে যায় তাদের দৌলতেই এটা সম্ভব হয়েছে। বাচ্চা মেয়েরা তাকে দেখছিল আগ্রহ নিয়ে। পাথর এবং সিমেন্ট দিয়ে তৈরি কিছু বাড়ি নজরে এল। বাকিগুলো কাঠের। পাহাড়ের ওপর উঠে আসায় এদিকে পায়ের তলায় বরফ নেই। গ্রামটি মোটেই হতশ্রী নয়। জনসাহেব বলেছিলেন এদের রোজগার ফসল ফলিয়ে। যখন বরফ পড়ে না তখন পাহাড়ে ফসল ফলায় এরা। আর জঙ্গলের কাঠ তো রয়েছেই।

একটা গুহার সামনে সুন্দর চাতালে দশ-বারোজন মানুষ বসে ছিল। এই চারজন এগিয়ে গিয়ে তাদের খবরাখবর দিল। অর্জুন দেখল গুহার মুখটা সুন্দর সাজানো। যারা বসে ছিল তাদের একজন তাকে এমন ভাষায় জিজ্ঞেস করল যার একটা শব্দও বোধগম্য হল না। এবার প্রথম লোকটি সেটি হিন্দিতে অনুবাদ করে বলল, "আমাদের প্রধান জানতে চাইছেন তুমি ওই সাদা চামড়াদের সঙ্গে কেন এসেছ?"

অর্জুন বলল, "আমি সমতলের মানুষ। পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা নেই। ওদের সঙ্গে হেলিকপটারে না এলে এখানে আসতে পারতাম না।"

লোকটি সেটা প্রধানকে শুনিয়ে দিতে তিনি দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন। দোভাষী জানাল, "তোমার এখানে আসার উদ্দেশ্য কী?"

"আমি শুনেছি তোমাদের পবিত্র দুটি বস্তু চুরি গেছে। ওগুলো কারা চুরি করেছে এবং কোথায় আছে তা খুঁজে বের করতে আমি চাই।"

"তুমি কি পুলিশ?"

"না। আমি সত্যসন্ধানী। প্রকৃত সত্যি খুঁজে বের করাই আমার কাজ।"

"এই খবর তোমাকে কে দিল?"

"তোমাদের গ্রামের এক ছেলে, যিনি এখন কাঠমণ্ডুর ডাক্তার।"

এবার ওরা আলোচনায় বসল। বেশ কিছুক্ষণ ওরা কথা বলল। তারপর দোভাষী বলল, "তুমি যার কথা বললে সে ছেলেবেলা থেকেই সাদা চামড়াদের সঙ্গে থেকে নিজের বিশেষত্ব হারিয়েছে। এই গ্রামে সে খুবই কম আসে। ওর বাবা-মা পর্যন্ত ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে চায় না। ওকে আমরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না।"

"উনি কিন্তু তোমাদের কথা খুব ভাবেন। তা ছাড়া তোমরা কি চাও না হারিয়ে যাওয়া জিনিসগুলোকে ফিরে পেতে?"

"নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু হারিয়ে যায়নি। চুরি করা হয়েছে।"

"এ-বিষয়ে তোমরা নিঃসন্দেহ?"

"নিশ্চয়ই। ওই পবিত্র গুহায় ওগুলো রাখা ছিল। কিছুদিন আগে সেগুলো

উধাও হয়ে গেল। অথচ ওই পবিত্র মাথা আর গায়ের চামড়া যুগ-যুগ ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা রক্ষা করে এসেছিলেন। যতদিন ওগুলো নিরাপদে ছিল ততদিন ওই গ্রামে কোনও অশান্তি হয়নি।"

"কিন্তু যে বা যারা চুরি করবে, তাদের স্বার্থ কী ?"

প্রধানকে দোভাষী প্রশ্নটা জানাতে তিনি খেপে গিয়ে উত্তেজনা প্রকাশ করলেন। দোভাষী বলল, "আজ থেকে অনেক বছর আগে এক সাদা চামড়ার দল এসে তখনকার প্রধানকে রাজি করিয়ে ওই পবিত্র জিনিসগুলো নিয়ে গিয়েছিল তাদের দেশে। ওগুলোকে পাহারা দেওয়ার জন্যে গ্রামের দু'জন পুরুষ সঙ্গে গিয়েছিল। তখনই সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে গেছে ওগুলোর কথা। ওরা অবশ্য ঠিকঠাক ফিরিয়ে দিয়েছিল তবু ওগুলোকে দেখতে পরের বছরগুলোতে সাদা চামড়াদের আসা-যাওয়া চলছিল। বহু টাকা দিয়ে কিনে নিতে চেয়েছিল কেউ-কেউ। আমরা বিক্রি করিনি। সেই লোভে চোর চুরি করল। এর জন্যে যারা দায়ী সেই সাদা চামড়াদের সঙ্গে আমরা কোনও সহযোগিতা করব না।"

অর্জুন বলল, "তোমাদের গ্রামের ছেলে এখন ডাক্তার। তিনি কখনওই তোমাদের ক্ষতি চাইবেন না। ওই পবিত্র জিনিসগুলো খুঁজে বের করতে তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি সাদা চামড়ার মানুষ নই।"

দোভাষী বলল, "তুমি পুলিশ নও। দেখে মনে হচ্ছে শরীরে তেমন শক্তি নেই। নিজেই বললে পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতাও নেই। তুমি কী করে খুঁজে বের করবে ?"

অর্জুন চারপাশে তাকাল। একটা বিশাল পাথর দেখতে পেল সে। ওটাকে সরানো দূরের কথা, নড়াবার শক্তি তার নেই। সে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের গ্রামের কেউ ওই পাথরটাকে কিছুটা সরাতে পারবে ?"

দোভাষী বলল, "পাগল। কারও ক্ষমতা নেই ওটাকে সরাবার। তিনটে মানুষ একসঙ্গে চেষ্টা করেও পারবে না।"

"আমি যদি সরিয়ে দিই ?"

"তুমি ! একা !" দোভাষী জানাতেই সবাই হেসে উঠল।

অর্জুন চারপাশে তাকাল। একটা কোদালের মতো জিনিস নজরে এল। সে ওটাকে তুলে পাথরের পেছনে চলে এল। বিরাট পাথর দাঁড়িয়ে আছে মাটির ওপর। সে কোদাল চালাল। সবাই ভিড় করে এল তার চারপাশে। প্রায় মিনিট পনেরো লাগল গর্তটাকে বড় করতে। একেবারে পাথরের ধার ঘেঁষে যতটা সম্ভব কাছে গর্তটাকে নিয়ে গেল সে। তারপর উলটো দিকে গিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে পাথরটাকে ঠেলতেই সেটা নড়ে কাত হয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে জনতা গুন্‌গুন করে উঠল। অর্জুন দোভাষীকে বলল, "তা হলে দেখলে, শুধু শক্তি দিয়ে যেটা সম্ভব নয়, একটু বুদ্ধি খরচ করলে সেটা সম্ভব

হয়।"

এই একটি ঘটনায় অর্জুনকে ওদের গ্রহণ করা সহজ হয়ে গেল। চাতালে বসিয়ে ওরা ওকে চমরি গাইয়ের দুধ খাওয়াল। অর্জুন দোভাষীকে জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের পবিত্র জিনিসগুলো চুরি হয়েছে কোনখান থেকে ?"

ওকে ওরা গুহার মধ্যে নিয়ে গেল। সে অবাক হয়ে দেখল গুহার প্রান্তে বেদির ওপর বিশাল শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এরা শৈব ? কিন্তু চারপাশে বৌদ্ধ-মন্দিরের স্মারকচিহ্ন ছড়ানো। ডানদিকে একটা উঁচু পাথর দেখাল দোভাষী। ইয়েতির মাথা এবং ছাল তার ওপর রাখা ছিল। বিদেশ থেকে ফেরার সময় একটা কাচের বাক্স আনা হয়েছিল। ওগুলো তার মধ্যে সংরক্ষিত ছিল।

এই গুহায় ঢোকার অন্য কোনও পথ নেই। যে চুরি করেছে তাকে আসতে হবে সামনে দিয়েই। সন্ধের আগে গুহার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। চুরি হয়েছে রাতেই, কারণ সকালে মন্দিরের দরজা খোলার পরই ওগুলোকে আর দেখা যায়নি। অথচ গুহার মুখ বন্ধ ছিল সারারাত।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই গ্রামের সবাই কি এই মন্দিরে পুজোর জন্যে আসেন ?"

দোভাষী জানাল, "হ্যাঁ। এখন পর্যন্ত আসে। তবে আগের মতো সবাই পুজো দেয় না। বিশেষ করে যারা কাঠমণ্ডুতে গিয়েছে তাদের কেউ-কেউ আলাদা হয়ে গিয়েছে।"

"পুজোর পুরোহিত কে ?"

"তিনি অসুস্থ। এই কারণে পুজো বন্ধ আছে। ওই পবিত্র জিনিসগুলো চুরি গিয়েছে বলে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি সুস্থ হলে আবার পুজো হবে। আর যদি মারা যান তা হলে নতুন পুরোহিত ঠিক করা হবে।"

"আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি ?"

গ্রামপ্রধানের সঙ্গে কথা বলে দোভাষী তাকে নিয়ে গেল যে বাড়িতে, তাকে বাড়ি বলা চলে না। কাঠের ঘরটির অবস্থা খুবই করুণ। তবে ঢালু ছাদ এখনও মজবুত। সম্ভবত তুষারের চাপ সহ্য করার জন্যেই ওটুকু রয়েছে। দরজা ভেজানো। দোভাষী সেটাকে ঠেলতেই খুলে গেল। ছোট্ট ঘরের ভেতর থেকে ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে এল। দোভাষী তার নিজের ভাষায় কিছু বলে অর্জুনকে ইশারা করল ভেতরে ঢুকতে। কোনওরকমে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতেই অর্জুন দেখতে পেল আপাদমস্তক কম্বল এবং ভেড়ার লোম সমেত চামড়ার নীচে কেউ শুয়ে রয়েছে। লোকটির মাথার পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে এক বৃদ্ধা।

দোভাষী বলল, "চুরি যাওয়ার খবর শোনার পর থেকে সেই যে জ্বর এসেছে তা আর কমছে না। এখন জ্বর বেড়েছে, কথা বলার শক্তি নেই।"

অর্জুন মুখ থেকে চাপা সরিয়ে দিতে বলল। দোভাষী সেটা জানাতে বৃদ্ধা কম্বল গলার ওপর নামিয়ে দিল। অর্জুন দেখল ভাঙাচোরা এক বৃদ্ধের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। চোখ বন্ধ। নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত। সে কপালে হাত দিয়ে দেখল জ্বর ভালই। সে দোভাষীকে জিজ্ঞেস করল, "ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছ না কেন?"

দোভাষী বলল, "তিনদিনের পথ। নিয়ে যেতে-যেতে মরে যাবে।"

"তা হলে কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না?"

"হচ্ছে। পাশের গ্রামে একজন মানুষ আছেন, যিনি গাছের পাতা-শেকড় দিয়ে অসুখ সারান। তিনি এসে দেখে গেছেন তিনদিন আগে। তাঁর ওষুধই খাওয়ানো হচ্ছে।" দোভাষী বলল।

"কিন্তু তাতে তো কাজ হচ্ছে না।"

"কী করা যাবে। অভিশাপ লেগেছে এই গ্রামের ওপর।"

অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবার গ্রামের মেয়ে-পুরুষ-বুড়োর দল যে যার বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাকে দেখছে। অর্জুন তাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে তারা হাসল। অর্জুন দোভাষীকে বলল, "কাঠমণ্ডুর হাসপাতালের ডাক্তার কোন বাড়িতে থাকতেন? ওঁর বাবা-মা নিশ্চয়ই বেঁচে আছেন?"

"তুমি সেখানে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

দোভাষী তাকে নিয়ে এল শেষপ্রান্তে। এখানে বরফ নেই। দূরে তুষারের মাঠ পড়ে রয়েছে। বাড়িটি সুন্দর। দেখলেই বোঝা যায় গৃহস্থের অবস্থা ভাল। বাড়ির সামনে কিছু গাছ লাগানো হয়েছে। দোভাষী ডাকতেই এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। লম্বা, মঙ্গোলিয়ান চোখ-মুখ, কিন্তু হাঁটাচলায় অসুস্থতা ধরা পড়ে।

দোভাষী বলল, "ইনি ইংরেজি জানেন। বিদেশ ঘুরে এসেছেন। তুমি যার কথা বললে ইনি তার বাবা।"

অর্জুন ইংরেজিতে বলল, "আমার নাম অর্জুন, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আপনি যখন ইংরেজি জানেন তখন কথা বলতে অসুবিধে হবে না।

ভদ্রলোক শূন্যে হাত চালালেন, "নো ইংলিশ। ওনলি ইয়েস অ্যান্ড নো। নো হ্যাবিট। হিন্দি থোড়া-থোড়া।"

অর্জুন হিন্দিতে জিজ্ঞেস করল, "আপনিই তো লন্ডনে গিয়েছিলেন?"

"জি। কুইন্স হাউস। ভেরি বিগ। হাম আভি সিক। ভেরি সিক।"

"কী হয়েছে আপনার?"

"হার্ট অ্যাটাক। আমার ছেলে বলেছে ঘরের বাইরে না যেতে, ওঠানামা না করতে। আমার ছেলে ডাক্তার।" বলে শ্বাস নিলেন, "আচ্ছা, কুইন কি মরে

গেছেন ? খুব ভাল মেয়ে ছিলেন।”

“না। উনি ভাল আছেন। ওঁর ছেলের বউ মারা গিয়েছে। তা আপনি যখন অসুস্থ তখন ছেলের কাছে গিয়ে থাকেন না কেন ? সেখানে ভাল চিকিৎসা হত। এখানে তো ডাক্তার নেই।”

“না, না। দিস ইজ গুড। এই জায়গা আমার জায়গা। এখান থেকে গেলে আমি মরে যাব।” হাসলেন বৃদ্ধ, “তা ছাড়া এই অসুখের যা-যা ওষুধ লাগে, সব ছেলে আমাকে দিয়ে গিয়েছে।”

“আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই মন্দির থেকে ইয়েতির মাথা আর চামড়া চুরি হয়ে গিয়েছে। শুনেছেন ?”

“শুনেছি। ভেরি স্যাড।”

“কাউকে সন্দেহ হয় আপনার ?”

বৃদ্ধ একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, “যার খুব টাকার লোভ সে নিয়েছে। হিলারি বলেছিল ওগুলো ভালুকের, ইয়েতি বলে কিছু নেই। কিন্তু তবু লোকে বিশ্বাস করে ইয়েতি আছে। যারা বিশ্বাস করে তাদের কাছে বিক্রি করলে লোভী লোকেরা প্রচুর টাকা পাবে।”

“এই লোভী লোকদের নাম বলতে পারেন ?”

“কী করে বলব কখন কার লোভ হচ্ছে। এই যে এ, এরও লোভ হতে পারে। এখন তো সব কাঠমণ্ডুতে গিয়ে সিনেমা দ্যাখে।”

“ওগুলো চুরি গিয়েছে বলে গ্রামের সবাই সাদা চামড়াদের ওপর রেগে গেছে। কিন্তু তারা চুরি করেনি। আপনার কী মনে হয় ?”

“আমি জানি না।”

“আপনি তো বিদেশ গিয়েছিলেন ওগুলো নিয়ে। তখন কেউ চুরি করতে পারেনি। এত বছর পর চুরি হল। সাদা চামড়ার লোক চুরি করতে এত বছর অপেক্ষা করত ? কী মনে হয় ?”

“আমি জানি না। শুধু জানি ওরা যেসব জায়গায় থাকে সেখানে কোনও মানুষ থাকতে পারে না। রাস্তায় চলতে গেলে একের সঙ্গে অন্যের ধাক্কা লাগে। ওরকম জায়গায় মানুষ ভাল হতে পারে না।”

“তা হলে ওদের কুইনকে ভাল মেয়ে বললেন কেন ?”

“ও হো। কুইন যে-বাড়িতে থাকে সেখানে ভিড় নেই। বিশাল বাড়ি, বাগান। কত বড়-বড় ঘর।”

দোভাষী চুপচাপ শুনছিল। এবার সে তাড়া দিল ফেরার জন্যে। অর্জুনের মনে পড়ল বৃদ্ধ একটু আগে বলেছেন যে, তাঁর ছেলে অনেক ওষুধ দিয়ে গেছে। সে বলল, “আপনার ছেলে কী কী ওষুধ দিয়েছে দেখতে পারি ?”

বৃদ্ধ কোনওরকমে ঘরে গেলেন। তারপর ফিরে এলেন একটা টিনের বাক্স নিয়ে। বাক্সটা খুললে হার্ট এবং প্রেশারের ওষুধ দেখতে পেল অর্জুন। প্রায়

তিন মাসের ব্যবস্থা করা আছে। তারপর নানান ক্যাপসুল আর ট্যাবলেট নজরে এল। তা থেকে দুটো ক্রোসিন ট্যাবলেট তুলে নিয়ে বাক্সটা ফেরত দিল অর্জুন। আবার আসবে জানিয়ে সে দোভাষীর সঙ্গে ফিরে আসছিল। পুরোহিতের ঘরের সামনে পৌঁছে ও দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। একটা ক্রোসিন ট্যাবলেট বের করে সে দোভাষীকে বলল, "এইটে জল দিয়ে খাইয়ে দাও।"

"এটা খেলে যদি মরে যায়?" দোভাষীকে খুব নার্ভাস দেখাল।

"তা হলে আমাকে মেরে ফেলো। যদি উনি মরে যান এই ক'দিনের অসুখের জন্যে মারা যাবেন, ট্যাবলেটের জন্যে নয়।"

দোভাষীর কথায় বৃদ্ধা ট্যাবলেটটা জলের সঙ্গে খাইয়ে দিল বৃদ্ধকে। অর্জুন কম্বল এবং ছাল কোমরের নীচে নামিয়ে দিল। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

গুহার কাছে ফিরে এসে অর্জুন দোভাষীকে বলল, "এই গ্রামের যেসব ছেলে কাঠমণ্ডুতে গিয়েছে তারা সবাই এখন এখানে আছে?"

"হ্যাঁ।" দোভাষী মাথা নাড়ল।

"চুরির পর কেউ গ্রাম থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি?"

"হলে তো আমরা তাকেই চোর বলে বুঝতে পারতাম।"

"যে লোকটি খবর দিতে গিয়েছিল সে ফিরে এসেছে?"

"হ্যাঁ। গতকাল ফিরেছে।"

"আপনারা কাকে সন্দেহ করেন?"

"কারও নাম বলতে পারব না। তবে এর পেছনে সাদা চামড়াদের বুদ্ধি আছে। ওদের একটা দল চুরি যাওয়ার পরেই গ্রামের এত কাছে তাঁবু ফেলল কেন? নিশ্চয়ই পবিত্র জিনিসগুলোকে চোর কাছেপিঠের বরফের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। ওরা সেটা জানে, তাই নিয়ে যেতে এসেছে।"

অর্জুন হেসে ফেলল। দোভাষী রেগে গেল, "হাসছ কেন?"

"দ্যাখো, ওদের এই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল এক বছর আগে। এখানে আসতে যেসব অনুমতি পাওয়া দরকার তার ব্যবস্থা করতে সময় লেগেছিল। তোমাদের পবিত্র জিনিসগুলো যদি চুরি না হত তা হলেও ওরা আসত। এই আসার সঙ্গে চুরির কোনও সম্পর্ক নেই। ওরা এসেছে তুষার-ভালুকের ছবি তুলতে।" অর্জুন ধীরে-ধীরে লোকটাকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

"তুষার-ভালুক? তার ছবি তুলবে ওরা?"

"হ্যাঁ। তাতে নিশ্চয়ই তোমাদের আপত্তি নেই।"

দোভাষী গুহার সামনে বসা মানুষগুলোকে খবরটা জানাতে তারা হো-হো করে হেসে উঠল। দোভাষী বলল, "যাক, আমাদের কাজটা সহজ হয়ে গেল।

আমাদের আর কিছুই করতে হবে না।"

"তার মানে?"

"এই তুষার-ভালুকগুলো খুব চালাক। প্রচণ্ড বুদ্ধি ওদের। আর শক্তিও খুব বেশি। ওদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া সহজ নয়। শেষ হয়ে যাবে সাদা চামড়ারা। তার ওপর এবার সঙ্গে দুটো মেয়েকে নিয়ে এসেছে। দ্যাখো।" দোভাষী মাথা নাড়ল, "যাক গে, তুমি বুদ্ধি খরচ করে চোরকে ধরতে পারবে?"

অর্জুন জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল। কয়েকটা ছেলে সেই বড় পাথরের নীচে অর্জুনের খোঁড়া গর্তটাকে এতক্ষণে বিশাল করে ফেলেছে। সে চেঁচিয়ে ওদের নিষেধ করল। ছেলেগুলো ভ্রূক্ষেপ করল না। অর্জুন দোভাষীকে বলল, "ওদের বারণ করো, নইলে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।"

লোকটা বুঝতেই পারল না কথাটা। হলদে দাঁত বের করে হাসতে লাগল। এবার ছেলেগুলো একসঙ্গে পাথরটাকে পেছন থেকে ঠেলতেই সেটা নড়ে উঠল। যেহেতু তার নীচে মাটির বাঁধন নেই, তাই গড়িয়ে গেল তৈরি করা গর্তে। এবং সেই চাপে গর্ত ডিঙিয়ে ঢালু জমিতে পড়ে মুহূর্তেই দ্রুতবেগে পাক খেতে-খেতে নামতে লাগল নীচের দিকে। চারধার থেকে চিৎকার উঠল। নীচের মানুষজন ছুটে পালাতে লাগল। একটা মুরগি পালাতে পারল না। অনেক ভাঙচুর করে পাথরটা নীচে বরফের ওপর যখন আছড়ে পড়ল, তখন দেখা গেল মুরগির শরীরটা কাগজের মতো মাটির ওপর আটকে আছে। ওর যে রক্ত মাংস হাড় ছিল তা আর বোঝা যাচ্ছে না। চারপাশের মানুষ যেন মূক হয়ে গেছে। কারও যেন সাড় নেই।

অর্জুন বলল, "আমি ওদের নিষেধ করেছিলাম। তুমিও কিছু বললে না। ভাগ্য ভাল, কোনও মানুষ ওই পাথরের সামনে পড়েনি।"

দোভাষী কিছু বলার আগেই গ্রামপ্রধানরা চিৎকার করে উঠল। সবাই দু'হাত আকাশে ছুড়ে কিছু বলছে। সেটা যে উল্লাসের অভিব্যক্তি তা বুঝতে সময় লাগল। লোকগুলো ছুটে এসে অর্জুনের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়াল।

দোভাষী বলল, "আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"কেন?"

"আমরা তো বটেই, আমাদের পূর্বপুরুষরা জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই ওই পাথরটাকে ওখানে দেখে এসেছে। আমরা সবাই জানি ওটা একটা শয়তান। এই মন্দিরের বাইরে শয়তানটা যুগ-যুগ ধরে বসে আছে। যখনই কেউ ঝগড়া আর মারপিট করে তখনই দেখা গেছে ওই পাথরটার পাশে সে গিয়েছিল। আমাদের কারও ক্ষমতা হয়নি ওটাকে সরাবার। তোমার জন্যে শয়তানটাকে গ্রাম থেকে দূর করে বরফের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হল। এখন ও ক্ষতি করবে যারা বরফের ওপর বাস করে তাদের। তুমি আমাদের খুব উপকার করেছ।"

এরকম কাকতালীয় ঘটনা অর্জুন কল্পনা করেনি। এক লহমাতে সে গ্রামের মানুষের প্রিয়জন হয়ে গেল। প্রধানের নির্দেশে একঘটি দুধ আর চমরি গাইয়ের দুধ থেকে তৈরি শক্ত ছুরপি পরিবেশন করা হল। খিদে পেয়ে গিয়েছিল অর্জুনের। কৌতূহলী দৃষ্টিগুলো নস্যাৎ করে সে খেয়ে নিল। প্রধানের সঙ্গে কথা বলে দোভাষী বলল, "আমরা এখন বিশ্বাস করি যে তুমি চোর ধরে দিতে পারবে। আর যেহেতু তুমি ওই সাদা চামড়াদের সঙ্গে এসেছ তাই এবার ওদের কোনও ক্ষতি করব না আমরা। তবে তুমি ওদের বলে দিও আমাদের গ্রামে যেন না ঢোকে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই দলের দুই ভদ্রমহিলা যদি আসতে চান?"

দোভাষী আবার আলোচনা করতে গেল। ওদের ভাষা না বুঝলেও অনুমান করা যাচ্ছে ওরা একমত হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত দোভাষী ফিরে এসে বলল, "মেয়েদের আমরা শ্রদ্ধা করি। তাদের ওপর আমাদের কোনও রাগ নেই। তবে তুমি যদি সঙ্গে থাকো তা হলেই আমরা মেয়েদের এখানে আসতে দিতে পারি।"

অর্জুন যখন তাঁবুতে ফিরে এল তখন বেলা বারোটা। অতটা পথ বরফ ভেঙে এলেও এবার তার তেমন কষ্ট হয়নি। লোকগুলোর দেওয়া ছুরপির একটা টুকরো তখন গালে ছিল। বস্তুটি দুগ্ধজাত কিন্তু প্রচণ্ড শক্ত। মুখে রাখলে একটা স্বাদ পাওয়া যায়। গলে খুব ধীরে-ধীরে। নরম হয় অনেকক্ষণ রাখার পরে। অর্জুনের মনে হল এই বস্তুটি নিশ্চয়ই বাড়তি এনার্জি জোগায়।

ক্যাম্পে কেউ ফিরে আসেনি। এখন মাথার ওপর সূর্য এবং খুব হালকা রোদ। শেরপা দু'জন এগিয়ে এল। একজন জিজ্ঞেস করল, "কতদূরে গিয়েছিলেন সার?"

"গ্রামে।"

"আপনি একা গিয়েছিলেন বলে আমরা চিন্তা করছিলাম।"

"থ্যাঙ্ক ইউ।" অর্জুন মাথা নেড়ে দেখল জুডি তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকাল। ওর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেজাজ ভাল নেই।

অর্জুন এগিয়ে গেল, "একা-একা খুব বিরক্ত লাগছে, তাই না?"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

"আমি তোমার কাছে একটা সাহায্য চাই।"

জুডি কথা না বলে তাকাল। দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

"আমি কাছাকাছি একটা গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানকার মানুষগুলো এমনিতে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। কিন্তু এক বৃদ্ধ পুরোহিত প্রচণ্ড অসুস্থ। গায়ে বেশ জ্বর। এদের এখানে চিকিৎসা করা হয় আদিম পদ্ধতিতে। অত জ্বর

দেখে আমি একটা ক্রোসিন ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়েছি।" অর্জুন বলল।

"ক্রোসিন ট্যাবলেট!" জুডি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"এটা এক ধরনের প্যারাসিটামল দেওয়া অ্যানালজেসিক ট্যাবলেট।"

"তুমি কি ডাক্তারি পড়েছ?"

"না।"

"তা সত্ত্বেও ওষুধ দিয়ে দিলে?"

অর্জুন জানে জুডি ঠিক কথা বলছে। কিন্তু এ-দেশের মানুষ সামান্য জ্বরজারিতে কিছু নিরীহ ওষুধ খেয়েই থাকে। সামান্য পেট খারাপ হলে কেউ ডাক্তারের কাছে যায় না। কিন্তু জুডিকে এসব কথা বোঝানো বৃথা।

সে বলল, "আমি জানতাম জ্বর বেশি হলে ওষুধটা কাজে দেয়।"

"কী ধরনের জ্বর। যদি অন্য কোনও ইনফেকশনে জ্বর আসে তা হলে কোনও কাজই দেবে না। আমাদের প্রত্যেকের নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে থাকা উচিত।" জুডি মাথা নাড়ল।

"সরি। এটা সবসময় সত্যি নয়। আমি যদি দেখি এই মুহূর্তে তুমি অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছ, যেহেতু আমি ডাক্তার নই তাই অক্সিজেন মাস্ক তোমার মুখে লাগিয়ে দেব না? তুমি মারা গেলেও আমার এক্তিয়ারের বাইরে যাব না? যে লোকটাকে ওষুধ দিয়েছি তার পেটে এখন পর্যন্ত কোনও ওষুধ পড়েনি। ও ওইভাবে ভুগে মরে গেলেও ওষুধ পড়বে না। বরং ট্যাবলেটটা খেয়ে যদি ওর একটুও উপকার হয় তা হলে ওর অনেক উপকার হবে।"

জুডি অবাক হয়ে অর্জুনের দিকে তাকিয়েছিল।

অর্জুন বলল, "তুমি ডাক্তার। লোকটাকে একবার দেখবে?"

জুডি অন্যদিকে তাকাল, "আমার যেতে আপত্তি নেই। তবে জনের অনুমতি চাই।"

"ঠিক আছে। জন এলে ওকে বলব।"

অর্জুন নিজেদের তাঁবুতে চলে এল। জুডি তাকে পছন্দ করছে না কেন? ডানার মতন সহজ মেয়ে ও নয়। প্রথম থেকেই দূরত্ব রেখে চলেছে। জন যদি আপত্তি করে তা হলে আর কী করা যাবে!

চেয়ারে বসে অর্জুন সমস্ত ঘটনাটা ভাবার চেষ্টা করল। আজ গ্রামে গিয়ে একটাই উপকার হয়েছে। ওরা তাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু মুণ্ডু এবং চামড়া যা গ্রামের মানুষের কাছে পবিত্র জিনিস, তা কে কীভাবে চুরি করল তার বিন্দুমাত্র হদিস পায়নি। এ যেন সমুদ্রে পড়ে যাওয়া একটা আধুলিকে খুঁজে বের করা। গ্রামের লোকগুলোকে দেখে বোঝাই যায় ওরা অসৎ নয়। অন্তত নিজেরা যা পবিত্র মনে করে তা টাকার লোভে বাইরের লোকের কাছে বিক্রি করবে না। বিক্রি যদি করেও তা হলে সেই টাকা রাখার এবং খরচ করার কোনও রাস্তা ওদের জানা নেই। একটা মস্ত পাথরকে যারা শয়তান বলে মনে

করে তাদের ধূর্ত বলা চলে না। অর্জুনের মনে হল পুরোহিতের কথা। ঘটনার দিন থেকেই লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কেন? তবে কি ও এমন কিছুর সাক্ষী যার জন্যে প্রচণ্ড মানসিক ধাক্কা খেয়েছে। এবং সেই কারণেই অসুস্থতা? অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে ভাবনাটাকে বাতিল করল। প্রথম চিন্তায় যে ভাবনা মাথায় আসে সেটাকে আঁকড়ে ধরলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভুল পথে হাঁটতে হয়।

"আসতে পারি?"

অর্জুন দেখল জুডি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"নিশ্চয়ই! এসো।" দ্বিতীয় খালি চেয়ারটা দেখিয়ে দিল অর্জুন।

"আই অ্যাম সরি।"

"ঠিক আছে।"

"আসলে আমি খুব ডিস্টার্বড।"

"কেন?"

"অভিযানে যখন যোগ দিয়েছিলাম তখন ভাবিনি এমন অলসভাবে সময় কাটাতে হবে। এখানে আমার কিছুই করার নেই, যতক্ষণ কেউ অসুস্থ না হয়। অথচ ডানাকে দ্যাখো, সবাই ব্যস্ত ওকে নিয়ে। ওর সাফল্যের ওপর এই অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছে।" নিশ্বাস ফেলল জুডি।

"ব্যাপারটা তুমি অন্যভাবেও দেখতে পারো।"

"কীরকম?"

"তোমার ওপর অভিযান নির্ভর করে আছে। ধরো, ডানা বা জন খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। তুমি যদি চিকিৎসা করে ওদের সুস্থ করতে না পারো তা হলে অভিযান বাতিল হয়ে যাবে। তাই না?"

"তা ঠিক। কিন্তু আমি কখনওই চাই না ওরা অসুস্থ হোক।"

এইসময় বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। ওরা বাইরে এসে দেখল দলের সবাই ফিরে এসেছে। জন এগিয়ে এলেন, "গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কীরকম দেখলে?"

"তোমাদের ওপর খুব রেগে আছে ওরা। ভাবছে তোমরাই ওগুলো চুরি করিয়েছ। আমি অনেক বুঝিয়েছি।"

জন বললেন, "কী ঘটেছে সব খুলে বলো। ডিটেল্‌সে।"

অর্জুন বলল।

জন ওর হাত ধরলেন, "অনেক ধন্যবাদ।"

"তোমাদের কোনও কাজ হল?"

এবার ডানা এগিয়ে এল, "অনেকটা ঘুরেছি। তুষার-ভালুকরা বোধহয় আগেই খবর নিয়েছিল। কেউ ছবি তুলতে এগিয়ে আসেনি।"

জন বললেন, "রাবিশ। আমি দুটো ভালুকের পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছি। চারটে পা নয়, দুটো পায়ের ছাপ। এখান থেকে মিনিট পনেরো উত্তরে। তার মানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চলেছে ও দুটো। তার ওপর রাত্রে তুষার পড়েছে। দিনের বেলার টাটকা ছাপ নজরে আসেনি। এর থেকে প্রমাণিত হয় ওরা মাইল দু'য়েকের মধ্যেই আছে। এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। তুমি আবার কবে গ্রামে যাবে?"

অর্জুন বলল, "আমি আজ যেতে চাই।"

"কেন?"

"ওই পুরোহিতকে বাঁচাতেই হবে।"

"কিন্তু লোকটার অসুখ কী, তা তো জানো না।"

"সেইজন্যে জুডিকে নিয়ে যেতে চাই।"

"জুডিকে? না, না।"

"না কেন?"

"ওরা আমাদের পছন্দ করছে না। জুডির ক্ষতি করতে পারে।"

"আমি কথা দিচ্ছি সেটা করবে না।"

"তা ছাড়া জুডি খুব নিয়ম মেনে চলে। আমার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে অভিযানের সদস্যদের সে চিকিৎসা করবে। বাইরের লোককে দেখতে আমি তাকে বাধ্য করতে পারি না।"

"জুডি যদি নিজে যেতে রাজি হয়?"

জন অবাক হয়ে তাকালেন, "তাই নাকি? তা হলে যাও তোমরা।"

খাওয়াদাওয়া শেষ করে ওরা রওনা হল। ডানার খুব ইচ্ছে ছিল সঙ্গে যাওয়ার। কিন্তু জন নিষেধ করলেন। সকালে এতটা পরিশ্রম করার পর আবার বরফ ঠেঙিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আগামীকাল ভোরের আগেই বেরোতে হবে তাঁদের।

এখানে সন্ধে নামে ঝুপ করে। তবু হাতে ঘণ্টা তিনেক সময় আছে। জুডির ওষুধের বাক্সটা অর্জুন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। প্রথম প্রথম হাঁটার সময় জুডি ফানি, ইন্টারেস্টিং ইত্যাদি শব্দ বলছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সে চুপ করে গেল। অর্জুন ঘড়ি দেখল। একটু-একটু করে তাদের ওপরে উঠতে হচ্ছে। পায়ের তলায় জমাট তুষার থাকায় হাঁটতে হচ্ছে পা টেনে-টেনে। হাতে সময় আছে। সূর্যাস্তের আগেই তাদের ফিরে আসতে হবে। সে বলল, "হেলিকপ্টারে না এসে পুরো পথটা যদি পায়ে হেঁটে আসতে হত তা হলে আমি কিছুতেই আসতাম না।"

"আমিও না।" এই প্রথম হাসি দেখা গেল জুডির মুখে।

"চলো, ওই পাহাড়ের বাঁকটা ঘুরলেই গ্রামে পৌঁছে যাব।"

গ্রামের পথে উঠতেই চিৎকার শুনতে পেল ওরা। দু'-তিনটে বাচ্চা মাথার

ওপরে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে আর লাফাচ্ছে। ওরা এগোতেই তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। জুডি ভয় পেল, "কী ব্যাপার ? আমরা বিপদে পড়ব না তো ?"

"উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়লে যিশু কী করতে বলেছেন ?"

"সরি। আবার উপকার করার বাসনা আমার নেই।"

গ্রামে ঢুকতেই বয়স্কদের এগিয়ে আসতে দেখল ওরা। দোভাষী ওই দলে নেই। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। এই ভাষা অর্জুনের জানা নেই। ব্যাপারটা ওরা কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল। জুডি বলল, "তুমি এদের ভাষা আগেরবার কী করে বুঝলে ?"

"তখন দোভাষী ছিল।"

"তা হলে শেরপাদের একজনকে সঙ্গে নিয়ে আসা উচিত ছিল। ওরা নিশ্চয়ই বুঝবে।"

লোকগুলো চুপ করতেই অর্জুন জুডিকে ইশারা করে এগোল। গ্রামের মধ্যে দিয়ে ওরা হাঁটছে আর লোকগুলো পেছনে আসছে। এবং প্রতি পদক্ষেপে ওদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। দোভাষী কোথায় গেল। সে যদি না থাকে তা হলে একমাত্র ভরসা হচ্ছে ডাক্তারের বাবা।

পুরোহিতের ঘরের সামনে পৌঁছে সে জুডিকে বলল, "পেশেন্ট এখানে থাকে। আমার সঙ্গে এসো।"

জনতাকে বাইরে রেখে ওরা ভেতরে ঢুকল।

লোকটি ঘুমোচ্ছে। তার পাশে বসা বৃদ্ধা অর্জুনকে দেখে দু'হাত তুলে কিছু বলতে লাগল। ব্যাপারটা আশীর্বাদের মতো বলে মনে হল অর্জুনের। অর্জুনের হাত থেকে ব্যাগ নিয়ে জুডি পরীক্ষা আরম্ভ করল। প্রথমে নাড়ি দেখল। তারপর স্টেথো দিয়ে বুক পরীক্ষা করল। এইসময় লোকটি চোখ খুলল। কিন্তু সে এত ক্লান্ত যে, বেশিক্ষণ তাকাতে পারল না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "জ্বর কত ?"

জুডি মাথা নাড়ল, "এখন জ্বর নেই।"

"তা হলে ওষুধ কাজ করেছে, তাই না ?"

"হয়তো। কিন্তু সেটা সাময়িক। জ্বর আবার আসবে।"

"কী করে বুঝলে ?"

"ওর বুকে কফ বসে আছে। হার্ট বিট নর্মাল নেই। এখনই রক্ত পরীক্ষা করা দরকার।" বলেই জুডির খেয়াল হল, "সেটা তো এখানে সম্ভব নয়। হসপিটাল কতদূরে ? সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না ?"

"একদিনে পৌঁছনো যাবে না। আগে এলে আমাদের হেলিকপটারে পাঠানো যেত। হেলিকপটার আসবে তিনদিন বাদে।"

"তা হলে ?" জুডিকে চিন্তিত দেখাল।

"এভারেস্টের একশো গজ নীচে যদি কেউ অসুস্থ হয় ডাক্তার হিসেবে তার

চিকিৎসা যেভাবে করবে,এর ক্ষেত্রে তাই করো।"

অর্জুনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জুডি লোকটার চোখের পাতা সরিয়ে টর্চ দিয়ে দেখল। তারপর পেট টিপতে লাগল। লোকটা বলল "উঃ।"

জুডি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "কোথায় ব্যথা লাগছে? এখানে?"

অর্জুন হেসে ফেলে অবাক হল! জুডি দ্বিতীয়বার চাপ দিতেই লোকটা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ, ওখানেই লাগছে।

এইসময় ঘরে ঢুকলেন বৃদ্ধ। অর্জুন বলল, "আপনি এতদূরে আসতে পারলেন?"

"না এসে উপায় নেই। যে লোকটা হিন্দি জানত সে গিয়েছে সাত মাইল দূরের গ্রামে। এদের কথা তোমরা বুঝতে পারছ না বলে বাধ্য হয়ে আমাকে ডেকে এনেছে। এমনিতে এরা আমাকে পছন্দ করে না। চুরি যাওয়ার পর তো একঘরে করে রেখেছে।"

"কেন?"

"আমার ছেলে সাহেবদের স্কুলে পড়েছে। ডাক্তার হয়েছে। গ্রামের বাইরে জন্মেছে। আমি একটু ইংরেজি জানি। তাই। ছেলে কত বলেছে তার ওখানে গিয়ে থাকতে। কিন্তু আমি যাব না। এই গ্রাম আমার প্রাণ, এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরতে চাই।"

অর্জুন বৃদ্ধের সঙ্গে জুডির আলাপ করিয়ে দিল।

বৃদ্ধ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, "ইউ ডক্টর?"

"ইয়েস।"

"ম্যারেড?"

"নো।"

"গুড।" তারপর পুরোহিতকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাড?"

"ইয়েস।" জুডি মাথা নাড়ল।

বৃদ্ধ এবার অর্জুনের দিকে তাকিয়ে হিন্দিতে বলল, "এই যে শুনলাম তোমার দেওয়া ওষুধ খেয়ে ও ভাল হয়ে গিয়েছে, জ্বর সেরে গেছে? আমি বললাম, ওই ওষুধ আমার ছেলে আমাকে দিয়েছিল। তা হলে?"

"ইনি ডাক্তার। যা বলছেন ঠিকই বলছেন।"

বৃদ্ধ গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। ওঁর ইংরেজির শব্দভাণ্ডার শেষ হয়ে গিয়েছে। জুডি ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "একে কী খাওয়ানো হচ্ছে?"

বৃদ্ধ বুঝতেই পারলেন না কথাগুলো। অর্জুন হিন্দিতে বলতে তিনি পুরোহিতের পাশে বসা মহিলাকে প্রশ্নটা করলেন। জবাব শুনে জানালেন, "জল ছাড়া কিছুই খেতে চাইছে না।"

জুডি বলল, "একে বলো মাংসের স্টু করতে। আজ চার ঘণ্টা অন্তর এক কাপ করে স্টু খাওয়াবে। কাল যদি জ্বর না আসে মশলা ছাড়া সেদ্ধ খাবার

দেবে। এর লিভারে ব্যথা হয়েছে। কোনওরকম পরীক্ষা ছাড়া রোগ ধরা সম্ভব নয়। হার্টের কন্ডিশন ভাল নয়। জ্বর না এলে যেন ঘরের বাইরে যায়। এই ঘরে দেখছি হাওয়া ঢোকার উপায় নেই।" কথা শেষ করে জুডি ব্যাগ থেকে শিশি বের করে ইঞ্জেকশন তৈরি করল। তারপর লোকটার হাতে ওষুধ ঢুকিয়ে দিল। মুখে একটু ভাঁজ পড়ল লোকটার। একবার তাকাল। বৃদ্ধ তাকে ওদের ভাষায় বোধহয় সান্ত্বনা দিল। জুডি চারটে ক্যাপসুল বের করে অর্জুনের হাতে দিল, "আজ দুটো একসঙ্গে, সুপ খাওয়ানোর পর, আর কাল সকালে কিছু খাইয়ে খাওয়াতে বলবে।"

অর্জুন বৃদ্ধকে সব বুঝিয়ে দিল। এমনকী সুপ কী করে তৈরি করতে হবে সে-কথাও। বৃদ্ধ সেটা তর্জমা করে দিলে মহিলা মাথা নেড়ে ক্যাপসুলগুলো হাত পেতে নিল। বাইরে বেরিয়ে আসতে প্রধান এগিয়ে এসে তিনবার মাথা ঝুঁকিয়ে কিছু বলল। বৃদ্ধ তর্জমা করল, "প্রধান বলছে তোমার কাছে সবাই কৃতজ্ঞ। তুমি একবেলাতেই পুরোহিতের জ্বর সারিয়ে দিয়েছ। এখন থেকে তোমাকে ওরা বন্ধু বলে মনে করছে। তাই তোমাদের কিছু খাওয়াতে চায় সবাই।"

অর্জুন বলল, "অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমরা দুপুরের খাবার খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া সন্ধের আগেই ফিরে যেতে হবে।"

বৃদ্ধের তর্জমায় কান দিল না লোকগুলো। ওদের নিয়ে আসা হল মন্দিরের সামনে। বসার জায়গা এনে দিল। মেয়েরা জুডিকে দেখছিল কৌতূহলী চোখে। কেউ-কেউ এগিয়ে এসে ওর গায়ে হাত বোলাল। জুডি বিব্রত হলেও মুখে হাসি রেখেছিল। এইসময় খাদ্যদ্রব্য এল। বড়-বড় ঘটিতে চমরি গোরুর দুধ, পোড়া মাংস আর প্রচুর পরিমাণে ছুরপি। অর্জুনের অনুরোধে দুধে চুমুক দিয়ে ছুরপি নিল জুডি। অর্জুনও মাংস খেল না। অনেক সাধাসাধিতেও নয়। এ কোন প্রাণীর মাংস আন্দাজ করা মুশকিল। আকৃতি দেখে বোঝাই যাচ্ছে প্রাণীটি ছোট নয়।

দুধটাও শেষ করতে পারল না ওরা। ছুরপিগুলো পকেটে রেখে রওনা হল ওরা। অর্জুন দেখল চারজন গ্রামবাসী ওদের সঙ্গে চলেছে। প্রচুর পরিমাণে শীতবস্ত্র পরে ওদের দিকে তাকিয়ে সংকোচ হচ্ছিল তার। কম্বল জাতীয় বস্ত্র শরীরে জড়িয়ে হাঁটছে। মাথায় কিছু নেই। পায়ে টায়ারের চটি। ওরা ওদের এগিয়ে দিতে চলেছে বুঝতে পেরে নিষেধ করল অর্জুন। ওরা শুনছিল না। অনেক চেষ্টার পর ওদের ফেরত পাঠাতে পারল সে।

জুডি চুপচাপ দেখছিল। ওরা চলে যেতে সে বলল, "আমি না বলে পারছি না এই মানুষগুলোর মন খুব ভাল।"

অর্জুন বলল, "চিরকালই নিঃস্ব মানুষেরা ভাল হয়।"

"কেন?"

"ওদের মনে জটিলতা থাকে না।"

"জন বলছিল ওরা আমাদের ওপর খুব রেগে আছে। হয়তো ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু কিছুই করল না।" জুডি হাঁটতে-হাঁটতে বলল।

"উপকার পেলে এরা মনে রাগ পুষে রাখে না।"

জুডি হাসল, "আচ্ছা তুমি কি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ? জন যখন বলেছিল তখন আমি ভেবেছিলাম শার্লক হোম্‌সের মতো কেউ পাইপ হাতে আসবে। তোমাকে দেখে খুব হতাশ হয়েছিলাম। তুমি ওদের চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসগুলো উদ্ধার করতে পারবে ?"

"জানি না। আজ দু'বার ওখানে গিয়েছিলাম, কিন্তু কোনও ক্লু পাইনি।"

"তা হলে ?"

"দেখা যাক ভাগ্যে কী আছে ?"

"আচ্ছা, গল্পের বইয়ে দেখেছি গোয়েন্দারা কখনও ব্যর্থ হয় না। তাই না ?"

"ব্যর্থ হলে পাঠক সেই গোয়েন্দার গল্প আর পড়বে না।"

"তুমি কি কখনও ব্যর্থ হয়েছ ?"

"অনেকবার। তবে আমার ভাগ্য ভাল, সেগুলো প্রচারিত হয়নি।"

দিনটা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছিল। সূর্যদেব পশ্চিমের আকাশে আরও কিছুক্ষণ হয়তো থাকবেন কিন্তু পাহাড় তাঁকে আড়াল করে দিয়েছে ইতিমধ্যে। অর্জুন দেখল হঠাৎ বরফের চেহারা বদলে গেল। অপূর্ব এক মায়াময় আলো এখন চারপাশে ছড়িয়ে। এই আলোতে কোনও তেজ নেই। ন্যাতানো, মিইয়ে যাওয়া মুড়ির মতো অস্বস্তিকর। অর্জুন বলল, "তাড়াতাড়ি। সন্ধে নেমে গেলে খুব মুশকিল হবে।"

"কী হবে ?"

"রাস্তা হারিয়ে ফেললে সারারাত এখানে বেঁচে থাকব না।"

"এখানে রাস্তা কোথায় ?"

"বাঃ, আমাদের পায়ের ছাপ দেখতে পাচ্ছ না ?"

তখনও ক্যাম্প নজরে পড়ছে না। হঠাৎ জুডি দাঁড়িয়ে গেল।

অর্জুন পেছনে ছিল, জিজ্ঞেস করল, "কী হল ?"

"কোনদিকে যাব ? এদিকেও ছাপ ওদিকেও ছাপ।"

অর্জুন দেখতে পেল। নরম বরফে পায়ের ছাপ পড়েছে। দু'দিকে দুটো লাইন। ডানদিকের ছাপটা এই অবধি এসে আবার ফিরে গিয়েছে। সেই ছাপ মানুষের পায়ের নয়।

অর্জুন বলল, "একটু ওপাশে গিয়ে দেখি। এসো।"

"ওটা তো আমাদের পায়ের ছাপ নয়।"

"না।" ওরা খানিকটা হেঁটে একটা বরফের টিলার ওপর উঠে এল। সামনেই পাহাড়, মাঝখানে দুটো ফুটবল-মাঠের মতো জায়গা বরফে ঢাকা।

হঠাৎ জুডি অর্জুনের হাত শক্ত করে চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, "লুক, লুক !"

জুডির হাত লক্ষ করে অর্জুন দেখল, বরফের ওপর একটা কালো প্রাণী হেঁটে যাচ্ছে। আলো কমে যাওয়ায় এবং দূরত্ব থাকায় স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু প্রাণীটি তাদের দিকে পেছন ফিরে হেঁটে আচমকা কোথায় মিলিয়ে গেল। জুডি চিৎকার করে উঠল, "ইয়েতি ! আই অ্যাম শিওর। ইট'স ইয়েতি !"

অর্জুন কোনও কথা বলতে পারল না। নিজের চোখকে সে অবিশ্বাস করবে কী করে ?

জুডি বলল, "তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। জনকে বলতে হবে ব্যাপারটা। এখনই যদি ওই পায়ের চিহ্ন ধরে খোঁজা যায় তা হলে পৃথিবীর আশ্চর্যতম আবিষ্কারটা করে ফেলব আমরা।"

ক্যাম্পে পৌঁছবার শেষদিকটায় প্রায় অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছিল। তাঁবুর আলো তাদের পৌঁছতে সাহায্য করল। জন খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, "এ কী কাণ্ড। তোমরা এত দেরি করলে ? চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। এখনই আমরা রওনা হচ্ছিলাম তোমাদের খুঁজতে। ওরা কি তোমাদের আটকে রেখেছিল ?"

জুডি প্রবলভাবে মাথা নাড়ল, "নো, নো। ওরা খুব ভাল লোক। ফিরে আসার সময় এমন একটা জিনিস দেখলাম যা তোমরা ভাবতে পারবে না।"

"কী জিনিস ?"

"ইয়েতি।" উত্তেজিত গলায় বলল জুডি।

দলের অন্য সদস্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ডানা বলল, "জন, তুমি বলেছিলে ইয়েতি বলে কিছু নেই। তোমরা ওর আগে প্রমাণ করেছ। তা হলে ডক্টর জুডি সেটাকে দেখলেন কী করে ?"

জুডি রেগে গেল, "অর্জুনকে জিজ্ঞেস করো।"

সবাই অর্জুনের দিকে তাকাল। অর্জুন বলল, "আমি একটা প্রাণীকে হেঁটে যেতে দেখেছি। বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। অনেকটা দূরে ছিল ও, আমাদের দিকে পেছন ফেরা। ওটা যে ঠিক কী, তা বলতে পারব না।"

জন বললেন, "জুডি ভুল করছে। হয়তো আশপাশের কোনও গ্রামের মানুষ যাচ্ছিল। ওরা সন্ধের সময়েও আসা-যাওয়া করতে অভ্যস্ত।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। ওই প্রাণী মানুষ নয়। ওর পায়ের ছাপ অনেক বড় এবং গোল।"

কথাটা শোনামাত্র জন চেঁচামেচি করে শেরপাদের ডাকতে লাগলেন। তারা এলে জন বললেন, "আমার মনে হচ্ছে তুষার-ভালুক আমাদের খুব কাছে চলে এসেছে। অর্জুনরা ওর পায়ের ছাপ দেখে এসেছে। এখন না গেলে রাত্রে যে তুষার পড়বে তাতে আর কোনও চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। চলো, বেরিয়ে

পড়ি।”

শেরপাদের নেতা বলল, “আপনি আদেশ করলে আমরা যেতে বাধ্য। কিন্তু আপনার তো অভিজ্ঞতা আছে সার। অন্ধকারে টর্চ নিয়ে গেলেও বরফের ওপর হেঁটে যাওয়া উচিত নয়।”

“আমি জানি। কিন্তু এমন সুযোগ সবসময় পাওয়া যায় না।”

শেরপাদের নেতা অর্জুনের কাছে পুরো ঘটনাটা শুনতে চাইল। অর্জুন বলার পর লোকটা মাথা নাড়ল, “সার, সুযোগ আবার পাওয়া যাবে।”

“কী করে বলছ?”

“জানোয়ারটা মানুষের পায়ের ছাপ পর্যন্ত এসে ফিরে গিয়েছে। ও একা ছিল। গ্রামের মানুষদের সম্পর্কে ওদের তেমন কৌতূহল নেই। কিন্তু আমাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই আছে। এই কারণেই আবার ফিরে আসবে। নরম বরফের ওপর ওরা চার পায়ে হাঁটে বলে বিপদে পড়ে না। আমরা পড়তে পারি।”

জুডি বলল, “কিন্তু ওটা দু'পায়ে হাঁটছিল।”

“ও নিজের পায়ের ছাপ দেখে ফিরে যাচ্ছিল বলে জানত দু' পায়ে হেঁটে গেলে বিপদে পড়বে না। ওরা মানুষকে নকল করে দু' পায়ে হাঁটে যখন ইচ্ছে হয়।”

যে-যার তাঁবুতে চলে গেলে জনকে পুরোহিতের কথা বলল অর্জুন। জন মন দিয়ে শুনে বললেন, “এটা খুবই মানবিক কাজ কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে।”

“কীরকম?”

“লোকটার আয়ু যদি সত্যি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে তা হলে কোনও চিকিৎসায় কাজ হবে না। তা ছাড়া হসপিটালে যেভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব তা এখানে জুডি করতে পারবে না। লোকটা মরে গেলে ওদের মনে হবে তোমাদের দেওয়া ওষুধ খেয়ে মারা গেল। তাই না?”

“আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু ক্রোসিন ট্যাবলেট খেয়ে লোকটার জ্বর কমে গিয়েছিল। জুডি বলেছে অবশ্য, ওর অবস্থা ভাল নয় কিন্তু এখনও মারা যাওয়ার আশঙ্কা নেই। ওকে সুস্থ করে তুলতে হবেই। সাময়িকভাবে হলেও সুস্থ করা দরকার।” অর্জুন জোর গলায় বলল।

“কেন?”

“মন্দির থেকে জিনিসগুলো যে-রাত্রে চুরি হয় তারপরেই লোকটা অসুখে পড়ে। আমি জানি না সেই রাত্রে পুরোহিত মন্দিরে ছিল কিনা।”

“ইন্টারেস্টিং।”

একটু পরেই ঝড় শুরু হল। দিনের আকাশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু সন্ধের কিছু পরেই যে প্রকৃতি রুদ্র চেহারা নেবে, ভাবা যায়নি। পাহাড়ের আড়ালে

থাকায় সরাসরি ঝড়ের আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে না তাঁবুগুলোকে। কিন্তু তার শোঁ-শোঁ আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছিল কয়েকশো রাগী বাইসন দৌড়ে যাচ্ছে। জন বিড়বিড় করে বললেন, "দিস ইজ ব্যাড। খুব খারাপ। এরকম ওয়েদার আমি পছন্দ করছি না।"

ঘড়িতে এখন মাত্র সাতটা বেজে দশ। অর্জুন তাঁবুর দরজা খুলে বাইরে তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সামনের পৃথিবীতে যে তাণ্ডব চলছে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে। এর মধ্যে একজন শেরপা দৌড়ে তাদের রাতের খাবার নিয়ে এল।

জন লোকটাকে বললেন, "তোমরা খুব ভাল পরামর্শ দিয়েছ। তখন বের হলে খুব বিপদে পড়তাম।" লোকটা খুশি হয়ে চলে গেল।

খাওয়া শেষে প্রাকৃতিক কাজ করতে বাইরে বের হতে হল। ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে খুব। জন বললেন, "তুষার-ঝড় হচ্ছে। সকালে কোনও পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাব না।"

শুতে যাওয়ার আগে জন সবক'টা তাঁবু ঘুরে এলেন। ঝুলন্ত বিছানায় শুয়ে আজ অর্জুনের খুব রোমাঞ্চ লাগছিল। এতদিন বইয়ের পাতায় যা পড়ে এসেছে আজ তা বাস্তবে ঘটছে। আজকের তুষার-ঝড় অথবা এস্কিমোদের নিয়ে কত কাহিনী লেখা হয়েছে। বাংলা কোনও গল্প-উপন্যাসে এসব পাওয়া যায়নি। অথচ হিমালয় কত কাছে। এক ঘণ্টা উড়ে গেলেই বরফের রাজত্বে পৌঁছনো যায়। আচ্ছা, যদি ওই প্রাণীটা সত্যি ইয়েতি হয়?

ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে-ভাবতে কখন ঘুম এসে গিয়েছিল। ঘুম ভাঙল চিৎকার শুনে। শেরপারা চেঁচাচ্ছে। তাদের গলা দাপিয়ে জনের কণ্ঠস্বর কানে এল, "ডোন্ট শুট। কেউ বন্দুকের আওয়াজ কোরো না।"

ধড়মড়িয়ে বিছানা থেকে নীচে নেমে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি শীতবস্ত্র জড়িয়ে বাইরে এসে অর্জুন দেখল মশালের মতো আলো হাতে নিয়ে শেরপারা তখনও চেঁচিয়ে চলেছে। দলের অন্য সদস্যরা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তাকে দেখে ডানা এগিয়ে এসে বলল, "এতক্ষণে ঘুম ভাঙল!"

"কী হয়েছে?" অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না।

"তুষার-ভালুক এসেছিল। শেরপারা বলছে দুটোকে দেখেছে।"

"কোথায়?"

"আমাদের তাঁবু আঁচড়াচ্ছিল। আমার ঘুম ভেঙে যেতে চিৎকার করি। তখন শেরপারা বেরিয়ে পড়ে ওদের তাড়ায়।"

"তুমি দেখেছ?"

"বা রে! আমি দেখব কী করে? আমি তো তখন তাঁবুর ভেতরে ছিলাম।"

এইসময় একজন সদস্য এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এত তাঁবু

ছিল, কিন্তু তোমাদেরটায় ওরা পৌঁছল কেন ?”

ডানা মাথা নেড়ে বলল, “জানি না।”

অর্জুন বলল, “আমার মনে হয় ওদের কেউ আহত অথবা অসুস্থ হয়েছে।”

ডানা চোখ বড় করল, “তার মানে ?”

“ওরা বোধহয় ডাক্তারের কাছে এসেছিল।”

সবাই মজা পেয়ে হেসে উঠল। শুধু জুডি রাগত ভঙ্গিতে বড়-বড় পা ফেলে তার তাঁবুর ভেতর চলে গেল! ডানা বলল, “হয়ে গেল। তোমার সঙ্গে ঘুরে আসার পর ও আজই একটু ভাল মুডে ছিল, তুমি তার বারোটা বাজিয়ে দিলে।”

প্রাণীগুলো এখন কাছাকাছি নেই বোঝার পর জন সবাইকে নিয়ে মিটিং করলেন। শুধু জুডি তার তাঁবু থেকে বের হল না।

জন বললেন, “আমি শুনেছি এই ধরনের ভালুকরা মানুষকে নকল করতে খুব পছন্দ করে। কিন্তু নিজে থেকে আক্রমণ করে বলে শুনিনি। এমন হতে পারে খাবারের গন্ধ পেয়ে ওরা এখানে চলে এসেছিল। আমরা কখন ঘুমোচ্ছি, কখন জেগে আছি এই পার্থক্যটা ওরা করতে পেরেছে। তাই আত্মরক্ষার জন্যে আমাদের একজন সদস্য আর একজন শেরপা প্রত্যেক রাত্রে জাগবে। যে জাগবে সে পরের দিন বিশ্রাম পাবে। যারা জাগবে তারা সন্দেহজনক কিছু দেখলেই চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে দেবে।”

একজন সদস্য জিজ্ঞেস করলেন, “সেটা দেখতে হলে তো খোলা আকাশের নীচে বসে থাকতে হয়। তা কি সম্ভব ?”

জন মাথা নাড়লেন, তা সম্ভব নয়। তিনি আর একটা তাঁবু খাটাতে বললেন যার সামনের দিকটা খোলা থাকবে। মাথার ওপর এবং পেছনের পাহাড়ের দিকটায় আড়াল থাকবে। দু'পাশের আড়াল দেখার কাজে অসুবিধে ঘটাবে না। ওরা যখন তাঁবু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন অর্জুন জুডিদের তাঁবুতে গেল।

“ভেতরে আসতে পারি ?”

“কী ব্যাপার ?” জুডি একটা চেয়ারে বসে ছিল।

“আমি তোমার সঙ্গে রসিকতা করেছিলাম। তুমি রেগে গেছ বলে আমি দুঃখিত।”

“হ্যাঁ, আমি তো এখানে রসিকতার বস্তু!”

“তার মানে ?”

“সারাটা সন্ধে ডানা আমাকে খেপিয়েছে ইয়েতি দেখেছি বলে। তারপর তুমিও—।” কথা শেষ করল না জুডি।

“আচ্ছা, যদি ইয়েতি বলে কিছু থাকে, যাকে দেখেছি সে যদি সত্যি ইয়েতি হয় আর আহত হয়ে তোমার কাছে চিকিৎসার জন্যে আসে তা হলে তুমি তার

চিকিৎসা করবে না ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

জুডি অবাক হয়ে তাকাল। তারপর বলল, "অবশ্যই।"

"রসিকতাকে ওইভাবে নাও না! সত্যি আমি তোমাকে আহত করতে চাইনি। আমি বলি কী, জন চাইছে দু'জন করে রোজ রাত জাগুক। আমাদের তো কাল সকালে কোনও কাজ নেই, তাই আমরাই প্রথমদিন পাহারাটা দিই। কি, তোমার আপত্তি আছে ?"

"আমি ?"

"হ্যাঁ। আমিও থাকব। যদি আবার ওরা আসে তা হলে দেখে বুঝতে পারব শ্বেত-ভালুক না ইয়েতি, কোনটা ঠিক।"

"দ্যাটস এ গ্রেট আইডিয়া।" উঠে দাঁড়াল জুডি।

"অবশ্য জন রাজি হবে কিনা জানি না।"

"কেন ?"

"এত ছেলে থাকতে মেয়েদের এই দায়িত্ব দিতে চাইবে কি ?"

"ও-কথা বললে আমি প্রতিবাদ করব।"

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জুডি সোজা জনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, "জন, আজ রাত্রে আমি পাহারা দিতে চাই। তোমার আপত্তি আছে ?"

জন জুডির মুখের দিকে তাকালেন, "বিন্দুমাত্র নয়।"

এমন উত্তর জুডি আশা করেনি। সে অর্জুনকে দেখল, তারপর বলল, "আমি তো ক্যাম্পে সারাদিন বসেই থাকব। দলের সবাই কাজে যাবে। তাই আমার রাত জাগতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

জন মাথা নাড়লেন, "সে-কথা ঠিকই। তবে ডানাকে তোমার সঙ্গে দিতে পারছি না।"

ডানা বলল, "আমার মনে হয় অর্জুন জুডির সঙ্গে থাকতে পারে।"

অর্জুন বলল, "আমার আপত্তি নেই।"

একটা রাইফেল দেওয়া হল ওদের। বলা হল বিপজ্জনক কিছু দেখতে পেলে শূন্যে গুলি ছুড়তে কোনও অবস্থাতেই যেন তুষার-ভালুককে আঘাত না করা হয়।

জুডি এবং অর্জুন বসে ছিল সদ্য নির্মিত ছাউনির নীচে। ওদের পেছনে পাহাড়ের আড়াল। একপাশে ক্যাম্পের বিছানাগুলোতে যে-যার মতো আরামে ঘুমোচ্ছে। যে-কোনও প্রাণীকে ওদের তাঁবুর দিকে পৌঁছতে হলে ওদের সামনে দিয়ে এগোতে হবে। অর্জুন সমস্ত শরীর মুড়ি দিয়ে বসেও ঠাণ্ডা এড়াতে পারছিল না। মাথার ওপর আচ্ছাদন রয়েছে, কিন্তু সামনের খোলা অংশ দিয়ে ঠাণ্ডা যেন হুড়মুড়িয়ে ঢুকছে। সে জুডির দিকে তাকাল। ওকে এখন মেয়ে বলে আলাদা করা যাবে না। দুটো চেয়ারে সারারাত জেগে বসে থাকতে হবে ওদের। সামনের অন্ধকার এখন অনেক চোখ-সয়ে গেছে। আকাশে মেঘ

নেই। ওই তুষার-ঝড়ের পর একটা দারুণ ঝকঝকে আকাশ অজস্র তারা নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এত দ্রুত প্রকৃতির চেহারা বদলে যায়!

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের নিউজিল্যান্ডে এমন ঠাণ্ডা পড়ে?"

জুডি মাথা নাড়ল, "না। এইসময় স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর যারা আছে তারা সত্যি ভাগ্যবান। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কী?"

"ইয়েতিদের গায়ে নিশ্চয়ই খুব জোর হয়?"

"ইয়েতিদের কেউ দ্যাখেনি!"

"যেন ভগবানকে সবাই দেখেছে! এমন কথা বলো!"

"তা হলে নিশ্চয়ই হয়। এই বরফের ওপর দুর্বল প্রাণী বাঁচতে পারে না।"

"উঃ কী ঠাণ্ডা! তুমি সিগারেট খাও?"

"খেতাম। এখন চেষ্টা করছি না খেয়ে থাকতে।"

"কিন্তু এই ঠাণ্ডায় একটা সিগারেট ধরালে ভাল হত।"

"সরি। আমার সঙ্গে প্যাকেট নেই!"

তারপর কোনও কথা নেই। দু'জনেই চুপচাপ। অর্জুন দেখল আকাশের তারারা বরফের ওপর জোনাকি-জোনাকি-আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এখন অন্ধকার তেমন নেই। এই বরফের পৃথিবীটাকে কী মায়াময় মনে হচ্ছে এখন। অথচ এইসময় ওখানে বেড়াতে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। কোথায় বরফের খাদের ওপর তুষার জমে আছে, পা দিলেই তলিয়ে যেতে হবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল অর্জুন, জুডির হাত তাকে স্পর্শ করা মাত্র সে দেখতে পেল, গুঁড়ি মেরে কিছু এগিয়ে আসছে ডানদিক থেকে। না, ওরা ইয়েতি তো দূরের কথা, বড়সড় কোনও জানোয়ারও নয়। একসঙ্গে চারটে। প্রথমে মনে হয়েছিল কুকুর, কিন্তু তারপর চিনতে পারল। বড় লোমওয়ালা চারপেয়ে জন্তুগুলো শেয়াল ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই বরফের ওপর শেয়াল কোত্থেকে এল?

জুডি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী করবে?"

"কিছু না। শুধু দেখে যাও।" ফিসফিস করে বলল অর্জুন।

শেয়াল চারটে শেষপর্যন্ত সাহসী হয়ে এগোতে লাগল। তারপর হঠাৎই ওদের একজন ঘুরে মুখ ওপরে করে নাক টানতে লাগল। জলপাইগুড়িতে যে শেয়াল অর্জুন দেখেছে তার চেয়ে অনেক বড় এবং শক্তিশালী এরা। অর্জুন আচমকা 'হ্যাট' বলে চেঁচিয়ে উঠতেই ওরা ছিটকে অনেকটা দূরে চলে গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল। এবার ওরা বুঝতে পেরেছে মানুষ জেগে আছে। একজন দুই থাবায় বরফ ছিটোল। একজন গোঁ-গোঁ করতে লাগল রাগে। ঠিক তখনই দূরে, বহু দূরে অদ্ভুত একটা আওয়াজ হল। যেন কিছু ডেকে উঠল। অস্পষ্ট আওয়াজ। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হল খুব। শেয়াল চারটে দ্রুত মিলিয়ে গেল

চোখের সামনে থেকে।

জুডি জিজ্ঞেস করল, "কীসের আওয়াজে ওরা ভয় পেল ?"

অর্জুন বলল, "বোধহয় আরও বড় কোনও জন্তু।"

জুডি বলল, "আমি ভাবতেই পারছি না এই আদিগন্ত বরফের রাজ্যে জন্তুগুলো কী করে থাকে ? খায় কী ?"

"নিশ্চয়ই প্রকৃতি ওদের খাবার জোটায়। মেরুদেশের তুষার-ভালুকরা শুনেছি সিল মাছ খেয়ে বেঁচে থাকে। আবার ওদের খাওয়ার পর যেটুকু পড়ে থাকে তাই খেয়ে বাঁচে শেয়ালজাতীয় প্রাণীরা।" অর্জুন বলল।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ। জ্যোৎস্নায় চারপাশ স্বপ্নের মতো দেখাচ্ছে। জুডি বিরক্ত হয়ে বলল, "আমি বুঝতে পারছি না জন কেন বরফের ওপর ক্যাম্প করল। ওই ওপাশের পাহাড়ে তো শুকনো জায়গা অনেক পড়ে আছে, যেমন ওই গ্রামটা, ওরকম কোনও জায়গায় ক্যাম্প করলে পায়ের নীচে এত ঠাণ্ডা হত না!"

"আমি জনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উনি বললেন, এখানে ক্যাম্প করলে তুষার-ভালুকের কাছাকাছি থাকা যাবে। বরফের ওপর দিয়ে সোজা এখানে ওরা চলে আসতে পারে।"

সারারাত জেগে দিনের আলো ফুটলে ঝুলন্ত বিছানায় গিয়েছিল অর্জুন। ঘুম যখন ভাঙল, তখন দুপুর। ক্যাম্প ফাঁকা। অভিযাত্রীরা বেরিয়ে গেছে অনুসন্ধানে। তৈরি হয়ে এক মগ চা নিয়ে চুমুক দিতে-দিতে সে গেল জুডির তাঁবুতে। দু'বার ডেকেও যখন সাড়া পাওয়া গেল না তখন বুঝল মেয়েটা এখনও গভীর ঘুমে

এখানে স্নান করার বালাই নেই। প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারতে বেশ কষ্ট হয়। আজ ব্রেকফাস্ট খাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। অর্জুন দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল। ওই ভারী জুতো, মোজা থেকে টুপি পর্যন্ত সমস্ত শরীর ভারী শীতবস্ত্রে মুড়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটতে মোটেই স্বচ্ছন্দ নয় সে। তবে গতকালের চেয়ে আজ একটু জোরে পা ফেলতে পারছে। অভিযাত্রীরা এদিকে যায়নি! কিন্তু গতকাল সে আর জুডি যে আসা-যাওয়া করেছিল তার কোনও চিহ্ন বরফের ওপর নেই। গত রাত্রে বয়ে যাওয়া তুষার-ঝড় এবং শেষে পড়া মিহি তুষার সেসবের ওপর যেন সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। ফলে যে জায়গা থেকে সেই অজানা প্রাণীর পায়ের চিহ্ন শুরু হয়েছিল তার হদিস পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

গতকালের মতো আজও গ্রামবাসীরা তাকে দেখে উল্লসিত হল। অর্জুন দেখল, দোভাষী হাসিমুখে এগিয়ে আসছে, "আমি তোমার ওখানে যাব বলে ভাবছিলাম।"

"কেন ?" অর্জুন অবাক হল।

"আমাদের পুরোহিত উঠে বসেছে, কথা বলেছে। শুনলাম গতকাল তোমার সঙ্গে একজন মহিলা এসেছিলেন, তিনি ভাল ওষুধ দিয়েছিলেন। আমি ছিলাম না বলে নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হয়েছিল, তাই না ?"

'না, তেমন কোনও অসুবিধে হয়নি।' তবু লোকটাকে হতাশ করল না অর্জুন।

সে সোজা চলে গেল পুরোহিতের বাড়িতে। পেছনের ভিড়টাকে বাইরে রেখে দোভাষীর সঙ্গে ভেতরে ঢুকল অর্জুন। তাদের দেখে পুরোহিত উঠে বসে একগাল হাসল। কিন্তু সেই মহিলা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন রাগত ভঙ্গিতে। অর্জুন কারণ জানতে চাইলে দোভাষী বলল, "সুস্থ হতেই পুরোহিত নাকি আর সুপ খেতে চাইছে না। অথচ ওই খেয়েই তো সুস্থ হয়েছে। তাই ওর বউ রাগারাগি করছে।"

অর্জুন পুরোহিতের শরীর ছুঁয়ে দেখল, একদম স্বাভাবিক উত্তাপ। আপাতচোখে মনে হচ্ছে সুস্থ। কিন্তু জুডি বলেছে অবিলম্বে ওকে হাসপাতালে ভর্তি না করলে ফল খারাপ হবে। এই সুস্থতা খুবই সাময়িক।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কথা বলতে পারবে ?"

দোভাষী তর্জমা করতেই লোকটা চটপট জবাব দিল। কথাবার্তা বলতে লাগল তর্জমার মাধ্যমে, "কথা বলা কী, আমি এখন দৌড়তে পারি। কিন্তু আমার বউ কিছুতেই এই ঘরের বাইরে যেতে দিচ্ছে না।"

"উনি ভালই করছেন। তুমি তো পুরোহিত ?"

"হ্যাঁ। আমার বাবাও এই কাজ করত।"

"তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায় ?"

"কেউ নেই। আমার ছেলেমেয়ে নেই।"

"যে-রাত্রে মন্দির থেকে চুরি হল সে-রাত্রে তুমি ওখানে ছিলে ?"

লোকটি চট করে মাথা নামিয়ে নিল।

অর্জুন বলল, "সবাই বলছে তুমি ছিলে। ভোরবেলায় তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো। তারপরই জ্বর আসে ঠিক তো ?"

লোকটা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"তুমি কি রোজ মন্দিরে থাকতে ?"

"না।"

"তা হলে সেদিন ছিলে কেন ?"

"আমি একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নটা কী মনে নেই। ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর খুব খারাপ লাগছিল। বউকে বললাম মন্দির থেকে ঘুরে আসি। তাতে মন ভাল হয়ে যাবে। তাই মন্দিরে গিয়েছিলাম।"

"তখন ক'টা বাজে ?"

"এখানে সময় কেউ বলতে পারবে না। তবে রাত শেষ হতে বেশি দেরি ছিল না। চাঁদ আকাশের অনেক নীচে নেমে গিয়েছিল।"

"তখন মন্দিরে কেউ ছিল ?"

"না।"

"মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল ?"

"হ্যাঁ। আমি গিয়ে খুলি।"

"তারপর ?"

"মন্দিরে প্রদীপ জ্বলছিল। আমি চুপচাপ বসে ছিলাম। হঠাৎ মনে হল বাইরে কিছু নড়ছে। তাকিয়ে দেখি ওই শয়তানের পাথরটার ওপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা ভয়ংকর ভূত আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। মাথা ঘুরতে লাগল, পেটে যন্ত্রণা শুরু হল। আমি চিৎকার করতে গেলাম কিন্তু কোনও শব্দ বের হল না। এইসময় ভূতটা আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি আর কিছু মনে করতে পারছি না। ওঃ!" লোকটার শরীর আবার কেঁপে উঠল।

"তুমি কি জানো মন্দির থেকে পবিত্র মাথা আর চামড়া চুরি গিয়েছে ?"

"আমাকে বউ বলেছে।"

"কে চুরি করেছে জানো ?"

"আমি জানি না। সত্যি বলছি জানি না।"

"ভয়ংকর ভূতটাকে দেখতে কেমন ?"

লোকটা চোখ বন্ধ করল, "লম্বা, বিশাল চেহারা, মুখটা বীভৎস। গায়ে লম্বা লোম ছিল। হেঁটে আসছিল পাহাড়টাকে আড়াল করে।"

"কোনও কথা বলেছে ?"

"না। বললেও আমি শুনিনি। আমার কোনও হুঁশ ছিল না।"

বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুন দোভাষীকে বলল, "ওকে যদি বাঁচাতে চাও তা হলে এখনই হাসপাতালে নিয়ে যাও।"

"কেন ? ও তো ভাল হয়ে গেছে!" দোভাষী অবাক!

"এটা খুব সাময়িক। সেই রাত্রে ও মনে ধাক্কা খেয়েছিল। হয়তো সেই কারণে বুকের রোগ হতে পারে। ওর পেটে যে ব্যথা আছে তা এতদিন চাপা ছিল বলে নিজেই টের পায়নি। এখন এইসব বড় হয়ে উঠবে।"

"কিন্তু হাসপাতাল তো অনেকদূরে।"

"নিয়ে যাওয়া যাবে না ?"

"ওখানে নিয়ে যেতে বাহকদের যে টাকা দিতে হবে তা পুরোহিতের নেই। যদি সত্যি হয় তোমার কথা তা হলে ওর এখানেই মরে যাওয়া উচিত, তাতে ও শান্তি পাবে।"

"বুঝতে পারছি। যদি আমাদের হেলিকপটার এর মধ্যে আমাদের ক্যাম্পে

আসে তা হলে ওকে কাঠমণ্ডুর হাসপাতালে পাঠাতে পারি। এতে নিশ্চয়ই তোমরা আপত্তি করবে না ?"

"ওখানে একা গেলে ও মরে যাবে। কথা বলার লোকই পাবে না।"

"পাবে। তোমাদের গ্রামের একটা ছেলে ওখানকার ডাক্তার।" অর্জুন বলল, "সে ওর দেখাশোনা করবে।"

দোভাষীর মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল সে প্রস্তাবটা পছন্দ করছে না। বলল, "এই ব্যাপারটা নিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলে তোমাকে জানাব।"

মন্দিরের কাছে পৌঁছে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা তো এখানে জন্মেছ। যে-কোনও কাজে কোথাও যেতে হলে বরফের ওপর দিয়ে যেতে হয়। তুমি কখনও তুষার-ভালুক দেখেছ ?"

"অনেকবার দেখেছি। কতবার দেখেছি মনে নেই।"

"ওরা এখানে আসে ?"

"একসময় ওরা খুব জ্বালাত। ফসল নষ্ট করে দিত। ওপরের পাহাড়ে ভুট্টা যখন পাকত তখন হামলা করত। আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠতাম না।"

"তারপর ?"

"আমরা লক্ষ করেছিলাম ওরা মানুষকে খুব নকল করে। দূর থেকে কোনও মানুষকে হাঁটতে দেখলেই ওরা পেছনের দুই পায়ের ওপর ভর রেখে হেঁটে চলে। ওই যে ডানদিকের বরফের পাহাড়ের ওপাশে ওদের ডেরা। ভুলেও কেউ ওদিকে যাই না। একবার আমরা বিকেলের দিকে ওই পাহাড়ের নীচে গেলাম দল বেঁধে। একটা বড় পাত্রে জল রেখে দুটো দলে আলাদা হয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট করতে লাগলাম। পুরোটাই ছিল অভিনয়। মার খেয়ে যে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিল সে-ও সেটা অভিনয় করেই করছিল। তারপর সবাই ওই পাত্রে মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে জল খেয়ে নিল। আমরা জানতাম ওরা নিশ্চয়ই আড়াল থেকে আমাদের লক্ষ করছে। চলে আসার আগে ওই জলের সঙ্গে খুব কড়া মদ মিশিয়ে দিলাম। ওরকম মদ একপাত্র খেলে মানুষ একদিন-রাত ঘুমিয়ে থাকবে। ওখান থেকে সরে এসে আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা লক্ষ করছিলাম। সেদিন ছিল চাঁদের রাত। তাই অন্ধকার নামল না। জ্যোৎস্নায় ওপর থেকে নেমে এল গোটাচারেক ভালুক। আমরা যেখানে যুদ্ধ করেছিলাম সেখানে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে মারপিট শুরু করে দিল ওরা। একেবারে হুবহু নকল করছিল ওরা। তারপর ক্লান্ত হলে আমাদের মতো পাত্রে মুখ ডুবিয়ে পান করতে লাগল একের পর এক। কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম ওরা টলছে এবং শেষ পর্যন্ত মাটিতে পড়ে গেল। আমরা তখন ছুটে গিয়ে নেশায় অজ্ঞান হওয়া ভালুকদের মেরে ফেললাম। ওদের চামড়া খুব কাজে লেগেছিল। দু'দিন ধরে মাংস খেয়েছিল গোটা গ্রাম। তারপর থেকে ওরা আর ঝামেলা করেনি।"

ঘটনাটাকে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অর্জুন কিছু বলল না। দোভাষী যে পাহাড়টাকে তুষার-ভালুকের এলাকা বলে দেখিয়েছিল সেদিকটা ভালভাবে দেখে রাখল।

সন্ধের আগেই ক্যাম্পে ফিরে এল অর্জুন।

ক্যাম্পের খবর ভাল। অভিযাত্রীদের একটা দল পায়ের চিহ্ন দেখে অন্তত আধ মাইল দূরে তুষার-ভালুকদের একটা দলকে দেখতে পেয়েছে। ডানা টেলিফোটোতে তার ছবি তুলেছে। কিন্তু মুভি ক্যামেরায় সেই ছবি ওঠেনি, ওঠার কথাও নয়। স্টিল ছবি কাঠমণ্ডুতে না পাঠালে প্রিন্ট হবে না। দ্বিতীয় দিনেই এই সাফল্যে সকলে খুব খুশি। সকলে এই নিয়ে কথা বলছিল। অর্জুন তাঁবুতে ফিরে চেয়ারে বসতেই জুডি এল, "লোকটার কাছে গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ। এখন কথা বলছে, উঠে বসেছে।"

"কিন্তু...।"

"আমি বলেছি আজও, ওরা হসপিটালে নিয়ে যেতে চাইছে না। আচ্ছা, এমন হতে পারে না, কোনও কিছু দেখে শক পেয়েছে লোকটা। আর তা থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, জ্বর এসেছিল।" অর্জুন জানতে চাইল।

"হতে পারে। কিন্তু ওর পেটে যে ব্যথা আছে সেটার পরীক্ষা হওয়া উচিত।" জুডি বেরিয়ে গেল।

একটু বাদে জন এলে অর্জুন আজকের ঘটনাটা জানাল। জন বললেন, হেলিকপ্টারে লোকটাকে কাঠমণ্ডুর হাসপাতালে পাঠাতে তাঁর আপত্তি নেই। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "পুরোহিত লোকটার কথা কি বিশ্বাস করছ?"

"না করার তো কিছু নেই।"

"ও যা বর্ণনা দিয়েছে বলছ, সেরকম প্রাণী তো গোরিলা জাতীয় কিছুর সঙ্গে মিলছে। ঠাণ্ডার ধারেকাছে গোরিলা থাকে না বলে শুনেছি। এই অঞ্চলে তো নয়ই। মনে হচ্ছে লোকটা ভুল দেখেছে।"

"আমারও তাই মনে হয়েছে। তবে যাই দেখুক, লোকটা খুব ভয় পেয়েছে। আর সেই রাতের আগন্তুকই জিনিসগুলো চুরি করেছে।"

"তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু ওর পরিচয় কী?"

"আমাদের আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।" অর্জুন বলল, "আচ্ছা, বলুন তো, আপনারা এই দু'দিন কোনদিকে গিয়েছিলেন?"

জন একটা ম্যাপ দেখালেন। এটা কোনও ছাপা ম্যাপ নয়। এখানে আসার পর জন নিজেই ম্যাপটা তৈরি করেছেন।

অর্জুন ম্যাপটা দেখল। তারপর উলটোদিকের একটা অংশ দেখাল, "আমার মনে হয় এই অঞ্চলে গেলে ওদের দেখা পেয়ে যাবেন।"

"কেউ তোমাকে বলেছে?"

"হ্যাঁ। গ্রামে যে লোকটা দোভাষীর কাজ করছে সে বলছিল।"

"হুম। ঠিক আছে।"

"গতরাত্রে পাহারা দেওয়ার সময় আমরা কয়েকটা শেয়ালকে দেখেছি। আর একটা বড় প্রাণীর গর্জন শোনামাত্র তারা পালিয়েছিল। আওয়াজটা এসেছিল ওইদিক থেকে। তাই বলছিলাম, শেরপাদের রাজি করিয়ে রাত্রে ওদিকে যাওয়া যায় না?"

"দেখলে তো, শেরপারা রাজি হয়নি।" জন গম্ভীর গলায় বললেন।

মাঝরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। কী কাণ্ড, শেয়াল ডাকছে। এই বরফের রাজ্যে কয়েকটা শেয়াল পরিত্রাহি চিৎকার করে চলেছে। গতরাত্রে ঠাণ্ডা কী তা হাড়ে-হাড়ে টের পেয়েছিল। এখন এই স্লিপিং-ব্যাগের আরাম থেকে বেরোতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না। তাঁবুর ভেতর কোনও আলো নেই। কিন্তু অর্জুনের মনে হল শেয়ালরা মিছিমিছি ডাকবে কেন? ওদের তো গলা সাধার কোনও দায় নেই।

অন্ধকারে পাশের ঘুমন্ত বিছানা থেকে জনের গলা ভেসে এল, "তুমি কি শেয়ালের ভাষা বুঝতে পারো?"

"না।" অর্জুন হাসল।

"তা হলে চলো, বাইরে বেরিয়ে দেখা যাক।"

কৌতূহল যে হচ্ছিল না তা নয়, কিন্তু শীতের কথা ভেবে উদ্যোগ নেয়নি অর্জুন। এবার স্লিপিং-ব্যাগ থেকে বের হয়ে যাবতীয় পোশাক এবং জুতো-মোজা পরে নিল অন্ধকারেই। জনের গলা শুনতে পেল, "রেডি?"

"হ্যাঁ।"

তাঁবুর বাইরে অদ্ভুত দৃশ্য। আজকের জ্যোৎস্না গতরাতের চেয়েও জোরালো। কী চকচকে দেখাচ্ছে পৃথিবীটাকে! বরফের ওপর জ্যোৎস্না পড়ায় একটা হলদে আলো ছিটকে উঠেছে। আজ রাত্রে যারা পাহারায় ছিল তারা এগিয়ে এল।

জন জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু দেখেছ?"

ফ্লেমিং বললেন, "তেমন কিছু নয়। কয়েকটা শেয়াল অনেকক্ষণ থেকে ঘুরঘুর করছিল আশপাশে। হঠাৎই ওরা দূরে চলে গিয়ে এইভাবে ডাকাডাকি করছে।" জন অর্জুনকে বললেন, "ডানাকে ঘুম থেকে তোলা যায় কিনা দ্যাখো তো!"

মেয়েটা যে এমন ঘুমকাতুরে, তা জানতে পারল অর্জুন। ক্যাম্পের সবাই যখন জেগে গিয়েছে তখনও ওর সাড়া নেই। শেষপর্যন্ত জুডি ওর ঘুম ভাঙাল। পোশাক পরে বাইরে এসে অর্জুনকে দেখে ডানা হাসল, "কী ব্যাপার? যুদ্ধ হচ্ছে নাকি?"

জন জিজ্ঞেস করলেন, "ডানা, তাকিয়ে দ্যাখো তো, এই আলোয় ছবি তুলতে

পারবে ?”

ডানা চারপাশে ঘুরে দেখল। তারপর বলল, “বেটাতে তুলতে পারব। অবশ্য কতটা ভাল হবে তা বলতে পারছি না।”

“ফিল্ম উঠবে না ?”

“না। ভিডিওতেই তুলতে হবে।”

“গো। গেট রেডি। কুইক।”

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ওরা তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। শেরপাদের নিয়ে পুরো দলটা। শুধু জুডি আর অর্জুনকে কেউ কিছু বলল না। অর্জুনের খারাপ লাগছিল। জনসাহেব তাকে সঙ্গে যাওয়ার কথা বলতে পারতেন।

প্রায় জনশূন্য ক্যাম্পে জুডি অর্জুনের পাশে এসে বলল, “এইসময় আমার খুব খারাপ লাগে। আমার যেন কোনও প্রয়োজনই নেই।”

“তুমি তো অভিযাত্রী নও, তাদের ডাক্তার। কিন্তু আমি ভাবছি ওরা ওইদিকে গেল কেন ?” অর্জুন হাত তুলল।

“কারণ ওইদিক থেকে শেয়ালের ডাক ভেসে আসছিল।”

অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর বলল, “চলো, একটু হেঁটে আসি।”

“সানন্দে।” জুডি খুশি হল।

হাঁটতে-হাঁটতে জুডি বলল, “এখানে খুব ভাল স্কেটিং করা যায়। কীরকম স্বপ্ন-স্বপ্ন মনে হচ্ছে, তাই না ?”

অর্জুনের হাতে স্টিক ছিল। প্রতিটি পা বাড়াবার আগে সে সামনের বরফ পরীক্ষা করে নিচ্ছিল। সে কিছু বলল না।

জুডি জিজ্ঞেস করল, “আমরা উলটোদিকে যাচ্ছি, না ?”

“হ্যাঁ। দোভাষী বলেছিল ওই বরফের পাহাড়ের দিকে তুষার-ভালুকদের দেখতে পাওয়া যাবে। আমি জনকে বলেছি, কিন্তু তিনি...।”

“আমার মনে হয়, এবার ফেরা উচিত।” জুডি বাধা দিল।

“কেন ?”

“আমাদের সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। আর শেয়ালগুলো হঠাৎ চুপ করে গিয়েছে। গতরাত্রে ওদের একটার দাঁত দেখেছি আমি। ভালুকের বদলে শেয়ালও যদি আমাদের আক্রমণ করে তা হলে, বুঝতেই পারছ।”

অর্জুন বলল, “আমার মনে হয় তুমি একাই ফিরে যেতে পারবে।”

“তুমি ?”

“আমি আর একটু দেখতে চাই।”

অগত্যা জুডি কাঁধ নাচাল, “তোমাকে একা ছাড়তে খারাপ লাগছে, বেশ, চলো।”

সূর্যকে মাথায় রেখে দিন চেনা যায়। কিন্তু চাঁদের বেলায় হিসেব গুলিয়ে যাচ্ছিল। অর্জুন দেখল গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার গতকালের মতো নীচে নেমে আসছে

না। অর্থাৎ আজ রাত্রে যদি প্রকৃতির মেজাজ পালটায় তা হলে পায়ের চিহ্ন থাকবে।

গ্রামের কাছাকাছি এসে অর্জুন ডানদিকে ঘুরল। এখানে উঁচু-নিচু হয়ে বরফের ঢেউ চলে গিয়েছে পাহাড়ের বুক পর্যন্ত। এই পথেই সেই অজানা জন্তুটা হেঁটে গিয়েছিল। বারংবার পরীক্ষা করতে হচ্ছে বরফ। দু-দু'বার ঘুরে যেতে হয়েছে আলগা বরফ সামনে থাকায়। দুই টিপির মাঝখানে দাঁড়িয়ে ওরা আকাশ ছাড়া কিছু দেখতে পেল না। কী মসৃণভাবে বরফের টিপি তৈরি হয়েছে। একমাত্র পায়ের চিহ্ন ছাড়া পৃথিবীর চেনা পরিবেশে ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই।

অর্জুন বুঝতে পারছিল একটু বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছিল না। ঠিক তখনই গর্জন কানে এল। ভয়ংকর ক্রুদ্ধ না হলে এরকম গর্জন করা সম্ভব নয়। এবং ওই গর্জন ছোটখাটো জন্তুর পক্ষে করাও সম্ভব নয়। ওরা চারপাশের উঁচু বরফের দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। তা হলে নিশ্চয়ই যে গর্জন করছে সে তাদের দেখে করেনি। এবার গর্জনটার আওয়াজ আরও বেড়ে গেল। একটি নয়, একাধিক জন্তু রাগ দেখাচ্ছে। অর্জুন ধীরে-ধীরে ওপরে উঠছিল। হঠাৎ তার ডান পা বরফের মধ্যে ঢুকে গেল। উত্তেজনায় পরীক্ষা করতে ভুলে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে মুক্ত করতে পারল সে। জুডি চাপা গলায় বলল, "লেট্স গো ব্যাক।" অর্জুন ওই স্বরে বলল, "জাস্ট ওপরে উঠে চারপাশে নজর বুলিয়ে ফিরে যাব।"

ধীরে ধীরে ওরা উঁচু টিলার ওপর যেতেই অর্জুন বসে পড়ল এবং জুডিকে জোর করে টেনে বসাল। চোখের সামনে অদ্ভুত দৃশ্য। টিলা থেকে নেমে যাওয়া বরফের উপত্যকায় দুটি বিশাল চেহারার ভালুক পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গর্জন করছে। কিছুটা দূরে একটি ভালুক নিরীহ মনে বসে আছে। একেবারে মানুষের ভঙ্গিতে দু'জন এগিয়ে গেল পরস্পরের দিকে। তারপর ফ্রিস্টাইল কুস্তি শুরু হয়ে গেল। যে বসে আছে সে ওসব লক্ষ না করে পাশ থেকে কিছু একটা টেনে নিল। লড়াই থেকে চোখ সরিয়ে অর্জুন দেখল জন্তুটির হাতে বলের চেয়ে বড় একটা জিনিস।

কিছুক্ষণ লড়াই করার পর একটা জন্তু যে আহত হয়েছে বোঝা গেল তার কানফাটানো চিৎকারে। তারপর সে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে দৌড়ে গেল ওপাশের পাহাড়ের দিকে। বিজয়ী ভালুক আনন্দে বরফের ওপর একবার গড়াগড়ি দিয়ে নিতেই দর্শক উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতের বস্তুটি ছুড়ে দিল বিজয়ীর দিকে। সেটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাশে পড়ল। এবার বিজয়ী এসে আলিঙ্গন করল দর্শককে। তারপর দু'জনে চারপায়ে হেঁটে চলে গেল ওপাশে।

মিনিটপাঁচেক চুপচাপ বসে রইল ওরা। চারপাশে কোনও শব্দ নেই।

অর্জুন দেখল দর্শক ভালুকের ছুড়ে দেওয়া বস্তুটি পড়ে আছে তখনও। ওটা পাথর বা কাঠ নয়! তা হলে কী? জুডিকে সেখানে বসেই লক্ষ রাখতে বলে সে নামতে লাগল। সে যখন নীচে নেমে এসেছে তখন ওপর থেকে জুডি চেঁচিয়ে সাবধান করল। অর্জুন দেখল সেই আহত ভালুকটা আবার ফিরে এসেছে। তার শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। তাকে দেখেও কিছু না বলে ভালুকটা এগিয়ে যাচ্ছিল বস্তুটির দিকে।

অর্জুন দ্রুত একটা বরফের চাঙড় তুলে ছুড়ে মারল ভালুকটার দিকে। সেটা গিয়ে লাগল ঠিক মাথায়। অন্য সময় হলে নিশ্চয়ই সে ছুটে আসত, ছিঁড়ে ফেলত অর্জুনকে। কিন্তু এখন কাতর চোখে তাকাল। অর্জুন দ্বিতীয়বার আঘাত করতেই সে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধীরে-ধীরে ফিরে গেল যেদিক থেকে এসেছিল সেইদিকে। অর্জুন দৌড়ে গিয়ে বস্তুটি তুলে নিল। তারপর যতটা সম্ভব জোরে উঠে এল ওপরে। এসে বলল, "লেট্স গো।"

জুডি জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী?"

"বুঝতে পারছি না। এটা কোনও কিছুর মাথা।" তারপরেই খেয়াল হল। হতেই সে 'হুররে' বলে চিৎকার করে উঠল।

জনসাহেবদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। সে রাত্রে তাঁরা কিছু শেয়ালের ছবি তুলেছিলেন। ওঁরা ফিরেছিলেন ভোরের মুখে। ফিরেই অর্জুনদের অভিযানের কথা শুনে আফসোসে মাথা চাপড়েছিলেন। তারপর অর্জুনের বয়ে আনা বস্তুটি দু'হাতে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, "এই তো, এই সেই মাথা। একটু ক্ষতি হয়েছে দাঁত বসানোর জন্যে। এই মাথাটাকেই এরা ইয়েতির মাথা বলে নিশ্চয় হিলারিকে দেখিয়েছিল। তার মানে ওই আহত ভালুকটাই চুরি করেছিল মন্দির থেকে। তা হলে ওর কাছেই চামড়াটা আছে। গ্রেট ডিসকভারি।"

সকাল হতেই সবাই মিলে গ্রামে গিয়ে মাথাটা ফিরিয়ে দিতেই উৎসব শুরু হয়ে গেল। সবাই এসে অর্জুনদের চমরি গাইয়ের দুধ খাওয়াতে লাগল। ওরা চুরি যাওয়া জিনিস ফিরে পাবে, ভাবেনি। ডানা বলল, "এই পাওয়াটা নেহাতই অ্যাকসিডেন্ট।" জুডি বলল, "বিজ্ঞানের অনেক আবিষ্কারই অ্যাকসিডেন্ট থেকে হয়েছে।" অর্জুন বলেছিল, "পুরোহিতের মুখে বর্ণনা শুনে আমি সন্দেহ করেছিলাম তুষার-ভালুককে। লোকটার বর্ণনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। ভালুকটা ওগুলো যাকে উপহার দিয়েছিল তাকে গায়ের জোরে পেতে পারেনি বলেই আমরা পেয়ে গেলাম।"

গ্রামবাসীদের অনুরোধে জনসাহেব ক্যাম্প সেখানে নিয়ে গেলেন। হেলিকপটার এলে অর্জুন পুরোহিতকে নিয়ে রওনা হল। চামড়াটা পাহাড়েই আছে এটা জানার পর তার কিছু করার নেই। আসার সময় জনসাহেব অনেক

ধন্যবাদ আর পারিশ্রমিকের চেক ওর হাতে দিয়ে দিলেন। অসুস্থ পুরোহিতকে তার স্ত্রী সমেত হাসপাতালে পৌঁছে ওদের গ্রামের ডাক্তার ভদ্রলোককে দায়িত্ব দিয়ে দিল। এবার ফিরে যেতে হবে।

ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে পৌঁছে ভাল করে স্নান করল অর্জুন। তারপর জনসাহেবের ঘর খুলিয়ে সুটকেসটা বের করে নিল। তারপর নিজের ঘরে ওটাকে নিয়ে এল। আগামীকাল ভদ্রপুরে ফিরে যাওয়ার প্লেনের টিকিট চাইল সে টেলিফোনে। কিন্তু প্লেনের অফিস থেকে জানাল কোনও সিট আগামী তিনদিন খালি নেই। অর্জুন নিজের নাম এবং হোটেলের নম্বর জানিয়ে অনুরোধ করল কেউ ক্যানসেল করলেই যেন তাকে জানানো হয়।

অনেকদিন পরে ঘুমিয়েছিল সে পা ছড়িয়ে, টেলিফোন বাজতেই ঘুম ভাঙল। রিসিভার তুলতেই প্রবীণলালের গলা শুনতে পেল, "আরে মশাই, আপনি ফিরে এসেছেন এ-কথা জানাবেন তো! কাজ হয়েছে?"

"কী কাজ?"

"যা বলেছিলাম।"

"হ্যাঁ, প্রমাণ হয়েছে ইয়েতি বলে কোনও প্রাণী নেই।"

"হুঁ। কিছুই পাননি?"

"না।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমার খবর পেলেন কী করে?"

"পেয়েছি। কালই ভদ্রপুরে যাবেন?"

"যাব তো, কিন্তু টিকিট নেই।"

"হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না।"

মিনিট পনেরো পরেই ফোন এল প্লেনের অফিস থেকে, "আজ যেতে পারবেন সার। আর এক ঘণ্টা বাদে ফ্লাইট।"

এয়ারপোর্টে পৌঁছে টিকিট নিতেই দেখল প্রবীণলাল দু'জন দেহরক্ষী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। সামনে এসে বললেন, "আমার জন্যে কিছুই নিয়ে এলেন না?"

"কিছু না পেলে কী করব বলুন?"

"আমি কিন্তু খালি হাতে ফিরে যাব বলে আসিনি।"

"আমার কিছুই করার নেই।"

"বাঃ, আপনার টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলাম আমি, আমার জন্যে আপনি কিছু করবেন না? এস. কে. গুপ্তার জন্যে আপনি একটা প্যাকেট ভদ্রপুর থেকে এনেছিলেন, সেটা কোথায়?" চোয়াল শক্ত হয়ে গেল প্রবীণলালের।

"আপনি জানলেন কী করে?"

"আপনাকে অনেক প্রশ্ন করার সুযোগ দিয়েছি। উত্তর দিন।"

"অন্যের জিনিস আপনাকে দেব কেন?"

"কারণ আমি জিনিসটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।"

boiboi.net

প্যাকেটটার কথা ভুলেই গিয়েছিল সে। একটা দেহরক্ষী সুটকেসটার দিকে হাত বাড়াতেই সে বাধা দিতে গিয়ে দেখল দ্বিতীয়জন রিভলভার তাক করেছে। অতএব চাবি দিতেই হল। প্যাকেট বের করে নিয়ে গেল প্রবীণলাল। আর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। অর্জুন চেঁচামেচি করে পুলিশ ডেকে ব্যাপারটা বলতেই লোকটা জানাল তাকে থানায় গিয়ে ডায়েরি করতে হবে। সেটা করতে গেলে এই প্লেন চলে যাবে। আবার কবে টিকিট পাওয়া যাবে কে জানে!

ভদ্রপুর এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নেমে অর্জুন অবাক! মানিকলাল আগরওয়ালা গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সে কাছে যেতেই ভদ্রলোক করমর্দন করে বললেন, "আপনার ট্রিপ কীরকম হল ?"

"ভাল। কিন্তু আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

"কেন ?"

"আপনার জিনিস পৌঁছে দিতে পারিনি।"

"হ্যাঁ। খুব স্যাড। এস. কে. গুপ্তা খুন হয়ে যায়।"

"কিন্তু ওই প্যাকেটটাও আমার কাছে নেই।"

"জানি। তাই তো আপনাকে রিসিভ করতে এলাম।"

"বুঝলাম না !"

"যে আপনার কাছ থেকে ওটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে সে পরে রেগে গিয়ে আমায় ফোন করে গালাগাল করেছে। ওই বলল এই ফ্লাইটে আপনি আসছেন। তাই এলাম। প্যাকেটে কিছুই ছিল না। একগাদা খবরের কাগজ আর একটা চিরকুট। তাতে লেখা ছিল, এটা খোলার জন্য ধন্যবাদ।"

"সে কী। কেন ?"

"আমি জানতাম, ওই প্যাকেট আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। আপনি ভানু ব্যানার্জির লোক; আপনাকে বিপদে ফেলতে চাইনি। অথচ প্যাকেট নিয়ে না গেলে গুপ্তা আমার ওপর রেগে যেত। ভেবেছিলাম পরে তার সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু সে সুযোগ আর পেলাম না। চলুন। আপনার জিপ তৈরি।"

শিলিগুড়ির পথে ফিরে যাচ্ছিল অর্জুন। এই লোকগুলোর সঙ্গে ওই তুষার-ভালুক, যে চুরি করে কাউকে খুশি করতে চেয়েছিল, তার কি কোনও মিল আছে ? না, অর্জুন মাথা নাড়ল। ওই চোর ভালুকটা অনেক সরল, সহজ।

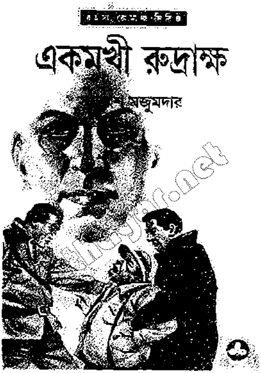

একমুখী রুদ্রাক্ষ

pathagar.net

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে গিয়ে মাকে তুলে দিতে এসেছিল অর্জুন। অবশ্য মা একা নন, জলপাইগুড়ি শহরের আরও সাতজন প্রৌঢ়া মায়ের সঙ্গে আছেন। ওঁরা দার্জিলিং মেলে কলকাতায় পৌঁছেই দুন এক্সপ্রেস ধরে প্রথমে হরিদ্বার যাবেন। এই মহিলাদের সংগঠন তৈরি হওয়ার পর তাঁরা আর কারও ওপর নির্ভর করবেন না বলে ঠিক করেছেন। বছরে দু'বার নিজেরাই বেরিয়ে যাবেন ভারতবর্ষ দেখতে। এবার যাচ্ছেন হরিদ্বার হয়ে কেদার-বদ্রীনাথ।

কেদারনাথ-বদ্রীনাথ যাওয়ার ইচ্ছে মায়ের অনেকদিনের। বেশ কয়েকবার অর্জুনকে বলেছেন সে-কথা। বেড়াতে যেতে কার না ভাল লাগে! কিন্তু প্রতিবারই একটা না একটা ঘটনায় জড়িয়ে যাওয়ায় আর মাকে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এখন মায়েদের সংগঠন 'ঘরোয়া' তৈরি হওয়ায় ওঁরা খুশি হয়েছেন। তবু যাওয়ার দিন সকাল থেকেই মায়ের মনখারাপ ছিল। তার ওপর দার্জিলিং মেলে জলপাইগুড়ি শহর থেকে ওঠা যাচ্ছে না। চার নম্বর গুমটিতে একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় শহরে ট্রেন ঢুকছে না। জলপাইগুড়ি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে ট্যাক্সি করে যাওয়ার পর মা নিচু গলায় বলেছিল, "তুই সঙ্গে গেলে খুব ভাল লাগত।"

দুটো ট্যাক্সি নিয়ে মহিলারা যাচ্ছিলেন। ওঁদের ট্যাক্সিতেও তিনজন আছেন। অর্জুন হেসে বলেছিল, "এটা তোমাদের 'ঘরোয়া' ভ্রমণ।"

ঘরোয়ার অন্য সদস্যরা শুনতে পেয়ে হেসেছিলেন।

দার্জিলিং মেল ছাড়ল সাতটা পনেরো মিনিটে। অর্জুন মোটরবাইক আনেনি। তাকে জলপাইগুড়ির বাস ধরতে স্টেশন থেকে রিকশা নিতে হবে। বেশি রাত হয়ে গেলে বাস পাওয়া যাবে না। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে গেলে সে সিঁড়ি বেয়ে ওভারব্রিজে উঠে এল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের আয়তন বেশ বড়। ওভারব্রিজে উঠে দেখা গেল অন্য প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা পথ ছুটে আসার পর কিছুক্ষণের জন্যে স্টেশনে দাঁড়ানো ট্রেন দেখতে অর্জুনের খুব ভাল লাগে। খানিকক্ষণ পরে গেলেও জলপাইগুড়ির বাস পাওয়া যাবে, অর্জুন ট্রেনটাকে দেখতে লাগল। তার পেছন দিয়ে যাত্রী এবং কুলিরা ছোটাছুটি করছে।

একজন রেলের লোক আসছিলেন, অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, "এটা কোন ট্রেন দাদা?"

"কাঞ্চনজঙ্ঘা, আজ বিফোর টাইমে ঢুকছে। আসাম যাবে।"

অর্থাৎ এই ট্রেন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন দিয়ে যাবে। সেখানে নেমে রিকশা নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাবে সে। অর্জুন বলল, "আমি জলপাইগুড়ি যাব। একজনকে ট্রেনে তুলে দিতে প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে ঢুকেছি। এখন কি ওই ট্রেনে যাওয়ার টিকিট কাটার সময় আছে?"

রেলের কর্মচারী ঘড়ি দেখলেন, "একটু রিস্ক হয়ে যাবে। টিকিট কাউন্টার অনেক দূরে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট আছে তো? চলুন, আমি গার্ডকে বলে দিচ্ছি।"

অর্জুনের খুব মজা লাগছিল। তার ফেরার কথা শিলিগুড়ি থেকে ছাড়া বাসে। বাসস্টপও বেশ দূরে। তার বদলে ট্রেনে গেলে সময় তো কম লাগবেই, বেশ ভালও লাগে।

আমাদের দেশের সরকারি কর্মচারীদের কাজকর্ম নিয়ে অনেক সমালোচনা করা হয়। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সত্যিকারের কাজের লোক যদি না থাকতেন তা হলে দেশটা অচল হয়ে যেত। এই ভদ্রলোক সেই শ্রেণীতে পড়েন। গার্ডের সঙ্গে কথা বলে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অর্জুন একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় জায়গা খোঁজার জন্যে ট্রেনের পাশ দিয়ে হাঁটছিল, হঠাৎ তার নজর একটি মুখের ওপর পড়তেই সে খুব চমকে গেল। দ্বিতীয় শ্রেণীর স্লিপার কামরায় জানলার পাশে বসে আছেন অমল সোম। যদিও তাঁর মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল তবু চিনতে অন্তত অর্জুনের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। পেছনে মাথা হেলিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে থাকার জন্যে তিনি অর্জুনকে দেখতে পেলেন না।

একটু সরে এসে অর্জুন ভাবতে লাগল এ কী করে সম্ভব। অমল সোম জলপাইগুড়ির বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন পাহাড়ে। সত্যসন্ধানে তাঁর আগ্রহ চলে গিয়েছিল। তিনি সন্ন্যাসী হননি কিন্তু নিজেকে জানার কারণে সংসার ত্যাগ করেছেন। মাঝে ফিরে এসেছিলেন ক'দিনের জন্যে, ইচ্ছে হয়েছিল বলেই এসেছিলেন। তখন তাঁকে আটকাবার চেষ্টা করেছিল অর্জুন, পারেনি।

অমল সোম না থাকলে অর্জুন কখনওই সত্যসন্ধানের কথা ভাবতে পারত না। এই মানুষটি প্রথমদিকে তাকে সহকারী হিসেবে সঙ্গে নিয়ে অনেক রহস্য সমাধান করেছেন। দিনের পর দিন ওঁর পাশে থেকে শিখেছে কী করে নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। অমল সোম যখন উধাও হয়ে গেলেন, তখন সেই প্রথম দিকটায় খুব অসুবিধে হত অর্জুনের। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠতে বেশি দেরি হয়নি।

এই অমল সোমকে আসামগামী এক দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে থাকতে দেখবে বলে কল্পনাও করতে পারেনি অর্জুন। তার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই মানুষটার

সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এতদিন কোথায় ছিলেন? বাড়িঘর ছেড়ে আর কতদিন এভাবে নিখোঁজ থাকবেন?"

কিন্তু নিজেকে সংযত করল অর্জুন। এসব প্রশ্ন করলে অমল সোম নিশ্চয় বিরক্ত বোধ করবেন। এমন তো হতে পারে উনি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে নেমে নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে স্টেশনেই তো সে দেখা করতে পারে। এই সময় এঞ্জিন হুইস্‌ল দিতেই যাত্রীরা দৌড়ে ট্রেনে উঠতে লাগল। অর্জুন চটপট সামনের কামরার দরজা ধরল। ট্রেন চলতে শুরু করলেও ও দরজা থেকে সরল না। জলপাইগুড়ি রোডে পৌঁছনোর আগে অন্তত গোটাতিনেক স্টেশন পড়বে। অমল সোম তার কোনওটায় যে নামবেন না তার তো ঠিক নেই। তার উচিত ছিল অমল সোমের কামরায় উঠে খানিকটা দূরত্ব রেখে লক্ষ রাখা।

এই সময় টিকিট চেকার এসে বললেন, "ভাই দরজা বন্ধ করে দিন। এই লাইনে সন্ধের পর প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে।"

দরজা বন্ধ করে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডাকাতরা ধরা পড়ছে না?"

"না। অন্তত আমি জানি না।"

ট্রেনে ডাকাতি হচ্ছে এই খবর অর্জুনও শুনেছিল। এখন চেকার সেই কথা বলতে আশেপাশের যাত্রীরা সেই আলোচনায় মত্ত হলেন। ডাকাতরা যাত্রী সেজে ওঠে। কে ডাকাত কে নয় বোঝা যায় না। এই যে ট্রেন চলছে, এই কামরায় ডাকাত থাকতে পারে। রিজার্ভেশন নেই এমন লোককে তাই কখনও উঠতে দেওয়া উচিত নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অর্জুনের রিজার্ভেশন নেই, এত অল্প দূরত্বে যাওয়ার জন্যে রিজার্ভেশন করার প্রয়োজন নেই বলে গার্ডসাহেব বলেছেন। অর্জুন ঘড়ি দেখল, পরের স্টেশনে যখন কামরা বদল করবেই তখন এইসব কথা গায়ে না মাখাই ভাল। তা ছাড়া কথাগুলো নেহাত মিথ্যে নয়।

হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে এল। ছুটন্ত ট্রেনের যাত্রীরা চিৎকার করছে আর সেটা ভেসে আসছে পাশের কামরা থেকেই। এবং তখনই গুলির আওয়াজ কানে এল। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ট্রেন ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেই পাশের কামরা থেকে কয়েকজন লাফিয়ে নীচে নামল। অর্জুন দরজা খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু অন্য যাত্রীরা বাধা দিলেন, "খুলবেন না, খুলবেন না, ডাকাতি হচ্ছে। দরজা খোলা দেখলে ডাকাতরা এখানে উঠে আসবে।" কেউ চিৎকার করল, "আশ্চর্য। ট্রেন দাঁড়িয়ে গেল কেন? এরকম জায়গায় ট্রেন দাঁড় করিয়েছে কেন?" রেলের পুলিশরা অন্য কামরা থেকে চলে এল। তাদের চেষ্টায় মিনিট কুড়ি বাদে ট্রেন ছাড়ল। পরের স্টেশনে ট্রেনটা থামামাত্র দরজা খুলে নেমে পড়ল অর্জুন। ততক্ষণে পাশের কামরার ক্ষুব্ধ যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। ডাকাতরা তাদের অনেককেই নিঃস্ব করে গেছে। ওই কামরায় কোনও রেল পুলিশ ছিল না কেন? এক যাত্রী যদি তাঁর অস্ত্র বের না করতেন তা হলে

ডাকাতরা আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যেত। স্টেশন মাস্টারকে এইসব অভিযোগের জবাব দিতে হবে, নইলে ট্রেন আটকে থাকবে। গোলমাল ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। কয়েকজন যাত্রীকে ডাকাতরা আহত করেছে, তাদের রেলের লোকরা নামিয়ে নিয়ে গেল শুশ্রূষার জন্যে। অর্জুন আক্রান্ত কামরায় উঠে এল। কামরাটা এখন প্রায় ফাঁকা। যারা বসে আছে তাদের মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ। কিন্তু অমল সোম নেই। যে জানলার পাশে তিনি বসে ছিলেন সেই জায়গাটা শূন্য।

অর্জুন কাছাকাছি একজনকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, এখানে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে ছিলেন, মুখে দাড়িগোঁফ, কোথায় গেলেন?"

লোকটি বলল, "কোথায় গেলেন তা কী করে বলব, তবে উনি না থাকলে আরও লোকের বারোটা বাজত। ডাকাতগুলো ওঁর কাছে টাকা চাইতেই উনি রিভলভার বের করে উঁচিয়ে ধরতেই ওরা পিছু হটল। ট্রেন স্টেশনে এসে থামার পর ওই দরজা দিয়ে নেমে গেলেন।"

অর্জুন দ্রুত প্ল্যাটফর্মে নামল, স্টেশনটি অতি সাধারণ, প্ল্যাটফর্মের আলো তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্বলছে। যেন জ্বলতে হয় বলেই জ্বলা। এক জায়গায় বেশ কিছু লোক দঙ্গল পাকিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, বাকি ট্রেনের যাত্রীরা ঝালমুড়ি বা চা খেতে ব্যস্ত। অমল সোম যে এখন প্ল্যাটফর্মে নেই তা বুঝতে অসুবিধে হল না অর্জুনের।

ওর খুব আফসোস হচ্ছিল। কী দরকার ছিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে দূর থেকে দেখে আড়ালে গিয়ে অনুসরণ করার? সোজা সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারত, "অমলদা, আপনি?"

pathagar.net

তার পরেই মনে হল, অমলদা যদি জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে না নামতেন, তা হলে দূরে কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই ছিল। আর সেখানে যেতে হলে তাঁকে আবার এই ট্রেনে উঠতে হবে। তিনি তো কারও সঙ্গে এখন লুকোচুরি খেলছেন না যে নিজেকে আড়ালে রেখেছেন। অর্জুনকে দেখে তাঁর গা-ঢাকা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই, অবশ্য তিনি যে অর্জুনকে দেখেননি, এ-ব্যাপারে সে একশোভাগ নিশ্চিত।

এই সময় আর-একটা কাণ্ড হল। ট্রেনযাত্রীদের সঙ্গে একে একে যোগ দিচ্ছিল স্থানীয় মানুষ। এই লাইনে রেল চলাচল নিয়ে তাদের যেসব অভিযোগ আছে তা এই সুযোগে জানাতে শুরু করল তারা। অর্জুন বুঝল এই ট্রেন কখন ছাড়বে তা কারও পক্ষে বলা সম্ভব নয়। রাতদুপুরে যদি জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামে তা হলে বিপদে পড়তে হবে। অর্জুন ঠিক করল সে বাসে যাবে। ট্রেন লাইন থেকে বাসের রাস্তা খুব বেশি দূরে নয়।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই অন্ধকার শুরু হয়ে গেল। পথ পিচের নয় এবং দু'ধারে ল্যাম্পপোস্ট নেই। কিন্তু লোকজন ছুটছে স্টেশনের দিকে। যেন ওখানে মজার কোনও ঘটনা ঘটেছে। এই সময় একটা খালি রিকশা

বেল বাজাতে বাজাতে ছুটে আসছিল। অর্জুন কোনওমতে সেটাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, "ভাই, বাসস্টপ কতদূরে।"

"অনেক দূরে! হেঁটে গেলে ভোর হয়ে যাবে।" লোকটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

"পৌঁছে দিতে কত ভাড়া নেবে?"

"দশ টাকা। তার নীচে গেলে পোষাবে না। পেঁয়াজের দাম আবার বাড়ছে।"

পেঁয়াজের দাম বাড়লে রিকশার ভাড়া কেন বাড়বে এ প্রশ্ন করা অবান্তর। কোনও আপত্তি না করে রাজি হয়ে গেল অর্জুন।

রিকশা ঘুরিয়ে রিকশাওয়ালা বলল, "ভগবানের লীলা বোঝা দায়! সারাদিন রিকশা নিয়ে বসে ছিলাম, দশটা টাকাও রোজগার হয়নি। অথচ যেই ট্রেন বন্ধ হল, পর পর প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলাম, দশ দশ কুড়ি।"

"তুমি আমার আগেও এখান থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে গেছ।"

"হ্যা, এক বাবুকে ছেড়ে দিয়ে এলাম এইমাত্র।"

অর্জুনের খটকা লাগল, "ভদ্রলোকের কি দাড়ি ছিল?"

"না তো! মাথার টাক একেবারে গলায় নেমে গেছে।"

বর্ণনা শুনে হাসি পেল অর্জুনের। যাহোক, অমল সোম তা হলে রিকশা নিয়ে বাসস্টপের দিকে যাননি!

রাস্তাটা ফুড়ুত করে ফুরিয়ে গেল। বড় রাস্তার পাশে গোটা পাঁচেক দোকানে টিমটিমে আলো জ্বলছে। কয়েকটা পুলিশের গাড়ি হেডলাইট জ্বালিয়ে স্টেশনের দিকে ছুটে গেল। ভাড়া মিটিয়ে দিতেই রিকশাওয়ালা ছুটল স্টেশনের দিকে। দুটো বাস রেষারেষি করতে করতে শিলিগুড়ির দিকে চলে গেল। জলপাইগুড়ির দিকে যাওয়ার বাসের কোনও চিহ্ন নেই।

এখন রাত সাড়ে আটটা। অর্জুন দোকানগুলোর সামনে পৌঁছে একজনকে জিজ্ঞেস করল, "জলপাইগুড়ি যাওয়ার বাস কোথায় দাঁড়ায় দাদা।"

"এখানেই।"

"এখন বাস আসবে তো?"

"ক'টা চান? সাড়ে দশটা পর্যন্ত এসেই যাবে।"

ওপাশে একটা চায়ের দোকান। একটু চা খেলে মন্দ হয় না! বেঞ্চিতে বসে এক গ্লাস চায়ের অর্ডার দিল অর্জুন। আজকের রাতের খাবার মা তৈরি করে দিয়ে গেছেন। কাল থেকে কাজের লোকের ওপর নির্ভর করতে হবে। চোখ বন্ধ করে চায়ের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে অর্জুন ভাবছিল এই সুযোগে রান্না নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলে কেমন হয়?

"এত রাতে শুধু চা খাচ্ছ কেন? সঙ্গে কিছু নিলে পারতে!"

গলা শুনে চমকে মুখ তুলে তাকাতেই অর্জুন অমল সোমকে দেখতে পেল। সে তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠল, "অমলদা?"

"নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে কী করছিলে?"

"মাকে দার্জিলিং মেলে তুলতে গিয়েছিলাম। আপনি আমাকে দেখেছিলেন?"

"পাশের কামরায় লাফ দিয়ে উঠতে দেখলাম বলে মনে হয়েছিল। তারপর, তোমাদের খবর কী? সবাই ভাল আছ তো?" অমল সোম দাঁড়িয়ে ছিলেন।

"হ্যাঁ। আপনি কি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন?"

"সেরকমই ইচ্ছে ছিল।"

এ-কথা শোনার পর অর্জুনের আর চা খাওয়ার ইচ্ছে হল না। চায়ের দাম মিটিয়ে দিয়ে অমল সোমের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়াল।

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি তো বাড়ি ফিরে যাচ্ছ?"

"আপনি?"

"আমি? এই কাছেই একটি ছেলের বাড়ি। ভাবছি তার সঙ্গে দেখা করব।"

"কে? আমি চিনি?"

"তুমি চিনবে কী করে? রেলে যারা ডাকাতি করে তাদের সঙ্গে তো তোমার সম্পর্ক থাকার কথা নয়!" অমল সোম হাসলেন।

"রেল ডাকাত?"

"হ্যাঁ। একটু আগে যারা আমাদের কামরায় ডাকাতি করেছিল তাদের মধ্যে সে ছিল। মুশকিল হল ওরা যেখানে ট্রেন থেকে নেমে পালিয়েছে সেই জায়গাটা এখান থেকে অন্তত মাইল পাঁচেক দূরে। পালিয়ে বাসরাস্তায় পৌঁছে যদি সরাসরি বাড়িতে ফিরে আসে তা হলেও এতক্ষণে পৌঁছেছে বলে মনে হয় না।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। অমল সোম এমন গলায় বললেন, যেন কোনও প্রিয়জনের সম্পর্কে কথা বলছেন। সে জিজ্ঞেস করল, "ওই ডাকাতের বাড়িটা আপনি চেনেন?"

"না, চিনি না। তবে চিনে নিতে পারব।"

"তা হলে তো পুলিশকে খবর দিলেই হয়!"

"আগে দেখি আমার ধারণাটা সঠিক কিনা। আচ্ছা!"

"অমলদা, আমি আপনার সঙ্গে যেতে চাই।"

"যাবে? বেশ তো, চলো। আমার আজকাল বেশিক্ষণ কথা বলতে ভাল লাগে না, তোমার অসুবিধে হতে পারে।" অমল সোম হাঁটতে শুরু করলেন। এতক্ষণে অর্জুন লক্ষ করল একটা বড় চামড়ার মোড়া ছাড়া অমল সোমের সঙ্গে কোনও জিনিসপত্র নেই। উনি কোথায় ছিলেন, ক'দিনের জন্যে আসছেন তা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে হলেও নির্লিপ্ত হয়ে হাঁটতে লাগল।

আধা অন্ধকারে দু'জন আসছিল! অমল সোম তাদের জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, মণ্ডলপাড়া কত দূরে?"

একজন জবাব দিল, "এই তো, ওপাশটা মণ্ডলপাড়া। কার বাড়ি যাবেন?"

"নামটায় একটু গোলমাল হচ্ছে। শিবু, মহাদেব বা শিবনাথ।"

"এই নামে তো মণ্ডলপাড়ায় কেউ নেই। কী করে?"

"সবাই জানে সে বেকার। কিন্তু ইদানীং রেলে ডাকাতি করছে।"

"সে কী! কী বলছেন আপনি!"

"হ্যাঁ ভাই। সেইজন্যেই তো দেখা করতে চাইছি।"

"আপনি কি পুলিশ?"

"দুর। আমাকে দেখে তো তা মনে হওয়ার কথা নয়!"

"তাকে দেখতে কেমন বলতে পারো?"

"নিশ্চয়ই। লম্বা, রোগা, কোঁকড়া চুল। তবে মনে হয় একটুও সাহসী নয়, উলটে ভিতুই বলা যায়।"

"এরকম একজনকে চিনি। চলুন তো!"

দু'জন আগে যাচ্ছিল, ওরা পেছনে। অর্জুন না জিজ্ঞেস করে পারেনি, "অমলদা, ডাকাতরা তো অনেক ছিল, এই ছেলেটিকে কী করে আপনি ঠাওর করলেন?"

"কোনও কৃতিত্ব নেই আমার। ডাকাতি করার আগে ওরা যাত্রী সেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কামরায় বসে ছিল। এই ছোকরা আর তার সঙ্গী বসে ছিল আমার পাশে। সঙ্গী সিনেমার গল্প করলেও ওর তাতে মন ছিল না। হঠাৎ বলল, 'মণ্ডলপাড়ার অনেক আগে নামতে হবে।' সঙ্গীটি বলল, 'তুই খুব ঘাবড়ে আছিস ভোলানাথ।' ছেলেটি প্রতিবাদ করল, 'অ্যাই আমার নাম ভোলানাথ নয়।' সঙ্গী বলেছিল, 'তুই একটা গাধা। আসল নামে ডাকতে নিষেধ করেছে বস্, মনে নেই।' তারপর ডাকাতি আরম্ভ হতেই ওরা স্বরূপ ধরল। কিন্তু এই ছেলেটি এত নার্ভাস ছিল, আমার দিকে ছুরি উঁচিয়েও ঠিকমতো ধরে রাখতে পারছিল না। যাকগে, এখানকার স্টেশনে নেমে জিজ্ঞেস করতেই জানতে পারলাম মণ্ডলপাড়া বেশি দূরে নয়। ভাবলাম ছেলেটার খোঁজ নিয়ে যাই।" অমল সোম যখন এইসব কথা বলছিলেন তখন ওরা একটা গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। একটা মুদির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পথপ্রদর্শক দু'জন কয়েকটা কথা বলে ঘুরে দাঁড়াল, "না, ওই নামে কেউ এখানে থাকে না। তবে যে চেহারা বলছেন তার সঙ্গে একজনের মিল আছে।"

"কী নাম তার?" অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

"বিশ্বনাথ মণ্ডল। বৈদ্যনাথ মণ্ডলের ছেলে।"

অমল সোম হাসলেন, "বাঃ, ওটাও তো ভোলানাথের নাম। তা বৈদ্যনাথবাবুর বাড়িটা একটু দেখিয়ে দেবেন?"

দু'জনে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে জানাল তারা ওই বাড়িতে যাবে না। বৈদ্যনাথ লোক সুবিধের নয়। সত্যি যদি গোলমেলে ব্যাপার থাকে তা হলে ওরা জড়াতে চায় না। এখান থেকে সোজা এগিয়ে গেলে বাঁ দিকে একটা বটগাছ পড়বে তার গায়ের বাড়িটা ওদের।

লোকদুটো চলে গেল না। মুদির দোকানের বেঞ্চিতে বসে পড়ল। অথচ ওরা

নিশ্চয়ই একটু আগে কোনও কাজে বাসরাস্তা ধরে হাঁটছিল।

বটগাছের পাশের বাড়িটায় আলো জ্বলছিল। যদিও এই গ্রামে ইলেকট্রিক এসে গেছে তবু তার আলোয় তেজ নেই। বৈদ্যনাথবাবুর বাইরের ঘরের দরজা খোলা। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল একজন বছর ষাটের মানুষ মাটিতে মাদুর পেতে শুয়ে আছেন।

অমল সোম ডাকলেন, "বৈদ্যনাথবাবু আছেন?"

"কে? কে?" ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন বৃদ্ধ। তাঁর পরনে লুঙ্গি, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। পাশে রাখা চশমা তুলে নাকের ওপর বসালেন।

"আপনি আমাদের চিনবেন না।"

"অ। শহরের লোক বলে মনে হচ্ছে।"

"আমি এখন শহরের নই। এর নাম অর্জুন, জলপাইগুড়িতে থাকে। আমি অনেকদূর থেকে আসছি।"

"অ। তা কী করতে পারি?"

"অনেকটা হেঁটে এসেছি, একটু বসতে বলবেন না?"

"উদ্দেশ্য কী তা না জানলে, হেঁ হেঁ, বুঝতেই পারছেন, যে খারাপ দিনকাল হয়ে গেছে, তা আসুন, মাদুরে বসুন।"

জুতো খুলে অমল সোমকে অনুসরণ করল অর্জুন। জুত করে বসে অমল সোম বললেন, "আপনি তো এই গ্রামের সম্মানীয় ব্যক্তি।"

"ছিলাম। এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়ে একঘরে হয়ে আছি। জাল ভোট দিয়ে হারিয়ে দিল ওরা। এর আগেরবার পঞ্চায়েতের সুবাদে কিছু করতে পেরেছিলাম বলে এই বুড়ো বয়সে কিছু খেতে পারছি। যাকগে, উদ্দেশ্যটা বললেন না?"

"আপনার ছেলের নাম বিশ্বনাথ?"

"হ্যাঁ ছয় মেয়ের পর ওই ছেলে। বিশ্বনাথের কাছে মানত করে আমার স্ত্রী পেয়েছিলেন। জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান বলে আর কাশীতে গিয়ে পুজো দেওয়া হয়নি। কেন?"

"ছেলে কী করে?"

"কিস্‌সু না। মানে এতকাল কিস্‌সু করত না। তবে ইদানীং ব্যবসায় নেমেছে। অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। গত সপ্তাহে দুই হাজার টাকা দিয়েছে আমাকে। প্রথম রোজগারের টাকা।" বৈদ্যনাথকে বেশ গর্বিত দেখাল।

অমল সোম বললেন, "বাঃ, খুব ভাল খবর। তা আপনার ছেলে যে অর্ডার সাপ্লাই করে, করার আগে সেই জিনিস তো বাড়িতে এনে রাখে, তাই না?"

"হ্যাঁ, উঠোনের পাশে একটা ঘর খালি পড়ে ছিল, ওটাকেই গুদামঘর করেছে।" বৈদ্যনাথ কথা ঘোরালেন, "কিন্তু আপনারা ছেলে সম্পর্কে এত প্রশ্ন করছেন কেন? মনে হচ্ছে ওর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছেন?"

অমল সোম হাসলেন, কিন্তু কথা বললেন না।

বৈদ্যনাথবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন, "না মশাই, ছেলের বিয়ে আমি এত তাড়াতাড়ি দেব না। কত আর বয়স! আগে ব্যবসায় ভাল করে দাঁড়াক, আমাকে মাসে অন্তত সাত-আট হাজার টাকা রেগুলার দিক, তারপর ভাবা যাবে।"

অমল সোম বললেন, "সে তো ঠিক কথা। ছেলে বাড়িতে আছে?"

"না, না। শিলিগুড়ি থেকে বাড়ি ফেরে শেষ বাস ধরে।"

"তা হলে তো অনেক রাত হবে। অতক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। আপনি ওকে বলবেন আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে। জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় গিয়ে অমল সোমের নাম বললে যে কেউ বাড়িটা দেখিয়ে দেবে।" অমল সোম উঠে দাঁড়াতে অর্জুনও উঠল।

বৈদ্যনাথবাবু বসে-বসেই জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? আপনার বাড়িতে যাবে কেন? আপনি কে জানি না, হুকুম করলেই সে আপনার বাড়িতে চলে যাবে?"

"সে না গেলে পুলিশ এখানে আসবে। শুধু তাকে নয়, আপনাকেও ধরে নিয়ে যাবে। বেশ কয়েক বছর হাজতে থাকতে হবে আপনাদের।"

বৈদ্যনাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন, "আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? বাড়ি বয়ে এসে পুলিশের ভয় দেখাচ্ছেন?"

অমল সোম বললেন, "ভয় দেখাচ্ছি কিনা সেটা ছেলের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারবেন। শ্রীমান ভোলানাথ আজ সন্ধেবেলায় ট্রেনে যা করেছেন তা ওর মুখ থেকে শুনতে এসেছিলাম, আপনিও শুনে নেবেন।"

"আমার ছেলের নাম বিশ্বনাথ, ভোলানাথ নয়।"

"ওই একই হল। ওর সঙ্গীরা ওকে ভোলানাথ বলে ডাকে, জেনে নেবেন।" কথাগুলো বলে অমল সোম বেরিয়ে এলেন। বৈদ্যনাথবাবুর গলা দিয়ে কোনও শব্দ বের হচ্ছিল না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি যখন এত নিশ্চিত তখন ছেলেটাকে পুলিশে না ধরিয়ে দিয়ে এইভাবে চলে এলেন কেন?"

অমল সোম বললেন, "প্রথম কথা, এখানে আসার আগে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিলাম না। দ্বিতীয় কথা, আমি পুলিশকে বললে পুলিশ নিশ্চয়ই ওকে ধরত কিন্তু প্রমাণ করতে পারত না। আমি ছাড়া আর কেউ সাক্ষী হিসেবে এগিয়ে আসবে বলে মনে হয় না। ওই কামরায় যারা ছিল তারা আজ রাতের পর যে যার জায়গায় চলে যাবে। পুলিশ তাদের হদিস পাবে না। শুধু একজনের সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর বিচারক করবেন বলে মনে হয় না। তৃতীয়ত, ডাকাতির সময় এই ছেলেটি তার সঙ্গীদের বারংবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল যেন কারও ওপর অত্যাচার না করা হয়। এটা থেকে মনে হয়েছে ছেলেটা এখনও ওই লাইনে দক্ষ হয়ে ওঠেনি। আমার হাতে রিভলভার দেখামাত্র চুপচাপ চলে গেছে দরজার কাছে।"

"আপনার মনে হচ্ছে ছেলেটা কাল সকালে দেখা করবে?"

"দুটো ঘটনার যে-কোনও একটা ঘটতে পারে। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে নার্ভাস হয়ে ছেলেটা আমার কাছে আসতে পারে। ওর বাবা যদি জানান আমি পুলিশ নই তা হলে ধরা পড়ার আগে এই রাস্তাটা খুঁজবে। নয়তো ওর দলবলকে গিয়ে বলবে, তারা আমাকে আক্রমণ করে মুখ বন্ধ করতে চাইবে। শেষটা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ অপরাধীরা সাক্ষীর বেঁচে থাকা পছন্দ করে না।" অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন, কারণ সেই দুই পথপ্রদর্শক মুদির দোকান ছেড়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"ওর বাপের দেখা পেয়েছেন?" একজন জানতে চাইল।

"হ্যাঁ। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ।"

"তা হলে বলছেন, এই বিশু ছোকরা ট্রেন-ডাকাতি করছে?"

"তাই যদি করে তা হলে আপনারা কী করবেন?"

"আমরা পঞ্চায়েত ডেকে ওকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেব।"

"তখন ও আরও বড় ডাকাতি করবে, তাই না? হয়তো সঙ্গীদের নিয়ে আপনাদের ওপর বদলা নেবে। অবশ্য যা করার তা আপনারা নিশ্চয়ই করতে পারেন। নমস্কার।" অমল সোম আবার হাঁটতে শুরু করলেন।

বাসরাস্তায় এসে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জলপাইগুড়ির থানায় ব্যাপারটা জানিয়ে রাখবেন?"

"না। না। কয়েকটা দিনের জন্যে এসেছি, ঝামেলা বাড়ানোর কী দরকার! দ্যাখো, আমি ইচ্ছে করেই ওর বাবাকে বলিনি ছেলে কী করছে। কিন্তু ওই দু'জনকে বলেছি। কাল সকাল হওয়ার আগেই পুরো গ্রামের মানুষ জেনে যাবে বিশ্বনাথ ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে। ওর বাবার ওপর যাদের রাগ আছে তারা খবরটা বেশি করে ছড়াবে। এই চাপটা বিশ্বনাথের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। ও অথবা ওরা আসবেই।"

একটা বাস পাওয়া গেল। ওরা যখন জলপাইগুড়ির কদমতলায় বাস থেকে নামল তখন রাত প্রায় এগারোটা। অর্জুন বলল, "অমলদা, অনেক রাত হয়ে গেছে, রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যান।"

"তোমাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে, তাই না। বেশ চলো। এত রাতে শ্রীমান হাবুকে জাগিয়ে খাবার তৈরি করতে বলা অন্যায় হবে। তোমার ওখানে সে-ব্যবস্থা আছে তো?"

"মা যাওয়ার আগে অনেকটা তৈরি করে গেছেন। কোনও সমস্যা হবে না।"

॥ ২ ॥

অমল সোম এই প্রথমবার অর্জুনের বাড়িতে রাত্রিবাস করলেন। অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। খাওয়াদাওয়ার পর অমল সোম বললেন, "তুমি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়তে পারো। আমি একটু জেগে থাকব।"

"আপনি কি দেরি করে ঘুমোন?"

"হ্যাঁ। একটা থেকে পাঁচটা।"

"অসুবিধে হয় না?"

"সবকিছু অভ্যেসের ওপর নির্ভর করে।"

শেষ পর্যন্ত অর্জুন প্রশ্নটা করে ফেলল, "অমলদা, আপনি এই জীবন যাপন করছেন কেন? আপনার কি স্বাভাবিক জীবন সম্পর্কে কোনও আগ্রহ নেই?"

"স্বাভাবিক জীবন বলতে কি ধরাবাঁধা সাংসারিক জীবন বোঝাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেরকমই দাঁড়িয়ে যায়।"

"অনেককাল তো সে-জীবন যাপন করেছি। তাই স্বাদ বদলালাম।"

"এখন আপনি কোথায় থাকেন?"

"যখন যেখানে ভাল লাগে। কখনও যোশীমঠের কাছে এক আশ্রমে, কখনও হৃষীকেশে। আসল নকল সাধুদের সঙ্গ বেশ উপভোগ করি। তবে কিছু উপকারও হয়েছে। এখন আমি মনঃসংযোগ করতে পারি।"

"আগে পারতেন না?"

"আমি সেই মনঃসংযোগের কথা বলছি, যা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আমার ক্ষমতা অবশ্য খুবই সামান্য। কিন্তু হিমালয়ে অনেক সাধু আছেন যাঁদের ক্ষমতা দেখলে বিজ্ঞান বিচলিত হয়ে যাবে।" অমল সোম হাসলেন, "এবার শুয়ে পড়ো। যাওয়ার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও।"

সকালবেলায় ওরা হাঁটতে হাঁটতে চলে এল হাকিমপাড়ায়। অমল সোমকে প্রায়ই থামতে হচ্ছিল, কারণ পথচারীদের কেউ কেউ তাঁকে দেখে অবাক হয়ে নানান প্রশ্ন করছিলেন।

বাড়ির সামনে পৌঁছে অমল সোম বললেন, "হাবু তোমার সঙ্গে দেখছি নিয়মিত দেখা করে। এরকম মানুষ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু ভাবছি এবার বাড়িটাকে বিক্রি করে দেব। আমার পরে তো এখানে কেউ বাস করার নেই। ওই হাবুটার জন্যে যদি একটা আশ্রমটাশ্রমের ব্যবস্থা করতে পারি!"

"আপনার কেন মনে হচ্ছে হাবু আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে?"

"বাগানটা এখনও আগের মতো পরিষ্কার। হাবু যত্ন করছে। শুধু যত্নে তো হয় না। টাকাও দরকার। তোমার কাছে গেলে তুমি ওকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে দেবে। অর্থাৎ সেটা সে করছে।"

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অমল সোম বেশ জোরেই ডাকলেন, "হাবু।" কিন্তু কোনও সাড়া এল না। অথচ অমল সোমের বাইরের দরজা খোলা। ওরা বারান্দায় উঠতেই অমল সোম দ্বিতীয়বার ডাকলেন। এবারও সাড়া নেই। ভেতরে ঢুকে অর্জুন বুঝতে পারল প্রলয় হয়ে গিয়েছে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড, চেয়ার ভেঙেছে, টেবিলের জিনিসগুলোর ওপর অত্যাচার হয়েছে।

অমল সোম দ্রুত ভেতরের বারান্দায় এলেন। উঠোনের ওপাশের তিনটে ঘরের একটায় হাবু থাকে। সেখানে হাবুকে পাওয়া গেল। তার হাত-পা বাঁধা, মুখে গলায় প্রহারের চিহ্ন স্পষ্ট। অমল সোমকে দেখামাত্রই হাবুর দু'চোখ থেকে জল বেরিয়ে এল। দ্রুত ওকে বাঁধনমুক্ত করতেই হাবু অমল সোমের পায়ের ওপর পড়ে গিয়ে অদ্ভুত স্বরে কাঁদতে লাগল। অমল সোম ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায় গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, "অর্জুন দ্যাখো তো, আমার ফার্স্ট এইডের বাক্সটা এখনও আছে কিনা।"

সেটাকে খুঁজে পেয়ে নিয়ে এল অর্জুন। অনেক চেষ্টায় হাবুকে শান্ত করে ওষুধ লাগালেন অমল সোম। তারপর অদ্ভুত দৃশ্যটি দেখল অর্জুন। হাবু কথা বলতে পারে না এবং কানে শোনে না। কিন্তু তার চোখমুখ চমৎকার কথা বলে। হাবু হাত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে মুখ বেঁকিয়ে কথা বলে যাচ্ছে আর তার সঙ্গে সমানে একই ভঙ্গি করছেন অমল সোম। মিনিট চারেক ধরে এই নির্বাক দৃশ্যটি দেখে গেল অর্জুন। হাবুর ইশারার সঙ্গে অর্জুন পরিচিত। সেটা ও যখন ধীরে ধীরে করে তখন বুঝতে অসুবিধে তেমন হয় না। কিন্তু এখন হাবু যে দ্রুততায় তার বক্তব্য জানাচ্ছে তা অর্জুনের কাছে অস্পষ্ট।

অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন, "দোষ আমারই।"

"কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি ভেবেছিলাম ও অথবা ওরা আজ সকালে এখানে আসবে। এই বোকামি আমি করে ফেলেছি।"

"তার মানে? কাজটা বিশ্বনাথের?"

"হ্যাঁ। ওরা এসেছিল ভোর রাতে। ছ'জন। আমাকে বাড়িতে না পেয়ে খুব হতাশ হয়ে হাবুর ওপর অত্যাচার চালিয়েছে। হাবু যে কথা বলতে পারে না এটা সম্ভবত বুঝতে পারেনি।" অমল সোমকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

"ভাগ্যিস আপনি গতরাতে আমাদের বাড়িতে ছিলেন?"

"সেটা হাবুর দুর্ভাগ্য। আমি থাকলে ওকে কষ্ট সহ্য করতে হত না। কিন্তু আমি ভাবছি ওই ভোরে ওরা আমার বাড়ি খুঁজে বের করল কী করে? তখন জিজ্ঞেস করার মতো মানুষ তো রাস্তায় থাকে না।"

"মর্নিংওয়াকে যারা বের হয় তারাই বলে দিয়েছে বাড়ির হদিস। আমার মনে হয় এবার থানায় খবর দেওয়া উচিত।"

"হ্যাঁ। অবশ্যই। তুমিই কাজগুলো করো।"

থানায় চলে এল অর্জুন। নতুন দারোগাবাবু সুদর্শন ব্যানার্জি মাস চারেক হল জয়েন করেছেন। ইতিমধ্যেই অর্জুনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়ে গেছে। ভদ্রলোককে দেখলে অধ্যাপক বলে মনে হয়, পুলিশের ছাপ ওঁর মুখে নেই।

"আসুন অর্জুনবাবু। সুপ্রভাত।" সুদর্শন তাঁর চেয়ারে বসে ছিলেন।

"নমস্কার। কিন্তু আজকের সকালটা আমাদের কাছে শুভ নয়।"

"সে কী! বসুন।"

অর্জুন সংক্ষেপে গত সন্ধ্যা থেকে যা যা ঘটেছিল তা বলে গেল। অমল সোম কে এবং অর্জুনের জীবনে তাঁর কী ভূমিকা সে-ব্যাপারে সুদর্শন আগেই জানতেন। পুরোটা শোনার পর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "একটা ব্যাপারে আমার খটকা লাগছে। মিস্টার সোম যখন বুঝতেই পারলেন বিশ্বনাথ ট্রেন ডাকাতি করেছে তখন কাল রাত্রেই পুলিশকে জানালেন না কেন ?"

"উনি প্রথমে বলেছিলেন ওঁর ধারণা ঠিক কিনা যাচাই করতে চান। পরে নিঃসন্দেহ হওয়ার পর বললেন, পুলিশ ছেলেটাকে অ্যারেস্ট করতে পারে ঠিকই কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বিশ্বনাথ যে ট্রেন ডাকাতি করেছে সে-কথা প্রমাণের জন্যে পুলিশ কাউকে সাক্ষী হিসেবে পাবে না।"

"কেন? উনি তো ছিলেন?"

"ওঁর একার সাক্ষী যথেষ্ট নয় বলে ওঁর ধারণা।"

"কিন্তু পুলিশকে জানালে ওঁর বাড়িতে হামলা করতে পারত না ওরা। আচ্ছা, আর-একটা কথা, মিস্টার সোম কি কখনও আপনাদের বাড়িতে রাত্রে থেকেছেন?"

"না। ওঁর বাড়িতে অত রাতে খাওয়ার অসুবিধে হবে বলে আমি ওঁকে অনুরোধ করলে উনি শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যান।"

"এই রাজি হয়ে যাওয়াটা ওঁর অতীতের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে একটু অস্বাভাবিক বলে মনে হয়নি আপনার ?" সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন।

"আপনি কী বলতে চাইছেন?"

"আমার মনে হচ্ছে মিস্টার সোম জানতেন তাঁর বাড়িতে হামলা হবে।"

"হ্যাঁ। যদি বিশ্বনাথ একা না আসে তা হলে দলবল নিয়ে আসবে এটা ওঁর অনুমানে ছিল। কিন্তু সেটা রাত্রেই নয়, আজ দিনের বেলায় বলে ভেবেছিলেন উনি।" অর্জুন একটু বিরক্ত হল।

সুদর্শন নিজেই ডায়েরিতে সব লিখে নিলেন। তারপর বললেন, "চলুন, এই সুযোগে মিস্টার সোমের সঙ্গে কথা বলে আসি।"

অর্জুন আপত্তি করল না, যদি ভদ্রলোক সাধারণ গল্প করতেও যান তা হলে এটা ওঁর তদন্তের মধ্যেই পড়বে। যদিও অমল সোম সেটা পছন্দ করবেন না।

মিনিট দশেক কথাবার্তার পর সুদর্শন অমল সোমকে প্রস্তাব দিলেন, "মণ্ডলপাড়া যদিও জলপাইগুড়ি সদর থানার জুরিসডিকশনে নয় তবু এস পি সাহেবকে বলে আমি অনুমতি আনিয়ে নিতে পারি। আপনি কি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবেন ?"

অমল সোম নির্লিপ্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কেন ?"

"প্রথমে এই বিশ্বনাথকে অ্যারেস্ট করব, তারপর ওর দলটাকে।"

"কী কারণে ?"

"সে কী ? প্রথম কথা, ওরা ট্রেনডাকাত ; দ্বিতীয়ত, আপনার বাড়িতে এসে ভাঙচুর করেছে, আপনার কাজের লোককে মেরেছে!"

"ওরা যে ট্রেনডাকাত তার প্রমাণ কোথায় ?"

"কিছু মনে করবেন না, আমি পুরনো পুলিশদের মতো অত্যাচারে বিশ্বাসী নই। কিন্তু তেমন হলে দেখেছি মারধোর করলে কাজ দেয়। পিঠে পড়লে বিশ্বনাথ পেটে কথা চেপে রাখতে পারবে না। আর ও যে এ বাড়িতে এসে হামলা করেছে তা আপনার কাজের লোকই বলতে পারবে।"

"আপনি ভুলে যাচ্ছেন, হাবু কথা বলতে পারে না।"

"ঠিক আছে, দেখে তো চিনতে পারবে। ও আইডেন্টিফাই করলেই হয়ে যাবে।"

"সেটাও ওর পক্ষে করা অসম্ভব!"

"কেন?" সুদর্শন অবাক হয়ে গেলেন।

"কারণ ওরা সবাই মুখে কালো কাপড় বেঁধে এসেছিল। হাবু ওদের মুখ দেখতে পায়নি।" অমল সোম চোখ বন্ধ করলেন।

"ও। মিস্টার সোম, আপনি অভিজ্ঞ মানুষ। কিন্তু কিছু মনে করবেন না, আপনার কথাবার্তায় আমি কোনও উৎসাহ পাচ্ছি না। দলটাকে ধরার কোনও চেষ্টাই আপনি করছেন না।" সুদর্শন বলতে বাধ্য হলেন।

"আমি আইনরক্ষক নই যে, কাউকে ধরার ক্ষমতা পাব। আপনি আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন বলে আমি আমার ধারণা আপনাকে জানিয়েছিলাম। আপনার থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। আইনরক্ষক হিসেবে আপনি যা ভাল হয় তাই করুন। ওরা যা করছে তার জন্যে কড়া শাস্তি হওয়া দরকার। দেখবেন সেটা যেন হয়। আইনের ফাঁক গলে অল্পদিনের মধ্যে বেরিয়ে এলে ওরা আরও ডেসপারেট হয়ে যাবে। তাতে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"

এর পর সুদর্শন বিদায় নিলেন। অর্জুন যখন তাঁকে গেটের বাইরে রাখা জিপের কাছে এগিয়ে দিল তখন তিনি নিচুগলায় বললেন, "এত নিরুত্তাপ মানুষ আমি কখনও দেখিনি। বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা।"

অর্জুনেরও অনেকটা সেইরকম মনে হচ্ছিল। এবার যেন অমল সোম একদম বদলে গিয়েছেন। ওঁর কথাবার্তা, অ্যাটিচুডের সঙ্গে আগের অমল সোমের কোনও মিল নেই। সে ফিরে এসে দেখল অমল সোম আবার চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। তাঁর হাতের আঙুলগুলো শুধু নড়ছে।

এই সময় হাবু চা নিয়ে এল। তিনকাপ চা, অর্থাৎ দারোগাবাবু যে চলে গেছেন সেটা সে বুঝতে পারেনি। আগে হাবুর এরকম ভুল কখনও হত না। এখন চুল পেকেছে, একটু থপথপে হয়েছে। যে হাবুর শরীরে হাতির শক্তি ছিল সে পড়ে পড়ে মার খেয়েছে ভাবতে অসুবিধে হয়।

অমল সোম চুপচাপ চা খেলেন। হাবু দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে। তাকে জিজ্ঞেস

করলেন, "দুপুরে খাব কী ? বাজার আছে ?"

হাবু শুনতে পায় না কিন্তু অমল সোমের ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝতে পারে। আঙুল নেড়ে জিজ্ঞেস করল, কী খাবেন তিনি ?

"পেঁপে সেদ্ধ, মাঝারি সাইজের, শসা আর দুধ।"

হাবু ঘাড় নেড়ে চলে যেতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ওখানে এই খান ?"

"হ্যাঁ। রাতে রুটি আর সবজি, যদি পাওয়া যায়। গত রাতে তোমার বাড়িতে অনেকদিন পরে অনিয়ম করেছি। পেঁপেটা নিয়মিত খাওয়া উচিত ; ওর অনেক গুণ।"

অমল সোম এমনভাবে কথা বলছিলেন যে, বিশ্বনাথ-সংক্রান্ত সমস্যার কথা তিনি যেন ভুলে গেছেন। সে বলল, "বিশ্বনাথের ব্যাপারটা কী করব ? হাবুকে মেরে গেল ওরা, ছেড়ে দেবেন ?"

অমল সোম উঠলেন। ব্যাগ থেকে কিছু জিনিস বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে বললেন, "পুলিশ তো জেনে গেল। ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব ওদের। আমি তো মণ্ডলপাড়ায় গিয়ে বদলা নিতে পারি না। সেটা তো আইনসম্মত নয়।"

"কিন্তু ওকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া—।"

"তুলে দেব ? কেন ? পুলিশ কি ঠুঁটো জগন্নাথ ! অন্য কেউ তাদের হয়ে কাজ না করে দিলে তারা কাজটা করতে পারে না ?" কথা বলতে বলতে অমল সোম জামা খুললেন। গত রাতে ওঁকে খোলা গায়ে দেখেনি অর্জুন। আজ দেখে অবাক হল। অমল সোমের গলায় দুটো মালা, একটা পাথরের, অন্যটা সম্ভবত রুদ্রাক্ষ। এর আগে কখনও মানুষটাকে ওসব পরতে দেখেনি সে। তাই জিজ্ঞেস না করে পারল না, "মালাগুলো কেন পরেছেন ?"

"এগুলো শরীর এবং মনের খুব উপকার করে।" গলা থেকে রুদ্রাক্ষের মালাটা খুলে এগিয়ে ধরলেন, "এগুলো একমুখী রুদ্রাক্ষ। সচরাচর পাওয়া যায় না। আবার যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে এর বেশ পার্থক্য আছে। তুমি কোথাও এই জিনিস কিনতে পারবে না। অলকানন্দার জলে স্নান করতে গিয়ে এটাকে পেয়েছিলাম। অনেক সাধু এটাকে চেয়েছিলেন। আর চেয়েছিলেন বলেই আমি দিইনি। যাঁরা সাধু তাঁরা কেন চাইবেন ? তাঁদের তো সব দিয়ে দেওয়ার কথা। তুমি ইচ্ছে করলে পরতে পারো।" অমল সোম বললেন।

"আমি পরে কী করব ?" অর্জুন মৃদু আপত্তি জানাল।

"নাথিং। জাস্ট ফিল দ্য ডিফারেন্স।" অর্জুনের হাতে মালাটা দিয়ে অমল সোম বললেন, "স্নানটান করে পরো, আর স্কিনের সঙ্গে যেন লেগে থাকে।"

রুদ্রাক্ষের মালাটাকে পকেটে ঢোকাল অর্জুন। এখন অমল সোম স্নান সেরে পুজোয় বসবেন। সেটা চলবে অনেকটা সময় ধরে। অতএব এখানে অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না।

॥ ৩ ॥

গলিতে ঢোকার মুখে বুড়িদির সঙ্গে দেখা। বুড়িদি তাদের বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে ছিল। বুড়িদি জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, তোর মা এখন নেই বলে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো ? হলে বলবি।"

"থ্যাঙ্ক ইউ বুড়িদি।" বলতে বলতে অর্জুন লক্ষ করল বুড়িদির মুখে সেই আগের মতো কালচে ছোপ জমছে। এক সময় এটা এত ঘন হয়ে গিয়েছিল যে, ঘরের বাইরে বেরোত না বুড়িদি। খুঁটিমারি জঙ্গল থেকে একটা শেকড় নিয়ে এসে সে বুড়িদিকে দিয়েছিল। সেটা ঘষে দাগটা সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল। কথাটা সে তুলল।

বুড়িদি বলল, "দ্যাখ না, আবার ওরকম হচ্ছে। অনেক বছর বেশ ভাল ছিলাম। সেই শেকড়টাকে যে কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে!" অর্জুন ঠিক করল যদি কখনও সে খুঁটিমারির জঙ্গলে যায় তা হলে বুড়িদির জন্যে আবার চেষ্টা করবে।

কাজের লোককে দায়িত্ব দিয়ে ওরা বেরিয়ে এসেছিল। বাড়ি ফিরে দেখল তার কাজ শেষ, রান্নাও হয়ে গেছে, সে চলে যাওয়ার জন্যে তৈরি। অর্জুন তাকে সন্ধেবেলায় আসতে নিষেধ করায় সে খুব খুশি হয়ে চলে গেল।

সকাল থেকে চা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি। আজকাল ওর খুব খিদে পায়। অর্জুন খানিকটা কেক খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার মন থেকে অস্বস্তিটা যাচ্ছিল না। বিশ্বনাথের ব্যাপারে অমল সোমের ওই নিস্পৃহ ভাব সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। বরং সুদর্শন ব্যানার্জিকে তার অনেকটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে। হাবুকে অমল সোম খুব স্নেহ করেন অথচ ওর অবস্থা দেখেও তিনি শীতল হয়ে আছেন। ধর্মভাব প্রবল হলে মানুষ কি এরকম নিরাসক্ত হয়ে যায় ?

স্নান করবে বলে জামা খুলতেই রুদ্রাক্ষের কথা মনে পড়ল। সে পকেট থেকে মালাটা বের করে দেখতে লাগল। রুদ্রাক্ষগুলো এত টাইট হয়ে এ ওর গায়ে বসে আছে যে, কী দিয়ে মালা গাঁথা হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। রুদ্রাক্ষগুলোকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সে। এরকম রুদ্রাক্ষ সে কখনও দেখেনি। মায়ের কাছে কয়েকটা আছে কিন্তু তার অনেক মুখ। সে শুনেছে রুদ্রাক্ষ পরলে শরীরের নানান উপকার হয়। অর্জুন মালাটাকে নাড়তে নাড়তে অলসভাবে মাথা গলিয়ে গলায় নিয়ে এল। ঠিক বুকের ওপর মালাটা শেষ হচ্ছে।

হঠাৎ শরীর গরম হয়ে উঠল। জ্বালা নয়, একটা তপ্ত হাওয়া যেন ঢেউয়ের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল সমস্ত শরীরে। অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারার আগেই মাটিতে পড়ে গেল সশব্দে। পড়ে স্থির হয়ে থাকল অনেকক্ষণ।

যখন সে সংবিৎ পেল তখন মাথার ভেতরটা একদম ফাঁকা, শরীরে কোনও উত্তাপ নেই। ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। ব্যাপারটা কীরকম হল? হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিক

তারে হাত পড়লে মানুষ যেভাবে ছিটকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়, তারও তো সেই অবস্থা হয়েছিল। সে রুদ্রাক্ষমালায় হাত রাখল। একদম স্বাভাবিক, অথচ এই মালা পরার পরই কাণ্ডটা ঘটেছিল। আর একটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, ওইভাবে মাটিতে পড়া সত্ত্বেও তার শরীরে কোনও আঘাত লাগেনি।

অর্জুনের মনে হল ঘটনাটা অমল সোমকে জানানো উচিত। রুদ্রাক্ষের এই মালার কোনও ক্ষমতা আছে কিনা সেটা উনি বলতে পারবেন। সে আবার পোশাক বদলে সদর দরজায় তালা ঝুলিয়ে বাইরে পা বাড়াল। রামগোপালবাবু আসছেন। ওদের পাড়ার খুব মাতব্বর লোক। দিনবাজারে বিশাল কারবার। ভদ্রলোক যথেষ্ট কৃপণ এবং কাউকে সাহায্য করেন না বলে দুর্নাম আছে। অর্জুন দূর থেকেই বলল, "রামগোপালকাকা, ভাল আছেন?"

রামগোপালবাবু দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে মুখ ভেটকে হাসলেন যার মানে দাঁড়ায়, এই চলে যাচ্ছে আর কী! কিন্তু অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "এই শখের টিকটিকিটার মতলব কী? এমনি এমনি জিজ্ঞেস করছে বলে মনে হয় না।"

গলাটা অবিকল রামগোপালবাবুর। অথচ তিনি এখনও মুখ ভেটকে ঘাড় কাত করে আছেন। ওভাবে কথা বলা যায় না। "এ কী রে! এ আবার আমাকে ওভাবে দেখছে কেন!" রামগোপালবাবুর মাথা সোজা হল।

অর্জুন মুখে বলল, "এমনি জিজ্ঞেস করলাম। হ্যাঁ, আপনার কয়েকটা ভুল ধরিয়ে দিচ্ছি। প্রথম কথা, আমি টিকটিকি নই। টিকটিকি বলা হত গুপ্তচরদের। পুলিশের স্পাই হলে তাকে। দ্বিতীয়ত, আমার কোনও মতলব নেই, আমি এমনি জিজ্ঞেস করেছিলাম। আচ্ছা, চলি।"

রামগোপালবাবুর চোয়াল ঝুলে গেল। অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "এইটুকুনি ছেলের কী লম্বা লম্বা বাত। তুই টিকটিকি কিনা তাতে আমার কী লাভ!"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "কী যে বলেন রামগোপালকাকা!"

রামগোপালবাবু এবার মুখ খুললেন, "তুমি কি ছায়ার সঙ্গে কথা বলছ? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি একটাও কথা বলিনি।"

অর্জুন হাসল, "তা হলে আমি ভুল শুনেছি।"

"কী শুনেছ তুমি?"

"আমি লম্বা লম্বা বাত বলি। আমি টিকটিকি কিনা তাতে আপনার কী লাভ! নিশ্চয়ই ভুল শুনেছি। আচ্ছা—!" অর্জুন হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করল যে জায়গায় রামগোপালবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে আর নড়তে পারছেন না।

রিকশা নিল অর্জুন। তার বাইকটা ঘরে বন্দি হয়ে রয়েছে। বন্দি করে গেছেন মা। সে বাইক চালায় বলে তাঁর খুব টেনশন হয়। তিনি বাইরে গেলে ছেলের যদি অ্যাকসিডেন্ট হয় সেই ভয়ে চাবি সরিয়ে রেখেছেন।

রিকশা চলছিল। হঠাৎ কানে এল, "এই বাবুটা খুব ভাল। মানুষের উপকার করে।"

অর্জুন চমকে চারপাশে তাকাল। তারপর সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল, "তুমি কি কদমতলায় থাকো?"

"না বাবু। তিস্তার চরে আমার বাসা। আপনি এই প্রথম আমার রিকশায় উঠলেন।"

অবিকল এক গলা। অর্থাৎ সে রিকশাওয়ালার মনে মনে বলা কথা শুনেছে। এটা কী করে সম্ভব? রিকশা ততক্ষণে থানার মুখে পড়েছে। থানার গেটে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে, জিপের পাশে সুদর্শনবাবু। সম্ভবত কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন। অর্জুন রিকশাওয়ালাকে থামতে বলল।

সে এগিয়ে যেতে সুদর্শনবাবু বললেন, "এই যে মশাই, সুখবর দিচ্ছি। মূল আসামি ধরা পড়ে গেছে। ওকে জেরা করতে মণ্ডলপাড়া যাচ্ছি। যাবেন নাকি?" অর্জুন কান পাতল। না, ভদ্রলোক মনে মনে অন্য কথা বোধ হয় বলেননি। অন্তত সে কিছু শুনতে পেল না।

"ক'জন ধরা পড়েছে?"

"আপাতত বিশ্বনাথকে ধরেছে লোক্যাল থানা। কান টানলেই মাথা আসবে। মিস্টার সোম বলেছেন ওকে ধরলে আমরা প্রমাণ করতে পারব না। উনি যে ঠিক বলেননি সেটা ওঁকে জানাবেন।" সুদর্শনকে খুব খুশি দেখাল।

বিশ্বনাথকে দেখার ইচ্ছে হল। ট্রেন-ডাকাত নয়, এক রাতের মধ্যে মণ্ডলপাড়া থেকে খবর পেয়ে জলপাইগুড়ি চলে এসে অমল সোমের বাড়িতে যে হামলা করেছে তার দর্শন পেতে আগ্রহী হল সে।

পুলিশের জিপে সে পৌঁছে গেল শহরতলির থানায়। সেখানকার প্রৌঢ় দারোগার সঙ্গে সুদর্শন অর্জুনের পরিচয় করিয়ে দিতেই লোকটা কৃতার্থ হয়ে হাসল কিন্তু অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "এই গোয়েন্দাটা আবার এখানে কেন? যত্তসব ঝামেলা।"

অর্জুন কিছু বলল না। তার মজা লাগছিল।

দারোগাবাবুর ঘরে বসার পর ভদ্রলোক বললেন, "কিছুতেই মুখ খুলছে না। অনেক চেষ্টা করেছি। শেষপর্যন্ত একটু রগড়ালাম কিন্তু কাজ হল না। আমার মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হয়েছে। এ ছোকরা যে ট্রেন-ডাকাতি করে সে-কথা গ্রামের লোকেরও জানা নেই।"

অর্জুন জিজ্ঞেস না করে পারল না। "ওদের বাড়ি সার্চ করেছেন?"

দারোগা তাকালেন। অর্জুন শুনতে পেল, "ও ছোকরা আমাকে কী ভাবে?" দারোগা হাসলেন,"একটা সুচও বাকি রাখিনি। লুটের জিনিস পাওয়া গেলে তো হয়েই যেত।"

অর্জুন বলল, "কিন্তু বিশ্বনাথের বাবা বলেছিলেন ও অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করে এবং জিনিসপত্র একটা ঘরে রাখে। এই ব্যবসাটা তো ভাঁওতা।"

"হতে পারে। কিন্তু আমি সেই ঘরে কিছুই পাইনি। এখন এই অবস্থায় কোর্টে

পাঠালে তো জাজ আমার বারোটা বাজিয়ে দেবে।”

সুদর্শন বললেন, “ছেলেটাকে এখানে আনুন তো!”

একজন সেপাইকে সেই হুকুম দিয়ে দারোগা বললেন, “এমনভাবে ওকে মারধোর করবেন না যা ও কোর্টকে দেখাতে পারে। ইতিমধ্যেই আমাকে ছোকরা মানবাধিকার কমিশনের নাম দু'বার শুনিয়েছে।”

সুদর্শন অবাক হলেন, “বাঃ। এ তো বেশ সেয়ানা বলে মনে হচ্ছে।” বিশ্বনাথকে নিয়ে এল দু'জন সেপাই। তার হাত খোলা কিন্তু কোমরে দড়ি বাঁধা রয়েছে। দেওয়ালের পাশে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

অর্জুন দেখল ছেলেটার বয়স একুশের বেশি নয়। রোগা লম্বা, গায়ের রং শ্যামলা। পরনে পাজামা আর ফুলশার্ট। সুদর্শন বললেন, “দ্যাখো বিশ্বনাথ, তুমি ধরা পড়ে গেছ। ট্রেন-ডাকাতের দলে তুমি ছিলে। এই সাহেবের কাছে সেটা যতই অস্বীকার করো কিন্তু যা সত্যি তা তো সবসময় সত্যি। আজ না হয় কাল তা প্রমাণিত হবে। তখন যা শাস্তি পাবে সেটার কথা ভাবো। তার চেয়ে যদি তুমি এখনই স্বীকার করে নাও আর যারা দলে ছিল তাদের নাম বলে দাও তা হলে আমরা তোমাকে ঠিক রাজসাক্ষী করে দেব। রাজসাক্ষী হলে তোমার শাস্তি কম হবে, নাও হতে পারে।”

বিশ্বনাথ কোনও জবাব দিল না। একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল।

সুদর্শন একটু অপেক্ষা করে বললেন, “আমি জানি তুমি তোমার সঙ্গীদের ভয় পাচ্ছ। ওরা তোমার ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু পুলিশ যদি তোমার পাশে থাকে তা হলে ওরা কী করতে পারে? উত্তর দাও।”

অর্জুন খানিকটা দূরে বসে শুনছিল। হঠাৎ মনে হল ছেলেটার কাছে যাওয়া দরকার। সে চেয়ার ছেড়ে কাছে এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল, “আমি কিছু জানি না, কিছু করিনি, এর বেশি একটা কথাও বলব না।”

অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। বিশ্বনাথ ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে আছে।

সে মৃদু গলায় ডাকল, “এই যে ভোলানাথ।”

বিশ্বনাথ তাকাল, জবাব দিল না। কিন্তু অর্জুন শুনল, “এ কেন ভোলানাথ বলল? যাই বলুক আমি কিছু জানি না।”

“ওর নাম বিশ্বনাথ, ভোলানাথ নয়।” দারোগাবাবু শুধরে দিলেন।

এই সময় দু'জন লোক ঘরে চলে এল। একজন বলে উঠল, “এই তো, এই তো আমার ছেলে। হ্যাঁ রে, তোকে কেউ মারধোর করেনি তো?”

বিশ্বনাথ জবাব দিল না। দ্বিতীয় লোকটি বলল, “দারোগাবাবু, আমি ওর উকিল। আমার মক্কেলকে কোন চার্জে ধরে নিয়ে এসেছেন জানতে পারি?”

“কোর্টে গিয়ে জানবেন।”

“না। আপনাকেই বলতে হবে। কারণ আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনও স্পেসিফিক চার্জ আপনার নেই। কাল রাত্রে দুটো লোক ওদের গ্রামে গিয়ে রটিয়ে

দিয়েছে যে ওরা ট্রেন-ডাকাত, সঙ্গে সঙ্গে ওকে আপনারা অ্যারেস্ট করে নিয়ে এলেন?" উকিল ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত।

সুদর্শন চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, "মাননীয় উকিলবাবু, ওর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ আছে। গতরাতে দলবল নিয়ে ও আমার এলাকায় একটি বাড়িতে হামলা চালিয়েছে। গৃহকর্তাকে না পেয়ে তার কাজের লোককে জখম করেছে। আর এইসব ঘটনার সাক্ষী আমাদের হাতে আছে। আপনি জামিন চাইলে কোর্টে আবেদন করতে পারেন।"

"কাল রাত্রে?"

"হ্যাঁ।"

"অদ্ভুত ব্যাপার। কাল সারারাত ও শিলিগুড়ি হাসপাতালে জেগে বসে ছিল। ওর বন্ধুর বাবা মৃত্যুশয্যায়। ও যে সেখানে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ছিল তার সাক্ষী অনেকেই। ডাক্তার নার্সদের সঙ্গে কথা বললেই জানা যাবে বিশ্বনাথ সেখানে ছিল কিনা। তা হলে নিশ্চয়ই ওর পক্ষে আপনার এলাকায় গিয়ে একই রাত্রে ওইসব কাজ করা সম্ভব নয়। তাই না?" উকিল খুব দৃঢ়তার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন।

স্থানীয় দারোগা বললেন, "তা হলে তো ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল।"

"কোনও জটিল ব্যাপার নয়। একজন নিরপরাধ লোককে আপনারা জোর করে থানায় ধরে রাখতে পারেন না।" উকিল জানালেন।

সুদর্শন বললেন, "পারি। সন্দেহজনক যে-কোনও মানুষকে আমরা থানায় ধরে আনতে পারি। আমরা ওকে আজই কোর্টে প্রোডিউস করে বিচারকের অনুমতি চাইব আরও কিছুদিন তদন্তের জন্যে পুলিশ হেপাজতে রাখতে। আপনারা বিরোধিতা করে যদি জামিন পেয়ে যান, ভাল কথা।"

"ওর বিরুদ্ধে এফ আই আর আছে?"

"আছে। জলপাইগুড়ির কোর্টে আসুন।"

স্থানীয় দারোগা বিশ্বনাথকে সুদর্শনের হাতে ছেড়ে দিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। হাতকড়ি পরিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে সেপাইদের সঙ্গে জিপে বসিয়ে ওকে জলপাইগুড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন সুদর্শন। তাঁর পাশে বসে ছিল অর্জুন। কেউ কোনও কথা বলছে না। ফাটাপুকুরের কাছে আসতেই অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "বদমাশটা নিশ্চয়ই খবর পেয়ে গেছে। ও যদি রেল গেটে এসে দাঁড়ায়—!"

অর্জুন চমকে তাকাতেই বিশ্বনাথের সঙ্গে চোখাচোখি হল। একটু বাদেই জিপ চলে এল রেলগেটের সামনে। এখন ট্রেনের সময় নয় বলে গেট খোলা। অর্জুন সুদর্শনকে বলল, "জিপ থামাতে বলুন তো।"

ড্রাইভার জিপ থামাতেই অর্জুন নীচে নেমে দাঁড়াল। এখানে কেউ নেই। দূরে দোকানগুলোর সামনে কয়েকজন অলসভাবে রয়েছে। অর্জুন জিপের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে বলল, "হারাধন তো আসেনি। খবর পায়নি বোধ হয়।"

শোনামাত্র বিশ্বনাথ যে অবাক হয়েছে তা বোঝা গেল। সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "কে হারাধন?"

"বিশ্বনাথকে জিজ্ঞেস করুন।"

বিশ্বনাথ মুখ ফিরিয়ে নিতেই অর্জুন শুনতে পেল, "এই লোকটা আমার মনের কথা জানল কী করে? ম্যাজিক জানে নাকি?"

"বিশ্বনাথ, হারাধন কে?" সুদর্শন গম্ভীর।

"আমি জানি না।"

পুলিশের জিপকে দাঁড়াতে দেখে দু-তিনজন কৌতূহলী এগিয়ে এসেছিল। অর্জুন তাদের সামনে গিয়ে বলল, "ভাই, একটু হারাধনকে খবর দেবেন। খুব দরকার।"

একজন বলল, "হারু তো ওই চায়ের দোকানের সামনে বসে আছে।"

অর্জুন চেঁচিয়ে ডাকল, "সুদর্শনবাবু, চলে আসুন।"

সুদর্শন গাড়ি থেকে নেমে কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বদমাশ লোকটাকে আপনি কী করে জোগাড় করলেন?"

"পরে বলব। একটু সাবধানে চলুন। আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে তো?"

"ওটা না থাকলে অস্বস্তি হয়।"

চায়ের দোকানের সামনে পৌঁছে ওরা দেখল, গোটা তিনেক ছেলে গল্প করছে। কাউকে দেখতে অপরাধীর মতো নয়। সুদর্শন সাদা পোশাকে ছিলেন। ওরা কথা থামিয়ে তাকাল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "হারাধন কে?"

"আমি, কেন?"

"তোমার বন্ধু বিশ্বনাথ গাড়িতে বসে আছে, ডাকছে।"

"কোন বিশ্বনাথ?"

"মণ্ডলপাড়ার বিশ্বনাথ।"

"আমি চিনি না। ওই নামে আমার কোনও বন্ধু নেই।"

"এখানে তুমি ছাড়া আর কেউ আছে যার নাম হারাধন?"

"খোঁজ নিন, আমি জানি না।"

ওর পাশের ছেলেটি বলল, "আর কোনও হারাধন এখানে নেই।"

"না থাকলে আমি কী করব? আমি বিশ্বনাথ বলে কাউকে চিনি না।"

সুদর্শন অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন আরও দু'পা এগিয়ে যেতেই শুনতে পেল, "এরা নিশ্চয়ই পুলিশ। ভোলানাথ নিশ্চয়ই ধরা পড়ে নাম বলে দিয়েছে। কী করে পালানো যায়!"

অর্জুন বলল, "ভোলানাথের নামই তো বিশ্বনাথ, তাই না?"

শোনামাত্র ছেলেটির চোয়াল ঝুলে গেল।

অর্জুন বলল, "বুঝতেই পারছ আমাদের কোনও ভুল হয়নি। জোর জবরদস্তি করলে সবাই জেনে যাবে। তার চেয়ে ভদ্রভাবে চলো, ওই জিপে তোমার বন্ধু

বসে আছে। আমরা কোনও ঝামেলা করতে চাই না।"

ছেলেটি বাধ্য হল উঠে দাঁড়াতে। সুদর্শন বললেন, "দৌড়ে পালাবার চেষ্টা কোরো না। পেছন থেকে গুলি ছুড়লে মাথায় লাগতে পারে।" বলতে বলতে তিনি অস্ত্রটা বের করে দেখালেন।

একটা কথাও না বলে হারাধন রাস্তাটা হেঁটে এসে জিপে উঠতেই সুদর্শনের নির্দেশে সেপাইরা তাকে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বিশ্বনাথের পাশে বসেই হারাধন চাপা নিষ্ঠুর গলায় বলে উঠল, "তুই আমাকে ধরিয়ে দিলি, এর শাস্তি তুই কল্পনাও করতে পারবি না।"

ইতিমধ্যে পিলপিল করে মানুষ ছুটে আসছে। স্থানীয় ছেলে হারাধনকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই খবরটা দ্রুত চাউর হয়ে যাচ্ছে। অর্জুন বলল, "হারাধনের বাড়িতে চলুন, ডাকাতির জিনিসগুলো ওখানে থাকলেও থাকতে পারে।"

মাথা নেড়ে ড্রাইভারকে সোজা জোরে চালাতে বলে সুদর্শন গলা নামালেন, "খেপেছেন? এই ক্রাউড পেছন পেছন যাবে। কেউ যদি খেপিয়ে দেয় তা হলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওদের ছিনিয়ে নেবে, আমার সঙ্গে ফোর্স নেই।"

ওদিকে পেছনের সিটে বন্দি অবস্থায় হারাধন সমানে গালাগালি করছে বিশ্বনাথকে। শেষ পর্যন্ত বিশ্বনাথ বলল, "আমি তোকে ধরিয়ে দিইনি।"

"মিথ্যে কথা। তুই না বললে এখানে গাড়ি থামল কেন? ওরা আমার খোঁজে চায়ের দোকানে কেন গেল?"

"আমি মুখে কিছু বলিনি। এদের জিজ্ঞেস কর!"

পাশে বসা একজন সেপাই হাসল, "না। এ কিছু বলেনি। কথাই বলেনি।"

"না বললে এরা জানল কী করে?"

বিশ্বনাথ করুণ গলায় বলল, "জানি না। আমি মনে মনে বলেছিলাম অথচ উনি শুনে ফেললেন?"

হারাধন রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলল না। অর্জুন শুনতে পেল, "কথাটা ঠিক; আমি মনে মনে ভোলানাথ বলেছিলাম অথচ এই লোকটা শুনতে পেয়েছিল।" সে একদম চুপ হয়ে যাওয়ার আগে ফিসফিস করে বিশ্বনাথকে বলল, "শোন, তুই কোনও কথা মনে মনে ভাববি না।"

জলপাইগুড়ির সদর থানায় না আসা পর্যন্ত কোনও কথাবার্তা হল না। সেকেন্ড অফিসারকে ওদের কাগজপত্র তৈরি করতে বলে সুদর্শন অর্জুনের সঙ্গে আলাদা বসলেন, "কী ব্যাপার বলুন তো? অনেকক্ষণ ধরে আমি কৌতূহল চেপে আছি।"

"কী ব্যাপারে বলুন?"

"আপনি রেলগেটে গাড়ি থামাতে বললেন, হারাধনের নামও সহজে উচ্চারণ করলেন। অথচ আমি নিশ্চিত এ-ব্যাপারে আপনার আগে কিছু জানা ছিল না।"

"আপনি ঠিকই বলেছেন। মানুষ যা চিন্তা করে তা কেউ কেউ পড়তে বা শুনতে পান, এটা জানেন তো?"

"শুনেছি। থট রিডিং গোছের কিছু।"

"ওই ধরে নিন।" অর্জুন হাসল, "এই যেমন আপনি জিপে বসে এই কথাটা অনেকবার ভেবেছেন। আমি ম্যাজিক দেখাচ্ছি বলে মন্তব্য করেছেন।"

"অ্যাঁ? সেটাই আপনি শুনতে পেয়েছেন।" সুদর্শন অবাক!

অর্জুন বলল, "কিন্তু এটা ম্যাজিক নয়।" অর্জুন উঠতে চাইল।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমাকে শিখিয়ে দেবেন?"

"এটা কাউকে শেখানো যায় না। গুরু দয়া করলে হয়ে যায়।"

"গুরু? আপনার গুরু কে?"

"অমল সোম।"

"যাচ্চলে! আপনি বুঝতে পারছেন না অর্জুন, এই ব্যাপারটা আমাদের ডিপার্টমেন্টে কী চমৎকার কাজে আসবে। অনেক ঘুঘু অপরাধীকে ধরার পর মারধোর দিয়েও মুখ খোলাতে পারি না। স্রেফ প্রমাণের অভাবে তারা পার পেয়ে যায়। ওদের মনের কথা পড়তে পারলে শাস্তি দিতে কোনও সমস্যা হবে না।" আন্তরিক গলায় বললেন সুদর্শন।

"আমি অমলদাকে আপনার প্রস্তাবের কথা বলব।"

"প্লিজ বলুন। দরকার হলে এস পি সাহেবকে নিয়ে ওঁর বাড়িতে যেতে পারি আমি। এই আবিষ্কারের কথা জানাজানি হলে সমস্ত পৃথিবীতে হইচই পড়ে যাবে।" সুদর্শন যেন স্বপ্ন দেখছিলেন।

"কিন্তু ওদের আজ কোর্টে তুলবেন যখন, তখন চার্জশিট দেবেন না?"

"সময় চাইব। আগে হারাধনকে রগড়াই, যদি খবর বের হয়। আমি বুঝতে পারছি এরাই ট্রেনে ডাকাতি করেছে কিন্তু এখনও হাতে কোনও প্রমাণ নেই। গাড়িতে উঠে বিশ্বনাথকে দেখে হারাধন যেরকম রি-অ্যাক্ট করল তাতেই স্পষ্ট, ওরা একটা অপরাধ করেছে।"

"কিন্তু শুধু এই কথাগুলো কি কোর্টে বিশ্বাস করবে?"

"না।"

"অমলদার বাড়িতে হামলা করে হাবুকে মারধোর করার অপরাধে বিশ্বনাথকে আপনি ধরে রাখতে পারবেন না। ওর উকিল ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে গতরাতে ও কোথায় ছিল।"

"হ্যাঁ। নিশ্চয়ই সাক্ষী রাখবে।"

"তা হলে? হামলা করল কে? বিশ্বনাথ নিজে না এসে ওর বন্ধুদের পাঠিয়েছিল? সেই বন্ধুদের মধ্যে হারাধন ছিল? এসব প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার।" অর্জুন এবার উঠে দাঁড়াল।

সুদর্শন মাথা নাড়লেন, "আমার মনে হচ্ছে বিশ্বনাথ কাল রাতে এই শহরে আসেনি। সে যখন শুনেছে ট্রেন ডাকাতির ব্যাপারে মিস্টার সোম তার খোঁজে গ্রামে গিয়েছিলেন, ওর বাবার সঙ্গে কথা বলে নিজের ঠিকানা দিয়ে এসেছেন,

তখন সে যদি হামলা করতে আসে তা হলে পুলিশ আগে তাকেই সন্দেহ করবে। ও চলে গেছে শিলিগুড়িতে। সেখানে থাকার অজুহাত খাড়া করেছে এবং বন্ধুদের পাঠিয়েছে।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে হঠাৎ অর্জুনের মনে হল ঘটনাটা এইরকম সহজভাবে ঘটেনি। বিশ্বনাথের বাড়ি এবং গ্রাম সে দেখেছে। বিশ্বনাথকেও। একটু রোগা হলেও ওর শরীরে শক্তি আছে। পড়াশুনো বেশি করেনি। কিন্তু এ-ধরনের অপরাধ অর্গানাইজ করার মতো বুদ্ধি এবং দক্ষতা ওর কিছুতেই থাকতে পারে না।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনারা ওদের কখন কোর্টে তুলবেন?"

"সেকেন্ড হাফে।"

"কোন চার্জে?"

"ট্রেন ডাকাতি এবং বাড়িতে হামলা। দুটো জুড়ে দেব।"

"আমি একবার বিশ্বনাথের সঙ্গে আলাদা কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।" সুদর্শন হুকুম দিলেন বিশ্বনাথকে আনার জন্যে।

অর্জুন বলল, "ওদের কি একসঙ্গে রেখেছেন?"

"না। একসঙ্গে থাকলেই তো পরামর্শ করবে।"

বিশ্বনাথকে নিয়ে আসা হল। তাকে চেয়ারে বসতে বললে সে ইতস্তত করে বসল। অর্জুন বলল, "বিশ্বনাথ, গতকাল আমি আর আমার দাদা তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। যাওয়ার আগে শুনলাম গ্রামের লোকজন তোমার বাবার ওপর খুব অসন্তুষ্ট। ব্যাপারটার কারণ কী বলো তো?"

"বাবাকে জিজ্ঞেস করলে পারতেন।"

"আমরা তোমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি রাত সাড়ে ন'টার পরে। তুমি নিশ্চয়ই তারও পরে বাড়িতে ফিরে আমাদের কথা শুনেছ। তাই তো?"

অর্জুন শুনতে পেল, বিশ্বনাথ ভাবছে, আমি কোনও জবাব দেব না।

"তুমি ভাবলে কোনও জবাব দেবে না, তাই তো?"

বিশ্বনাথ চোখ তুলে তাকিয়ে ভাবল, "এই লোকটা আমার মন পড়তে পারছে কী করে? যা ভাবলাম তা জেনে ফেলছে? আমি তা হলে আর ভাবব না। দুর, ভাবব না বললেই পারা যায় নাকি? যদি হারাধন মুখ খোলে!"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "ঠিক কথা। হারাধন মুখ খুললে তুমি খুব বিপদে পড়ে যাবে। তার চেয়ে আমরা তোমার সঙ্গে গেল রাত্রে গ্রামে ফিরে যাই। গিয়ে বৈদ্যনাথবাবুর সামনে দাঁড়াতেই তিনি তোমাকে কী বলতে পারেন? এখন টাকাপয়সা রোজগার করছ আর তোমার বাবা যেহেতু ওই বস্তুটিকে খুব ভালবাসেন তাই তোমাকে বকাঝকা অথবা মারধোর না করে সতর্ক করেন। বলেন তোমার স্টোররুমে যা সাপ্লাই-এর জিনিস ছিল সব তিনি বের করে আলাদা রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তোমাকে তখনই জলপাইগুড়ির হাকিমপাড়ায় অমল সোমের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বলবেন। ঠিক বললাম?"

ঠোঁট টিপে থাকল বিশ্বনাথ। আর মনে মনে বলল, "আমি কোনও কিছু ভাবব না। যা বলার বলে যাক।"

"তারপর তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলবল জুটিয়ে একটা গাড়ি ম্যানেজ করে চলে এলে জলপাইগুড়িতে। ঠিকানা খুঁজে অমল সোমের বাড়িতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাউকে না পেয়ে ওঁর কালা বোবা চাকরটাকে মারলে। ঠিক?"

সজোরে মাথা নাড়ল বিশ্বনাথ, "না, আমি জলপাইগুড়িতে যাইনি।"

"তা হলে শিলিগুড়িতে চলে গিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু শিলিগুড়িতে নেমেই তুমি হাসপাতালে যাওনি। কারণ সেখানে তোমার কোনও বন্ধুর বাবা অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন এ-কথা তুমি জানতে না। তুমি কি কাউকে ফোন করে ঘটনাটা বলেছিলে, না নিজে গিয়েছিলে?"

"আমি হাসপাতালে গিয়েছিলাম।"

"কেন? সেখানে তো তোমার যাওয়ার কথা নয়। যদি তেমন কেউ অসুস্থ থাকত যার জন্যে রাত জাগা যায় তা হলে তুমি সন্ধে থেকেই সেখানে থাকতে, মণ্ডলপাড়ায় ফিরে যেতে না।"

অর্জুন শুনল বিশ্বনাথ ভাবছে, "কথাটা ঠিক বলছে। মহামুশকিল হয়ে গেল! লোকটা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথার চাপ দিচ্ছে।"

অর্জুন হাসল, "তোমার তাই মনে হচ্ছে? আমি কথার চাপ দিচ্ছি?"

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে বসল, "আপনি কে?"

"আমার নাম অর্জুন।"

"আপনি এইভাবে মনের কথা বলেন কী করে?"

"কোথায় আর বললাম? তুমি তো মনে মনে ভাবছ না কাল রাত্রে শিলিগুড়িতে পৌঁছে ঠিক কী করেছিলে।"

"আমি হাসপাতালে ছিলাম।"

"হ্যাঁ। সেটা আমিও বিশ্বাস করি। তুমি জলপাইগুড়িতে যাওনি।"

অর্জুন শুনল বিশ্বনাথ ভাবছে, "সত্যি কথা বলছে কিনা কে জানে!"

বিশ্বনাথকে ফেরত পাঠিয়ে সে সুদর্শনকে বলল হারাধনকে আনাতে। সুদর্শন সেই আদেশ দিয়ে বলল, "আপনি তো আমার কেস খারাপ করে দিচ্ছেন অর্জুন। আপনি বিশ্বাস করেন বিশ্বনাথ জলপাইগুড়িতে আসেনি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে তো ওর বিরুদ্ধে হামলার মামলা টিকবে না।"

"না। কারণ কোনও বুদ্ধুও দল নিয়ে আসবে না হামলা করতে যখন সে জানে তার গোপন খবর লোকটার জানা। কিন্তু হামলা হয়েছিল তার কারণ ট্রেন-ডাকাতির একমাত্র সক্রিয় সাক্ষীকে সরিয়ে দেওয়া দরকার বলে ওরা মনে করেছিল।" অর্জুন কথা শেষ করতেই হারাধনকে নিয়ে সেপাই ঢুকল। তাকে

আদর করে বসিয়ে অর্জুন বলল, "এখন তুমি কী করবে তা তোমাকেই ঠিক করতে হবে হারাধন।"

"মানে?"

"বিশ্বনাথ বলে গেছে সে জলপাইগুড়িতে হামলা করতে আসেনি। ওর বাবার কাছে গত রাত্রে মণ্ডলপাড়ায় ফিরে যখন জানতে পারল ট্রেনডাকাতির দু'জন সাক্ষী বাড়িতে খোঁজ করতে এসেছিল তখনই ও গ্রাম ছেড়ে শিলিগুড়িতে ফিরে যায়। শিলিগুড়িতে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করে। তুমি তখন ওখানেই ছিলে। আজ সকালে বাড়ি ফেরার প্ল্যান ছিল। খবরটা শুনে তুমিই বন্ধুদের জোগাড় করে একটা গাড়ি নিয়ে মাঝরাতে জলপাইগুড়িতে যাও সাক্ষীকে সরিয়ে দিতে। সাক্ষীকে না পেয়ে কাজের লোককে মারধোর করে ফেরার পথে রেলগেটের কাছে নেমে গিয়েছ, কারণ তার কাছেই তোমার বাড়ি।" অর্জুন হাসল।

"মিথ্যে কথা।" মাথা নাড়ল হারাধন।

"কোনটা মিথ্যে?"

"আমি কিছু জানি না।"

"তুমি যে কাল সারারাত বাড়ি ছিলে না, ভোরে ফিরেছ, এ খবর এতক্ষণ আমরা পেয়ে গেছি। এটাও মিথ্যে?"

হারাধন চুপ করে রইল। কিন্তু সে কিছু ভাবছে না?

"চুপ করে থাকলে তোমার উপকার হবে না। কাল রাত্রে শিলিগুড়িতে বিশ্বনাথ তোমার সঙ্গে দেখা করেনি?"

"না।"

"তুমি তা হলে এ-ব্যাপারে কিছু জানো না?"

"না।"

"গতকাল ট্রেনে ডাকাতির একটু আগে বিশ্বনাথকে ভোলানাথ বলে ডাকোনি? যার জন্যে বিশ্বনাথ তোমার ওপর রেগে গিয়েছিল!"

হারাধন এমনভাবে চমকে উঠল যে, সুদর্শন পর্যন্ত হেসে উঠলেন, "আর লুকিয়ে লাভ নেই ভাই। বুঝতেই পারছ বিশ্বনাথ একটু আগে সব কথা ফাঁস করে গেছে।"

হারাধন মাথা নিচু করল। বোঝাই যাচ্ছিল ওর মনে ঝড় বইছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কাল ট্রেনে তোমরা ক'জন দলে ছিলে?"

"আটজন।" মিনমিনে গলায় জবাব এল।

"আটজনই কি বন্ধু?"

"না। কাজ করতে গিয়ে আলাপ হয়েছিল।"

"তুমি রেলগেট, বিশ্বনাথ মণ্ডলপাড়ার, আর বাকিরা?"

"কেউ বেলাকোবা, কেউ আমবাড়ি ফালাকাটার, বাকিরা শিলিগুড়ির।"

"এর আগে কতবার ট্রেনডাকাতিতে ছিলে তোমরা?"

“আমি সেকেন্ড টাইম।”

“কী করে এদের সঙ্গে যোগাযোগ হল?”

“সিনেমা দেখতে গিয়ে।”

“কীরকম?”

“শিলিগুড়ির মেঘদূত সিনেমায় মিঠুনের বই এসেছিল। অ্যাডভান্স হাউসফুল ছিল, কারেন্ট টিকিটের লাইন ব্ল্যাকাররা ম্যানেজ করে নিচ্ছিল বলে আমার সঙ্গে ঝামেলা হয়। আমি দু'জনকে খুব মেরেছিলাম। তখন একজন এসে মিটিয়ে দিয়ে টিকিট দিল। সিনেমা দেখে বেরনোর সময় লোকটা আমাকে ডেকে নিয়ে গেল একটা রেস্টুরেন্টে। চা, কাটলেট খাইয়ে আমার খবর নিল। আমি বেকার শুনে কাজ পাইয়ে দেবে বলে। পরদিন লোকটা রেলগেটে এসে আমার বাড়িতে যায়। সব দেখেশুনে বলে পরদিন শিলিগুড়িতে যেতে।”

“শিলিগুড়ির কোথায়?”

হারাধন তাকাল, “আমি মরে যাব। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। বস্ বলে দিয়েছে কেউ পুলিশের কাছে মুখ খুললে তার জান নিয়ে নেওয়া হবে।”

“কেউ জানবে না। বস্ জানবে কী করে?”

“এইসব কথা আপনারা কোর্টে বললেই বস্ জেনে যাবে।”

“তোমাকে কথা দিচ্ছি কোর্টে কিছু বলব না আমরা।”

“আপনি পুলিশ?”

“না। আমি পুলিশ নই। উনি এখানকার চার্জে আছেন এবং আমি জানি উনি আমার কথা রাখবেন।”

হারাধন মাটির দিকে তাকাল। অর্জুন শুনতে পেল, “বলেই ফেলেছি যখন তখন আর চেপে গিয়ে লাভ কী! ওরা যদি কোর্টে কিছু না বলে তা হলে আমিও বলব আমি কিছু বলিনি।”

অর্জুন হাসল, “ঠিক কথা। তুমি ঠিক ভাবছ ভাই।”

হারাধন হাউমাউ করে উঠল, “আচ্ছা, আমি যা ভাবছি তা আপনি বুঝতে পারছেন কী করে বলুন তো?”

“ভগবানের আশীর্বাদে। হ্যাঁ, বাকিটা বলো!”

হারাধন কয়েকবার নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, “ওই মেঘদূত সিনেমার সামনে।”

“তারপর?”

“সেখানে ওই লোকটা ছিল।”

“কী নাম লোকটার?”

“মানাভাই।”

“বাঙালি?”

“জানি না। বাংলা নেপালি হিন্দি। এমনকী ইংরেজিতেও কথা বলে।”

"বেশ। মানাভাই তোমাকে কী বলল?"

"বলল, আমার গায়ে জোর আছে, সাহসও আছে, আমি কেন আরও বেশি রোজগারের ধান্দায় না গিয়ে চাকরির চেষ্টা করছি। ওর বস্ নাকি আমাদের মতো বেকার ছেলেদের উপকার করার জন্যে একটা ক্লাব করেছেন। আমি ইচ্ছে করলে সেই ক্লাবের মেম্বার হতে পারি।"

"তারপর?"

"মানাভাই আমাকে নিয়ে গেল সেবক রোডের একটা বাড়িতে। বাড়িটায় ঢোকার গেটের ওপর একটা সাইনবোর্ড ছিল। তাতে চায়ের ব্যবসা করার কথা লেখা ছিল। সামনে অনেক চায়ের বাক্স ছিল। পেছনের দরজা দিয়ে যে ঘরে মানাভাই আমাকে নিয়ে গেল সেখানে ছ'জন ছেলে বসে ছিল।"

"বিশ্বনাথ তাদের মধ্যে ছিল?"

"না। ও পরে এসেছিল।"

"তারপর কী হল?"

"ওখানে একজন মাস্টারমশাই এলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা ভাগ্যের হাতে মার খেয়ে গরিব হয়ে বেঁচে থাকতে চাই, না কি ভাগ্যকে জয় করতে চাই।' প্রথমটা চাইলে এখনই চলে যেতে পারি। সবাই একসঙ্গে বললাম, ভাগ্যকে জয় করতে চাই। তিনি খুশি হলেন। বললেন, 'ভাগ্যকে জয় করার অনেক পথ আছে। সাহস, বুদ্ধি এবং শক্তিকে এক করতে হবে। এই পৃথিবীতে কেউ মুখ দেখে হাতে কিছু তুলে দেয় না। ওই তিনটি গুণ এক করে সেটা আদায় করে নিতে হয়। পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যাদের কিছু নেই। আবার কিছু মানুষ আছে যাদের প্রচুর আছে। আমরা চাইলে ওই প্রচুর থাকা মানুষদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে নিতে পারি। কিন্তু ওই আদায় করতে গেলে সহজে সেটা দেবে না। তখন জোর খাটাতে হবে।"

একজন জিজ্ঞেস করল, জোর করে আদায় করতে গেলে পুলিশ ধরবে। কিন্তু মাস্টারমশাই হেসে বললেন, "তোমরা সেখানে এই কাজটা করবে যেখানে পুলিশ থাকবে না। খবর পেয়ে পুলিশ আসার আগেই তোমরা অনেক দূরে চলে আসবে। আমরা চাই না এইসব করার সময় ওদের কেউ আহত হোক। কিন্তু তেমন প্রয়োজন হলে আর কী করা যাবে।" প্রথমদিন ওই পর্যন্ত হয়েছিল। আমাদের একটা কাগজে সই করতে হয়েছিল। একজন ক্যামেরাম্যান এসে প্রত্যেকের ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছিল। বলা হল, আজ থেকে এই ক্লাবের কথা যে বাইরে বলবে সে বিশ্বাসঘাতক এবং বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু।

তারপর একটু একটু করে আমাদের শেখানো হল কী করে কোন ট্রেনে ডাকাতি করতে হবে। কীভাবে হাইওয়েতে বাস- আটকে ডাকাতি করতে হবে। ট্রেন বা লংরুটের বাসযাত্রীরা নিজেদের খুব অসহায় ভাবে। ডাকাত দেখলে তেমন প্রতিরোধ করে না। আর রিভলভার দেখলে তো কথাই নেই। আমি বা বিশ্বনাথ

বাস ডাকাতি করিনি, ট্রেনে করেছি। প্রথমবার কেউ বাধা দেয়নি। দ্বিতীয়বারে একটা লোক রিভলভার দেখিয়েছিল বলে একটু মুশকিল হয়েছিল। তবু কেউ ধরা পড়িনি।

"তারপর?"

"রাত্রে বিশ্বনাথ বসকে জানিয়েছিল দুটো লোক মণ্ডলপাড়ায় তাদের বাড়িতে গিয়ে ডাকাতির কথা বলে জলপাইগুড়িতে যেতে বলেছে, বস ঠিক করল বিশ্বনাথ যাবে না। সে হাসপাতালে থাকবে। সেখানে সত্যিই একজন অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে, আমাদের পাঠাল গাড়ি দিয়ে লোকদুটোকে শেষ করে দিতে। আমরা ভোর পাঁচটায় পৌঁছে হাকিমপাড়ায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। একটা লোক হাফপ্যান্ট পরে হেঁটে এলে তাকে জিজ্ঞেস করে বাড়িটায় পৌঁছে গেলাম। কিন্তু লোকদুটোর কপাল ভাল বলে ওরা রাত্রে বাড়িতে ফেরেনি। ওদের চাকরটা জবাব দিচ্ছিল না বলে বেশ ধোলাই খেয়েছে। শেষপর্যন্ত ওরা আমাকে রেলগেটে নামিয়ে দিয়ে শিলিগুড়ি চলে গেল।"

অর্জুন সুদর্শনের দিকে তাকাল, "এ সত্যি কথা বলেছে। তোমাকে বলি হারাধন, যে দু'জনকে তোমরা খুন করতে গিয়েছিলে তার একজন হলাম আমি। আর যে চাকরটাকে মেরেছ সে বোবা এবং কালা, বেচারা কথা বলতে পারে না।"

হারাধন মুখ নিচু করল। সুদর্শন ওকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, "এ ছোকরা যদি সত্যি কথা বলে থাকে তা হলে আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। এখনই শিলিগুড়িতে খবর পাঠাই। ওই চায়ের অফিসে গিয়ে সবক'টাকে হাতেনাতে ধরে ফেলুক। আমার মনে হচ্ছে ওটাই ডাকাতির জিনিস রাখার গুদাম।"

"আমার তা মনে হয় না।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"কেন?"

"ওরা অত বোকা নয়। এখন পুলিশ গেলে কাউকে খুঁজে পাবে না। ওরা ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে, বিশ্বনাথ এবং হারাধনকে পুলিশ ধরেছে। নিশ্চয়ই সতর্ক থাকবে এখন।"

"তা অবশ্য। কিন্তু এই বস্ লোকটা কে?"

"যে মানাভাই বা মাস্টারমশাইকে চালায়। এখন তো মনে হচ্ছে এই অঞ্চলের সমস্ত ট্রেন-বাস ডাকাতি এই লোকটির জন্যে হচ্ছে।"

অর্জুন কথা শেষ করামাত্র সেকেন্ড অফিসার এসে দাঁড়ালেন, "সার, এই দুটোকে কোর্টে নিয়ে যাব?"

"যাবেন। কিন্তু কী কেস দিয়েছেন?"

"ট্রেনডাকাতি, খুনের জন্যে বাড়িতে হামলা। এটা না দিলে হয়তো জামিন পেয়ে যাবে।"

সুদর্শন কিছু বলার আগে অর্জুন বলল, "একটি অনুরোধ করব?"

সুদর্শন মাথা নাড়লেন।

"ওদের দু'জনের বিরুদ্ধে শুধু ট্রেনডাকাতির অভিযোগ রাখুন।"

"শুধু ট্রেনডাকাতি?" সেকেন্ড অফিসার মাথা নাড়লেন, "না, তা হলে বিচারক জিজ্ঞেস করবেন প্রাথমিক কোনও প্রমাণ আছে কিনা? তেমন বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি না দেখালে ওরা ছাড়া পেয়ে যাবে।"

"যাক না!" অর্জুন বলল।

"কী বলছেন অর্জুন?" প্রতিবাদ করলেন সুদর্শন।

"ভেবে দেখুন, বিশ্বনাথ এবং হারাধনকে আপনারা যখন ইচ্ছে তখনই ধরতে পারবেন, যদি ওরা পালিয়ে না যায়। পালিয়ে গেলেও ওরা ওদের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেশিদিন থাকতে পারবে না। ধরা পড়বেই। কিন্তু আপনাদের কী লাভ হবে? ওদের দল, বিশেষ করে ওদের বস্ বিশ্বাস করবে ওরা মুখ না খোলায় পুলিশ কেস সাজাতে পারেনি। ফলে লোকটা আবার ডাকাতির মতলব আঁটবে। তখন ওদের হাতেনাতে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন আপনারা। এদের শাস্তি দিয়ে কী লাভ, যতক্ষণ না ওদের বস্‌কে ধরতে পারছেন। বরং যদি সম্ভব হয় কোর্ট থেকে ছাড়া পেয়ে ওরা কোথায় যায় তা কাউকে দিয়ে ফলো করিয়ে দেখুন।" অর্জুন বলল।

সুদর্শন একটু চিন্তা করে বললেন, "বেশ ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাচ্ছে কিন্তু চুনোপুঁটি ধরে কোনও লাভ নেই। তুমি আর একবার বদমাশটাকে নিয়ে এসো।" সেকেন্ড অফিসার সমর্থন করতে পারছিলেন না কিন্তু বড়বাবুর আদেশ মানতে তিনি বাধ্য।

একটু বাদেই হারাধনকে একজন সেপাই পৌঁছে দিয়ে গেল।

সুদর্শন বললেন, "হারাধনবাবু, আমরা আমাদের কথা রাখছি, তুমি যা বলেছ তা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আজ কোর্ট থেকেই ছাড়া পেয়ে যাবে তোমরা। আমরা এখনই সব খবর প্রকাশ করছি না। কিন্তু বলো তো বাবা, তোমাদের ওই বস্‌কে কোথায় পাওয়া যাবে?"

"আমি জানি না। সত্যি বলছি জানি না।"

সুদর্শন অর্জুনের দিকে তাকালেন। অর্জুন ইশারায় বলল, সত্যি বলছে।

"মানাভাই?"

"মানাভাইয়ের বাড়ি কোথায় জানি না, তবে ওঁকে এয়ারভিউ হোটেলের উলটোদিকের মারুতি স্ট্যান্ডে বেশিরভাগ সময় দেখা যায়।"

"গুড। শোনো হারাধন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এইরকম ডাকাতি করে বেশিদিন কেউ জেলের বাইরে থাকতে পারে না। তোমার স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আমরা তোমাকে শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি শাস্তি পেলে ডাকাতি বন্ধ হবে না। তোমাদের বস্ নতুন ছেলেকে দলে নেবে। তাই আগে তাকে ধরা দরকার। আমি তোমার কাছে খবর চাই।" সদর্শন বললেন।

হারাধন চুপ করে থাকল। অর্জুন শুনল, "আমি খবর দিচ্ছি জানতে পারলে বস্ আমাকে মেরে ফেলবে। তার চেয়ে জেলে যাওয়া ভাল।"

অর্জুন হাসল, "তুমি ঠিকই ভাবছ।"

সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "কী ভাবছে ও?"

"আপনাকে খবর দিয়েছে জানতে পারলে ওর বস্ ওকে মেরে ফেলবে।"

হারাধন চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি কী করে মনের কথা টের পান?"

অর্জুন বলল, "উত্তরটা আগেই দিয়েছি। শোনো, খবর দিতে তোমাকে এখানে আসতে হবে না। যে-কোনও খবর তুমি টেলিফোনে জানিয়ে দিও। এই আমার নম্বর, ওকে লিখে দিন।"

সুদর্শন কাগজ টেনে লিখে এগিয়ে দিলেন।

অর্জুন বলল, "এটা ভাল করে মুখস্থ করে ছিঁড়ে ফেলো। সঙ্গে রাখা ঠিক হবে না। আচ্ছা, এবার আমি উঠি।"

অর্জুন বেরিয়ে এল।

গলিতে ঢুকতেই বুড়িদিকে দেখতে পেল সে। বুড়িদি তাদের বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে আছে। একটু কাছে যেতেই সে স্পষ্ট বুড়িদির গলা শুনতে পেল, "খালি হাতে আসছে? মুখে বড় বড় কথা কিন্তু উপকার করার বেলায় নেই। যখন গোয়েন্দাগিরি করত না তখন ভাল ছেলে ছিল। এখন খুব নাম হয়ে গেছে তাই ল্যাজ মোটা হয়ে গেছে।"

বুড়িদির ভাবনা শুনতে পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল অর্জুন। বুড়িদি তার সম্পর্কে এইরকম ভাবে? সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

আর-একটু এগোতেই একগাল হেসে বুড়িদি জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে, পেলি?"

""এখনও পাইনি।" অর্জুন সহজ হতে পারছিল না।

"দ্যাখ না বাবা। আমার মুখের দাগ রোজ বেড়ে যাচ্ছে।"

অর্জুন আর দাঁড়াল না। তার বাড়ির দরজায় পৌঁছনোমাত্র সে ডাক শুনতে পেল, "ও অর্জুন। একটু ওয়েট করো।"

সে দেখল, রামগোপালবাবু এগিয়ে আসছেন, "আমি অনেকক্ষণ ধরে তোমার অপেক্ষায় এখানে দাঁড়িয়ে আছি। বুঝলে?"

"কেন বলুন তো?"

"কথা আছে। তালা খুলে ভেতরে চলো।"

বাইরের ঘরের চেয়ারে বসে গলা নামালেন ভদ্রলোক, "শোনো, আমি স্বীকার করছি তুমি অন্তর্যামী।"

"কী যা-তা বলছেন?" অর্জুন তীব্র আপত্তি করল।

"একদম যা-তা নয়। আমার মনের কথা তুমি ঠিকঠাক বলে গেলে তখন। আমি যা ভেবেছি তাই বলেছ। বাবা, ওইসব ভাবনা আমি ইচ্ছে করে ভাবিনি, হঠাৎ মাথায় এসে গিয়েছিল কিন্তু তুমি সেটা হুবহু বলে দিয়েছ। আমি অনেক সাধু-

সন্ন্যাসীর কাছে ঘোরাঘুরি করেছি কিন্তু তাঁদের কেউ এমন ক্ষমতায় অধিকারী নন।"

"আপনি চা খাবেন কাকা?"

প্রশ্নটা করেই অর্জুন শুনতে পেল রামগোপালবাবু ভাবছেন, 'আমাকে কাটিয়ে দেওয়ার মতলব করছে ছোকরা। কিন্তু আমি ছাড়ব না।'

"না ছেড়ে কী করবেন?"

"অ্যাঁ? তবে? দ্যাখো বাবা, আমার সঙ্গে লীলা কোরো না।"

"কী বলতে চাইছেন আপনি?"

আর-একটু এগিয়ে এলেন রামগোপালবাবু, "তুমি তো স্টেডি কাজকর্ম করো না। মাঝে মাঝে গোয়েন্দাগিরি করো বটে, তাতে ক'টা টাকাই বা হয়! তোমাকে আমি মাস মাইনের চাকরি দেব। ধরো, মাসে পাঁচ হাজার।"

"সে কী? এত টাকা?"

"দিতাম। ছেলেবেলা থেকে দেখছি তোমাকে। এটুকু নাহয় করলাম।"

"আমাকে কী কাজ করতে হবে?"

"আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হবে। চারধারে প্রচুর শত্রু আমার। সবাই প্যাঁচ কষছে কীভাবে আমাকে গর্তে ফেলা যায়। কারও মনের কথা বুঝতে পারি না আমি। তুমি সঙ্গে থাকলে ওদের মনের কথা আমি শুনে ফেলব। মানে তুমি বলবে আমি শুনব।" তৃপ্তির হাসি হাসলেন রামগোপালবাবু। যেন শত্রুকে কবজা করে ফেলেছেন।

"তাতে একটু অসুবিধে আছে কাকা।"

"কীরকম?"

"আপনার শত্রুরা যেই জানতে পারবে আপনি নন আমি জেনে আপনাকে ওদের মনের কথা বলে দিচ্ছি অমনই ওরা আমাকে হাত করতে বেশি টাকা অফার করবে। আমার কাছে আপনার মনের কথা জানতে চাইবে।"

"আমার মনের কথা?" চুপসে গেলেন রামগোপালবাবু।

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রামগোপালবাবু তাকালেন, অর্জুন শুনতে পেল, "এ দেখছি মহাধূর্ত!"

"আমাকে মহাধূর্ত বলুন আর যাই বলুন কথাটা সত্যি।"

সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীর ভঙ্গি করলেন ভদ্রলোক, "ছি ছি ছি। আমি ভাবতে চাইনি কিন্তু ভেবে ফেলেছি। তা তোমাকে বেশি টাকার লোভ দেখালেই বা ওদের দলে যাবে কেন? তোমার বিবেক বলে কিছু তো আছে!"

"তা আছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমি যে আপনার মনের কথাও জেনে যাব। সেটা কি আপনার ভাল লাগবে?"

"না। লাগবে না।" মাথা নাড়তে লাগলেন রামগোপালবাবু।

"তা হলে?"

"আচ্ছা বাবা, এই বিদ্যে তুমি কোথায় আয়ত্ত করলে?"

"স্বপ্নে। মাটি থেকে এক হাত ওপরে শরীরটাকে তুলে নিয়ে যেতে পারলেই দেখবেন মানুষের মনের কথা শুনতে পাচ্ছেন।"

"সে তো শুনেছি যোগী-ঋষিরা পারেন।"

"হ্যাঁ। আপনার শরীর ভারী হয়ে গেছে, বাস্তবে পারবেন না। আপনি স্বপ্নে চেষ্টা করে দেখুন। পেয়ে যাবেন।"

রামগোপালবাবু চলে গেলেন বিষণ্ণ মুখে। এখন হয়তো কয়েক রাত তিনি ওরকম স্বপ্ন দেখার চেষ্টা করবেন। সফল না হলে জলপাইগুড়ি শহরে প্রচার করবেন অর্জুনের ক্ষমতার কথা।

একলা ঘরে বসে অর্জুন রুদ্রাক্ষর মালাটাকে দেখল। এটা পরলে মানুষ অদ্ভুত ক্ষমতা পায়। ঠিক কথা। কিন্তু সেইসঙ্গে দুঃখকে ডেকে আনা হয়। এই যে বুড়িদি তার সম্পর্কে এরকম ভাবে তা রুদ্রাক্ষ পরার আগে সে জানত না। পরিচিত প্রিয় মানুষের মনের খারাপ দিকটা জেনে ফেললে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই মুশকিল হয়ে পড়বে। যাকে আমি খুব ভালবাসি সে আমার সম্পর্কে মনে এক আর মুখে আর-এক বলে সেটা জানার পর সম্পর্ক রাখা কি সম্ভব? অর্জুনের মনে হল, এই মালা তার ভাবার ক্ষমতাকে ক্রমশ নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। সত্যসন্ধান করতে যদি তাকে এই মালার ওপর নির্ভর করতে হয়, তা হলে তার স্বকীয়তা কোথায় রইল! বরং খুব প্রয়োজনে যেমন রিভলভার বের করতে হয় তেমনই কোনও উপায় না থাকলে এটাকে পরবে সে।

দুপুরের খাওয়া শেষ করে মনে হল অমল সোমের সঙ্গে দেখা করে এলে হয়। এই রুদ্রাক্ষের মালা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছে না সে।

গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অর্জুন দেখল বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ। অমল সোম দুপুরে ঘুমোন না। নির্দ্বিধায় দরজায় শব্দ করল সে। কোনও সাড়া নেই। বেশ কয়েকবারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর খিড়কি দরজায় পৌঁছে ফাঁক দিয়ে আঙুল গলিয়ে শেকল খুলল সে।

এখন দুপুরের শেষ। ভেতরের বারান্দায় ছায়া পড়েছে। অর্জুন দেখল অমল সোমের থাকার ঘর দুটোর ভেতরদিকের দরজায় তালা ঝুলছে। বুকের ভেতরটায় ছ্যাঁত করে উঠল। তালা কেন? অমলদা কি চলে গেছেন। সে হাবুর ঘরের দিকে তাকাল। দরজা খোলা। সেখানে গিয়ে দেখল হাবু ভেতরে নেই। অতএব বাগানে চলে এল অর্জুন। এবং তখনই হাবুকে দেখতে পেল। পেয়ারা গাছের নীচে মাদুর পেতে চিত হয়ে শুয়ে আছে হাবু। না, ঘুমোচ্ছে না। ওর চোখ গাছের ডালে বসে থাকা একটা নীলকণ্ঠ পাখির দিকে স্থির। অর্জুনকে দেখে পাখিটা ডানা ঝাপটে উড়ে গেল। পাখির উড়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে মুখ ফেরাতে হাবু তাকে দেখতে পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল।

অর্জুন হাতের ইশারার সঙ্গে কথা বলে জানতে চাইল অমল সোম কোথায়?

হাবুর মাথায় এখনও ব্যান্ডেজ। পাটি মাটি থেকে তুলে ভাঁজ করছিল সে, কিন্তু অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "ঘর থেকে যার মন উঠে গেছে তাকে আর ঘরে পাবে কী করে?"

হাবুর গলার স্বর কোনওদিন শোনেনি অর্জুন, কারণ সে কথা বলতে পারে না। এখন যে কণ্ঠস্বর কানে এল সেটা বেশ ঘষঘষে, অমার্জিত। অর্জুন চমৎকৃত। সে হাবুর মনের কথা শুনতে পাচ্ছে? বাঃ।

পাশ কাটিয়ে হাবু চলে গেল তার ঘরে। যাওয়ার সময় অর্জুনের কানে এল, "আর আমার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। আমিও চলে যাব।"

হাবু ফিরে এল একটা খাম নিয়ে। সেটা খুলতেই চিঠি দেখতে পেল অর্জুন। "কল্যাণবরেষু, আশা করি আজ বিকেলের মধ্যে তুমি এই বাড়িতে একবার আসবে। গতকাল আমি নিউ বঙ্গাইগাঁও যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছিলাম। পথে কয়েকটা রেলডাকাতের জন্যে যাত্রা বিঘ্নিত হয়েছিল। তাই আজ আবার রওনা হচ্ছি। এখানে এসে বুঝলাম একা থেকে-থেকে শ্রীমান হাবু খুব কাহিল হয়ে পড়েছেন। তার নার্ভ এই একাকিত্ব সহ্য করতে পারছে না। তার ওপর বিনা কারণে তার কপালে গত রাতে প্রহার জুটেছে। ওকে আর এভাবে একা ফেলে রাখা উচিত নয়। আমি দিন সাতেকের মধ্যে নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে ফিরে আসব। তারপর যা হোক একটা ব্যবস্থা করব। তোমার মা সম্ভবত দিন সাতেকের মধ্যে জলপাইগুড়িতে ফিরে আসছেন না। খুব যদি অসুবিধে না হয় তা হলে তুমি কি হাবুকে একটু সঙ্গ দিতে পারবে? —তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, অমল সোম।"

তার নীচে আবার পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, "রুদ্রাক্ষের মালাটি যদি কোনও সমস্যা তৈরি করে তা হলে হাবুর কাছে রেখে দিও। —অমল সোম।"

এইটুকু? যেন রুদ্রাক্ষের মালার কোনও ভূমিকা নেই যে তাকে নিয়ে কিছু লেখার প্রয়োজন আছে! সমস্যা হয় বলতে কী বোঝাচ্ছেন? অমলদা কি জানেন না এই মালার মাহাত্ম্য কী?

অর্জুন শুনল, "কী লিখেছে কে জানে!"

অর্জুন ইশারা করে বোঝাল অমল সোম সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবেন এবং ততদিন তাকে এ-বাড়িতে থাকতে বলেছেন।

হাবুর মুখে হাসি ফুটল। অর্জুন শুনল, "বাঃ, খুব ভাল কথা। তা হলে আজ রাত্রে মাংস রাঁধতে হয়।"

অর্জুন পকেট থেকে টাকা বের করে হাবুর হাতে দিতে হাবু খুব অবাক হয়ে তাকাল। অর্জুন বলল, "একটু পরে মাংস কিনে এনো।"

ঠোঁট নাড়া দেখে কথা বোঝার ক্ষমতা আছে হাবুর। অর্জুন তাকে মাংস আনতে বলছে বুঝতে পেরে তার চোখ বড় হয়ে গেল। অর্জুন শুনল, "শুধু মাংস না, সঙ্গে মিষ্টি দই আনব।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "রাত্রে মিষ্টি দই খেতে নেই।"

ঠোঁট নাড়া দেখে কথাটাকে বুঝতে পেরে হাবু মাটিতে বসে পড়ল। সে একদৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আজ পর্যন্ত অমল সোম ছাড়া কেউ তার মনের কথা বুঝতে পারেনি। অমল সোমও এত স্পষ্ট কোনওদিন বলতে পারেননি।

অর্জুন সরে এল। বাগানে হাঁটতে হাঁটতে সে স্থির করল ক'দিন না হয় এখানেই থেকে যাবে। কিন্তু অমল সোম বিশ্বনাথদের সম্পর্কেও কোনও কথা চিঠিতে লেখেননি! হঠাৎ এত নিরাসক্ত হয়ে গেলেন কী করে? এই সময় সামনের বনফুলের গাছের ডালে বসে একটা দাঁড়কাক কুৎসিত গলায় চিৎকার করে উঠতেই অর্জুন কাকটাকে দেখতে পেল। দু'পা এগোতেই সে অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেল। কেউ কিছু বলছে কিন্তু তার কোনও শব্দ সে বুঝতে পারছে না। সেই শব্দহীন স্বর ঘষঘষে। কাকটা উড়ে যাওয়া মাত্র সেই স্বর কান থেকে মিলিয়ে গেল।

অর্জুন হতভম্ব হয়ে গেল। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এই যে, কাকটা তাকে দেখে যা ভাবছিল তা তার কানের পরদায় শব্দ হয়ে এসে আঘাত করছিল। যেহেতু ওর ভাষা তার জানা নেই তাই সে কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি। তার মানে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু অথবা নেপালি ছাড়া অন্য ভাষাভাষী মানুষ যদি কিছু ভাবে তা হলে এই রুদ্রাক্ষের মালা কোনও সাহায্য করতে পারবে না। সে একটু-আধটু ওড়িয়া ভাষা বুঝতে পারে। একজন উৎকলবাসী কিছু ভাবলে সে যেটুকু বোঝে সেটুকুই বুঝতে পারবে?

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে সে বাড়ির বাইরে চলে এল। গেটের বাইরে একটা গোরু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন তার দিকে এগোতেই গোরুটা সতর্ক হয়ে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা রাগী শব্দ কানে এল। অথচ গোরুটা মুখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। এই শব্দের সঙ্গে কাকের ভাবনার শব্দের কোনও মিল নেই। অর্জুন ধীরে-ধীরে আবার পিছিয়ে যেতে শব্দটা স্বাভাবিক হয়ে মিলিয়ে গেল। অর্জুন দেখল গোরুটা নিশ্চিন্ত হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। অর্জুন মালাটার রুদ্রাক্ষে আঙুল রাখল। ঠিকই। গোরুদের ভাষা তার জানা নেই বলে সে শব্দটার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারল না। তবে ওই আওয়াজের ধরন বলে দিচ্ছে সে এগিয়ে যাওয়াতে গোরুটা খুব বিরক্ত হয়েছিল।

বিকেলে হাবু বাজার করে নিয়ে আসার পর অর্জুন বের হল। করলা নদীর পাশ দিয়ে এগোতেই দেখল একটা মারুতি ভ্যান বেশ জোরে এগিয়ে আসছে। ভ্যানটা তার পাশে এসে বেশ জোরে ব্রেক কষে থেমে যেতেই অর্জুন বিরক্ত হয়ে দেখল একটা লোক দ্রুত চালকের আসন থেকে নেমে পড়েছে। তার সামনে এসে লোকটা হাতজোড় করে বলল, "ভাল আছেন দাদা? অনেকদিন বাদে আপনার দর্শন পেলাম।"

লোকটি রোগা, মধ্যবয়সী, প্যান্টের ওপর ধূসর রঙের গেঞ্জি, যা ময়লা হলেও বোঝা যাবে না। লোকটি বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন না দাদা?"

অর্জুন সত্যি কথা বলল, "ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"সে কী? আমার কপালটাই খারাপ। ঠোঁটকাটা চাঁদুকে মনে আছে?"

মনে পড়ে গেল। মালবাজারে থাকত ঠোঁটকাটা চাঁদু। ঠোঁটের ওপরটায় অনেকটা কাটা ছিল বলে সবাই ওকে ডাকত ঠোঁটকাটা চাঁদু বলে। সেবার একটা কাঠচুরির কেসে পুলিশ ওকে জড়িয়ে ফেলেছিল। সে-সময় অর্জুন লোকটার উপকারে এসেছিল। সেই ঠোঁটকাটা চাঁদুর সঙ্গে একে দেখেছে সে।

"আমার নাম মাধব। ডাকনাম মাধু।"

"তাই বলো। চাঁদু-মাধুর মাধু তুমি। তখন তো এরকম পোশাক পরতে না?"

খুব লজ্জা পেয়ে গেল মাধব, "আজ্ঞে, এখন গাড়ি চালাই, টু-পাইস হয়, এখন এসব না পরলে খারাপ দেখায়। কোথায় যাচ্ছেন, চলুন পৌঁছে দিচ্ছি।"

"না, না। আমি হাঁটতে বেরিয়েছি।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "গাড়িটা কার?"

"শিলিগুড়ির মালিক। আমি মান্থলি কন্ট্রাক্টে চালাই। জলপাইগুড়িতে এসেছিলাম একজন প্যাসেঞ্জার ছাড়তে। আমার গাড়িতে একটু উঠবেন না দাদা?"

"তুমি তো যাচ্ছ আমার উলটোদিকে।"

"কোনও জরুরি কাজে যাচ্ছিলাম না, এক বন্ধুর বাড়ি ঘুরে যেতাম। আপনি উঠুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাব।" মাধবের অনুরোধ আর এড়ানো গেল না।

কদমতলার মোড়ে যখন ওরা পৌঁছল তখন সন্ধে হব হব। ভ্যান থামলে অর্জুন বলল, "তুমি তো বেশ ভালই চালাও।"

"আপনাদের আশীর্বাদে এসব হয়েছে। নইলে এখনও মালবাজারে পড়ে থাকতাম। পেট চালাতে কী না করতে হত।"

"এখন কেমন রোজগার করো।"

"দু'নম্বরি না করলে দিনে শ'দুয়েক থাকে।" মাধব হাসল।

"কীরকম দু'নম্বরি?"

"টানা জিনিস পাচার করছে বুঝেও না বোঝার ভান করে ভাড়া খাটলে ডাবল ইনকাম। আরও কত কী!"

"তুমি দু'নম্বরি করো না?"

"সত্যি কথা বলছি দাদা, বাধ্য না হলে করি না।"

"বাধ্য না হলে মানে?"

"যন্ত্র দেখিয়ে বলে যেতে হবে। কথা না শুনলে লাশ হয়ে যাব।"

"পুলিশকে বলে দাও না কেন?"

"এ কী বলছেন দাদা! ভাড়া খেটে খাই, পুলিশ আমাকে কতক্ষণ বাঁচাবে? চুকলি করেছি বলে আরও সর্বনাশ করে ছাড়বে।"

মাধব চলে গেল গাড়ি নিয়ে। একসঙ্গে ভাল এবং খারাপ লাগছিল অর্জুনের।

মাধবের জন্যে। তারপরেই খেয়াল হল এতক্ষণ মাধবের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও ওর মনের কথা সে একবারও শুনতে পায়নি। এর অর্থ, মাধব একবারও মনে মনে অন্য চিন্তা করেনি? তা হলে তো ছেলেটাকে সত্যি সৎ বলতে হবে।

বাড়িতে গিয়ে সব বন্ধ করে অমল সোমের বাড়িতে ফিরে এল সে সন্ধের পরে। হাবু তাকে চা বানিয়ে দিল। অমল সোমের ঘরের তালা খুলে দিয়েছে হাবু। ওর মধ্যে এখন বেশ ফুর্তির ভাব। যখনই সে অর্জুনের কাছাকাছি হয়েছে তখনই সেই ফুর্তির প্রকাশ জানতে পেরেছে ওর ভাবনায়। একটা মানুষ যদি বাড়িতে থাকে তা হলে কোনও কষ্ট হয় না। কাজে আমি ভয় পাই না। কিন্তু নিজের জন্যে কাজ করতে একটুও ভাল লাগে না। তা ছাড়া অর্জুনবাবু মানুষটা ভাল। আজ কতদিন হল ওকে দেখছি। যখন প্রথম বাবুর কাছে এসেছিল তখন তো প্রায় বাচ্চা ছেলে।

এইসব কথা কানে গেলেও অর্জুন কিছু বলল না। হাবু তার রান্নাঘরে চলে গেলে সে অমল সোমের চেয়ারে বসল। টেবিলের ওপর পেপারওয়েট, কিছু কাগজ আর অনেক বই। এইসব বই বিচিত্র। গীতা, বাইবেল, সৈয়দ মুজতবা আলির রচনাবলীর সঙ্গে আগাথা ক্রিস্টি মিলেমিশে রয়েছে। অর্জুন ওসবে হাত না দিয়ে গলা থেকে মালাটাকে খুলে টেবিলে রাখল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কানের পরদা যেন ফেটে গেছে এমন একটা আওয়াজ মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে যাচ্ছিল। সে কান চেপে ধরল কিছুক্ষণ। ধীরে-ধীরে কান স্বাভাবিক হয়ে এল। তখন শরীরে বেশ অবসাদ, যেন দু'মাইল টানা ছুটে এসেছে।

রুদ্রাক্ষগুলো গোল নয়, অনেকটা ঢোলকের সাইজ। একটাই মুখ। এ ছাড়া অন্য কোনও বিশেষত্ব নেই। প্রতিটি বীজের মধ্যে ফাঁক নেই বললেই চলে। এখনও কী দিয়ে মালাটা গাঁথা, ঠাওর করতে পারল না অর্জুন। পৃথিবীর মানুষের বুদ্ধির বাইরে একটি কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে এই মালা। বিজ্ঞান যেখানে থমকে থাকবে, সেখানে এ সক্রিয়। অমল সোমের হাতে না পড়ে কোনও বুদ্ধিমান শিক্ষিত অপরাধীর হাতে পড়লে লোকটা মালার সাহায্যে কত কিছু করতে পারত। এখন প্রশ্ন হল, অমল সোম মালাটাকে কোত্থেকে পেলেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, এমন মূল্যবান জিনিস তিনি অবহেলায় কেন হাতছাড়া করলেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর একমাত্র অমল সোমই দিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নানান কারণ অনুমান করা যায়। এ-কথা ঠিক অমল সোম তাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন। এই মালা তাকে দিয়ে তিনি যাচাই করতে চেয়েছেন। সে কীভাবে এর ব্যবহার করে তা দেখতে চেয়েছেন। মালাটা কোনও সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে তাঁর সন্দেহ ছিল এবং সেক্ষেত্রে হাবুর কাছে রেখে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর কিছু না হোক, উনি জানতেন মালা নিয়ে অর্জুন বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। অর্জুন বইগুলোর দিকে তাকাল। একটি নাম তাকে আকর্ষণ করল। বইটির নাম, মনের কথা। বইটি হাতে নিয়ে দেখল লেখকের নাম স্বামী হৃদয়ানন্দ।

মাত্র একশো পাতার বই। সে পাতা ওলটাল। মানুষের মন নিয়ে লেখক গবেষণা করেছেন। পাতা ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ পেন্সিলের দাগ চোখে পড়ল। যদি অমল সোম দাগিয়ে থাকেন তা হলে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। এই পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত যেসব শব্দ বেজে যাচ্ছে তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ আমাদের শ্রবণযন্ত্র গ্রহণ করতে সক্ষম। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলোর কার্যক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই কারণে মানুষ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত। কখনও কখনও কোনও পশুর ইন্দ্রিয় মানুষের থেকে অনেকগুণ শক্তিশালী বলে প্রমাণিত। শকুন যে দূরত্ব থেকে তার খাদ্যবস্তু আবিষ্কার করে সেই দূরত্বে মানুষের দৃষ্টি শক্তিহীন। ঝড়বৃষ্টির আগে পিপড়েরা আতঙ্কিত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড়য় অথচ আকাশে তখনও দুর্যোগের চিহ্ন ফুটে ওঠে না সে-সময়। মানুষের পক্ষে আগাম এই অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোনও কোনও মানুষ এই সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন।

এই সক্ষমতা এসেছে চিন্তার ব্যায়ামের মাধ্যমে। ব্যায়াম যেমন শরীরকে মেদশূন্য করে তেমনই চিন্তার ব্যায়ামে মন চিন্তাশূন্য হয়। যখন সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় তখন দ্বিতীয় শ্রবণযন্ত্রের জন্ম হয়, যা বাতাসে মিশে থাকা শব্দাবলী শুনতে সাহায্য করে। কথিত আছে হিমালয়ের কোনও কোনও যোগীপুরুষ তাঁদের সাধনালব্ধ শক্তি পৃথিবীর জাগতিক কোনও বস্তুর মধ্যে নিহিত করে রাখেন। যেভাবে পাথর ধারণ করলে মানুষের নানান উপকার হয় তেমনই সেইসব বস্তু ধারণে সাধনা ছাড়াই মানুষ ফললাভ করতে পারে। পাথর, মাদুলি অথবা তাবিজে যেসব সভ্য শিক্ষিত মানুষ অত্যন্ত আস্থাবান তাঁরা নিশ্চয়ই এই তথ্য অস্বীকার করতে পারবেন না।

এখানেই দাগ শেষ হয়েছে। অমল সোম এখানে কবে দাগ দিয়েছেন? এবারে, না অনেক আগে?

হাবু কখন ঘরে ঢুকেছে টের পায়নি অর্জুন। হাবুর হাতে রাতের খাবারের থালা। ইশারায় খেতে বসতে বলছে। অর্জুন ঝটপট মালাটা পরে ফেলল। পরামাত্র শরীর গরম হয়ে উঠল। জ্বালা নয়, একটা তপ্ত হাওয়া যেন ঢেউয়ের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল সমস্ত শরীরে। মাটিতে পড়তে পড়তে চেয়ারে বসে পড়ল অর্জুন ধপ করে। পড়ে স্থির হয়ে রইল কিছুক্ষণ। সে চোখ বন্ধ করতে বাধ্য হল।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল থালা হাতে হাবু। অর্জুনের শরীর খারাপ হয়েছে ভেবে সে হাউমাউ করে থালাটাকে খাওয়ার টেবিলের ওপর রাখতে ছুটল। ততক্ষণে শরীর শান্ত হয়েছে অর্জুনের। ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ানো মাত্র হাবু ছুটে ফিরে এল। তাকে কোনও পাত্তা না দিয়ে খেতে বসে গেল অর্জুন। হাবু ইশারায় জিজ্ঞেস করে গেল, শরীর খারাপ কিনা, অর্জুন মাথা নেড়ে না বলে গেল। অর্জুন শুনল, হাবু ভাবছে, চোখের সামনে দেখলাম চোখ বন্ধ হয়ে গেল, পা টলে গেল, তবু স্বীকার করছে না।

সকালে সুদর্শন এ-বাড়িতে হাজির হলেন, "আপনি এখানে যে আছেন তা তো জানি না। আপনার বাড়িতে লোক পাঠালাম, ফিরে এসে জানাল তালাবন্ধ।"

"বসুন। কী ব্যাপার?"

"পাখি তো উড়ে গেল।"

"তার মানে?"

"কোন শেষবেলায় কোর্টে প্রোডিউস করতেই ওদের উকিল হইচই লাগিয়ে দিল। যেহেতু আমাদের চার্জে কোনও জোরালো পয়েন্ট নেই তাই পুলিশ আটকে রাখতে পারে না। জামিন পেয়ে গেল।"

"তারপর?"

"ওরা কদমতলায় গিয়ে বাসে উঠেছিল। হারাধন রেল গেটে নেমে গেছে, বিশ্বনাথ মণ্ডলপাড়ায়। কিন্তু উকিল ফিরে গেছে শিলিগুড়িতে।"

"ওঁকে ফলো করেনি আপনার লোক?"

"কী বলব বলুন! যেহেতু বলা ছিল ওই দু'জনকে কভার করতে হবে তাই তাঁর মাথায় উকিলের কথা ঢোকেনি।"

"একটা সুযোগ হারালেন। আমার বিশ্বাস উকিলকে শিলিগুড়ি থেকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই রিপোর্ট দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। আমিও তাই মনে করি। তবে পালা করে মণ্ডলপাড়া বাসস্টপে লোক রেখেছি। বিশ্বনাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে বাসে উঠলেই ওকে ফলো করবে।"

"ওরকম জায়গায় অচেনা লোককে দেখলে সবাই সন্দেহ করবে না?"

"জলপাইগুড়ির কেউ নয়, ওখানকার লোক।"

"কিন্তু ধরুন, যদি ও বাসে না গিয়ে প্রাইভেট কারে যায়?"

"এটা তো আমার মাথায় ছিল না। কিন্তু ওর মতো একটা নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে প্রাইভেট কার পাবে কোথায়?"

"যার প্রয়োজন সে পাঠাতে পারে। হারাধন ফোন করেছিল?"

"না। আপনি আমাকে চিন্তায় ফেললেন। এদিকে কাল রাতে এস পি সাহেব ডেকেছিলেন ট্রেনডাকাতির সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করেছি, অ্যারেস্ট করে এনেছি অথচ জামিনের বিরোধিতা তেমন করে করলাম না কেন জানতে চাইছিলেন। কেন আরও সিরিয়াস চার্জ ওদের বিরুদ্ধে সাজালাম না? আমি আপনার কথা বললে সেটা আমার বিরুদ্ধে যেত। কোনওমতে ম্যানেজ করেছি। কিন্তু উনি খুশি হননি।"

অর্জুন বলল, "আমাদের পরিকল্পনার কথা ওঁকে খুলে বললেন না কেন?"

"বলে লাভ হত না। কারণ হারাধন যে ফিরে গিয়ে আমাদের সাহায্য করবে তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই।" সুদর্শনকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল।

ওঁর জিপ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। অর্জুন দেখল একজন সেপাই বেশ

উত্তেজিত হয়ে গেট খুলে ছুটে আসছে। সুদর্শন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"সার মেসেজ এসেছে, আজ সকালে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে ডাকাতি হয়েছে।"

"সে কী!" এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে জিপে পৌঁছে গিয়ে ওয়াকিটকি চালু করলেন সুদর্শন। অর্জুন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। কথা শেষ করে সুদর্শন বললেন, "আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। একেবারে নাকের ডগায় ডাকাতিটা হয়েছে।"

"কোথায়?"

"রানিনগর আর জলপাইগুড়ি রোডের মাঝখানে। আমি চলি।" সুদর্শন জিপে উঠে বসতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ওখানেই যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। ট্রেনটাকে জলপাইগুড়ি রোডে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।"

"আমি সঙ্গে গেলে অসুবিধে হবে?"

সুদর্শন একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, "আসুন।"

॥ ৪ ॥

জলপাইগুড়ি শহরের দু'পাশ দিয়ে দুটো ট্রেন লাইন চলে গেছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সগর্বে এসে রানিনগর স্টেশনে ওরা আলাদা হল। ফলে জলপাইগুড়ি দুটো স্টেশন পেয়ে গেল। একটা সেই পুরনো স্টেশন যা শহরের বুকের ওপর হলেও অব্যবস্থা এবং অযত্নে প্রাগৈতিহাসিক হয়ে রয়েছে। বড় ট্রেন বলতে দার্জিলিং মেলের কয়েকটা কামরা বিকেলবেলায় যাত্রী টেনে আনে। দ্বিতীয় স্টেশনটা ছিমছাম, অনেকটা লম্বা প্ল্যাটফর্ম, নামী ট্রেনগুলি থামে বা না থেমে ছুটে যায় আসাম থেকে বা আসামে। কিন্তু স্টেশনটায় পৌঁছতে হাঙ্গামা করতে হয়। তিস্তা নদীর প্রায় কোল ঘেঁষে এই স্টেশনে পৌঁছতে রাতবিরেতে রিকশা পাওয়া মুশকিল। ট্রেন লেট হলে বিপাকে পড়তে হয়।

সুদর্শনের জিপ এই দ্বিতীয় স্টেশনের দিকে ছুটছিল। জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিঙিয়ে রেললাইনের কাছে পৌঁছে সুদর্শন বললেন, "একটা কথা বলছি বলে কিছু মনে করবেন না।"

"নিশ্চয়ই না। বলুন।"

"আমাদের বড়কর্তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছেন এখানে। আপনি জিপ থেকে নামছেন এটা কেউ কেউ পছন্দ নাও করতে পারেন।"

"বুঝতে পেরেছি। জিপ থামাতে বলুন, নেমে যাচ্ছি।"

স্টেশনটা দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু ওই পথে প্রচুর মানুষ ছুটে যাচ্ছে।

দূরেও প্রচুর লোক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ মুখে মুখে ডাকাতির খবর চাউর হয়ে গেছে। সুদর্শন বললেন, "না, থাক, আপনাকে নামতে হবে না।"

অর্জুন শুনতে পেল সুদর্শন বলছেন, "এস পি সাহেব যা-ই ভাবুন, আমার কি,

সামান্য ভদ্রতাবোধ থাকবে না? ছি ছি, কী বললাম ওঁকে!"

অর্জুন হেসে ফেলল। জিপ থেমে গিয়েছিল। মাটিতে পা বাড়িয়ে সুদর্শন জিজ্ঞেস করলেন, "হাসছেন কেন?"

"আপনার সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। আমি কিছুই মনে করিনি।"

সুদর্শন মাথা নাড়লেন, "ওঃ, আপনাকে এড়ানোর উপায় নেই।"

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল। যাত্রীদের চিৎকার চেঁচামেচি এখনও চলছে। স্থানীয় যুবকেরা তিনজন মানুষকে ট্রেন থেকে নামিয়েছে যারা মৃত না জীবিত বোঝা যাচ্ছে না। সুদর্শন তাঁর দু'জন সেপাইকে নিয়ে কাজ শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কনভয় ছুটে এল শহর থেকে। এস পি, ডি এস পি সাহেবরা প্রচুর সেপাই নিয়ে চলে এসেছেন। যাত্রীদের সঙ্গে সুদর্শনের ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা নিরাপত্তাহীনতার জন্যে পুলিশকে দায়ী করছিলেন। সাধারণ পুলিশ এবং রেলপুলিশের যে পার্থক্য তা তাঁরা বুঝতে চাইছিলেন না। তিনটে শরীরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

যাত্রীদের জিজ্ঞেস করে অর্জুন জানতে পারল ট্রেনটা একটু লেটে চলছিল। রানিনগর স্টেশনে গাড়িটা দু'ভাগ হয়ে যায়। এই কাটাকুটির জন্যে প্রায় মিনিট কুড়ি খরচ হয়। কুচবিহারের দিকে সেই অর্ধেক ট্রেন যাত্রা শুরু করা মাত্র এসি টু-টিয়ারে সাতজন ছেলে ঢুকে পড়ে। তাদের মুখ কালো কাপড়ে বাঁধা ছিল। যাত্রীদের দামি জিনিসপত্র ছিনতাই করছিল বেশ রুক্ষভাবে। শেষ পর্যন্ত তিনজন যাত্রী বাধা দেন। এরা সঙ্গে-সঙ্গে তিনজনের পেটে ছুরি চালায়। তখন চা-বাগানের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলছিল। তার পরেই ট্রেন গতি কমায়। এরা চেন ধরে টানে। গতি আর একটু কমতে সবাই লাফিয়ে জঙ্গলে মিলিয়ে যায়। যেখানে ডাকাতি হয় তার চারপাশে কোনও লোকালয় ছিল না। এই কামরায় কোনও রেলরক্ষী না থাকায় ডাকাতরা সহজে পালাতে পেরেছে। সাধারণত ডাকাতি হয় থ্রি-টিয়ার স্লিপার ক্লাসে। আজ পর্যন্ত কখনও এসি কামরায় ডাকাতরা ডাকাতির জন্যে পছন্দ করেনি। পালাবার অসুবিধে হবে ভেবেই হয়তো অপছন্দ করেছে। তাছাড়া দামি টিকিট বলে রক্ষী থাকে বন্দুক নিয়ে। আজ এখানে রক্ষী ছিল না কিন্তু থ্রি-টিয়ার স্লিপার ক্লাসে বন্দুকধারী ছিল। সম্ভবত সেই কারণেই ডাকাতরা ওই কামরা এড়িয়ে গিয়ে এখানে হামলা করেছে আজ।

রেলপুলিশের কর্তারা এসে গেলে সুদর্শনের চাপ কমল। এর মধ্যে এস পি সাহেব সুদর্শনকে বলেছেন, "কী করব বলুন তো! দুটো ডাকাতকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন। ওরা থাকলে চাপ দিয়ে বের করা যেত এই ডাকাতি কারা করেছে। লোক তিনটে মারা গেলে খবরের কাগজ আমাদের ছেড়ে দেবে? আপনাদের একটা ভুলের জন্যে এইভাবে হেনস্থা হতে হয় আমাকে।"

"কিন্তু সার, এই ডাকাতি অন্য দলও করতে পারে।"

"আপনি কী করে জানলেন? কাল যাদের ছেড়ে দিয়েছেন তারাই যে আজ সকালে ডাকাতি করেনি তার কোনও প্রমাণ আছে আপনার কাছে?"

সুদর্শন কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

খানিকটা দূরে অর্জুন এসি টু-টিয়ারের এক যাত্রীর কাছে ডাকাতদের চেহারার বর্ণনা শুনছিল। ভদ্রলোক যতটা মনে করতে পারছেন ততটাই বলতে গিয়েও গুলিয়ে ফেলছেন। যে লোকটা প্রথম ছুরি চালিয়েছিল তাকে মোটাসোটা বলেই মাথা নাড়লেন, ঠিক মোটা নয়। ওইরকম উত্তেজনার সময় দেখার স্মৃতি পরে বিশ্বাসঘাতকতা করতেই পারে।

এস পি সাহেব সুদর্শনকে জিজ্ঞেস করলেন, "ইনি এখানে কেন?"

সুদর্শন একটু পাশ কাটিয়ে বললেন, "হয়তো ট্রেন ডাকাতির কথা শুনে এসেছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলবেন?"

"ডাকুন এঁকে।"

সুদর্শন ডাকতেই অর্জুন এগিয়ে এসে বলল, "নমস্কার।"

এস পি সাহেব তাকালেন। অর্জুন শুনল, "মতলবটা কী? আমাকে অপদস্থ করার ধান্দায় আসা হয়েছে এখানে?" এস পি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও বুঝি এই ট্রেনে ছিলেন?"

"না। খবরটা শুনে ছুটে এলাম।"

"কেন?" এস পি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "এই ট্রেনে আপনার কোনও ক্লায়েন্টের আসার কথা ছিল নাকি?"

"না। আমি কোনও মতলব বা কোনও ধান্দা নিয়ে এখানে আসিনি।"

অর্জুন শুনল, "আচ্ছা সেয়ানা তো!"

অর্জুন হাসল, "এস পি সাহেব, মিছিমিছি আমাকে গালাগালি না দিয়ে যাত্রীদের কাছে গিয়ে ডাকাতদের হদিস পাওয়া যায় এমন কোনও ক্লু খুঁজে বের করুন না!"

"কী? আমি আপনাকে গালাগালি দিয়েছি?" এস পি সুদর্শনের দিকে তাকালেন, "সুদর্শন, আপনি আমাকে কিছু বলতে শুনেছেন?"

সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে না বললেন।

"কোনও ভদ্রলোককে অকারণে সেয়ানা ভাবা কি উচিত বলে মনে হয় আপনার? আচ্ছা, নমস্কার।" অর্জুন সরে এল ওখান থেকে।

এস পি সাহেবের মুখের চেহারা দেখে সুদর্শন মজা পেলেন, "স্যার, অর্জুনবাবুর মধ্যে কিছু অলৌকিক ক্ষমতা লক্ষ করেছি।"

"যেমন?"

"উনি মনের কথা বুঝতে পেরে যান।"

"ডেঞ্জারাস ব্যাপার। আপনার মতো আমারও একই সন্দেহ হচ্ছে। এইসব লোক ইচ্ছে করলে বিশাল ক্রাইম করতে পারে। আরে মশাই, এটা কোনও

অলৌকিক ব্যাপার নয়। আপনাকে সম্মোহিত করে ওর ইচ্ছেমতো আপনার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। যাকগে, এসি কামরার প্যাসেঞ্জারদের এক-এক করে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়ে বসছি।" এস পি সাহেব চলে গেলেন।

কিন্তু যাত্রীদের রাজি করাতে পারলেন না সুদর্শন। নিরাপত্তার অভাবে তাঁরা এতক্ষণ বেশ উষ্ণ ছিলেন, এখন পুলিশ তাঁদেরই জেরা করবে জেনে খেপে গেলেন। তাঁদের দাবি, যার যা গিয়েছে তা রেল কর্তৃপক্ষ নথিবদ্ধ করে অঙ্গীকার করুক, অবিলম্বে ক্ষতিপূরণ করবে।

অর্জুন বুঝল এখানে অপেক্ষা করার কোনও মানে হয় না। সে স্টেশনের বাইরে এসে একটা রিকশা নিতে গিয়ে আবিষ্কার করল একটাও রিকশা নেই। এই ট্রেনের যেসব যাত্রী এখানে নেমেছে তাদের নিয়ে শহরে চলে গেছে রিকশাগুলো। অর্জুন হাঁটা শুরু করল। সুদর্শনকে বিরক্ত করার কোনও মানে হয় না। এস পি সাহেব থাকলে ওঁকে আদেশ মান্য করতেই হবে।

মিনিট সাতেক হেঁটে লেভেল ক্রসিং-এ পৌঁছে গেল অর্জুন এবং সেখানেই অজিত নাগের দেখা পেয়ে গেল। অজিত ওর সঙ্গে জেলা স্কুলে পড়ত। খুব মাতব্বর ছিল সে-সময়। এখন কন্ট্রাক্টরি করছে।

"কী রে? তুই? ট্রেনে এলি?" অজিত জিজ্ঞেস করল।

"না। তুই কেমন আছিস?"

"আর থাকা! আমরা কুলিগিরি করি তোর মতো তো নয়। কোথায় যাবি?" অজিত জিজ্ঞেস করল।

"বাড়ি।"

"তা হলে চল তোকে আমি জলপাই মোড়ে নামিয়ে দিচ্ছি, ওখান থেকে রিকশা পেয়ে যাবি।" অজিত তার মোটরবাইক চালু করল।

ওর পেছনে উঠে অর্জুন জানতে চাইল, "তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"শিলিগুড়ি।"

বাইক চলছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোর সঙ্গে এক্সট্রা হেলমেট নেই?"

"আছে।" অজিত মেরুদণ্ড সোজা করে বাইক চালাচ্ছিল।

"আমাকে দে।"

"তুই তো একটু পরেই নেমে যাবি। এদিকে পুলিশ কোথায়?"

"আমি ভাবছি তোর সঙ্গে শিলিগুড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

"যাবি? চল, তোকে একটা দারুণ দোকানে মোমো খাওয়াব।" অজিত বাইক থামাল। তারপর বাইকের বাক্স থেকে একটা হেলমেট বের করে অর্জুনকে দিল। হেলমেট পরলে মানুষের চেহারা পালটে যায়।

অজিত বাইক চালাচ্ছিল বেশ দ্রুতগতিতে। ছুটন্ত বাস বা লরিদের ও তেমন পাত্তা দিচ্ছে না। অর্জুন নিজে হলে কখনওই এভাবে চালাত না। একসময়

pathagar.net

রেলগেট এসে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তোর কি খুব তাড়া আছে?"

অজিত মাথা নাড়ল, না।

"তা হলে ওই চায়ের দোকানের সামনে একটু দাঁড়া।"

অজিত দাঁড়াল। মাটিতে নেমে অর্জুন দেখল দোকানে হারাধন নেই। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, হারাধনের বাড়িটা কোথায়?"

দোকানদার তাকাল। অর্জুন শুনতে পেল, "আর একজন এল।" দোকানদার মাথা নাড়ল, "ওকে বাড়িতে পাবেন না। সকালেই শিলিগুড়ি চলে গিয়েছে। কখন ফিরবে জানি না।"

"আমার আগে ওকে কে খুঁজতে এসেছিল?"

"জানি না।"

"আপনি তো দেখেছেন।"

"ওর কোনও বন্ধু বোধ হয়। বাড়ি কোথায় জিজ্ঞেস করতে দেখিয়ে দিয়েছিলাম। একটু পরেই দেখলাম হারাধন ওর সঙ্গে বাসে উঠে গেল। কী ব্যাপার বলুন তো?"

অর্জুন মাথা নেড়ে আবার বাইকে উঠে বসল। বাইক চালু করে অজিত জিজ্ঞেস করল, "এই হারাধনটা কে রে?"

"ট্রেনে ডাকাতি করেছিল।"

"যাচ্চলে। আজকেই তো ডাকাতি হয়েছে।"

"সেই দলে ও ছিল কিনা জানি না।"

"তুই এদের নিয়ে কারবার করিস, না?"

"কারবার বলা যায় কিনা বুঝতে পারছি না।"

অর্জুন শুনল অজিত ভাবছে, অর্জুন কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। ওর সঙ্গে থাকলে মন্দ হয় না! অর্জুন হাসল।

মণ্ডলপাড়া চলে এল। অর্জুন বলল, "বাঁ দিকে চল।"

একটাও প্রশ্ন না করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরল অজিত। একেবারে বৈদ্যনাথের বাড়ির সামনে পৌঁছে অর্জুন ওকে থামাল। বিশ্বনাথদের বাড়ির দরজা বন্ধ। সেখানে শব্দ করতে ভেতর থেকে হেঁড়ে গলার চিৎকার ভেসে এল, "কে?"

"আমি অর্জুন।"

দরজা খুললেন বৈদ্যনাথ। সম্ভবত হেলমেট থাকায় তিনি প্রথমে চিনতে পারলেন না, "কী চাই?"

"বিশ্বনাথ বাড়িতে আছে?" হেলমেট খুলল অর্জুন।

"ও। তুমি? তুমি আবার এসেছ? তোমার সাহস তো কম নয়!"

"আপনি কি ভয়ঙ্কর মানুষ যে, আসতে ভয় পাব?" অর্জুন হাসল।

"তোমরা আমার ছেলেকে মিথ্যে মামলায় জড়িয়েছ। ওর জীবনটাকে নষ্ট করে

দিতে চাইছ তোমরা।" গলা তুলে চিৎকার শুরু করলেন বৈদ্যনাথ।

সামনের পথ দিয়ে যাঁরা যাচ্ছিলেন তাঁরা ওই চিৎকারে দাঁড়িয়ে গেলেন। ক্রমশ ভিড় বাড়তে লাগল। অজিত ডাকল, "অর্জুন চলে আয়।"

অর্জুন হাত তুলল, "আপনি একটু থামবেন?"

"থামব? তুমি আমার ছেলেকে জেলে ঢোকাতে চাইছ বিনা দোষে, আর আমি চুপ করে থাকব। আগের দিন হলে তোমাকে আমি এই গ্রাম থেকে বেরোতে দিতাম না।"

"বেশ, আপনার আগের দিন এখন যখন নেই তখন দয়া করে বলুন বিশ্বনাথ বাড়িতে আছে কিনা, কারণ আজ সকালেও ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে। ও বাড়িতে থাকলে বেঁচে যাবে।"

এই সময় এক প্রৌঢ় এগিয়ে এসে বললেন, "বলে দাও না বিশু বাড়িতে আছে কিনা? ট্রেনডাকাতির কথা আমিও শুনেছি।"

"ও একটু বেরিয়েছে।" গম্ভীর মুখে বললেন বৈদ্যনাথ।

"কখন বেরিয়েছে?"

"সকালে।"

"ঠিক সময়টা বলুন।"

"এই তো একটু আগে।"

"কোথায় গিয়েছে? শিলিগুড়িতে?"

"আমি জানি না, আমাকে বলে যায়নি।"

"অনেক ধন্যবাদ।" অর্জুন ফিরে গেল বাইকে। সঙ্গে সঙ্গে বাইক চালু করল অজিত। জনতা কোনও আপত্তি জানাল না তাদের পথ করে দিতে।

হাইওয়েতে ওঠার পর অজিত বলল, "ভাগ্যিস লোকগুলো খেপে যায়নি। তা হলে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারতাম না।"

"ওরা খেপে যাবে কেন? ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে গ্রামের কেউ ভাল ধারণা রাখেন না। উলটে সবাই একটু বিরক্ত।"

"কিন্তু কেসটা কী বল তো? এই ছোকরাও ট্রেনডাকাতির সঙ্গে জড়িয়ে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে পুলিশ ওদের ধরছে না কেন? পুলিশ জানে?"

"ধরেছিল। কাল কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছে।"

"জামিন পেয়েই আবার ডাকাতি করেছে।"

"সেটা এখনও জানি না।"

ওরা শিলিগুড়িতে চলে এল। অর্জুন বলল, "তুই আমাকে এয়ারভিউ হোটেলের সামনে নামিয়ে দে।"

"এখানে তোর কতক্ষণ লাগবে?"

"বলতে পারছি না।"

"তুই তো জলপাইগুড়ি ফিরে যাবি?"

"বাঃ, যাব না কেন?"

"গুরু, কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যাচ্ছিস নাকি?"

"না, না। স্রেফ বেড়াতে এলাম।"

"ঠিক আছে। আমি ঘণ্টাদুয়েক বাদে এখান দিয়ে ফিরব। তোর কাজ হয়ে গেলে অপেক্ষা করিস।" অজিত চলে গেল।

অর্জুন বুঝল অজিত তাকে বিশ্বাস করেনি। সে বেড়াতে এসেছে বলা সত্ত্বেও বলল কাজ শেষ হয়ে গেলে অপেক্ষা করতে। সম্ভবত ওর ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে থাকার। কিন্তু আদৌ কোনও অ্যাডভেঞ্চারের কথা যখন মাথায় নেই তখন ও বেচারাকে হতাশ করে লাভ কী! ও ওর কাজ করুক।

এয়ারভিউ হোটেলের পাশে একটা সুন্দর রেস্তরাঁ আছে। খিদে পেয়েছিল। অর্জুন সেখানে বসে মোগলাই পরোটা খেয়ে নিল। তারপর বাইরে আসতেই পেট্রল পাম্পের সামনে মারুতি স্ট্যান্ডটা নজরে পড়ল। তার মনে পড়ল এই স্ট্যান্ডেই নাকি মানাভাইকে পাওয়া যায়, বলেছিল হারাধন। সে ধীরেসুস্থে পার হতেই শুনতে পেল, "আরে দাদা, আপনি?"

অর্জুন দেখল, মাধব এগিয়ে আসছে। মালবাজারের ঠোঁটকাটা চাঁদুর বন্ধু মাধু। গতকালই ওর সঙ্গে জলপাইগুড়িতে দেখা হয়েছিল। অর্জুন হাসল, "এই একটু কাজে এসেছিলাম। তুমি এখানে কী করছ?"

"এই স্ট্যান্ডেই তো আমি গাড়ি রাখি। কোথায় যাবেন বলুন?"

"কোনও বিশেষ জায়গায় যাওয়ার কথা নয় আমার।" বলতে বলতে অর্জুনের খেয়াল হল। মাধুর কাছে মানাভাইয়ের খবর পাওয়া যেতে পারে।

"চলুন দাদা, আপনাকে চা খাওয়াই।"

"না, না। আমি এইমাত্র খেলাম। তুমি এখন কোথাকার প্যাসেঞ্জার তুলছ?"

"কোনও ঠিক নেই। পুরো ভাড়া পেলে প্যাসেঞ্জার যেখানে বলবে। তা না হলে কার্শিয়াং পর্যন্ত শাট্‌ল খাটব।" মাধব বলল।

"আচ্ছা, এখানে মানাভাই বলে কেউ আসে?"

মাধব চকিতে স্ট্যান্ডটা দেখে নিল, "কী ব্যাপার দাদা?"

"নামটা শুনে তুমি যেন চমকে উঠলে?"

"না, মানে, মানাভাই খুব পাওয়ারফুল লোক। এই স্ট্যান্ড ওই কন্ট্রোল করে। ওকে কমিশন দিতে হয় আমাদের।"

"তারপর?"

"কোনও বড় প্যাসেঞ্জার তুললে মানাভাইকে রিপোর্ট দিতে হয়।"

"কীরকম?"

"স্টেশনে নিয়ে গেলে কোন ট্রেনে যাচ্ছে, কীরকম দামি জিনিস নিয়ে যাচ্ছে, তার একটা আন্দাজ করে বলতে হয়।"

"সেটা শুনে মানাভাই কী করে?"

"তা আমি জানি না দাদা। ওই যে আসছে। ওই মারুতিটায়।"

অর্জুন দেখল একটা মারুতি ভ্যান বেশ জোরে ছুটে এসে কায়দা করে ওদের পেছনে পৌঁছেই সজোরে ব্রেক চাপল। চাকায় শব্দ হল। ড্রাইভারের পাশের আসন থেকে যে লোকটা নেমে দাঁড়াল তাকে দেখতে মোটেই শক্তিমান বলে মনে হয় না। রোগা, খাটো, পরনে সাফারি। একবার মাধবকে দেখে লোকটা পাম্পের অফিসে ঢুকে গেল।

এই সময় ওপাশ থেকে একজন চিৎকার করল, "অ্যাই মাধু, কার্শিয়াং তুলবি? চারজন আছে।"

মাধব হাত নাড়ল, "পেছনে বসিয়ে দে। দাদা কার্শিয়াং যাবেন?"

"না। আচ্ছা, এই মানাভাই থাকে কোথায়?"

"জানি না। তবে আমি ওঁকে কয়েকদিন পাঙ্খাবাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। মানাভাইকে কেউ প্রশ্ন করে না।"

"ও এত শক্তিশালী হল কী করে? ওর মাথার ওপর কেউ আছে?"

"তা জানি না। তবে পুলিশ ওকে খুব খাতির করে।" মাধব বলল।

এই সময় মানাভাই বেরিয়ে এল। অর্জুন লোকটাকে দেখল। ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে বলল, "এ মাধুভাই, কার্শিয়াং যাচ্ছ ?"

মাধব মাথা নাড়ল।

"এই প্যাকেটটা গুরুং-এর দোকানে দিয়ে দেবে।"

"ও যদি দোকানে না থাকে ?"

"ওর বাপ থাকবে।"

"আচ্ছা।"

ওপাশ থেকে লোকটা চেঁচাল, "পাঁচজন হয়ে গেছে।"

মাধব উত্তর দিল, "আর একটা তোল।"

মানাভাই জিজ্ঞেস করল, "ইনি যাবেন না ?"

অর্জুন ঝটপট বলল, "এখনও ঠিক করিনি।"

"তার মানে ? আপনি যাবেন কিনা ঠিক না করে স্ট্যান্ডে এসেছেন ?"

"তা নয়। একবার ভাবছি যাব, আর একবার ভাবছি গিয়ে যদি কাজ না হয় তা হলে ভাড়াটাই পকেট থেকে যাবে।" অর্জুন হাসল।

"আমার তো মনে হয় না। মাধব এতক্ষণ ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলছে যখন,তখন বোঝাই যাচ্ছে ও ভাড়া নেবে না। কী মাধব ?"

মাধব হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

"ও না নিলে ওর ক্ষতি হবে। সেটা কি ঠিক ? তা ছাড়া ফেরার সময় তো ভাড়া দিতে হবে। কাজকর্ম নেই, বেকার ছেলে, তাই ঝুঁকি নিতে ঠিক সাহস হচ্ছে না।" অর্জুন নরম গলায় বলল।

pathagar.com

"কার্শিয়াং-এ কোথায় কাজ আপনার ? আমাকে ওখানকার সবাই চেনে। আমাকে বললে আপনার উপকার হতে পারে।" মানাভাই তাকাল।

অর্জুন দ্রুত নাম হাতড়াচ্ছিল। এর আগে কার্শিয়াং-এ সে গিয়েছে। সে বলল, "ডাউহিল স্কুলে খাতাপত্র সাপ্লাই দেওয়ার জন্যে যাচ্ছিলাম।"

"ও। তাতে কি প্রফিট হবে আপনার ?"

"ওঁরা যদি কাজটা দেন তা হলে কিছুটা উপকার হবে।"

"ঠিক আছে। ওখানে মিসেস তামাং আছেন। বলবেন আপনি আমাকে চেনেন। হয়তো কাজ হয়ে যাবে। কী নাম আপনার ?"

সে জবাব দেওয়ার আগে মাধব বলল, "অর্জুন।"

মানাভাই মাথা নাড়তেই ওপাশ থেকে লোকটা চেঁচাল, "ছ'জন হয়ে গেছে। জলদি। কার্শিয়াং, কার্শিয়াং।"

মাধব বলল, "যাঃ। চলুন, একজন প্যাসেঞ্জারকে নেমে যেতে বলি।"

মানাভাই মাথা নাড়ল, "না। তা পারো না তুমি। স্ট্যান্ডের নিয়ম হল প্যাসেঞ্জারকে গাড়িতে তুললে নামানো যাবে না। তুমি চলে যাও, আমি অর্জুনকে পরের গাড়িতে তুলে দেব।"

কথাগুলো শেষ হতেই টেলিফোন বেজে উঠল। মানাভাই পকেট থেকে মোবাইল বের করে নিচু গলায় 'হেলো' বলল। দু-তিনটে কথা বলেই লোকটা দ্রুত চলে গেল তার মারুতির দিকে। চোখের নিমেষে মারুতি হাওয়া হয়ে গেল।

মাধব হাসল, "এরকম মাঝে মাঝে হয়।"

"কীরকম ?"

"ওই যে দেখলেন না। কেউ মোবাইলে ডেকে পাঠালে মানাভাই এখানে এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। আসুন।" মাধব হাঁটা শুরু করল।

"এই যে বললেন ডাউহিল স্কুলে যাবেন ?"

"না। থাক। তা ছাড়া তোমার গাড়িতে জায়গা নেই।"

"আপনি আসুন না— !"

গাড়ির কাছে গিয়ে মাধব একটি নেপালি ছেলেকে নেপালি ভাষায় বলল সে যদি পেছনে গিয়ে বসে তা হলে আর একজন প্যাসেঞ্জার নিতে পারে।

ছেলেটা প্রবলভাবে আপত্তি করল। অর্জুন বলল, "মাধব, পরে আর একদিন হবে। এখন তুমি যাও।" বলে আর না দাঁড়িয়ে সোজা হাঁটতে লাগল।

সেবক রোডে সে মারুতিটাকে দেখতে পেল। মানাভাইয়ের গাড়ি। একই নম্বর। গাড়িতে কেউ নেই। উলটোদিকের বাড়িগুলোর দিকে নজর বোলাতেই চায়ের অফিসের সাইনবোর্ড দেখতে পেল সে। অর্জুন একটু সরে একটা দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মানাভাই তা হলে এই ডেরায় এসেছে। কী এমন জরুরি ফোন, যা ওকে এখানে নিয়ে এল ?

মিনিট তিনেক বাদে চারজন যুবক বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল। রাস্তায় নেমে

দু'পাশে দেখে ওরা চারজন দু'ভাগে দু'দিকে হাঁটা শুরু করল। অর্জুন এগোল। যারা শহরের দিকে যাচ্ছিল তাদের পেছনে চলে এল সে। একজন বলল, "আমি এখান থেকে রিকশা নিয়ে সিনক্রেয়ারের সামনে চলে যাচ্ছি। তুমি পাঁচ মিনিট পরে অটো নিয়ে চলে এসো। এই রিকশা।" ছেলেটি একটা রিকশা দাঁড় করিয়ে উঠে বসল। দ্বিতীয় ছেলেটি ঘড়ি দেখল। অর্জুন তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই শুনতে পেল, "ব্যাটাকে ঠিক মেরে ফেলবে। বেইমানির শাস্তি মৃত্যু।"

অর্জুন গম্ভীর গলায় বলল, "এটা পৃথিবীর সব দেশের মাফিয়াদের নিয়ম। বেইমানির শাস্তি মৃত্যু।"

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল ছেলেটা। তারপর মুখ ঘুরিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগল শিলিগুড়ির ব্যস্ত রাস্তার পাশ ধরে। অর্জুনও দৌড়ল। এবং এই সময় যে চিৎকারে খুব কাজ হয় সেই চিৎকারটা করল সে, "চোর, চোর, ধরুন ধরুন।" দু'পাশের লোকজন অবাক হয়ে এই দৌড় দেখছিল, চিৎকার কানে যাওয়ামাত্র ছেলেটি যাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল তাদের দু'জন ওকে জাপটে ধরল। ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে করতে ছেলেটি চেঁচাল, "আমি চোর নই, ছাড়ুন, ছেড়ে দিন আমাকে !"

ততক্ষণে অর্জুন পৌঁছে গেছে পাশে। ছেলেটির কবজি শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি চোর নও ?"

"না।" মাথা নাড়ল ছেলেটি।

"তা হলে পালাচ্ছিলে কেন ?"

"ছেড়ে দিন। ছেড়ে দিন প্লিজ।" সেইসঙ্গে অর্জুন শুনতে পেল, "এই লোকটা আমার মনের কথা টের পেল কী করে। আমাকে পালাতেই হবে। নইলে ওরা ঠিক মেরে ফেলবে। ধরা পড়ে গেছি জানলে বিশ্বাস করবে না।"

ভিড় জমছিল। সবাই চোর দেখতে চায়। অর্জুন বলল, "শোনো, তোমাকে কেউ মারবে না। তুমি যদি আমার কথা শোনো তা হলে কোনও বিপদ হবে না।"

অর্জুন হাত বাড়িয়ে একটা রিকশা থামিয়ে ছেলেটাকে একটু জোর করেই সঙ্গে তুলে নিল। জনতা সম্ভবত হতাশ হল হাতের সুখ না করতে পারার জন্যে।

রিকশা চলছিল, অর্জুন ছেলেটার কবজি শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করল, "নাম কী ?"

ছেলেটা জবাব দিল না। অর্জুন বলল, "মুখ বন্ধ করে থাকলে কোনও লাভ হবে না। তুমি এখন ভাবছ আমি পুলিশ কিনা, তাই তো ?"

"আপনি কে ?"

"আমি একজন সত্যসন্ধানী।"

"মানে ?"

"ওটা তুমি বুঝবে না। তোমরা যেখান থেকে বের হলে সেখানে কি হারাধন আর বিশ্বনাথ ছিল ? সত্যি কথা বলবে !"

Boighar.net

"না।"

"ওরা কোথায় ?"

"জানি না।"

"তুমি তখন কাকে মেরে ফেলার কথা ভাবছিলে ? কে বেইমানি করেছে ?"

"আমি আপনাকে কোনও কথা বলব না।"

"তুমি ভয় পাচ্ছ, ওরা তোমার ক্ষতি করবে?"

"যা সত্যি তাই আমাকে মানতে হবেই।"

"বাঃ ! খুব ভাল। আজ ভোরে জলপাইগুড়ি রোডে ট্রেন ডাকাতি করে যে জিনিসগুলো তোমরা পেয়েছ সেগুলো কোথায় রেখেছ ?"

"আপনি, আপনি কী করে জানলেন ?"

"সেটা তোমার না জানলেও চলবে। কত পেয়েছ আজকের কাজের জন্যে ?"

"এখনও পাইনি। জিনিসগুলো বিক্রি হয়ে গেলে পাব।"

"তার মানে তুমি স্বীকার করছ— !"

"আপনি যখন সব খবর জানেন— !"

"তোমার নাম কী ?"

"অসিত।"

"অসিত, এবার বলো হারাধন কোথায় ?"

"সত্যি বলছি আমি জানি না।"

"মানাভাই কী বলল তোমাদের ?"

অসিত তাকাল। বোঝা যাচ্ছিল সে খুব অবাক হয়ে গেছে। হঠাৎ গলার স্বর বদলে গেল ওর, "আপনি আমাকে পুলিশে দেবেন না তো ?"

"আপাতত না। অবশ্য তুমি যদি সহযোগিতা করো।"

"কী চান আপনি ?"

"তোমাদের বস-এর কাছে যেতে চাই।"

"বসকে আমি কখনও দেখিনি।"

"কোথায় থাকেন তিনি ?"

"তাও জানি না। যা কিছু খবর মানাভাই দেয়।"

"দ্যাখো অসিত, এখন পর্যন্ত তুমি সত্যি কথা বলছ বলেই মনে হচ্ছে। তোমার সঙ্গী সিনক্লেয়ার হোটেলের সামনে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে কেন ?"

প্রশ্নটা করেই অর্জুন শুনতে পেল, "অনেক বলেছি, আর বলা উচিত হবে না।"

অর্জুন বলল, "অনেক যখন বলতে বাধ্য হয়েছ তখন—।"

"আপনি কি ভগবান ?" কথা থামিয়ে দিল অসিত।

"সে কী ?"

"না হলে আমি যা ভাবছি তা বুঝে ফেলছেন কী করে ?"

"কেউ কেউ চিন্তা পড়তে পারে। শোনোনি ?"

"বেশ। আমরা পাঙ্খাবাড়ি যাচ্ছি।"

"পাঙ্খাবাড়ির কোথায় ?"

"জানি না, ওখানে গিয়ে গুরুংয়ের দোকানে দেখা করতে বলা হয়েছে।"

"তুমি কোথায় থাকো?"

প্রশ্নটা শুনে মুখ ফেরাল অসিত। অর্জুন বলল, "চুপ করে থেকে কোনও লাভ নেই। তুমি তো জানো আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারি।"

"ফাটাপুকুরে।"

"ঠিক আছে। তুমি গিয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করো। আমি এখানে নামব।"

"আপনি আমার ক্ষতি করবেন না তো?"

"ক্ষতি করতে চাইলে তো প্রথমেই পাবলিককে দিয়ে মার খাওয়াতাম।" রিকশাওয়ালাকে থামতে বলে নেমে পড়ল অর্জুন।

রাস্তার একপাশে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস। বেশ ভিড়। চিৎকার চেঁচামেচি লেগেই আছে। অর্জুন একটা এসটিডি বুথে ঢুকে পড়ল। একবারেই লাইন পেয়ে গেল সে, সুদর্শনই ফোন ধরলেন।

"আরে! আপনি কোথায়?"

"শিলিগুড়িতে। মানাভাই-এর সন্ধান পেয়েছি।"

"বাঃ। কিন্তু শিলিগুড়ি তো আমার এলাকা নয়। এদিকে যে পাঁচজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তার চারজনই মারা গেছে। যে এখনও আছে সে কতক্ষণ থাকবে বলা যাচ্ছে না।"

"আমি এখন বস-এর সন্ধানে যাচ্ছি। হারাধন এবং বিশ্বনাথকে পাওয়া যাচ্ছে না। সম্ভবত ওদের জীবন বিপন্ন।" অর্জুন জানাল।

"আপনি এক কাজ করুন। শিলিগুড়ির কোন জায়গায় রয়েছেন এখন?"

"তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস।"

"দশ মিনিট অপেক্ষা করুন। শিলিগুড়ির ওসির সঙ্গে কথা বলছি। ওখানে থাপা আছে। খুব ভাল লোক। এসটিডি বুথের নাম কী?"

বাইরে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করে নাম বলে দিল অর্জুন। বাইশ টাকা মিটারে উঠেছে। অর্জুন সেটা মিটিয়ে দিয়ে বলল, "একটু বসতে পারি ভাই?"

লোকটি বলল, "বসুন।"

চেয়ারে বসে রাস্তার দিকে তাকাল সে। লোকটা জিজ্ঞেস করল, "কোথাও যাওয়ার থাকলে বলুন টিকিট আনিয়ে দিচ্ছি।"

সে মাথা নাড়ল, "না। কোথাও যাচ্ছি না। এই জায়গাটা সবসময় এমন জমজমাট থাকে? কত বাস যাচ্ছে আসছে!"

"সবসময়। সবরকম ধান্দা এখান থেকে হয়। আপনি কি আবার ফোন করবেন?"

"হ্যাঁ। দশ মিনিট পরে।"

কিন্তু ন' মিনিটের মাথায় পুলিশের জিপটা সামনে এসে দাঁড়াল। মিষ্টি চেহারার এক ভদ্রলোক জিপ থেকে লাফিয়ে নামলেন। তাঁর পরনে জিন্‌স আর হাওয়াই শার্ট। সোজা এসটিডি বুথে ঢুকে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "অর্জুন?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "মিস্টার থাপা?"

"ইয়েস। আমাকে কে খবর দিয়েছে বলুন তো?"

"সুদর্শনবাবু।"

সঙ্গে সঙ্গে হাত মেলালেন ভদ্রলোক। ততক্ষণে পেছনের লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে হাত কচলাচ্ছে, "আসুন সার, আসুন সার। কোল্ড ড্রিঙ্ক না চা, কী বলব?"

হাত নেড়ে না বলে থাপা অর্জুনকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, "জলপাইগুড়ির ওসি আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন আপনাকে সাহায্য করতে। আপনার কথা আমি আগেই শুনেছি, আলাপ করতে পেরে খুশি হলাম। এবার বলুন, কী ধরনের সাহায্য চাই।"

"আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আজও ট্রেনে ডাকাতি হয়েছে এবং তিনজন যাত্রী ইতিমধ্যে মারা গিয়েছেন। আমার অনুমান ভুল হতে পারে কিন্তু ভুল না হলে ওই দলের পাণ্ডা এখন পাঙ্খাবাড়িতে আছেন।" অর্জুন বলল।

"পাঙ্খাবাড়ি? ওটা অবশ্য শিলিগুড়ি থানার মধ্যে পড়ে না, তবে আমার যেতে আপত্তি নেই। লেট্‌স গো।"

যেতে যেতে প্রধান খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত ব্যাপার জেনে নিলেন। অর্জুন সব বলল, শুধু রুদ্রাক্ষের মালাপ্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। থাপা অবাক হয়ে বললেন, "বাঃ। আপনি তা হলে থটরিডার, আমি কী ভাবছি তা বলতে পারবেন?"

"চেষ্টা করব।" অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেল, "ভারতবর্ষে এখনও জেম্‌স বন্ড জন্মায়নি।"

থাপা জিজ্ঞেস করল, "বলুন তো, আমি কী ভাবলাম?"

অর্জুন বলল, "ভারতবর্ষের কথা ভাবছেন কেন? পৃথিবীতেই কোনও জেম্‌স বন্ড জন্মাবে না। কারণ ওর জন্ম উপন্যাসের পাতায়।"

প্রচণ্ড জোরে হাত চেপে ধরে থাপা চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী অদ্ভুত ব্যাপার। আপনি তো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী।"

পেছনে বসা সেপাইরা মজা পেয়ে গেল। তারাও অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। দু'জনকে সন্তুষ্ট করে অর্জুন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। জিপ শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর দার্জিলিং-এর রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে ঢুকে পড়েছিল। এবার আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুটছে।

সবাই চুপ করে গেলে অর্জুন অসিতের কথা নিয়ে ভাবতে লাগল। ছেলেটা থাকে ফাটাপুকুরে। এই জায়গাটাও শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ি যেতে পড়ে।

একটা অদ্ভুত ঘটনা হল, এখন পর্যন্ত এই দলের যে তিনজনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তারা থাকে শিলিগুড়ির বাইরে। অর্থাৎ এই দলের ছেলেগুলোকে ওরা শহরের বাইরে থেকে কি সংগ্রহ করে? কেন করে? এই ছেলেরা মফস্বলের বলে শহরের ছেলের মতো চালাকচতুর নয় বলে কি ওদের ধারণা? এবং অবশ্যই এরা বেকার, কাজকর্ম নেই, টাকার লোভ দেখানো অনেক বেশি সহজ।

মানাভাইয়ের কথা ভাবল সে। লোকটাকে ধরা সহজ। কিন্তু ওকে ধরে যে কিছুতেই পেট থেকে কথা বের করা যাবে না এ-ব্যাপারে অর্জুন নিশ্চিত। ওর ওপর আস্থা না থাকলে ওকে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে দেওয়া হত না। অর্জুনের মনে পড়ল মানাভাই মারুতিভ্যানের ড্রাইভার মাধবকে একটা প্যাকেট দিয়েছে পাঙ্খাবাড়িতে পৌঁছে দিতে। সে উত্তেজিত হল। মাধবকে প্যাকেটটা গুরুং-এর দোকানে পৌঁছে দিতে বলেছিল মানাভাই। সেই গুরুং-এর দোকানেই যাচ্ছে অসিত। এই গুরুং লোকটা খুব জরুরি। মাধব যখন জিজ্ঞেস করেছিল গুরুং না থাকলে কী করবে, তখন মানাভাই জবাব দিয়েছিল, ওর বাপ থাকবে। কথাটার দুটো মানে, এক, গুরুং তার দোকান ছেড়ে কোথাও যায় না। দুই, সে যখন কোথাও যায় তখন তার বাবা দোকান চালায়।

জিপ পাহাড়ে উঠছিল। পাঙ্খাবাড়ির পথ অনেকটা খাড়াই। এই পথ আগে আরও খারাপ ছিল। কার্শিয়াং যাওয়ার মূল রাস্তা সুখনা দিয়ে। একটু ঘুরপথ বলে সময় লাগে। এখন পাঙ্খাবাড়ির পথ অনেকটা ভাল। ভারী বাস বা লরির এই পথে যেতে অসুবিধে হয়। কিন্তু জিপ বা মারুতি সহজেই চলে যায় এবং কম সময়ে কার্শিয়াং পৌঁছয়। ফলে এই পথে গাড়ির সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গিয়েছে।

অর্জুন দেখল সোজা ওপরে উঠে আচমকা ডান দিকে বাঁক নিতে হল জিপটাকে। শক্ত করে কিছু ধরে না রাখলে মুশকিল। মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি পাঙ্খাবাড়িতে আগে গিয়েছেন?"

"না।" অর্জুন মাথা নাড়ল।

"তা হলে প্রথমে এখানকার পুলিশ স্টেশনে যাওয়া উচিত।"

"আমার মনে হয় সেটা না করাই ঠিক হবে।"

"কেন?"

"আমি এখনও জানি না ওদের চিফ পাঙ্খাবাড়িতে আছে কিনা। যদি থাকে এবং এটাই যদি ওর আস্তানা হয়, তা হলে লোক্যাল থানার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। সেটা না থাকলেও থানায় ওর বিশ্বস্ত কেউ থাকতে পারে, যে আমাদের আসার খবরটা ওকে পৌঁছে দেবে।"

"আপনি দেখছি খুব সতর্ক।" মিস্টার থাপা বললেন।

অর্জুন হাসল, "তা ছাড়া যদি চিফ এখানে না থাকে তা হলে থানায় বলে আমি হাসির খোরাক হয়ে যাব। আপনিও হয়তো সময় নষ্ট করার জন্যে বিরক্ত হবেন। কিন্তু আপনি তো নিজেই এসেছেন সাহায্য করতে।"

"হুম। তা হলে আমরা কোথায় যাচ্ছি? পাঙ্খাবাড়ি এসে গেল বলে!"

অর্জুন একটু ভাবল। বাঁক ঘুরতে দূরে কিছু বাড়ি দেখা গেল পাহাড়ের গায়ে। অর্জুন বলল, "জিপ থামাতে বলুন, আমরা দু'জন এখানে নেমে পড়ি।"

জিপ থামালেন মিস্টার থাপা, "তারপর?"

"ওরা জিপ নিয়ে পাঙ্খাবাড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা ওপরে উঠে দাঁড়াক। জিপ শিলিগুড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখে এমন ভান করুক যে, এঞ্জিনে গোলমাল হয়েছে। ঠিক আধঘণ্টা বাদে আবার ওরা পাঙ্খাবাড়ির ভেতর দিয়ে নীচে নেমে এসে এখানে অপেক্ষা করবে। যদি আমাদের দেখা না পায় তা হলে আধঘণ্টা আরও অপেক্ষা করে পাঙ্খাবাড়িতে গিয়ে গুরুং-এর দোকানের খোঁজ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। ওদের বুঝিয়ে দিন।" অর্জুন ধীরে ধীরে বলল।

মিস্টার থাপা তাঁর সেপাইদের কী করতে হবে বুঝিয়ে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বলে অর্জুনের সঙ্গে নীচে নেমে দাঁড়ালেন। একটু বাদে জিপ চোখের আড়ালে চলে গেলে মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে তো কোনও মানুষের বাড়ি নেই, এখানে নামলেন কেন?"

"একটা মিনিবাস আসছে, চলুন ওটায় উঠি।"

"বাসে?"

"হ্যাঁ। আপনাকে যদি কেউ পুলিশ বলে চিনতে না পারে তা হলে আমাদের যাত্রী ছাড়া অন্য কিছু ভাববে না। আপনার সঙ্গে অস্ত্র আছে?"

মিনিবাস আসছে বাগডোগরা থেকে। বেশ ভিড়। কোনওমতে দু'জনে সিঁড়ির ওপর পা রাখতে পারল। যাত্রীরা সবাই পাহাড়ের মানুষ। পাঙ্খাবাড়িতে নেমে মাথা পিছু দু'টাকা দিতে হল। মিস্টার থাপার আপত্তি সত্ত্বেও অর্জুনই দিয়ে দিল। পাঙ্খাবাড়ির বাসস্ট্যান্ড আদৌ জমজমাট নয়। পাহাড়ি জায়গার বাসস্ট্যান্ডেই যা কিছু প্রাণচাঞ্চল্য থাকে। এখানে একটা চায়ের দোকান, একটা রেস্টুরেন্ট আর কিছু অন্যান্য দোকান নজরে পড়ল। এদের মধ্যে কোনটা গুরুং-এর দোকান? অর্জুন ঘড়ি দেখল। অসিত এবং তার বন্ধুর এখানে চলে আসার কথা। ওরা নিশ্চয়ই গুরুং-এর দোকানে পৌঁছে গেছে।

"চা খাবেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"না। আমি চা খাই না।"

"সিগারেট?"

হাত নাড়লেন ভদ্রলোক, "আপনি খেলে খেতে পারেন।"

"আসলে স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলে চায়ের দোকানে ঢোকা দরকার। চলুন।" ওরা দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"একটা চা।" অর্জুন বলল।

একজন প্রৌঢ়া দোকান চালাচ্ছেন। গরম জলে কাপ ধুতে ধুতে জিজ্ঞেস করলেন, "স্পেশ্যাল না অর্ডিনারি।"

"স্পেশ্যাল।"

প্রৌঢ়া খুশি হলেন, "এখানে কোথায় এসেছেন আপনারা?"

"কোথাও না। কার্শিয়াং যাচ্ছিলাম, জায়গাটা দেখে ভাল লাগল বলে নেমে পড়লাম। একটু ঘুরে আবার বাস ধরব।"

চায়ের কাপ অর্জুনের হাতে তুলে দিয়ে প্রৌঢ়া নেপালি ভাষায় মিস্টার থাপাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিও আগে এখানে আসেননি?"

মিস্টার থাপা জবাব দিলেন, "আমি তো এদিকে থাকি না।"

"ও। এখানে দেখার কিছুই নেই। থাকতে হয় বলে থাকি।"

মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন, "খুব ঠাণ্ডা পড়ে শীতকালে?"

"খুব মানে দার্জিলিংয়ের মতো নয়।"

"আমাকে এক বন্ধু বলেছিল পাঙ্খাবাড়িতে থাকার জায়গা পাওয়া খুব মুশকিল। কার যেন দোকান আছে তিনি ইচ্ছে করলে ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তাঁর নামটা মনে পড়ছে না!" মিস্টার থাপা অভিনয় করলেন।

"কোন দোকান? এভারেস্ট স্টোর্স? প্রধানের দোকান?"

"না, না। পেটে আসছে, মনে আসছে না।"

"গুরুংয়ের দোকান?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। গুরুং। এই নামটাই শুনেছিলাম।"

"গুরুং আর আগের মতো নেই। ওর হালচাল সব বদলে গেছে। আগে ও একটা ঘর ভাড়া দিত। তখন রোজগার ছিল না। এখন পাহাড়ের ওপাশে জমি কিনে বিরাট বাড়ি করেছে। পাঁচিল ঘেরা।"

"হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেল?"

"ওর দাদা এল কাঠমাণ্ডু থেকে। অনেক টাকা নিয়ে এসেছে।"

মিস্টার থাপা বলল, "একেই বলে কপাল! গুরুং ভাইয়ের দোকানটা কোথায়?"

"একটু ওপরে উঠলেই বাঁ দিকে দেখতে পাবেন।"

চায়ের দাম একটু বেশি। হাসিমুখে সেটা মিটিয়ে দিয়ে ওরা হাঁটা শুরু করল। মিস্টার থাপা বললেন, "একটু রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু গুরুংকে কী বলবেন?"

"আগে গিয়ে দেখি কী অবস্থা, সেই বুঝে কথা বলা যাবে।" অর্জুন বলল। বাঁক ঘুরতেই ডান দিকে একটা ডালভাতরুটির হোটেল আর বাঁ দিকে একটা বড় স্টেশনারি দোকান দেখতে পেল ওরা। দোকানের নাম, কাঞ্চনজঙ্ঘা।

মিস্টার থাপা বললেন, "এরকম নির্জন জায়গায় এতবড় দোকান!"

"নিশ্চয়ই খদ্দের আছে।"

"একটা বুড়ো বসে আছে দোকানে।"

"উনি সম্ভবত গুরুংয়ের বাবা।"

"কী করে বুঝলেন?"

"চলুন না, জিজ্ঞেস করে দেখা যাক।"

এখন এখানে ঠাণ্ডা নেই, তবু বৃদ্ধ সোয়েটার পরে বসে আছেন কাউন্টারের ওপারে। চকোলেট থেকে হরলিক্স, খাতাপত্র, প্রসাধনী জিনিসের বিপুল সম্ভার এখানে সাজানো। বৃদ্ধ রোগা। পিটপিটে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই?"

"আচ্ছা, এখানে মিস্টার গুরুংকে পাওয়া যাবে?"

"আমিই গুরুং।"

"ও। নমস্কার। আমরা আপনার সাহায্য চাই। কলকাতার একটা স্কুলের তিরিশটা বাচ্চা নিয়ে স্কাউটের দল এখানে আসবে। ওরা এই পান্থাবাড়িতে সাতদিন থাকতে চায়। যা খরচ লাগে সব দেবে। আমরা তার ব্যবস্থা করতে এসেছি। বাসস্ট্যান্ডে খোঁজ করতে সবাই বলল আপনার দোকানে আসতে। আপনি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।" অর্জুন বলল।

"আমি কী করে সাহায্য করব!"

"কিছু না, ওই তিরিশজনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা যদি করে দেন! তিরিশজনের জন্যে দিনে তিন হাজার টাকার বাজেট আছে।"

বৃদ্ধকে চিন্তিত দেখাল, "সাতদিন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তো পাহাড়ের লোক, আপনিও এর সঙ্গে আছেন?"

প্রশ্নটা মিস্টার থাপার দিকে তাকিয়ে, অতএব তাঁকে জবাব দিতে হল, "আমি শিলিগুড়িতে থাকি। ইনি আমার পরিচিত!"

"দেখুন, এখানে অত লোকের থাকার জায়গা নেই। তবে, আমার ছেলের সঙ্গে কথা বললে ও একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।"

"বেশ তো। তিনি এখন কোথায়?" মিস্টার থাপা জিজ্ঞেস করলেন।

"ওই বেঞ্চিতে বসুন। তার আসার সময় হয়ে গিয়েছে।"

দোকানের সামনে ফেলে রাখা বেঞ্চিতে বসল ওরা। অর্জুন লক্ষ করল বৃদ্ধ ওদের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। এই বুড়ো যেভাবে 'আমিই গুরুং' বলেছিল তাতে অবাক হয়েছিল সে। ওর ধারণা ছিল গুরুং লোকটা মধ্যবয়সী। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর ওরা দেখতে পেল মিস্টার থাপার জিপ ওপর থেকে নেমে আসছে। অর্জুনের ভয় হল অফিসারকে দেখে ড্রাইভার জিপ না থামিয়ে দেয়। সে মিস্টার থাপাকে বলল, "আসুন, দোকানের ভেতরে যাই। খিদে পেয়েছে, বিস্কুট কিনব।"

মিস্টার থাপা ইঙ্গিত বুঝতে পেরে চটপট দোকানের ভেতর ঢুকে পড়তেই

জিপ পাশের রাস্তা দিয়ে নেমে গেল।

"কী বিস্কুট নেবেন?" বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

"মেরি বিস্কুট।"

বৃদ্ধ একটা প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "ওই যে এসে গেছে।"

ওরা দেখল বেশ স্মার্ট এক নেপালি ভদ্রলোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধ প্রথমে তাঁর ভাষায় ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন। শোনার পর গুরুং জিজ্ঞেস করল, "কলকাতার কোন স্কুল?"

"ক্যালকাটা ইউনাইটেড।" ঝটপট নামটা বানাল অর্জুন।

"কবে আসতে চায়?"

"সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে।"

"দেখুন ভাই, এখানে তো থাকার জায়গার খুব অভাব। আপনারা বলেছেন তিরিশটা বাচ্চা আসবে, সঙ্গে নিশ্চয়ই মাস্টাররাও ক'জন থাকবে?"

"হ্যাঁ, তা তো থাকবেই।"

"অসম্ভব।"

"আপনিও সমস্যাটাকে অসম্ভব বলছেন?"

"আমি কে?" গুরুং হাসল, "আপনারা কার্শিয়াং চলে যান, ওখানে অনেক জায়গা পেয়ে যাবেন।"

"না, ওরা কার্শিয়াং বা কোনও শহরে থাকতে চায় না।"

"আরে ভাই, এই পাহাড়ে কে আপনাকে দশ-বারোটা ঘর দেবে? তাঁবুতে থাকবে ওরা?" আচমকা জিজ্ঞেস করল গুরুং।

"কোনও সমস্যা নেই।"

"তা হলে আরও এক হাজার ডেইলি বেশি দেবেন।"

"কোথায় তাঁবু ফেলব?"

"ওই পাহাড়ের পেছনে আমার বাড়ি আছে। তার পাশে অনেকটা জায়গা প্লেন করে রেখেছি, ওখানে ফেলা যেতে পারে।"

গুরুং কথাটা বলতেই ওর বাবা বললেন, "জায়গাটা দেখিয়ে দাও না!"

"তুমি সব ব্যাপারে কথা বলবে না।"

"ও।"

এই সময় দুটো ছেলে এগিয়ে এল ; "মিস্টার গুরুং আছেন?"

"হ্যাঁ। আপনারা?"

"আমরা শিলিগুড়ি থেকে আসছি।"

"আমিই গুরুং। কে পাঠিয়েছে?"

"এম বি।"

অর্জুনের খেয়াল হল, এই দু'জনকে সেবক রোডে দেখেছে সে। অসিতদের সঙ্গে বেরিয়ে এরাই উলটোদিকে হেঁটে গেছে। অর্জুন গুরুংয়ের পাশে গিয়ে

দাঁড়াতেই শুনতে পেল, "ঝামেলা হয়ে গেল। এই দুটোকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।"

অর্জুন বলল, "আপনি তো বাড়িতেই যাবেন, আমরা জায়গাটা দেখে আসি আপনার সঙ্গে গিয়ে।"

গুরুং মাথা নাড়ল, তারপর ইশারায় ওদের অনুসরণ করতে বলে হাঁটতে লাগল। অর্জুন শুনল, মাত্র আটাশ হাজার, খুব বেশি হলে সাতদিনে চৌদ্দ হাজার থাকবে। বাবার জন্যে ফালতু ঝামেলা নিতে হবে।

অর্জুন বলল, "গুরুং ভাই, এখানে টাকাটা বেশি কথা নয়। আপনি যে বাচ্চাদের সাহায্য করছেন এটা ক'জন করে বলুন!"

অর্জুন শুনল, "এ ব্যাটা আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে। কিন্তু ওর সঙ্গীটাকে খুব চেনা চেনা লাগছে। কোথায় দেখেছি যেন!"

গুরুং দাঁড়াল, "আপনি কোথায় থাকেন ভাই?"

অর্জুন বলল, "গ্যাংটকে। আপনি নিশ্চয়ই গ্যাংটকে গিয়েছেন?"

অর্জুন শুনল, "গ্যাংটকের জুবিলি স্কুলে পড়ায় নাকি লোকটা?"

"গ্যাংটকে কয়েকবার গিয়েছি। গ্যাংটকের কোথায়?"

মিস্টার থাপা কোনও কথা বলার আগেই অর্জুন বলল, "উনি টিচার। গ্যাংটকের জুবিলি স্কুলে পড়ান।"

গুরুংয়ের মুখে হাসি ফুটল, "তাই বলুন। আপনাকে ওখানেই দেখেছি। খুব চেনা মনে হচ্ছিল। আমার ভাগ্নী ওই স্কুলে পড়ে।"

মিস্টার থাপার গলা শুকনো শোনাল, "কী নাম?"

"শ্রেয়া। নিচু ক্লাসে পড়ে।"

পিচের রাস্তা ছেড়ে কাঁচা পথ ধরে ওরা অনেকটা চলে এসেছিল। এবার বাঁক ঘুরতেই বাড়িটা দেখতে পেল। অনেকটা জায়গা সমতল করে দোতলা বাড়ি বানানো হয়েছে। বাড়িটা বিশাল। লম্বা তারের বেড়ায় ঘেরা বাগানে ফুলের গাছ আছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনার বাড়ি?"

"ঠিক আমার নয়, আবার আমারও বলতে পারেন।"

"বুঝলাম না!"

"বাড়িটা বানিয়েছেন আমার দাদা। উনি বিয়ে করেননি। তাই ওঁর পরে তো বাড়িটা আমিই পাব।" হাত বাড়াল গুরুং, "ওই যে ওপাশে জায়গাটা দেখছেন, ওখানে তাঁবু ফেলা যেতে পারে।"

"জলের ব্যবস্থা?"

"ওসব হয়ে যাবে।"

মিস্টার থাপা বললেন, "সত্যি বাড়িটা সুন্দর। একবার ভেতরে গিয়ে দেখতে পারি? অবশ্য আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে।"

অর্জুন শুনল, "ঝামেলা পাকাল। ঠিক আছে, বাগানে নিয়ে গিয়ে বের করে

দেব। হাজার হোক শ্রেয়ার মাস্টার।"

অর্জুন লক্ষ করছিল সেই ছেলে দুটো খানিকটা দূরত্ব রেখে ওদের অনুসরণ করছে। এম বি পাঠিয়েছে মানে কি মানাভাই পাঠিয়েছে? ওরা কি লোকটাকে এম বি বলে?

নীচে নেমে গেটের কাছে পৌঁছতেই একটি পাঞ্জাবি যুবক দৌড়ে এসে সেলাম করে তালা খুলে দিল। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান।

বাড়ির সামনে বাগানে পৌঁছে গুরুং বলল, "এই হল বাড়ি। এমন কিছু আহামরি নয়।"

অর্জুন বলল, "তা হলে তাঁবুর ব্যাপারটা পাকা।"

"এখনই বলতে পারছি না। সামনের মাসে আমার বাইরে যাওয়ার কথা আছে। যদি ক্যানসেল হয় তা হলে করে দেব।"

"কিন্তু সেটা জানব কী করে?"

"দোকানের ঠিকানায় চিঠি লিখবেন।"

এই সময় মিস্টার থাপা বললেন, "এক্সকিউজ মি, মিস্টার গুরুং। আমি আপনাদের টয়লেটটা ব্যবহার করতে পারি? স্টমাকে মনে হচ্ছে গোলমাল হয়েছে।"

অর্জুন শুনল, "সর্বনাশ! টয়লেটে যাওয়ার আর সময় পেল না।"

সে বলল, "এ কি বলছেন মিস্টার গুরুং! জন্মমৃত্যু এবং টয়লেট পাওয়া তো আগে থেকে জানান দিয়ে হয় না।"

গুরুং এমনভাবে ঘুরে দাঁড়াল যেন কেউ তাকে সপাটে চড় মেরেছে। তার মুখ হাঁ হয়ে গেল। অর্জুন বলল, "ওঁকে টয়লেটটা দেখিয়ে দিন।"

"আপনি! আপনি হঠাৎ এ-কথা বললেন কেন?"

"আমার মনে হল আপনি এরকম ভাবতে পারেন।"

গুরুং তাকিয়ে ছিল একদৃষ্টিতে। অর্জুন শুনতে পেল, "এই লোকটা থেকে দূরে থাকতে হবে। খুব সাঙ্ঘাতিক লোক।" তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মিস্টার থাপাকে বলল, "আসুন আমার সঙ্গে। আর তোমরা ওই গাড়িতে গিয়ে উঠে বসো।"

বাগানের আর-এক প্রান্তে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তার সামনে দু'জন ড্রাইভার। মিস্টার থাপাকে নিয়ে গুরুং বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলে ছেলে দুটো এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ড্রাইভার ওদের মারুতি ভ্যানে উঠতে বলল।

অর্জুন ভেবে পাচ্ছিল না কীভাবে বাড়ির দোতলায় উঠবে। ছেলে দুটোকে যখন গাড়িতে উঠতে বলা হল তখন নিশ্চয়ই কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। তা হলে হারাধনদের কি এ-বাড়িতে নিয়ে আসা হয়নি? অসিত এবং তার সঙ্গী কোথায় গেল? এদের চিফ যদি দোতলায় থাকে তা হলে সেখানেই কি ওরা রয়েছে! সেই শক্তিমান লোকটি এখন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ওপরে যেতে গেলে ও নিশ্চয়ই বাধা দেবে এবং তাতে কাজের কাজ হবে না। লোকটার কাছাকাছি গিয়ে কান

পাতল অর্জুন কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। আশ্চর্য! লোকটা কি কিছুই ভাবছে না?

মিস্টার থাপাকে নিয়ে গুরুং ফিরে এল একটু বাদে, "আচ্ছা!"

অর্জুন শুনতে পেল, "বিদায় হও।"

"তা হলে আপনি কথা দিচ্ছেন না?"

মাথা নাড়ল গুরুং। অর্জুন শুনল, "এখানে একে আনাই ভুল হয়েছে। একটু পরেই বস্ বের হবে। এদের এখান থেকে না কাটালে—!"

গুরুং হাত নাড়ল, "বাই।"

অর্জুন মিস্টার থাপাকে বলল, "চলুন, অন্য কোথাও খোঁজ করি।"

ওরা গেট পেরিয়ে পাহাড়ি পথ ধরে হেঁটে ওপরে চলে এল। বাড়িটা এখন নীচে। অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে একটা ঝোপ দেখতে পেল। সে পা চালাল। "চটপট চলে আসুন, লুকোতে হবে।"

মিস্টার থাপা একটুও দ্বিধা করলেন না। ঝোপের আড়ালে চলে গিয়ে বললেন, "জানি না, কেউ আমাদের লক্ষ করল কি না।"

"নীচের ওরা করেনি, ওপর থেকে কেউ করলে ওরা জানতে পারবে না। ভেতরটা কীরকম দেখলেন?"

"কিছুই চোখে পড়েনি। তবে এত কস্টলি টয়লেট বোধ হয় ফাইভস্টার হোটেলেই থাকে। এরকম জায়গায় ভাবা যায় না। আপনার যদি মনে হয় এই বাড়িতে লিডার লুকিয়ে আছে তা হলে আমরা সার্চ করতে পারি।"

"আমি তো নিশ্চিত নই।"

"কিন্তু এই গুরুং লোকটা হঠাৎ যেন বদলে গেল।" মিস্টার থাপার কথা শেষ হওয়ামাত্র একটা লোক বাইরে বেরিয়ে ইশারা করা মাত্র ভ্যানের পাশে দাঁড়ানো মারুতি জেনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে এল সিঁড়ির সামনে। তারপরই সেই শক্তিমান লোকটা পেছনের দরজা খুলে একপাশে দাঁড়িয়ে গেল। এখান থেকে বারান্দাটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু বাইনোকুলারের অভাব টের পাচ্ছিল অর্জুন।

এই সময় চারজন লোক বেরিয়ে এল ব্যস্ত পায়ে? এদের মধ্যে গুরুংও আছে। ওদের পেছন পেছন যে মানুষটা বেরিয়ে এল তার উচ্চতা বড়জোর সাড়ে চার ফুট। মাথাটা বিশাল বড়। পরনে গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট শার্ট। গরমজামা পরেনি। লোকটা সোজা গাড়ির মধ্যে ঢুকে যাওয়া মাত্র ওরা দরজা বন্ধ করে ভ্যানের দিকে ছুটল। শুধু গুরুং গিয়ে জেনের সামনের সিটে বসে দরজা বন্ধ করল।

অর্জুন বলল, "তাড়াতাড়ি চলুন। বড় রাস্তায় পৌঁছতে হবে।"

মিস্টার থাপা বললেন, "সেটা সম্ভব করতে পারলে চাকরি ছেড়ে দিতাম। ওরা গাড়িতে চেপে এখানে আসার আগে বড় রাস্তায় পৌঁছলে বিশ্বরেকর্ড হয়ে যাবে দৌড়নোর।"

কথাটায় যুক্তি আছে। তা ছাড়া গুরুং মিস্টার থাপাকে চিনতে পারেনি বটে কিন্তু ওই বেঁটে লোকটা তো চিনতে পারে। গাড়ি দুটো তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে

গেছে। ঝোপের মধ্যে বসেই ওরা দেখল গাড়ি দুটো ওদের পেছন দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

মিস্টার থাপা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "ওরা কোথায় গেল এইটেই জানা গেল না।"

"ওরা তো আমাদের ঠিকানাটা বলত না!"

"এই যে ছেলে দুটো এল, ওরাও কি ডাকাতি করে?"

"সেটাই স্বাভাবিক।"

বড় রাস্তায় পৌঁছতেই ভ্যানটা আচমকা থেমে গেল পাশে, "এ কী! দাদা, আপনি?"

"আরে! তোমার এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?"

"তাড়াতাড়ি? এর মধ্যে ঘণ্টা চারেক চলে গেছে জানেন?"

মাধব কার্শিয়াং থেকে প্যাসেঞ্জার নিয়ে ফিরছে। ভ্যান ভর্তি। "মাধব, তুমি একটু নেমে আসতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই।" গাড়ি একপাশে করে প্যাসেঞ্জারদের কিছু বুঝিয়ে সে চলে এল অর্জুনের কাছে। নিচু গলায় বলল, "বড়বাবুকে নিয়ে এখানে?"

"চিনতে পেরেছ?"

"চিনব না? আমার কথা একটু বলে দেবেন যাতে কেস না নেয়?"

"বলে দেব। কিন্তু তোমার কাছে একটা উপকার চাই।"

"আদেশ করুন।"

" তুমি আজ গুরুং-এর দোকানে একটা প্যাকেট পৌঁছে দিয়েছ মনে আছে? মানাভাই তোমাকে দিয়েছিল।"

"আর বলবেন না দাদা। শিলিগুড়ি থেকে ওঠার সময় পেছনে বসা একটা প্যাসেঞ্জার এমন ঝামেলা করছিল যে, যাওয়ার সময় ওই প্যাকেটটা দিতে একদম ভুলে গিয়েছি। এখন দেব।"

"প্যাকেটটা দেখতে পারি?"

মাধব গাড়ির দিকে ছুটে গেল। ফিরে এল একটা বড় খাম হাতে। অর্জুন বলল, "মানাভাই বলেছিল প্যাকেট, এটা তো খাম।"

"এটাই দিয়েছিল দাদা।"

অর্জুন ঝটপট খাম খুলে ফেলল। গোটা পাঁচেক কাগজ। ইংরেজিতে ছাপা কোনও কিছুর জেরক্স। পড়ে বিষয় জানার সময় হাতে নেই, দ্রুত পাতা উলটে গেল সে। পেছনের পাতার কোণে লেখা, টু থার্টি পি এম, সিংলা বাংলো।

এই কথাটার মানে কী? সে মাধবকে জিজ্ঞেস করল, "সিংলা বাংলো বলে কোনও বাড়ি কি এখানে আছে?"

"না দাদা, আমি জানি না।"

"দোকানে গুরুংয়ের বাবা আছেন। ওকে যখন এই খামটা দিতে যাবে তখন জিজ্ঞেস করবে সিংলা কোথায়?"

"ঠিক আছে। কিন্তু খামটা তো ছিঁড়ে ফেলেছ?"

"বলবে ছিঁড়ে গিয়েছে।"

মাথা নেড়ে চলে গেল মাধব তার গাড়ি নিয়ে।

মিস্টার থাপা বললেন, "খবরটা দিতে ওকে আবার ফিরে আসতে হবে। তার চেয়ে চলুন এগিয়ে যাই।"

ওরা হাঁটছিল। একটু এগোতেই মিস্টার থাপার ভ্যানটাকে দেখতে পাওয়া গেল। ওপর থেকে ধীরে ধীরে নামছে। অর্জুন বলল, "উঠে পড়ুন। রাস্তায় মাধবকে ধরে নেব।"

॥ ৫ ॥

ভ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল মাধব। ঠিক গুরুং-এর দোকানের সামনেই সে ভ্যানটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এতক্ষণ আটকে থাকায় ভ্যানের যাত্রীরা এবার চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করেছে। জিপটাকে পাশে আনতেই মাধব এগিয়ে এল, "আধ কিলোমিটার নেমে বাঁ দিকের কাঁচা রাস্তা ধরে গেলে সিংলা পড়বে! এবার আমি যাই দাদা?"

"ঠিক আছে। খামটা ছেঁড়া দেখে কিছু বলেনি?"

"আমার হাত থেকে নিয়ে টেবিলে রেখে দিল বুড়ো। ভাল করে দেখল না পর্যন্ত। চলি।" দ্রুত ভ্যানে উঠে নেমে গেল মাধব।

ঘড়ি দেখল অর্জুন। আড়াইটে বেজে গেছে। এইসব পাহাড়ে দিন শেষ হয় খুব তাড়াতাড়ি। সে ড্রাইভারকে একটু জোরে চালাতে অনুরোধ করল। পুলিশের ড্রাইভারকে এরকম অনুরোধ করলে কী হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেল অর্জুন। ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটছিল, এই গাছটা সামনে চলে আসছে, এই সরে যাচ্ছে। আধ কিলোমিটার পথ ফুড়ুত করে ফুরিয়ে যেতেই অর্জুন চিৎকার করে বলল, "এবার বাঁ দিকের রাস্তা ধরে আস্তে চলুন।"

মিস্টার থাপা বললেন, "জেরক্সের পেছনে ওই লেখাটা তো অন্য কোনও কারণেও লেখা হতে পারে। তাই না?"

"ঠিকই। কিন্তু আমাদের কাছে কোনও তথ্য নেই, ওরা কোথায় গেল তাও জানতে পারছি না। সিংলা বলে যখন একটা জায়গা আছে তখন তার বাংলোটা দেখে আসা যাক।"

এই সময় পেছনে বসা একটি সেপাই জানাল, খানিকটা দূরে আর-একটা গাড়ি আসছে। এই রাস্তা পাকা নয়। বেশ সরু এবং পাহাড়ের গা ঘেঁষে চলেছে। দুটো বড় গাড়ি পাশাপাশি হলে অনেক জায়গায় আটকে যাবে। অর্জুন তেমন একটা

জায়গায় পৌঁছে বলল, "এখানে দাঁড়িয়ে যান। পেছনের গাড়ির লোকদের একটু দেখুন মিস্টার থাপা।"

মিনিটখানেকের মধ্যে পেছন থেকে হর্নের আওয়াজ ভেসে এল। খুব তাড়া থাকলে লোকে ওইভাবে হর্ন বাজায়।

অর্জুন বলল, "আমি নামব না। আপনারাই দেখুন।"

কিন্তু তার আগেই পেছনের গাড়ির আরোহী নেমে এসে বেশ কর্কশ গলায় গাড়ি সরাতে বলছে। একজন সেপাই জবাব দিল, "পুলিশের গাড়ি দেখছেন না?"

"পুলিশের গাড়ি বলে কিনে নিয়েছ নাকি? এটা পাহাড়, শিলিগুড়ি নয়। এই জিপ তো শিলিগুড়ির।"

মিস্টার থাপা নেমে দাঁড়ালেন। "হ্যাঁ শিলিগুড়ির।"

"ও, আপনি! এখানে আপনাকে দেখতে পাব ভাবিনি।"

"আপনি এখানে কী করছেন?"

"এই একটু পারিবারিক কাজে যাচ্ছিলাম।"

অর্জুন বুঝতে পারল গলাটা মানাভাইয়ের। জিপের সামনের সিটে বসে থাকায় সে লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু লোকটা এখানে এসেছে যখন, তখন নিশ্চয়ই দেরি করে এসেছে। জেরক্সের পেছনে লেখা ছিল আড়াইটে।

"সার। গাড়িটা একটু সরালে আমরা বেরিয়ে যেতে পারি।"

"আপনি তো সিংলা বাংলোয় যাচ্ছেন?"

"না, মানে, আপনি...!"

"আপনার কোনও চিন্তা নেই, আমরাও সেখানে যাচ্ছি।"

"না, না, আমি এক রিলেটিভের বাড়িতে যাচ্ছি।"

ইতিমধ্যে ড্রাইভার দু-তিনবার ইচ্ছে করে ফল্স স্টার্ট দিচ্ছিল। শব্দ করে থেমে যাচ্ছিল এঞ্জিন। এবার অর্জুনের ইঙ্গিতে এঞ্জিন চালু করল। মিস্টার থাপা বললেন, "ওই যে, গাড়ি ঠিক হয়ে গেছে। এদিকটায় আমি কখনও আসিনি। আপনি আসুন না আমার সঙ্গে! আপনার রিলেটিভের বাড়িতে নামিয়ে দেব। আপনার ড্রাইভারকে বলুন ফলো করতে। আসুন।"

জিপের পাশে পৌঁছে অর্জুনের দিকে অর্থবহ হাসি ছুড়ে মিস্টার থাপা ডাকলেন, "জলদি।" এবার অর্জুন মানাভাইকে দেখতে পেল। লোকটা যদি ভূত দেখত তা হলেও এত অবাক হত না। কিন্তু দ্রুত নিজেকে সামলে নিল সে, অর্জুনের পাশে উঠে বসল গম্ভীর মুখে। এই জিপে ড্রাইভারের পাশে দু'জন স্বাভাবিকভাবে বসতে পারে, তিনজন হওয়ায় মিস্টার থাপাকে একটু বেকায়দায় বসতে হয়েছিল। জিপ চলতে শুরু করলে মিস্টার থাপা বললেন, "সিংলা বাংলোটা কোথায় বলে দেবেন।"

অর্জুন শুনল, "এই লোকটা যে পুলিশের চর তা যদি আগে বুঝতাম! শালা মধুভাই একে চেনে। ওর হচ্ছে! এরা সিংলা বাংলোর খবর পেল কী করে? ওখানে

নিশ্চয়ই বস্ আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। গাড়িটা যদি রাস্তায় খারাপ না হত তা হলে অনেক আগে পৌঁছে যেতাম।"

অর্জুন হাসল শব্দ করে।

লোকটা রাগী চোখে তাকাল। অর্জুন শুনল, "এ ব্যাটা হাসছে কেন?"

অর্জুন বলল, "গাড়ির কথা কেউ বলতে পারে। কিন্তু কখন খারাপ হবে তা কেউ জানে না। আড়াইটের মধ্যে পৌঁছতে হলে আপনার উচিত ছিল অনেক আগে রওনা হওয়া। তাই না মানাভাই।"

"আপনি কে বলুন তো?"

"থটরিডার। আপনি যা ভাববেন আমি তা বলে দেব।"

"আমি এখন থেকে কিছুই ভাবব না।" অর্জুন শুনতে পেল।

সে হাসল, "তা কি হয়? আজ সকালে ট্রেনে যে ডাকাতিটা হল তা নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না? হারাধন যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সেটা নিয়ে ভাববেন না?"

হতভম্ব হয়ে গেল মানাভাই। অর্জুন শুনল, "এ ব্যাটা সব জেনে গেল কী করে?"

"জানতে ইচ্ছে করলে জানা যায়।" অর্জুন বলতেই মানাভাই চিৎকার করে উঠল, "আমি নেমে যাব। এই লোকটা যা ইচ্ছে আমার নামে বলছে।"

"মনে মনে আপনি ঠিক উলটো ভাবছেন।"

মানাভাই মাথা নামাতেই অর্জুন মিস্টার থাপাকে বলল, "ও ভাবছে কখনওই আমাদের সিংলা বাংলোতে নিয়ে যাবে না।"

"আমি মরে যাব, আমাকে মেরে ফেলবে।" আর্তনাদ করে উঠল লোকটা।

হঠাৎ মিস্টার থাপার গলার স্বর বদলে গেল, "না নিয়ে গেলে আমি আপনাকে মেরে ফেলব। অপরাধীদের মারতে আমার খুব ভাল লাগে।"

"সার, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি শিলিগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি।"

অর্জুন মানাভাইয়ের হাঁটুতে হাত রাখল, "ওই বেঁটে লোকটার নাম কী?"

"কোন বেঁটে লোক?"

"যাকে রিপোর্ট করতে আজ আপনি এসেছেন।"

"আমি নাম জানি না। সবাই চিফ বলে, আমিও তাই বলি।"

"মিস্টার থাপা, এই লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।"

"ঠিক আছে। ওঁর নাম এস কে গুরুং।"

"দোকানদার গুরুংয়ের দাদা?"

"না। উনি নেপাল থেকে এসেছেন।"

"আপনার সঙ্গে আলাপ হল কী করে?"

"আমি কাজ খুঁজছিলাম, উনি কাজ দিয়েছেন।"

"এ-পর্যন্ত ক'টা ট্রেনডাকাতি করেছেন?"

"আমি করিনি।"

"যারা করেছে তাদের রিক্রুট তো আপনি করেছেন।"

অর্জুন শুনল, "আর বলব না। অনেক বলে ফেলেছি।"

এই পথে মানুষ ছিল না এতক্ষণ। এবার এক বৃদ্ধকে দেখা গেল। মিস্টার থাপা জিপ থামিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "সিংলা কতদূরে?"

"আপনারা সিংলা পেরিয়ে এসেছেন।"

আচমকা খেপে গেলেন মিস্টার থাপা। জিপ থেকে মানাভাইকে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারলেন। মানাভাই মাটিতে পড়ে গিয়ে আর্তনাদ করতেই পেছনে আসা ভ্যানটা মুখ ঘোরাতে চেষ্টা করল। মানাভাই চিৎকার করে ড্রাইভারকে নিষেধ করতে সে থেমে গেল। মাটি থেকে উঠে মানাভাই বলল, "ঠিক আছে, যা বলবেন তাই করব।"

অর্জুন গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। ভ্যানের ড্রাইভারকে জিপে নিয়ে আসা হল। মানাভাইকে নিয়ে ওরা ভ্যানে উঠল। মিস্টার থাপা ড্রাইভিং সিটে বসলেন। দুটো গাড়ি মুখ ঘোরাল। জিপের ড্রাইভারকে বলা হল ইশারা করা মাত্র থেমে যেতে।

মিনিট দশেক যাওয়ার পর মানাভাই বলল, "এই জায়গার নাম সিংলা।"

অর্জুন বলল, "এবার আপনি সত্যি কথা বলেছেন।"

"কী করে বুঝলেন?"

"কারণ উলটোপালটা ভাবেননি। বাংলোটা কোথায়?"

"ডান দিকের রাস্তায়। বাঁক নিলেই দেখা যাবে।"

গাড়ি থামল। অর্জুন নেমে জিপের কাছে গেল। ভ্যানের ড্রাইভার গম্ভীর মুখে বসে ছিল। অর্জুন তাকে বলল, "তুমি ওই ভ্যান ভাড়া খাটাও।"

"হ্যাঁ। এসব ঝামেলা হবে জানলে কে আসত!"

"মাধবকে চেনো?"

"মাধব? আমার বন্ধু।"

"বাঃ। শোনো, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, তা হলে জিপ থেকে নেমো না।" তারপর সেপাইদের দিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, "আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। পনেরো মিনিটের মধ্যে না ফিরলে বাংলোর ভেতর যাবেন। সামনের বাঁক ঘুরলেই বাংলো।"

মিস্টার থাপা ধীরে ধীরে গাড়িটাকে নীচে নামিয়ে আনলেন। তাঁর পাশের সিটে বসে আছে মানাভাই, পেছনের সিটে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল অর্জুন। বাঁক ঘুরতেই বাংলোটাকে দেখা গেল। কাঠের বাড়ি। দোতলা। সামনে লন। দোতলার বারান্দায় দু'জন লোক বসে আছে। তাদের একজন চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল, "এতক্ষণে আসার সময় হল? চিফ তোমাকে কখন রিপোর্ট করতে বলেছিল?"

মানাভাই জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, "গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

আমার কিছু করার ছিল না।"

অর্জুন বুঝল, দোতলার লোকটা গুরুং। কিন্তু সে যদি ড্রাইভারকে দেখতে পায় তা হলে স্পষ্ট চিনে ফেলবে। ভাগ্যিস ভ্যানের ড্রাইভারের দিকটা বাংলোর উলটো দিকে পড়েছে। অর্জুন চাপা গলায় বলল, "আপনি নামবেন না। বলুন পায়ে চোট পেয়েছেন, হাঁটতে পারছেন না।"

"কী হল? নামছ না কেন?" গুরুং চিৎকার করল ওপর থেকে।

"হাঁটতে পারছি না। পায়ে চোট।"

গুরুং মুখ ঘুরিয়ে কিছু বলল। এবার বারান্দায় রেলিং-এর ঠিক ওপরে দ্বিতীয় লোকটির মুখ দেখা গেল। সেই বেঁটে লোকটা। কোনও মানুষের মুখ যে এত কদর্য হতে পারে, তা ভাবা যায় না।

"কী করে চোট পেলে?" গুরুং জিজ্ঞেস করল।

"বললাম না গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল অ্যাকসিডেন্টে, তখনই চোট পাই। ডাক্তার পর্যন্ত দেখাতে পারিনি।" মানাভাই জবাব দিল।

"চোট পেলে না নামাই ভাল। সেটা আরও খারাপ হবে।" গমগম করল কণ্ঠস্বর। ওই বেঁটে মানুষের শরীর থেকে এত জোরে শব্দ বেরুতে পারে না শুনলে বিশ্বাস করা যাবে না। তারপর ধীরে ধীরে সিঁড়ির ওপর এসে দাঁড়াল লোকটা। বেঁটে, গালিস দেওয়া প্যান্ট, মাথায় টুপি এবং মুখে চুরুট। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। লোকটা বলল, "রিপোর্ট?"

"আজ আমাদের কেউ ধরা পড়েনি। তবে পাঁচজন প্যাসেঞ্জার উন্ডেড হয়েছে। ছেলেরা বাধ্য হয়েছে ওটা করতে।"

"ভুল। উন্ডেড নয়। চারজন মারা গেছে।"

"আমি খবর পাইনি সার।"

"তুমি আজকাল গাফিলতি করছ মানাভাই। আমি এখানে বসে যে খবর পাই, তুমি শিলিগুড়িতে থেকে তা পাও না। কত টাকার জিনিস?"

"এখনও কাউন্ট করিনি। আনুয়াবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"এটাও ঠিক নয়। হিসেব তোমার রাখা দরকার। আজ মাত্র পঁচিশ হাজার এনেছে ছেলেরা। এত কম টাকার জন্যে চার্জ করা বোকামি। মালদা থেকে যে তোমাকে খবরটা দিয়েছে তাকে আর দরকার নেই।"

"ঠিক আছে।"

"গাড়িটা কার?"

"ভাড়া গাড়ি।"

"ড্রাইভার?"

"বিশ্বাসী।"

"এখন থেকে নিজে গাড়ি চালাবে। সাক্ষী সঙ্গে রেখে ঘোরা আমি পছন্দ করি না।" আরও দু'পা নেমে এল বেঁটে লোকটা, "গুরুং, ওদের আনো।"

একটু পরেই নীচের ঘরের দরজা খুলে ছ'জন ছেলেকে বাইরে বের করে আনা হল। ওদের সঙ্গে ছ'জন বলবান মানুষ ছিল। দু'জনের হাত পেছন দিক করে বাঁধা।

"ওদের আলাদা করে দাও।"

গুরুং নেমে এসেছিল নীচে। হারাধন আর বিশ্বনাথকে দল থেকে সরিয়ে একটা বিশাল গর্তের কাছে নিয়ে যাওয়া হল। যে মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হয়েছে সেই মাটি পাশেই স্তূপ করা। পেছনে হাত থাকায় ওদের অসহায় দেখাচ্ছিল।

"এই দুটো ছেলেকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল। কেন করেছিল? না, একজন যে ডাকাতি করেছে সেই প্রমাণ ট্রেনে রেখে এসেছিল। তার সূত্র ধরে ওর বাড়িতে সেই রাত্রে দু'জন হানা দিয়েছিল, যারা পুলিশ নয়। খবরটা যদিও সে আমাদের কাছে ঠিক পৌঁছে দিয়েছিল কিন্তু লোক দু'জনকে ওদের ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। অতএব সাক্ষী থেকেই গেল। পুলিশ ওকে পরদিন ধরল। ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্বিতীয়জনকেও তুলে নিল। কিন্তু পুলিশ কী করল? এই দ্বিতীয়জনকে মারল না। বরং দু'জনকেই আদর করে সেদিনই জামিন দিয়ে দিল। কেন দিল? যেখানে পুলিশ ডাকাতের সন্ধানে মরিয়া সেখানে তাদের দু'জনকে হাতে পেয়েও কোন কারণে ছেড়ে দিতে পারে? আমি এই প্রশ্নের জবাব ওই ছ'জনের কাছে জানতে চাইছি।"

বিশ্বনাথ মাথা নাড়ল, "আমি কিছু বলিনি। জলপাইগুড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর ওকেই পুলিশ বারংবার জেরা করেছে।"

"তাই। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় ওকে ধরল কী করে?"

"ওদের সঙ্গে একটা লোক ছিল, যে মনের কথা বুঝতে পারে।"

"অ্যাঁ?" হা হা করে হাসল বেঁটে লোকটা। হাসি যেন তার থামতেই চায় না। "গুরুং শুনেছ? কী হে, তুমিও একই কথা বলবে নাকি?"

হারাধন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ। বুঝতে পারে।"

"অসম্ভব!" চিৎকার করে উঠল লোকটা, "একমাত্র মূর্খরাই এমন কথা বলতে পারে। এই বিজ্ঞানের যুগে এ-কথা শোনাও অন্যায়! নিজেদের দোষ ঢাকতে তোমরা গল্প শোনাচ্ছ।" বলতে বলতে লোকটা নেমে এল গাড়ির পাশে।

হারাধন চিৎকার করল, "আমি মিথ্যে কথা বলছি না।"

হঠাৎ অর্জুনের কানে এল, "এই দুটোকে এবার মাটির তলায় পাঠানো যাক। বাকি চারজন দৃশ্যটা দেখে সবাইকে বলবে বেইমানির শাস্তি কী!"

বিশ্বনাথ চেঁচাল, "মানাভাই, ওঁকে একটু বলুন, চুপ করে থাকবেন না।"

অর্জুন শুনল মানাভাইয়ের গলা, "পাগল।"

বেঁটে লোকটি দু'বার গালিস ধরে টানল। ফত ফত করে শব্দ বাজল। অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেল, "মানাভাই বাঁচাবে? ওরও তো সময় হয়ে এসেছে!" তারপরেই চিৎকার শুনতে পেল, "গুরুং, রেডি ফর অ্যাকশন।"

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল অর্জুন। সে বসে ছিল দুটো সিটের

মাঝখানে পা রাখার জায়গায়। একেবারে গাড়ির মধ্যে ঝুঁকে না দেখলে তাকে কেউ দেখতে পাবে না। তার শরীরের পাশেই ভ্যানের দরজা, দরজার ওপাশে বেঁটে লোকটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। অর্জুন শুনতে পেল বেঁটে লোকটা ভাবছে, "ওদের জ্যান্ত কবর দেওয়াই ভাল।"

সে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, "জ্যান্ত কবর দেওয়া ভাল কেন?"

বেঁটে লোকটা আপনমনে জবাব দিল, "ভাল, কারণ এতে কোনও খরচ নেই।"

গুরুংয়ের গলা কানে এল, "আপনি কার সঙ্গে কথা বলছেন?"

বেঁটে সজাগ হল, "মানে?"

"আপনি বললেন এতে কোনও খরচ নেই। কীসের খরচ বুঝলাম না?"

"তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছ জ্যান্ত কবর দেওয়া ভাল কেন?"

"না তো? আমি এইমাত্র এখানে এলাম।"

"তা হলে নিশ্চয়ই মানা জিজ্ঞেস করেছে।"

সঙ্গে সঙ্গে মানা প্রতিবাদ করল, "আমি? আমি জ্যান্ত কবরের কথা জানব কী করে যে জিজ্ঞেস করব?"

"তাই তো! এটা কীরকম ব্যাপার হল?"

"আপনি কি জ্যান্ত কবর দেওয়ার কথা ভেবেছেন?"

"অ্যাঁ? হ্যাঁ। বোধ হয়।"

"তা হলে সেই থটরিডার এখানেও এসে গিয়েছে।" মানাভাই বলল।

"থটরিডার?" বেঁটে লোকটার গলা ফ্যাঁসফেসে শোনাল।

"ওই যে যার কথা ওই ছেলেগুলো এতক্ষণ বলছিল।"

"বাজে কথা। মনের ভুল। ওদের গর্তে ফেলে দাও। তোমরা যারা দৃশ্যটা দেখছ, তারা মনে রেখো, তোমাদের দেখানোর জন্যে এইখানে নিয়ে আসা হয়েছে। বেইমানির শাস্তি কী তা তোমরা নিজের চোখে দ্যাখো। এর পরে ফিরে গিয়ে তোমাদের অন্য সহকর্মীদের এই গল্প শোনাবে। তোমরা যতদিন বিশ্বস্ত থাকবে ততদিন তোমাদের সমস্ত দায়িত্ব আমার। কিন্তু বেইমানি করলেই আমার চেয়ে নির্দয় পৃথিবীতে আর কাউকে পাবে না। তবে আমি এদের সুযোগ দিতে চাই। গুলি করে মেরে ফেলে না দিয়ে জ্যান্ত গর্তে ফেলব ওদের। ফেলে মাটি চাপা দিয়ে দেব। ওরা সুযোগ পাবে ওপরে উঠে আসার। যে নরম মাটি মাথার ওপর থাকবে তা সরিয়ে উঠে আসতে পারলেই বেঁচে যাবে।" গালিস টানল লোকটা, "গুরুং।"

গুরুং ইশারা করতেই বলবান লোকদুটো হারাধন এবং বিশ্বনাথকে গর্তে ফেলার জন্যে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে পনেরো মিনিট সময় চলে গেছে। জিপের শব্দে অর্জুন বুঝল সেপাইরা চলে এসেছে। সে ঝট করে ভ্যানের দরজা খুলতেই বেঁটে লোকটা খুব অবাক হয়ে তাকাল। অর্জুন তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ভ্যানের ভেতর টেনে

আনার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে সে মিস্টার থাপার চিৎকার শুনতে পেল। ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে তিনি সতর্ক করছেন, "যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানেই থাকো, নড়বার চেষ্টা করলেই গুলি করব।"

ওই বেঁটে মানুষটার শরীরে এত শক্তি যে, অর্জুন ওকে কিছুতেই কাবু করতে পারছিল না। লোকটা তাকে খামচাচ্ছিল। পা ছুড়ছিল শূন্যে, আবার মাথা দিয়ে ওর পেটে আঘাত করছিল। সেপাইরা ছুটে এল জিপ থেকে। ওরা বেঁটে লোকটাকে টেনে সরাতে যেতেই ওর হাত এসে পড়ল অর্জুনের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে গলায় এত জোরে টান লাগল যে, শ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড়। অর্জুন মুখ ফেরাতেই শব্দ হল এবং ঝুরঝুর করে রুদ্রাক্ষের ফলগুলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল মাটিতে।

ততক্ষণে লোকটাকে কব্জা করে ফেলেছে সেপাইরা। অর্জুন নিচু হয়ে রুদ্রাক্ষ কুড়নোর চেষ্টা করল। ওদিকে মিস্টার থাপা তখন গুরুংকে আটক করেছেন। কিন্তু বাকি চারটে ছেলে প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করেছে। সেপাইরা তাদের ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আসার পর মিস্টার থাপা অর্জুনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। অর্জুন তখনও উবু হয়ে রুদ্রাক্ষ খুঁজে চলেছে। গোটা দশেক পাওয়া গিয়েছে এতক্ষণে। সে চিৎকার করল, "এগোবেন না। পায়ের তলায় পড়লে নষ্ট হয়ে যাবে ওগুলো।"

"কী খুঁজছেন?"

"রুদ্রাক্ষ। এক মুঠোর প্রচুর দাম।"

মিস্টার থাপার সামনে একটা পড়ে ছিল। সেটা তুলে তিনি অর্জুনের দিকে ছুড়ে দিলেন। ওরা বাড়ির ভেতরটা সার্চ করতে গেল, এক এক করে প্রায় আঠারোটা রুদ্রাক্ষ পেল অর্জুন। এগুলো কী দিয়ে গাঁথা ছিল সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কোনও সুতো নেই বা চেন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। হারাধন আর বিশ্বনাথ কাছে এসে দাঁড়াতে সে চিৎকার করল, "খোঁজো, ভাল করে খুঁজে দ্যাখো তো এরকম রুদ্রাক্ষ পাও কি না।"

হারাধন কান্নাজড়ানো গলায় বলল, "দাদা, আমাদের কী হবে?"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল। হাত বাঁধা অবস্থাতেও বেঁটে লোকটা শরীর মুচড়ে যাচ্ছে সমানে। তার চোখ জ্বলছে।

অর্জুন বলল, "কী আর হবে? আবার ডাকাতি করবে।"

"না দাদা। জীবনে আর ওসব কাজ করব না।"

"সেটা পুলিশ বুঝবে! এখন পারো যদি খুঁজে বের করো।"

ইতিমধ্যে লোকাল থানায় খবর পাঠিয়েছেন মিস্টার থাপা। সেখান থেকে বিরাট পুলিশবাহিনী এসে গেছে। একই সঙ্গে তল্লাশি চালানো হচ্ছে গুরুংয়ের বিশাল বাড়িতে। গুরুংয়ের মানাভাই পুলিশকে জানিয়েছে এই লোকটি নেপাল

থেকে এসেছিল তিন বছর আগে। একটু একটু করে লোকটা টাকা ছড়িয়ে ওদের দলে টেনে নিয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারের রেলপথ ডাকাতির পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা বলে দল অর্গানাইজ করিয়েছে। স্থানীয় ছেলে নেওয়ার কারণ ওরা ওই রেলপথ থেকে চট করে যে যার বাড়িতে গিয়ে লুকোতে পারবে। এদিকে শিলিগুড়ি থেকে আলুয়াবাড়ি পর্যন্ত বাসরাস্তায় ডাকাতির পরিকল্পনা এই লোকেরই! ওরা এর নাম জানে না। ওকে চিফ বলে ডাকতে হয়।

তল্লাশি তখনও শেষ হয়নি, অর্জুন মিস্টার থাপাকে বলল, "এদের নিয়ে কী করবেন? এদের তো কোর্ট জামিন দিয়েছে।"

"তা হলে আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু যে চারজন পালিয়েছে তাদের ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। ডাকাতির কিছু জিনিস এখানে পেয়েছি। গুরুংয়ের বাড়িতে কী পাওয়া যাবে জানি না।" মিস্টার থাপা বললেন।

"আমি এবার ফিরে যেতে চাই।"

"বেশ তো। যদি সম্ভব হয় কাল একবার আমার থানায় আসবেন।"

"চেষ্টা করব।"

মানাভাই পুলিশ হেফাজতে বলে ওর ভ্যানটাকে পাওয়া গেল। পুলিশ তাকে ছেড়ে দিয়েছে বলে ড্রাইভার খুব কৃতজ্ঞ। অর্জুনের সঙ্গে হারাধন এবং বিশ্বনাথ ভ্যানে উঠে বসল।

কিছুক্ষণ যাওয়ার পর হঠাৎ বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করল, "দাদা, কিছু বলছেন না যে!"

"কী ব্যাপারে!"

"এখনই আমি একটা উলটোপালটা ভেবে ফেলেছিলাম।"

"কী ভেবেছ?"

"বাঃ, আপনি তো সব বুঝতে পারেন। আমি ভাবছিলাম আপনি না থাকলে এতক্ষণে মাটির তলায় শুয়ে থাকতাম।"

অর্জুন চোখ বন্ধ করল। সে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। রুদ্রাক্ষগুলো এখন তার পকেটে। বাড়ি গিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরলে তবে হয়তো এটা সক্রিয় হবে। এই শয়তানটা যে মালা আঁকড়ে ধরবে তা সে বুঝতে পারেনি।

ভ্যানের ড্রাইভার জলপাইগুড়িতে যখন পৌঁছে দিল তখন রাত ন'টা। পথে মণ্ডলপাড়ায় বিশ্বনাথ এবং রেলগেটে হারাধন নেমে গিয়েছিল।

বাড়িতে না গিয়ে সোজা ঘোষপাড়া কালীবাড়ির কাছে দেবাশিসের সোনার দোকানে চলে এল অর্জুন। দেবাশিস তখন দোকান বন্ধ করছে। ওকে দেখে অবাক হল, "কী ব্যাপার? অর্জুন, তুই?"

"যাঃ, দোকান বন্ধ হয়ে গেছে?"

"বল না, কী করতে হবে?"

"একটা মালা, রুদ্রাক্ষের, গেঁথে দিতে হবে।"

দেবাশিস মজা পেল। আলোর সামনে রুদ্রাক্ষগুলো ধরে বলল, "এগুলো কোথায় পেলে? একমুখী রুদ্রাক্ষ। বেশ দামি। কী দিয়ে গাঁথব?"

"কী দিয়ে গাঁথলে ভাল হয়?"

"এগুলো তো সুতোয় গাঁথা হয়। লাল সুতো। দাঁড়া।" অনেকক্ষণ ধরে একটা একটা করে রুদ্রাক্ষ বসিয়ে মালা গেঁথে ফেলল দেবাশিস। ওটা হাতে নিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কত দিতে হবে?"

"ধুস। এর জন্যে কেউ পয়সা নেয়! দামি জিনিস, যদি বিক্রি করার ইচ্ছে হয় তো বলবি।" দেবাশিস বলল।

মালাটা গলায় পরতেই অর্জুন বুঝল একটু ছোট হয়ে গেছে। তার মানে কয়েকটা ফল সে খুঁজে পায়নি। সে চোখ বন্ধ করল কিন্তু কোনও শব্দ শুনতে পেল না। অথচ দেবাশিসের মনে কোনও ভাবনা আসছে না এমন তো হতে পারে না!

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি কিছু ভাবছ?"

দেবাশিস মাথা নাড়ল, "ভাবছি এই জিনিস কোথায় পেলে?"

অর্জুন বেরিয়ে এল। রাত সাড়ে ন'টায় জলপাইগুড়ির রাস্তা ফাঁকা। ওর বুকের মধ্যে তখন প্রচণ্ড চাপ। এ কী হল? মালাটা অকেজো হয়ে গেল? অমল সোমকে সে কী জবাব দেবে? আর অমল সোমকে না পেলে এই রহস্যের সমাধানও হবে না। কিন্তু তিনি কবে ফিরবেন তা তিনিই জানেন।

ততদিন এই মৃত রুদ্রাক্ষ আগলে বসে থাকতে হবে তাকে।

pathagar.net

সন্ধানে

pathagar.net

pathagar.net

চিঠিটা এসেছিল তিনদিন আগে। কলকাতার একটি বিখ্যাত ডিটেকটিভ কোম্পানি অর্জুনকে চাকরির প্রস্তাব পাঠিয়েছে। প্রস্তাব গ্রহণ করলে আগামী মাসের এক তারিখে তাকে ওদের কলকাতার অফিসে রিপোর্ট করতে হবে।

চিঠিটা মাকে দেখিয়েছিল অর্জুন। ছেলে সত্যসন্ধানী বলে মায়ের নিশ্চয়ই গর্ব হয়, কিন্তু যে-কোনও বাঙালি মায়ের মতো ছেলের ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি সবসময় চিন্তায় থাকেন। চিঠি পড়ে বললেন, "যেচে তোর কাছে চাকরি এসেছে, মাইনেও ভাল, চাকরিটা নিয়ে নে।"

"তুমি আমার সঙ্গে কলকাতায় যাবে?"

"আমি? এই বাড়ি ছেড়ে আমি কী করে যাব?"

"তা হলে তোমাকে ছেড়ে আমি ওখানে পাকাপাকি থাকব কীভাবে?"

"বাঃ! চাকরির জন্যে লোকে দূরদেশে যায় না? আমাকে পাহারা দিতে দিতে তোর যখন চুল পাকবে তখন কী হবে?"

তিনদিন ধরে অনেক ভেবেছে অর্জুন। শেষ পর্যন্ত মায়ের জন্যে নয়, নিজের জন্যেই সে স্থির করেছে চাকরিটা নেবে না। এইসব গোয়েন্দা সংস্থার কাজ ধরাবাঁধা। যেসব সমস্যার কথা মানুষ পুলিশকে না জানিয়ে সমাধান করতে চায় তাই নিয়ে হাজির হয় সংস্থাগুলোর কাছে। সংস্থাগুলো গোপনে খবর এনে দেয়। এমনকী বিয়ের আগে মেয়ের বাবা ছেলে কেমন জানতে এদের দ্বারস্থ হন। এখানে চাকরি নিয়ে সে-ছেলের সম্বন্ধে খোঁজখবর করতে যাচ্ছে, দৃশ্যটা কল্পনা করতে গিয়ে হেসে ফেলল। হ্যাঁ, ঠিকই, জলপাইগুড়িতে সত্যসন্ধানীর নিয়মিত রোজগার হওয়া সম্ভব নয়। বিকল্প একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

ধন্যবাদের সঙ্গে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দেবে বলে চিঠি লিখতে বসেছিল অর্জুন, এই সময় ফোনটা এল। টাউন ক্লাবের সন্তুদা বললেন, "অর্জুন, একটু আসতে পারবে?"

"কোথায়?"

"আমাদের অফিসে। এ পি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চায়।"

"কী ব্যাপার?"

"ফোনে বলা যাবে না, চলে এসো।" সন্তুদা হেসে লাইন কেটে দিলেন।

চিঠিটা শেষ করে অর্জুন তার বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পোস্ট অফিসের সামনে চারটে ছেলে মোটরবাইকের ওপর বসে আড্ডা মারছে। পোশাক দেখলে বোঝা যায় বাড়ির অবস্থা ভাল। তেইশ-চব্বিশ বছরের ছেলেগুলোর ভাবভঙ্গিতে ঔদ্ধত্য ছিল। জলপাইগুড়িতে ইদানীং এই ধরনের কিছু ছেলেকে দেখা যাচ্ছে।

চিঠি পোস্ট করে বাইকের দিকে এগোতেই জনার্দনকে দেখতে পেল সে। দু' হাতে ধূপবাতি নিয়ে এর-ওর কাছে বিক্রির চেষ্টা করছে। ওকে দেখে জনার্দন এগিয়ে এল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ভাল আছ জনার্দন?"

"না সার। একদম ভাল নেই। আপনি আমার কী অবস্থা করেছেন দেখুন।"

"কেন? বেশ সুন্দর ব্যবসা করছ দেখতে পাচ্ছি।"

"ছাই ব্যবসা। কেউ ধূপ সহজে কিনতেই চায় না। কোনওমতে ডাল-ভাতের জোগাড় হয়। এবার অন্য কিছু না করলে মরে যাব।"

"অন্য কিছু মানে? তুমি কি আবার পুরনো লাইনে ফিরে যেতে চাইছ?"

"না সার। ধর্মত বলছি, চাইছি না। কিন্তু।"

অর্জুন চিন্তা করল, "তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতে দেখা কোরো।"

জনার্দন মাথা নাড়ল, "আমি একটা চায়ের দোকান করতে চাই সার। আপনি যদি কোর্টের সামনে দোকানের ব্যবস্থা করে দেন—! যা খরচ হবে আমি প্রতি মাসে শোধ করে দেব। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, আমি বেইমানি করব না।"

অর্জুন মাথা নেড়ে এগোচ্ছিল, জনার্দন পেছন থেকে বলল, "সার!"

অর্জুন তাকাল। জনার্দনের গলার স্বর নেমে গেল, "একটা কথা বলছি সার। দয়া করে আমার নাম কাউকে বলবেন না। ওই যে চারটে ছেলে ভটভটির ওপর বসে আছে, ওরা ভাল নয়।"

"কী থেকে বুঝলে?"

"আমি লাইন ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু দু'-একজন বন্ধু তো লাইনে আছে এখনও। কাল তাদের একজন বলছিল এরাই নাকি মাঝরাতে আসাম রোডে ছিনতাই করে।"

জলপাইগুড়ি শহরের আশপাশে কিছু ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। পুরনো পাপীদের ধরেও পুলিশ সুরাহা করতে পারেনি। শহরের অবস্থাপন্ন পরিবারের বেকার ছেলেরা যদি ওই কাজে নামে তা হলে পুলিশের পক্ষে প্রথমেই হদিস পাওয়া মুশকিল।

জনার্দনকে ছেড়ে বাইক নিয়ে হেঁটে রাস্তায় আসতেই একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, "হ্যালো জেম্স বন্ড!" আর-একজন বলল, "দুর। জেম্স বন্ড বুড়ো হয়ে গিয়েছে। বল, জেম্স বন্ডের নাতি।" বাকি দু'জন সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র আওয়াজ তুলল সিটি বাজিয়ে।

এসব ক্ষেত্রে গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে হয়। ওদের চ্যালেঞ্জ করলে সোজা অস্বীকার করবে। বলবে, তাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলেনি। অর্জুন বেরিয়ে এল।

সন্তুদা বললেন, "এসো, এসো। কফি খাবে?"

"নাঃ। এ পি-দা এসেছেন?"

"হ্যাঁ। কালই এসেছে কলকাতা থেকে। চলো।"

সন্তুদা অর্জুনকে এ পি সাহেবের ঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। এটা চা-বাগানের জেলা অফিস। আসল অফিস কলকাতায়। এ পি সাহেব ডুয়ার্সের বেশ কিছু চা-বাগানের মালিক। খেলাধুলো ভালবাসেন। টাউন ক্লাবের সঙ্গে তাঁর বাবার আমল থেকে জড়িত। কলকাতার খেলাধুলোর জগতেও ওঁর প্রতিপত্তি আছে।

"গুড মর্নিং অর্জুনবাবু। এসো। বোসো।" এ পি সাহেব তাঁর চেয়ারে বসে ছিলেন।

সন্তুদা বললেন, "আমাকে দরকার আছে?"

এ পি সাহেব নীরবে মাথা নেড়ে না বললেন। সন্তুদা চলে গেলে তিনি হাসলেন, "ব্যবসাপত্র কেমন চলছে?"

"ব্যবসা?" অর্জুন অবাক!

"বাঃ। তুমি ঘরের খেয়ে বনের মোষ কদ্দিন তাড়াবে?"

"বনের মোষ তাড়ানো যাদের স্বভাব তারা বোধ হয় খাওয়ার কথা চিন্তা করে না। বলুন, কীজন্য ডেকেছেন?" অর্জুন হাসল।

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। অনেক আগের এক বাংলা ছবিতে এইরকম একটা সংলাপ শুনেছিলাম। চরকায় তেল দেওয়া যার স্বভাব সে নিজের চরকা পরের চরকা নিয়ে ভাবে না, চরকা পেলেই তেল দেয়। ওয়েল, আমি তোমার সাহায্য চাই। তোমার দক্ষিণা কত বলো।" এ পি সাহেব বাঁ হাতে পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করছেন।

"দক্ষিণার কথা প্রথমেই কেন?"

"আমি তোমাকে বিনাপয়সায় খাটাতে চাই না, তাই।"

"আপনার যেটা ভাল মনে হবে তাই দেবেন। কাজটা কী তাই বলুন।"

পেপারওয়েটটা মুঠোয় চাপলেন এ পি সাহেব। তারপর বললেন, "আমি জানি একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আপনি বিষয়টা গোপন রাখবেন। জলপাইগুড়িতে আমাদের বিশেষ সম্মান আছে। আমার বাবার কথা তো আপনার জানাই আছে।"

"আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন।"

"বেশ। আমার এক মামাতো ভাইয়ের ছেলের নাম সন্দীপ। সেই ভাই হঠাৎ অকালে মারা যায় বলে আমরা তার স্ত্রী আর সন্তানকে দেখাশোনা করতাম। ছেলেটি স্কুলে যখন পড়ত তখন পড়াশুনায় বেশ ভাল ছিল। কিন্তু স্কুল ছাড়ার পর থেকেই ও রেজাল্ট খারাপ করতে শুরু করে। স্কুলের রেজাল্ট ভাল ছিল বলে ওকে কলকাতার কলেজে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু সেখানে ভাল লাগছে না বলে

ফিরে এসে এখানকার কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু ইদানীং তার কথাবার্তা, চালচলন দেখে ওর মায়ের সন্দেহ হচ্ছে ও সুস্থ জীবনযাপন করছে না।"

"কী দেখে মনে হচ্ছে ওঁর?"

"বেশিরভাগ দিন কলেজে যায় না। দুপুরটা বাড়িতে ঘুমোয়। সন্ধেয় বের হয়ে রাত একটা-দুটোর সময় ফেরে। জিজ্ঞেস করলে বলে, কাজ ছিল।"

"আপনি ওর সঙ্গে কথা বলেছেন?"

"আমার সঙ্গে প্রথমে দেখা করতে চায়নি। এড়িয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত যখন মুখোমুখি হয়েছে তখন একটাই জবাব দিয়েছে, ওর কিছুই হয়নি। কিন্তু মুখচোখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আমার কাছ থেকে চলে যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে।"

এত সামান্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা কখনও ভাবেনি অর্জুন। কলকাতার যে অফিস তাকে চাকরির প্রস্তাব দিয়েছে তারা হয়তো এসব কেস নিয়েই ডিল করে। সেটা করতে ইচ্ছে নেই বলেই ওদের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে সে।

এ পি সাহেব বললেন, "অথচ সন্দীপের কোনও ইচ্ছে অপূর্ণ রাখিনি আমরা।"

"সন্দীপের বাড়ি কোথায়?"

"রেসকোর্সে। ওখানে ওকে সবাই চেনে।"

"ঠিক আছে। আমি দেখছি। আপনি ওর মাকে আমার কথা বলে রাখবেন।"

অর্জুন উঠে পড়ল। এ ধরনের কাজ নিতে তার অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এ পি সাহেবের মুখের ওপর না বলতে পারল না।

চলে যাচ্ছিল অর্জুন, এ পি সাহেব ডাকলেন, "অর্জুন!"

অর্জুন পেছনে তাকাল। এ পি সাহেব বললেন, "জলপাইগুড়ির বদলে তুমি কলকাতায় চলে আসছ না কেন? আমি তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারি।"

"আমার চাকরি করার ইচ্ছে নেই। তাই।"

"চাকরি কেন, তুমি নিজেই প্র্যাকটিস করবে ওখানে।"

"বেশ তো। আপনি একটু আগে দক্ষিণার কথা বলছিলেন, সন্দীপের সমস্যাটা যদি জানতে পারি তা হলে আপনার সাহায্য নেব।" অর্জুন বেরিয়ে এল।

প্র্যাকটিস! উকিল ডাক্তাররাই এদেশে প্র্যাকটিস করে থাকেন। হ্যাঁ, সেই অর্থে একজন সত্যসন্ধানী তো প্র্যাকটিস করতেই পারেন। অর্জুনের মনে হল এখনও দুপুরের দেরি আছে যখন, তখন সন্দীপবাবুর সঙ্গে দেখা করা যেতেই পারে।

রেসকোর্স পাড়ায় ওদের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। এখন এই শহরে একটাই মুশকিলে পড়তে হয়। বেশিরভাগ লোক তাকে ঘুরে-ঘুরে দ্যাখে। পোস্ট অফিসেও তাই হয়েছিল। এখানে সন্দীপের বাড়ির খোঁজ করতেই তিনটে ছেলে এগিয়ে এল, "সন্দীপের বাড়িতে যাবেন অর্জুনদা, আসুন, নিয়ে যাচ্ছি।"

অর্থাৎ এরা তাকে চেনে। একটু এগোতেই একজন জিজ্ঞেস করল, "ওদের বাড়িতে কি কোনও রহস্য উদ্ধার করতে যাচ্ছেন?"

"কেন? ওদের বাড়িতে রহস্য আছে নাকি? সন্দীপ তোমাদের বন্ধু?"

"না। ও আমাদের সঙ্গে মেশে না।"

বাড়িটা চিনিয়ে দিয়ে ছেলেগুলো চলে গেল। সামনে চিলতে বাগান, পেছনে তিনতলা বাড়ি। একটা কাজের লোক গেটের সামনে দাঁড়িয়ে জানাল সন্দীপ এখন বাড়িতে নেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওর মা আছেন?"

এই সময় এক মধ্যবয়সী মহিলা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন, "কী চাই?" অর্জুন ওপরের দিকে তাকায়, "আমাকে এ পি সাহেব আসতে বলেছেন।"

"ওহো, আসুন আসুন।" ভদ্রমহিলা চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

মিনিট তিনেকের মধ্যে অর্জুন এবং সন্দীপের মা মুখোমুখি। অর্জুনের সঙ্গে কথা বলছিলেন ভদ্রমহিলা। এ পি সাহেব ইতিমধ্যে টেলিফোনে ওঁকে জানিয়ে দিয়েছেন অর্জুনের কথা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি ওকে কখনও জিজ্ঞেস করেছেন ওর কী সমস্যা?"

"কতবার। বলতেই চায় না।"

"আপনার সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করে?"

"ব্যবহার? কথাই বলতে চায় না। আগে টাকাপয়সা চাইত, এখন তাও চায় না। আমি যেচে দিতে গেলে বলে, দরকার নেই। এই একটু বাদে ফিরবে। স্নান-খাওয়া শেষ করে ঘুমোবে। সন্ধের পর আবার বেরিয়ে যাবে। ফিরবে মাঝরাতে। চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি।"

"ওর বন্ধুদের আপনি চেনেন?"

"আগে চিনতাম। এখন কে বন্ধু জানি না। কেউ বাড়িতে আসে না।" ভদ্রমহিলা বললেন, "এর ওপর এক জ্বালা হয়েছে। একটা কালো বেড়াল নিয়ে এসেছে কোত্থেকে। অন্ধকারে বেড়ালটার চোখ জ্বলে। ঘরের ভেতর খাঁচায় পুরে রেখেছে, বাইরে বেরুতে দেয় না। কিন্তু মাঝে-মাঝে রাত্রে ও বেড়ালটাকে নিয়ে বাইরে যায়।"

"বেড়ালটাকে ঘরের বাইরে যেতে দেয় না?"

"না। কাজের লোক বলেছে ও নাকি বেড়ালটার সঙ্গে কথা বলে, কীসব ট্রেনিং দেয়। বেড়ালটাকে দেখলেই আমার বুকের ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।"

"আপনার ছেলে এখন ফিরবে বললেন। ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"না, না। এখনই ওর সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। আপনি খোঁজখবর নিন। যদি বাইরে থেকেই খবর পেয়ে যান, তা হলে খুব ভাল হয়।"

"আপনি ওকে ভয় পাচ্ছেন?"

"তা পাচ্ছি। আপনাকে ওর পেছনে লাগিয়েছি জানলে প্রচণ্ড অশান্তি করবে।

খুব রাগী। আমি একবার দাদাকে ডেকে এনেছিলাম বলে ও শাসিয়েছে, দ্বিতীয়বার ওরকম করলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।"

"বেশ। প্রয়োজন না হলে কথা বলব না। ওর একটা ছবি দেখতে পারি?"

ভদ্রমহিলা ঘর থেকে একটা ফোটোগ্রাফ এনে দিলেন। ঝকঝকে দেখতে এক তরুণ। কোথাও মালিন্য নেই। ছবিটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে সে আবার দেখল। কীরকম চেনা-চেনা লাগছে ছেলেটাকে।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞেস করলেন, "কদ্দিনের মধ্যে ওর সত্যিকারের খবর দেবেন?"

অর্জুন হেসে ফেলল, "দেখি। তবে ওই সত্যিকারের খবর শুনে আপনার যদি ভাল না লাগে? যাকগে, ওর বেড়ালটা কি এখন বাড়িতেই আছে?"

"হ্যাঁ।"

"একটু দেখা যেতে পারে?"

ভদ্রমহিলা ইতস্তত করলেন, "বেড়ালটাকে ও ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। ঘর অন্ধকার করে রাখে সবসময়। আমাকে নিষেধ করেছে ওই ঘরের দরজা খুলতে। আপনি কাচের জানলা দিয়ে দেখতে পারেন।"

ভদ্রমহিলা অর্জুনকে নিয়ে এলেন দোতলার একটি ঘরের সামনে। ঘরের দরজা বন্ধ। তালা দেওয়া নয়, ছিটকিনি তোলা আছে। ওপাশে একটি কাচের জানলা। ভদ্রমহিলা সেখানে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, "ওই যে, ওই যে।"

অর্জুন দ্রুত জানলার সামনে গেল। বন্ধ জানলার ওপাশে ঘরের কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। শুধু অন্ধকারে দুটো চোখ জ্বলছে। চোখ দুটো তাদের লক্ষ করছে বোঝা গেল। রাত্রে এমন জ্বলন্ত চোখ দেখলে যে কেউ ভয় পেতে বাধ্য।

"ওকে কি বেঁধে রাখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ। চেন দিয়ে বাঁধা থাকে।"

"চলুন।" অর্জুন পা বাড়াল।

বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিল অর্জুন। রেসকোর্স ছাড়িয়ে পোস্ট অফিসের মোড়ের কাছে পৌঁছতেই আচমকা মনে পড়ে গেল। বাইক ঘুরিয়ে পোস্ট অফিসের সামনে পৌঁছে দেখল ওই ছেলে চারটে এবং তাদের বাইক নেই। একটু এগোতেই জনার্দনকে দেখতে পেল। একগাল হাসল জনার্দন, "আপনি আবার ফিরে এলেন?"

"ওই ছেলেগুলো কোথায় গেল দেখেছ?"

চোখ ঘুরল জনার্দনের, "কাদের কথা বলছেন?"

"ওই যারা বাইক নিয়ে আড্ডা মারছিল। যাদের কথা তুমি—।"

অর্জুনকে শেষ করতে দিল না জনার্দন, "একটু আগে পাণ্ডাপাড়ার দিকে চলে গেল ওরা। আমাকে এর মধ্যে জড়াবেন না সার।"

অর্জুন বুঝতে পারল কেন তার তখন ছবি দেখে মনে হয়েছিল বেশ চেনা-

চেনা। তাকে যখন ছেলেগুলো আওয়াজ দিচ্ছিল তখন যে ছেলেটা বলেছিল, দুর জেম্‌স বন্ড বুড়ো হয়ে গেছে, বল জেম্‌স বন্ডের নাতি, তার সঙ্গে ছবির খুব মিল রয়েছে। ভুল না করলে ওটা সন্দীপেরই ছবি। অর্জুনের মনখারাপ হয়ে গেল। এ পি সাহেবের আত্মীয় যে কুসংসর্গে পড়েছে তা আবিষ্কার করতে তার কয়েক ঘণ্টাও লাগল না। এই মফস্বল শহরের রহস্যকাহিনী তেমন জোরালো হয় না। সে ঠিক করল সন্দীপের মাকে কিছু জানাবে না। এ পি সাহেবকে বলে দিলেই ল্যাটা চুকে যায়।

বাড়ি ফেরার সময় অর্জুনের মনে হল, এ পি সাহেব বিচক্ষণ মানুষ। এই শহরে তাঁর আত্মীয় মোটরবাইক নিয়ে তিন বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা মারছে দিনের পর দিন, এ তথ্য নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নয়। তিনি নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়ে জেনেছেন সন্দীপের এই বন্ধুদের পরিচয় কী? আর যদি তা জেনে থাকেন তা হলে কেন অর্জুনকে এই দায়িত্ব দিলেন? সে ঠিক করল আজই লাঞ্চের পর সে এ পি সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলবে।

বাড়ি ফেরামাত্র মা বলল, "তোর চিঠি এসেছে।"

খামটা নিল অর্জুন। বিদেশি খাম।

খাম খুলে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সে। মেজর চিঠি লিখেছেন। সেই মেজর। কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব আর মেজর। যে মেজর এখন থাকেন আমেরিকায়। মেজর চিঠি লিখেছেন ইংরেজিতে।

অনেকদিন হয়ে গেল মেজরের সঙ্গে অর্জুনের কোনও যোগাযোগ নেই। সেই যে সুধামাসির সঙ্গে আমেরিকায় গিয়ে মেজরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওটাই শেষ দেখা। মেজর মানেই রহস্য, ছুটোছুটি। চিঠিটা বাংলায় তর্জমা করলে এমন দাঁড়ায়, "কী হে? ব্যাপারটা কী তোমাদের? ভদ্রতা করে দুটো লাইন লিখলেও তো পারো! তোমার বয়সে লেখাটেখার অভ্যেস নেই কিন্তু এটা বলে রাখাই বদ অভ্যাস। তোমার বয়সে কোনও খারাপ অভ্যেস শুরু করা ঠিক নয়। গতকাল তোমার সিনিয়ারকে ফোন করেছিলাম, কোনও সাড়াশব্দই পেলাম না। তোমাকে একটা সুখবর দিচ্ছি। বিষ্টুসাহেব এখন বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। তিনি প্রায়ই বলেন কালিম্পঙে যাবেন। তাঁর কুকুরের সমাধির পাশে বসে প্রার্থনা করবেন। বোঝো!

"আমরা যাচ্ছি। ইয়েস। জলপাইগুড়িতে যাচ্ছি। সঙ্গে একটি সত্তর বছরের যুবক থাকবে। অতএব তুমি এই জানুয়ারি মাসে জলপাইগুড়ির বাইরে পা বাড়িও না। নতুন শতাব্দীতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বলে আনন্দে অনেকটা লিখে ফেললাম। পৃথিবীর সব ভালবাসা তোমার ওপর বর্ষিত হোক।—মেজর।"

চিঠির তারিখ লক্ষ করল অর্জুন। বারোদিন আগে লেখা। আমেরিকা থেকে জলপাইগুড়িতে পৌঁছতে এই খামটার বারোদিন লেগে গেল। মাস শেষ হতে তো বেশি দেরি নেই। অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল।

মেজর একা আসছেন না, সঙ্গে যিনি আসছেন তাঁর বয়স সত্তর। ওঁর স্বভাবমতো সঙ্গীর পরিচয় উনি দেননি। এঁদের সঙ্গে আসছেন কিনা তা লেখেননি মেজর। বিষ্টুসাহেব খুব ভালমানুষ। প্রায় সাহেব কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ভালবাসেন।

মাকে খবরটা দিল অর্জুন। মা বলল, "আমি ওপাশের ঘরটা ঠিকঠাক করে রাখছি, তুই ওদের বাড়িতেই নিয়ে আয়।"

"না মা। বাড়িতে ওঁদের ভাল লাগবে না। মেজরের সঙ্গে আর-একজন বৃদ্ধ আসছেন। বোধ হয় তিনি আমেরিকান। আমাদের খাওয়াদাওয়া তাঁর সহ্য হবে না।"

"জলপাইগুড়ি শহরের কোন হোটেল ওঁদের সাহেবদের খাবার খেতে দেবে? তুই তো বলিস ভাল হোটেলগুলো সব শিলিগুড়িতে।"

"ঠিক। হয়তো ওঁরা শিলিগুড়িতেই থাকবেন।"

এখন দুপুর নয়, আবার বিকেলও নামেনি। অর্জুন বাইক নিয়ে বের হল এ পি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। জীবনদার বই-এর সামনে পৌঁছতেই সে লোকটাকে দেখতে পেল। ঊর্ধ্বমুখী হয়ে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। লম্বা দাড়িতে সাদা ছোপ, চিনতে দেরি হল না। বাইকটা পাশে দাঁড় করিয়ে অর্জুন বলল, "কেমন আছেন গোরক্ষনাথবাবু?"

লোকটা চমকে তাকাল। মাথা নাড়ল, "চেনা গেল না তো!"

"আমি অর্জুন। হাকিমপাড়ার অমল সোমের বাড়ির হারুকে আপনি তিনটে পশুপাখি জোগাড় করতে বলেছিলেন। তারপর গিয়েছিলেন সেনপাড়ার মিত্তিরদের বাড়িতে।"

"এইবার মনে পড়েছে। সেদিন কত চেষ্টার পর সেনবাবুর আত্মা বিদায় নিয়েছিলেন। তা আপনি তো শেষ পর্যন্ত ওখানে থাকেননি।"

"আমি ব্যাপারটাকে বিশ্বাস করি না।"

"যে ভূতে বিশ্বাস করে না তার ভগবানেও বিশ্বাস করা উচিত নয়। দু'জনকেও তো সাদা চোখে দেখা যায় না।"

"আপনি সেই ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন এখনও?"

"দেখুন, আপনি আমার বিশ্বাসে আঘাত করছেন।"

"ঠিক আছে, ওই গাছের দিকে কেন তাকিয়ে ছিলেন?"

"ওই মগডালে একটা কানা কাক বসে আছে। ব্যাটা জন্ম থেকে কানা কিনা তাই ঠাওর করছিলাম।"

"আপনি সেটা এত নীচ থেকে বুঝতে পারেন?"

"দেখে-দেখে মানুষের অভিজ্ঞতা হয়। রুগির মুখ দেখে শুনেছি বিধান রায় বলে দিতেন কী অসুখ হয়েছে। আচ্ছা, নমস্কার।" হাতজোড় করল গোরক্ষনাথ।

"আপনি কোথায় থাকেন গোরক্ষনাথবাবু?"

"আজ্ঞে, তিস্তা ব্রিজের কাছে।"

"আপনার প্রেতাত্মারা কাদের ভয় পায় যেন?"

"ওই যে বলেছিলাম। একটা কানা কাক, যে জন্ম থেকে কানা; একটা খোঁড়া শকুন, যে জন্ম থেকে খোঁড়া; আর একটা কুচকুচে কালো বেড়াল, যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে। আমাদের চারপাশে সবসময় যেসব আত্মা ঘুরে বেড়ায়, এরা তাদের দেখতে পায়। আপনার বিশ্বাস না হলে পরখ করে দেখতে পারেন।" চোখ বন্ধ করল গোরক্ষনাথ।

॥ ২ ॥

এ পি সাহেব অফিসে ছিলেন না। জরুরি খবর পেয়ে ডুয়ার্সের চা-বাগানে চলে গিয়েছেন। ওঁর সঙ্গে দেখা হল না কিন্তু কথাগুলো বলা দরকার ছিল। সন্তুদার টেবিলে বসে কিছুক্ষণ ওঁকে কাজ করতে দেখল অর্জুন। একসময় জলপাইগুড়ির টাউন ক্লাবের নামী ফুটবলার ছিলেন সন্তুদা। এখনও শরীর ঠিক রেখেছেন। কাজ শেষ করে সন্তুদা জিজ্ঞেস করলেন, "চা খাবে?"

মাথা নাড়ল অর্জুন, "এ পি সাহেবকে বলবেন, উনি যে সমস্যার কথা বলেছেন সেটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আমি সেটাই বলতে এসেছিলাম।"

"তাই? ঠিক আছে বলে দেব।" সন্তুদা এক মুহূর্ত ভাবলেন, "তোমার সঙ্গে সন্দীপের কি দেখা হয়েছে? বোধ হয় হয়নি, তাই না?"

"ওকে আমি দেখেছি। আচ্ছা চলি।"

"দাঁড়াও। এ পি সাহেব বলে গিয়েছেন তোমার যদি গাড়ির দরকার হয় তা হলে ব্যবস্থা করে দিতে। অথবা অন্য কোনও সাহায্য—।"

"না। তার দরকার নেই। ছেলেটা খারাপ সংসর্গে পড়েছে। ওর বন্ধুদের তো সবাই চেনে। খুব বড় কিছু খারাপ করে ফেলার আগে ওকে সরিয়ে ফেলা দরকার, ব্যস, এইটুকু।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

সন্তুদা বললেন, "তুমি বলছ, আমরাও জানি। কিন্তু ওর বন্ধুরা এই শহরের মানী এবং বড়লোকের ছেলে। তাদের খারাপ ছেলে বলা খুব সহজ নয়।"

এই সময় অর্জুন সন্দীপকে অফিসে ঢুকতে দেখল। প্রায় ঝড়ের মতো সে এগিয়ে গেল কর্মরত এক ভদ্রলোকের সামনে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, "আপনাদের মালিক অফিসে নেই?"

লোকটি উঠে দাঁড়াল, "না, সাহেব বাগানে গিয়েছেন।"

"কবে ফিরবেন?"

"আগামীকাল।"

"ননসেন্স!"

সন্তুদা গলা তুলে ডাকলেন, "সন্দীপ, এদিকে এসো।"

সন্দীপ রাগী চোখে তাকাল, "আপনি আমাকে জ্ঞান দিতে আসবেন না!"

সন্তুদা হাসলেন, "কী আশ্চর্য? খামোকা জ্ঞান দিতে যাব কেন? তুমি হঠাৎ এত উত্তেজিত হয়ে উঠলে, আফটার অল এটা তো অফিস।"

সন্দীপ কয়েক পা এগিয়ে এল, "আপনি ওঁকে বলে দেবেন আমার পেছনে লোক লাগিয়ে কোনও লাভ হবে না।"

"তোমার পেছনে উনি লোক লাগাবেন কেন?"

"লাগিয়েছেন, সেই লোক মায়ের সঙ্গে কথা বলে এসেছে। আরে, সব জায়গায় আমার অ্যান্টেনা ফিট করা আছে।"

"তুমি ভুল করছ। লোক নয়। তুমি কি ওঁকে চেনো না?" অর্জুনকে দেখিয়ে দিল সন্তুদা। চোখ ছোট করে অর্জুনকে দেখল সন্দীপ। তারপর হেসে বলল, "এঁকে কে না চেনে! ইনি গোয়েন্দা। তা হলে আপনাদের সাহেব আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছে। চমৎকার। এই যে, শুনে রাখুন, আপনি যত বড় গোয়েন্দা হন, আমার পেছনে ঘুরে কোনও লাভ হবে না। দ্বিতীয়বার যেন আপনার ছায়াও আমার বাড়িতে না পড়ে। আন্ডারস্ট্যান্ড?" কথা শেষ করে হনহন করে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

ওর চলে যাওয়াটা দেখলেন সন্তুদা। তারপর বললেন, "ভুল হল। তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেওয়াটা ঠিক হল না।"

"সেটা আজ না হলেও কাল তো জানতেই পারত। আচ্ছা, চলি।"

চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্সে অনেকদিন বাদে রামদাকে কাউন্টারে দেখল অর্জুন। ইদানীং অসুস্থতার জন্যে ভদ্রলোক খুব কম বাড়ি থেকে বের হন। এই সময় দোকানে ভিড় নেই। অর্জুনকে দেখে ওঁর পেটেন্ট হাসিটা হাসলেন, "কী খবর?"

"কেমন আছেন রামদা?"

"এই, চলছে। বসুন। চা চলবে?"

বয়সে অনেক বড় তবু ভদ্রলোক তাকে আপনি বলেন। এরকম পরিষ্কার মানুষ খুব কম দেখেছে অর্জুন। কাউন্টারের ভেতরে একটা চেয়ার খালি থাকেই, অর্জুন সেটায় বসল। বিভিন্ন অসুখের জন্যে ওষুধ কিনতে মানুষ আসে উদ্বেগ নিয়ে, দেখতে দেখতে ভাল অভিজ্ঞতা হয়। একজনকে ওষুধ বিক্রি করে রামদা বললেন, "আজ সকালে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি।"

"কীরকম?" অর্জুন তাকাল।

"ডিসপোজাল সিরিঞ্জ কিনছে লোকে। একসঙ্গে এক ডজন।"

"শুধু সিরিঞ্জ? ইনজেকশনের অ্যাম্পুল?"

"না। শুধু সিরিঞ্জ। আর যারা কিনছে তাদের এর আগে কখনও দেখিনি। অবশ্য আমি এখন দোকানে বসি না, ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

"কত সিরিঞ্জ বিক্রি করেছেন আজ?"

"আশিটা। স্টকেও বেশি নেই। ভাবছি এর পর শুধু সিরিঞ্জ চাইলে বিক্রি করব না।"

"প্রেসক্রিপশন ছাড়া সিরিঞ্জ বিক্রি করতে পারেন?"

"হ্যাঁ। এ নিয়ে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।"

"এত সিরিঞ্জ নিয়ে ওরা কী করতে পারে?"

"জানি না ভাই। একজন তো কেনেনি, তা হলে বুঝতাম স্টক করছে।"

রামদা আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন খদ্দের আসায়। অর্জুনের অস্বস্তি হচ্ছিল। টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনের চটি বই খুলে শহরের অন্য মেডিক্যাল স্টোর্সের নাম্বার বের করে তার একটায় ডায়াল করল, "আচ্ছা, আপনার কাছে ডিসপোজাল সিরিঞ্জ কত আছে?"

"বেশি নেই। আজ হঠাৎ পাবলিক দশ-দশটা করে কিনে নিয়ে গেছে।"

টেলিফোন রেখে দিল অর্জুন। রামদার হাত খালি হলে সে বলল, "ব্যাপারটা স্বাভাবিক নয় রামদা। শুধু আপনার দোকান থেকে নয়, শহরের অন্য দোকান থেকেও সিরিঞ্জ কেনা হয়েছে। তার মানে এর পেছনে একটা পরিকল্পনা কাজ করছে। আপনার উচিত পুলিশকে জানানো।"

"পুলিশকে?"

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, তাই না?"

"তা তো বটেই। কিন্তু পুলিশকে জানানো মানে হাজার ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া। ঠিক আছে, তুমি বলছ, আমি থানায় ফোন করছি।" নাম্বার বের করে রামদা থানায় ফোন করলেন। বড়বাবুকে চাইলেন। শুনলেন বড়বাবু এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন। মেজবাবু ফোন রেখে তাঁকে ঘটনাটা বলবেন। রিসিভার নামিয়ে রেখে রামদা হাসলেন, "কী বলল জানেন? সিরিঞ্জ বিক্রি হয়েছে এতে তো আপনার খুশি হওয়া উচিত। এখন মানুষ আর ট্যাবলেটে ভরসা পায় না, ডাইরেক্ট ইনজেকশন নিয়ে অসুখ সারায়। ডিসপজাবেল সিরিঞ্জ ব্যবহার করছে মানে শরীর-সচেতনতা বেড়েছে। এ নিয়ে আপনি নালিশ করতে চাইছেন?"

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আপনি আপনার কর্তব্য করেছেন রামদা। চলি।"

বাইকে উঠে এঞ্জিন চালু করতেই অর্জুন দেখতে পেল উদভ্রান্তের মতো হাবু দু'পাশে তাকাতে তাকাতে হাঁটছে। এ-সময় হাবুর এখানে আসার কথা নয়। অমল সোম ওকে বাড়ির দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। বাজার করা ছাড়া ও বাড়ির বাইরে যায় না। তা ছাড়া বোবা এবং কালা বলে পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশাও করতে পারে না। দেখামাত্র হাবু ছুটে এল তার কাছে। তারপর হাত নেড়ে চোখ ঘুরিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের করে উত্তেজনা প্রকাশ করল।

এমনিতে হাবুর ইশারা বুঝতে পারে অর্জুন। কিন্তু ও এত উত্তেজিত যে, কিছুই বোধগম্য হচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত সে এই অনুমানে পৌঁছল যে, বাড়িতে এমন কোনও গোলমাল হয়েছে যে, হাবু তার সাহায্যের জন্যে ছুটে আসতে বাধ্য হয়েছে। সে ইশারায় হাবুকে বাইকের পেছনে উঠে বসতে বলল।

হাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। ওর শরীর তাগড়া এবং প্রচুর শক্তি ধরে। কিন্তু বাইকের পেছনে যেভাবে উঠে বসে নড়বড় করতে লাগল তাতে অর্জুন বিপাকে পড়ল। কীভাবে বসতে হবে দেখিয়ে দিয়ে সে বাইক চালু করল। অর্জুন অনেকবার অমল সোমকে প্রশ্ন করতে গিয়েও করেনি। এত লোক থাকতে তিনি হাবুর মতো বোবা কালা মানুষকে কেন বাড়ির পাহারাদার হিসেবে রেখেছেন! অমলদা যখন ছিলেন তখন হাবু রান্নাও করত। সে যে খুব রাগী এবং শক্তিশালী, এটা প্রচারিত হওয়ায় কোনও অবাঞ্ছিত আগন্তুক ওই বাড়িতে ঢোকার সাহস পায় না। হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে হাবু যেভাবে তার বাইকের পেছনে বসে আছে তা দেখে রাস্তার লোকজন হাসছে। কোনওমতে ওকে নিয়ে অর্জুন হাকিমপাড়ায় চলে এল।

বাড়ির সামনে বাইক দাঁড় করানোর পরও হাবুকে নামতে দেখা গেল না। অর্জুন তাকে নামতে বলে নিজে নেমে দাঁড়াল। হাবু বসে আছে চোখ বন্ধ করে। এবং তারপর বোঝা গেল ওর পা অসাড় হয়ে গেছে। ধরে ধরে মাটিতে নামানোর পরও বসে পড়ছিল। গেট খুলে ভেতরে ঢুকে অর্জুন দেখল বাইরের ঘরের দরজা বন্ধ। বাগানটা আগের মতো সুন্দর হয়ে আছে। তা হলে গোলমাল কীসের।

ততক্ষণে হাবু ধাতস্থ হয়েছে। ওকে ইশারায় ডেকে নিয়ে এল খিড়কি দরজায়। সেটা ঠেলে ভেতরে ঢোকার পর দেখা গেল উঠোন বারান্দা জুড়ে সুটকেস বাক্স প্রায় পাহাড়ের মতো পড়ে আছে। এবং তখনই গর্জন কানে এল। বিকট শব্দে নাক ডাকছে কারও। যেখান থেকে শব্দটা ভেসে আসছে সেটা অমল সোমের শোয়ার ঘর। অর্জুন সেই ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে গেল।

মেজর অমল সোমের খাটে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। তাঁর দাড়ি গোঁফের জঙ্গল থেকে আওয়াজটা প্রচণ্ড জোরে বের হলেও তিনি তা শুনতে পাচ্ছেন না। কোনও হুঁশই নেই তাঁর।

এতক্ষণে পরিষ্কার হল। মেজরকে হাবু চেনে। তিনি মালপত্র নিয়ে এসে পড়ায় দরজা খুলে দিয়ে সে ছুটেছে অর্জুনকে খবর দিতে। আর এই অবসরে মেজর একটু বিশ্রাম করে নিচ্ছেন।

মেজর যে এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বেন, অর্জুন ভাবেনি। আর জলপাইগুড়ি শহরে এলে উনি সোজা অমল সোমের বাড়িতে চলে আসবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই বাড়িতে ওঁর পক্ষে কি থাকা সম্ভব? নিজের বাড়ি বলে অমল সোম যা মেনে নেন তা মেজরের পক্ষে বেশ কষ্টকর হবে। অসল সমস্যা হবে খাওয়াদাওয়া নিয়ে। হাবুর হাতের রান্না উনি খেতে পারবেন বলে মনে হয় না।

মেজরকে নাক ডাকতে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাবু দাঁড়িয়ে ছিল মালপত্তরের পাশে। হাত তুলে দুটো আঙুল দেখাল। তারপর একটা আঙুল ঘরের দিকে নির্দেশ করে দু'হাত ওঠালো। বুঝতে পারল অর্জুন। দু'জন এসেছে বলে হাবু জানাচ্ছে। মেজরের চিঠিতেও তো ওই খবর ছিল। ওঁর সঙ্গে এক বৃদ্ধের আসার কথা। তিনি কোথায় গেলেন? উঠোনের আশেপাশে তিনি নেই। অর্জুন মালপত্তরগুলো দেখল। এতসব সঙ্গে কেন এনেছেন তা মেজরের সঙ্গে কথা না বললে জানা যাবে না। একটা ঢাউস সুটকেসের দিকে নজর গেল। দেখেই বোঝা যায় খুব দামি সুটকেস।

হ্যান্ডেলের সঙ্গে একটা ট্যাগ লাগানো রয়েছে, তাতে লেখা, গোরান স্যলম্যান। অর্জুন আবার চারপাশে তাকাল, না, গোরানসাহেবের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সে ইশারায় হাবুকে ওখানে থাকতে বলে বাগানের দিকে এগোল।

অমল সোমের বাড়ির ভেতরের বাগানটা প্রায় এক বিঘে জমির ওপর। বড় বড় আম কাঁঠাল নারকেল এবং সুপুরি গাছ প্রায় জঙ্গলের চেহারা নিয়ে নিয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে অমলদার অবর্তমানে হাবু এদিকটায় বেশি নজর দেয়নি।

খানিকটা এগোতেই অর্জুনের কানে এল ওদিকের গাছে গাছে পাখিরা প্রবল স্বরে চেঁচিয়ে চলেছে। এরকম কাণ্ড সাধারণত শত্রু দেখলে ওরা করে থাকে। অর্জুন সেদিকেই এগোল। খানিকটা যেতেই সে মানুষটাকে দেখতে পেল। তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে কিছু দেখছেন। জিনিসটা লোকটির হাতে ধরা। অর্জুন ডাকল, "হ্যালো।"

গোরান স্যলম্যান ঘুরে দাঁড়ালেন। ওঁর বাঁ হাতের মুঠোয় হাত তিনেক লম্বা সাপের মাথা শক্ত করে ধরা। মানুষটির বয়স হলেও শরীরে যে ভাল শক্তি আছে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। চোখের মণি নীল এবং দৃষ্টি অত্যন্ত শীতল। সাপটা লেজ নাড়ছিল। এটি একটি পরিণত বয়সের শঙ্খচূড়, তা একবার দেখেই বুঝতে পারল অর্জুন। এই বিষধর রাগী সাপটাকে ভদ্রলোক খালি হাতে ধরলেন।

"ওয়েলকাম। দিস ইজ অর্জুন।"

"গোরান, গোরান স্যলম্যান।"

"এরকম একটা বিষধর সাপ আপনি খালি হাতে ধরলেন?" ইংরেজিতে প্রশ্ন করল অর্জুন। গোরানসাহেব কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর মুঠোর চাপ বাড়ালেন। হঠাৎ সাপটা স্থির হয়ে গেল এবং ওর মুখ থেকে তরল কিছু বেরিয়ে আসতেই গোরানসাহেব কিছুটা দূরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। বাঁ হাতের মুঠোর চাপে একটা প্রমাণ সাইজের শঙ্খচূড় সাপকে মেরে ফেলা সহজ ব্যাপার নয়!

প্রথমে গাছের পাতা ছিঁড়ে আঙুলগুলো মুছলেন গোরানসাহেব। এই সময় গোটা তিনেক কাক উড়ে গিয়ে নামল সাপটার পাশে। ওটা মরে গিয়েছে বুঝতে পেরে শরীরের তিন জায়গায় তিনজন ঠোকর দিচ্ছিল আর ভয়ে ভয়ে দু'জন মানুষের দিকে তাকাচ্ছিল। অর্জুন গোরানসাহেবের দিকে তাকাল। ওঁর মুখ হাঁ

হয়ে গিয়েছে। জিভ সামান্য বেরিয়ে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। দেখলেই অস্বস্তি হয়। কাকেদের সাপ খাওয়া দেখে উনি এরকম উত্তেজিত হলেন কেন?

অর্জুন বলল, "আপনারা অনেকটা জার্নি করে এসেছেন, চলুন, ভেতরে চলুন।"

গোরানসাহেব ওর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "তুমি যাও, আমি একটু পরেই আসছি।"

এই কথার পর দাঁড়িয়ে থাকা অসভ্যতা। অর্জুন ধীরে ধীরে উঠোনে ফিরে এল। কিন্তু কাকের সাপ খাওয়া দেখার সময় গোরান সাহেবের মুখের অভিব্যক্তি তাকে স্বস্তি দিচ্ছিল না।

হাবু দাঁড়িয়ে আছে, যেমন ছিল। ঘরের ভেতর থেকে নাক ডাকার শব্দ ভেসে আসছে। অর্জুন এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ল। দ্বিতীয়বারের আওয়াজটা তীব্র হওয়ায় আচমকা নাসিকাগর্জন থেমে গেল। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ শুয়ে থাকার পর মেজরের হাত বিছানার ওপর কিছু খুঁজতে চাইল। চশমাটাকে পাওয়ার পর চোখে এঁটে উঠে বসলেন তিনি, তারপর পরিষ্কার বাংলায় চিৎকার করলেন, "কে রে?"

"আমি, অর্জুন।"

তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পড়লেন মেজর। তারপর অদ্ভুত শব্দ করে দৌড়ে এসে অর্জুনকে জড়িয়ে ধরলেন, "ও তুমি? দ্য গ্রেট মধ্যমকুমার। ওঃ, কতদিন পরে তোমার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি। কোনও পারফিউম মাখোনি বলে গন্ধটাকে জেনুইন লাগছে। নিউজিল্যান্ডের সমুদ্রে একধরনের রেয়ার টাইপের সিলমাছের গায়ে এরকম গন্ধ পেয়েছি।"

অর্জুন হতভম্ব। কী বলছেন ভদ্রলোক? তার আর সিলমাছের শরীরের গন্ধ এক? সিলমাছের ঘাম হয় নাকি? একে ঠাণ্ডার দেশের প্রাণী, তার ওপর জলে থাকে, মেজর কী করে গন্ধের খবর পেলেন জিজ্ঞেস করলে অন্য কথা বলা যাবে না।

"আপনি যে তাড়াতাড়ি এসে যাবেন, ভাবিনি! চিঠি পেয়েছি।"

"চিঠি লেখার পর এখানে আসার জন্যে উত্তেজনা বেড়ে গেল। তারপর ওই বিষ্টুসাহেব, সকাল দুপুর বিকেলে টেলিফোনে জ্বালিয়ে গেছেন। বুঝলে, জ্বলে গিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। এখানে এসে দেখি মিস্টার সোম নেই। এ ব্যাটা হাবু তো কোনও কথাই বোঝে না। আচ্ছা, তুমিই বলো, কোনও বুদ্ধিমান লোক ওইরকম কেয়ারটেকারের ওপর বাড়ির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে বাইরে যায়?" মেজর কথা বলছিলেন চেঁচিয়ে।

"বুদ্ধিমান বলেই বোধ হয় উনি যেতে পারেন।"

"অ্যাঁ? ওহো, হো, হো, হো।" হাসিতে ফেটে পড়লেন মেজর।

তিনি শান্ত হলে অর্জুন প্রশ্ন করল, "বিষ্টুসাহেব এসেছেন?"

"ইয়েস। বাগডোগরায় নেমে আর তর সইল না। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কালিম্পং

চলে গেলেন। সমাধিতে শুয়ে ওঁর কুকুরটা নাকি কেঁদেই চলেছে, না গেলে শান্ত হবে না। যাক গে, এখন কী করি বলো!"

"এখানে থাকার ব্যাপারে বলছেন?"

"ইয়েস। মিস্টার সোম বাড়িতে নেই অথচ আমরা দখল করে বসে রইলাম, এটা তো ভাল দেখায় না। জলপাইগুড়িতে হোটেলের ব্যবস্থা কীরকম?"

"এখনও এই একটা ব্যাপারে আমরা পিছিয়ে আছি। আসলে এখানে তো টুরিস্ট খুব কম আসে, তাই ভাল হোটেল তৈরি হল না। তবে আমি সার্কিট হাউসে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

"এখানে দেখলাম ইন্ডিয়ান স্টাইলের ল্যাট্রিন। মিস্টার সোম রোগা মানুষ, তাঁর পক্ষে ব্যায়াম করা সহজ। আমার মধ্যপ্রদেশ যেভাবে বাড়ছে, বুঝেছ। ওই যে গোরান আসছে। তোমাকে লিখেছিলাম ওর কথা। আলাপ করিয়ে দিই।" মেজর চটপট চোস্ত আমেরিকান ইংরেজিতে বলে গেলেন, "ইনি গোরান স্যুলম্যান। আত্মাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করেন। আর ইনি হলেন অর্জুন, এঁর কথা বলেছি।"

অর্জুন বলল, "আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে।"

মেজর চোখ বড় করলেন, "ও গোরান, এখন থেকে অর্জুন আমাদের গাইড। ও বলছে এখানকার সার্কিট হাউসে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।"

"কেন? এই জায়গাটা তো ভালই।"

"ভাল, কিন্তু যার বাড়ি সে তো নেই।"

"বাড়িতে না থেকে আমরা এই গাছেদের মধ্যে টেন্ট ফেলে থাকতে পারি। যখন পাহাড়ে জঙ্গলে যাব তখন তো এইভাবেই থাকতে হতে পারে।"

"মরেছে!" মেজর বাংলায় ফিরে এলেন। অর্জুন তাকাল। গোরানের ডান হাতে পাতায় জড়ানো বস্তুটি কি শঙ্খচূড় সাপটার মাথা?

॥ ৩ ॥

শেষ পর্যন্ত সার্কিট হাউসেই ঘরের ব্যবস্থা করতে হল অর্জুনকে। গোরানসাহেবের যুক্তি মনঃপূত হয়নি মেজরের।

পাহাড়ে জঙ্গলে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হয় বিকল্প ব্যবস্থা নেই বলে। এভারেস্টের পাঁচশো ফুট নীচে যদি একটা বিশ্রী ধর্মশালাও থাকত তা হলে অভিযাত্রীরা সেখানেই গিয়ে উঠতেন, তাঁবু খাটাতেন না। গোরানসাহেব অ্যাডভেঞ্চার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু মেজর রাজি হলেন না।

সার্কিট হাউসের ব্যবস্থা করে ওঁদের ওখানে তুলে দিতে-দিতে সন্ধে হয়ে এল। অত লটবহর টানাটানি না করে হাবুর জিম্মায় রেখে দেওয়া হল। গোরানসাহেব তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করলে অর্জুন খাওয়াদাওয়ার প্রসঙ্গ তুলল। মেজর ততক্ষণে পোশাক পালটে ফেলেছেন। আলখাল্লায় বেল্ট বাঁধতে-বাঁধতে বললেন, "নো

প্রবলেম। প্রথমে বলো, তোমার মা কীরকম আছেন?"

"ভাল।"

"তা হলে তো চুকেই গেল। ওঁর হাতের নিরামিষ রান্না খাব। এই ধরো লাউয়ের ঘণ্ট, চালকুমড়ো নারকোল দিয়ে, শুক্তো, বড়ির ঝোল।" বলতে-বলতে খেয়াল হল তাঁর, "ওঁকে খাটানো হয়ে যাবে না তো?"

"মোটেই না। মা এসব রান্না করতে পারলে খুশি হবেন। কিন্তু ওই ভদ্রলোক দিশি রান্না খাবেন?"

"আলবত খাবে। আমেরিকানরা তো সেদ্ধ ছাড়া কিছুই খেতে জানে না। এবার খেয়ে দেখুক রান্না কাকে বলে! শুধু একটু মিষ্টি দিতে বোলো।"

"কিন্তু এগুলো তো দিনের খাবার।"

"তাই তো! আমাদের কাছে কিছু টিনফুড আছে। আজ চালিয়ে নেব।" মেজর একটা ব্যাগ খুলে হুইস্কির বোতল বের করলেন। সেটাকে আলোর সামনে ধরে খানিকক্ষণ দেখলেন। ওঁর দাড়িগোঁফের জঙ্গলের মধ্যে দিয়েও তৃপ্তির হাসিটা ফুটে উঠছিল, "গুড। তুমি তো এখন সাবালক। চলবে তো?"

"না।" অর্জুন হেসে মাথা নাড়ল।

ছিপি খুলে বোতল থেকে সরাসরি কয়েক ঢোক গলায় চালান করে দিলেন মেজর। তারপর চোখ বন্ধ করে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে রইলেন। অর্জুনের মনে পড়ল মেজরের মদ্যপান সে প্রথম দিন থেকে দেখে আসছে। অনেক বছর চলে গেল। ইতিমধ্যে মেজরের দাড়ির বেশিরভাগই সাদাটে হয়ে গিয়েছে। অথচ ওঁর স্বভাব বদলায়নি, মদের প্রতি আসক্তি একই রয়েছে।

বোতলটাকে যত্ন করে টেবিলের ওপর রেখে মেজর বিছানায় বসলেন, "এবার বলো, গোরান স্যুলম্যানকে তোমার কেমন লাগল।"

"একটু অন্যরকম।"

"ঠিক। মাঝে-মাঝে আমারও মনে হয় ও মানুষ নয়, মানুষের শরীরে বাস করা একটা আত্মা। আসলে আত্মা নিয়ে গবেষণা করতে করতে ওর মধ্যে পরিবর্তন এসে গিয়েছে। এমনিতে লোকটা ভাল।"

"আজ অমলদার বাগানে একটা শঙ্খচূড় সাপকে উনি মুঠোয় চেপে মেরেছেন। পরে সেই সাপটার মাথা কেটে পাতায় জড়িয়ে নিয়ে এসেছেন।"

"সাপের মাথা?" চোখ বড় করলেন মেজর, "সাপের মাথার সঙ্গে হয়তো আত্মার কোনও সম্পর্ক আছে। এসব লোকদের বোঝা মুশকিল। আমি আসতে রাজি হলাম, কারণ তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। দ্বিতীয়ত, ভূতপ্রেতে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু ড্রাকুলার গল্প পেলেই পড়ে ফেলি। এই সুযোগে যদি জ্যান্ত ড্রাকুলা দেখা যায়, মন্দ কী।" বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন মেজর।

"আপনি চিঠিতে স্পষ্ট কিছু লেখেননি। ব্যাপারটা কী?"

"গোরান স্যুলম্যানকে আত্মা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা খুব গুরুত্ব দেন।

গোরান বিশ্বাস করে আত্মা আছে। তবে ভালমানুষ মারা গেলে তাঁদের আত্মা মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। কিন্তু মন্দ মানুষের আত্মা পৃথিবীতে আটকে থাকে, যন্ত্রণা পায়। সেই যন্ত্রণা নাকি মারাত্মক। মানুষ হয়ে থাকার সময় যাদের কামনা-বাসনা মেটে না, লোভের শেষ যাদের হয়নি, তারাই বদ-আত্মা হয়ে যায়। এই আত্মাদের কেউ প্রতিশোধ নিতে, অত্যাচার করতে একটা শরীর বেছে নেয়। এদের বলা হয় ড্রাকুলা। দিনের বেলায় এদের কোনও ক্ষমতা নেই, কিন্তু রাত্রে এরা ভয়ানক হয়ে ওঠে।" গলায় মদ ঢাললেন মেজর।

"এসব কথা এখন একটা কিশোরও জেনে গিয়েছে। সেইসঙ্গে এও জানে রাক্ষস-খোক্কস ড্রাকুলা স্রেফ গাঁজাখুরি গপ্পো। আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না, গোরানসাহেবের মতো একজন আধুনিক মানুষ কেন এসবে ইন্টারেস্টেড হলেন!"

"গাঁজাখুরি! মাই ডিয়ার অর্জুন, পৃথিবীর নানান দুর্গম জায়গায় ঘুরে আমি স্পষ্ট জেনে গেছি আমার জ্ঞানই শেষ কথা নয়। তুমি একটা গোরুকে দেখবে সুন্দর সাঁতার কেটে নদী পার হচ্ছে। ওকে সাঁতার শেখাল কে? কখনও যে-মানুষ জলে নামেনি সে কি সাঁতার কাটতে পারবে? একবার আলাস্কা পেরিয়ে এমন একটা বরফের দেশে গিয়েছিলাম যেখানে আমাদের আগে কেউ যায়নি। তুষারঝড়ে আমরা আটকে পড়ায় খাবার শেষ হয়ে যাচ্ছিল। একদিন আমি আর একজন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান শিকার করতে বের হলাম। ওইসব অঞ্চলে সীল পাওয়া যায়। বরফের চুড়োয় একটা বসে ছিল। আমাদের দেখেই সেটা শূন্যে ঝাঁপ দিল। অতবড় চর্বিওয়ালা শরীর নিয়ে ঠিক পাখির মতো অনেকটা উড়ে নীচের বরফের খাঁজে লুকিয়ে পড়ল। সীল উড়তে পারে এ-কথা তুমি বিশ্বাস করবে? অত কথা বলার দরকার কী, এ-দেশে এখনও নিশ্চয়ই তান্ত্রিকদের খুব প্রভাব আছে, আছে তো?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"তা আছে।" অর্জুন স্বীকার করল।

"শুধু সরল অশিক্ষিত মানুষরাই তাদের কাছে যায়, এ-কথা নিশ্চয়ই বলবে না! শিক্ষিত মানুষ যখন তাদের সামনে মাথা নিচু করে বসে তখন গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে পারবে? রামকৃষ্ণদেব মা কালীর দর্শন পেতেন। তুমি জানো না?"

"পড়েছি। কিন্তু—!"

"ভগবান থাকলে ভূত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"

"গোরানসাহেব আগে কী করতেন?"

"ও ডাক্তারি পাশ করে গবেষণা করে গেছে চিরকাল।"

"কী ব্যাপারে?"

"ওই একটা প্রশ্ন করলে গোরান খুব রেগে যায়। চলো, অনেকক্ষণ বকবক করে যাচ্ছি। তোমাদের শহরটা একটু ঘুরে দেখি।" মেজর আবার বোতলের দিকে হাত বাড়ালেন। অর্জুন বলল, "আজকে বিশ্রাম নিলে ভাল হত না? অনেকটা জার্নি করে এসেছেন! তার চেয়ে আপনাদের পরিকল্পনার কথা শুনলে ভাল লাগবে।"

অর্জুন বলল।

মেজর উঠে একটা ব্যাগ খুলে বড় প্যাকেট বের করলেন। সেখান থেকে ভাঁজ করে রাখা একটা ম্যাপ টেবিলের ওপর বিছিয়ে বললেন, "কাম হিয়ার।"

অর্জুন কাছে গেল। একটা বড় বিন্দুর ওপর আঙুল রেখে মেজর বললেন, "দিস ইজ জলপাইগুড়ি। এখানে আমরা এখন রয়েছি। ঠিক আছে। এটা তিস্তা নদী। সাহেবদের তৈরি ম্যাপ, ভুল থাকলে বলে দেবে তুমি। এই তিস্তা পার হলে হিমালয়ের নীচের পুরো জায়গাটার নাম ডুয়ার্স। এই যে রাস্তাটা ডুয়ার্স পেরিয়ে সোজা আসামে চলে গিয়েছে।"

অর্জুন ম্যাপটাকে লক্ষ করছিল। প্রথমেই চোখে পড়ল তিস্তার ওপর যে দুটো ব্রিজ তৈরি হয়েছে তা ম্যাপে নেই। এখান থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে ধূপগুড়ি চলে গিয়েছে রাস্তাটা। এখন যে ময়নাগুড়িতে না গিয়ে বাইপাস হয়ে নতুন তৈরি ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে ধূপগুড়ি যাওয়া যায়, সেই রাস্তাটাও ম্যাপে নেই। অর্থাৎ এই ম্যাপ তৈরি হয়েছিল ষাট সালের আগে। ডুয়ার্সের ভূগোল মোটামুটি এক থাকলেও পথঘাট বদলে গেছে।

মেজর বললেন, "এই পথ ধরে আমরা সোজা চলে যাব হাসিমারায়। তারপর থেকেই ভুটানের এলাকা। এই হাসিমারার পাশে একসময় ব্রিটিশদের কবরখানা ছিল। গোরান যা তথ্য পেয়েছে এই এলাকায় একশো বছর আগে প্রচুর ব্রিটিশ প্রয়োজনে থাকতেন। চা-বাগানের পত্তনের পর এখানে তাঁদের একটা ক্লাবও তৈরি হয়েছিল। সেই ক্লাব ভারতীয় বিপ্লবীরা পুড়িয়ে দিয়েছিল একসময়। তিনজন ব্রিটিশ সেই আগুনে পুড়ে মারা যায়। আমরা ওখানে যেতে চাই।"

"কেন?"

"ওই তিনজন ব্রিটিশের মৃত আত্মা এখনও ওইসব অঞ্চলে সক্রিয় বলে গোরানের ধারণা। ও নাকি ওর পরিচিত আত্মার কাছ থেকে এমন তথ্য পেয়েছে।"

অর্জুন হেসে ফেলল। মেজর চোখ ছোট করলেন, "তুমি হাসছ কেন?"

অর্জুন বলল, "ওই আত্মারা এখানে পড়ে আছে কেন? ওরা যখন ব্রিটেন থেকে এসেছিল তখন স্বচ্ছন্দে স্বদেশে চলে যেতে পারে। সেটাই তো স্বাভাবিক। আর চলে যেতে ওদের তো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।"

মেজর মাথা নাড়লেন, "ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি গোরানকে করেছিলাম।"

"উনি কী জবাব দিয়েছেন?"

"খুব ভুল বলেননি। এই আত্মারা বদ-আত্মা। এদের কামনা-বাসনা ডুয়ার্সের জঙ্গল এবং মানুষকে নিয়েই জীবিত অবস্থায় ছিল। মারা যাওয়ার পর তাই এরা এখানেই থেকে গেছে। তা ছাড়া দীর্ঘকাল দেশছাড়া হওয়ায় দেশের জন্যে কোনও আকর্ষণ এদের মধ্যে নেই।" মেজর বললেন।

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, "আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি এর আগে

যেসব অভিযানে গিয়েছেন তার প্রত্যেকটাই বিজ্ঞান-নির্ভর ছিল। কিন্তু এই আত্মা খোঁজার ব্যাপারটা যে-কোনও সুস্থ লোকের কাছেই হাস্যকর শোনাবে।"

"তুমি ভুল করছ। গোরান যদি শুধু আত্মা খুঁজতে এখানে আসতে চাইত তা হলে আমি ওর সঙ্গী হতাম না। ও এসেছে ড্রাকুলার সন্ধানে। এখানেই আমার ইন্টারেস্ট।"

"ড্রাকুলা? ওটা তো একটা কাউন্টকে নিয়ে বানানো গল্প।"

"ঠিক। কিন্তু কাগজে পড়েছি এদেশে এখন ডাইনি সন্দেহে মানুষকে পুড়িয়ে মারা হয়। আমি তাই দেখতে চাই আসল ব্যাপারটা কী। আর এই কাজে তোমার সাহায্য চাই।" মেজর আবার গলায় তরল পদার্থ ঢাললেন।

"কীরকম?"

"এই অভিযানে তুমি আমাদের সঙ্গী হবে।"

"আপনার বন্ধু কি সেটা চাইবেন?"

"হ্যাঁ। সেইজন্যে আমরা প্রথমে জলপাইগুড়িতে এলাম।"

"কিন্তু আপনি বুঝতেই পারছেন আমি ব্যাপারটাকে আজগুবি ভাবছি। তাই প্রতিটি স্তরে আমি প্রমাণ খুঁজব। এটা কি ভাল লাগবে? মানুষ যখন ভক্তিতে নম্র হয় তখন সে অন্ধ হয়ে যায়। সে-সময় কারও সন্দেহ সে সহ্য করতে পারে না।"

"তোমার আর গোরানের মাঝখানে তো আমি আছি।"

কিছুক্ষণ বাদে অর্জুন বেরিয়ে এল মেজরের ঘর থেকে। এখন সন্ধে শেষ হতে চলেছে। গোরান স্যালম্যানের ঘরের দরজা বন্ধ। একটা সাপের মাথা কেটে ঘরে নিয়ে এসে ভদ্রলোক তখন থেকে দরজা বন্ধ করে কী করছেন তা তিনিই জানেন। হয়তো ঘনিষ্ঠ আত্মাদের ডেকে কথাবার্তা বলছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবযান' বইটা ইংরেজিতে কেউ অনুবাদ করেছে কিনা অর্জুনের জানা নেই, থাকলে ওঁকে পড়তে দেওয়া যেত।

সার্কিট হাউসের সামনে বাইকে উঠতেই অর্জুন শুনতে পেল, "কী খবর? এখানে?"

সে পেছন ফিরে তাকাতেই অবনীবাবুকে দেখতে পেল। জলপাইগুড়ি থানার ও.সি অবনীবাবু মানুষটি ভাল। অর্জুনের সঙ্গে সুসম্পর্ক রয়েছে। অর্জুন বাইক থেকে নেমে বলল, "বাইরে থেকে দু'জন অতিথি এসেছেন, দেখা করতে এসেছিলাম। আপনি?"

"আরে বলবেন না। ওপরওয়ালা এসেছেন। ডেকে এনে ধমকালেন। কেন এটা হচ্ছে, কেন ওটা হচ্ছে।" অবনীবাবুকে একটু বিরক্ত দেখাল।

অর্জুনের মনে পড়ে গেল, "তিস্তার ওপাশে হাইওয়েতে নাকি সন্ধের পরে ছিনতাই হচ্ছে? গাড়ি থামিয়ে করছে?"

"আরে! এই খবর আপনি পেয়ে গেছেন? হ্যাঁ। পরপর কয়েকটা হয়েছে।

গাড়িগুলো থেমে যাচ্ছে আর মুখোশপরা ছিনতাইবাজরা যা পাচ্ছে কেড়ে নিচ্ছে। তবে এখন পর্যন্ত খুনখারাপি করেনি।"

"সেটা কেউ বাধা দেয়নি বলে করেনি। কারা করছে?"

"কোনও ক্লু পাইনি। পরিচিত ছিনতাইবাজরা ইংরেজিতে কথা বলতে পারে না, এরা নাকি বলে। দুটো গাড়ির ড্রাইভার একই স্টেটমেন্ট দিয়েছে।"

"আচ্ছা, ওই সময় হাইওয়ে ফাঁকা থাকার কথা। গাড়িগুলো যাওয়া-আসা করে বেশ দ্রুতগতিতে। এরা ওদের থামায় কী করে?"

"এটাই মিস্ট্রি। ঠিক ছিনতাইবাজদের সামনে এসে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে যায়। ভাবছি আজ একটু টহলে বের হব।"

অর্জুন হাসল, "আপনার গাড়ি দেখতে পেলে ওরা ভদ্রলোক হয়ে যাবে। ওরা কি কোনও একটা বিশেষ জায়গায় রোজ ছিনতাই করছে?"

"না। জায়গা পালটাচ্ছে। তবে তিস্তা ব্রিজের এক মাইলের মধ্যেই ঘটনাগুলো ঘটেছে। ঠিকই বলেছেন, আমার গাড়ি না নিয়ে প্রাইভেট গাড়িতে যাওয়াই ভাল। আসবেন নাকি আমার সঙ্গে?"

"কোনও কাজ যখন নেই, তখন যাওয়া যেতে পারে।" অর্জুন বলল।

অবনীবাবু ঘড়ি দেখলেন, "তা হলে মিনিট পঁয়তাল্লিশের মধ্যে থানায় চলে আসুন।" অবনীবাবু তাঁর জিপের দিকে এগোলেন।

বাড়ি ফিরে এ পি সাহেবকে ফোন করল অর্জুন। তিনি মাত্র পাঁচ মিনিট আগে ফিরেছেন। অর্জুনের গলা পেয়েই বললেন, "সন্তু আমাকে বাগানে ফোন করেছিল। তুমি বলেছ কোনও বড় খারাপ কাজ করার আগে ওকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু আজ অফিসে ও তোমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তাতে আমি খুব অপমানিত বোধ করছি। তুমি কি নিশ্চিত ও খারাপ কাজ করছে?"

"হ্যাঁ।"

"কী কাজ?"

"সেটা জানতে হলে ওকে হাতেনাতে ধরতে হয়। আর ধরা পড়লে আইন তার মতো কাজ করবে। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন!"

"নিশ্চয়ই। ও যদি কোনও অন্যায় করে থাকে তা হলে আমি চাইব শাস্তি হোক। আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হলেও আমি ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করব না। আমি চেয়েছিলাম তেমন কিছু করার আগে ওকে সাবধান করে দিতে। ও যদি ইতিমধ্যেই অপরাধী হয়ে থাকে তা হলে আইন ওর বিচার করুক। থ্যাঙ্কু অর্জুন।" এ পি সাহেব টেলিফোন রেখে দিলেন। মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল অর্জুনের।

তিস্তা ব্রিজের ওপর গাড়িটা থামিয়ে অবনীবাবু ড্রাইভারকে পাঠালেন টোল

দিতে। এখনও এই ব্রিজ পারাপার করতে টাকা দিতে হয়। সরকারি গাড়ি, বিশেষ করে গাড়ি যদি পুলিশের হয় তা হলে তাদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়। কিন্তু অবনীবাবু যেন ইচ্ছে করেই জানাতে চাইলেন তাঁরা সরকারি মানুষ নন! অন্ধকার গাড়ির ভেতর বসে থাকায় টোল যারা সংগ্রহ করছে তারা তাঁকে চিনতে পারল না।

মোড় পর্যন্ত চলে এসে অবনীবাবু বললেন, "আমি কিন্তু আমার এলাকার বাইরে চলে এসেছি। এবার ফিরতে হয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "শেষ ছিনতাই কোথায় হয়েছিল?"

গাড়িটা আবার ব্রিজের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছে অবনীবাবু বললেন, "এখানে।"

গাড়ি থামল না। অর্জুন দেখল জায়গাটা বেশ অন্ধকার। দু'পাশে লুকিয়ে থাকার মতো চমৎকার পাথরের আড়াল রয়েছে। অর্থাৎ ছিনতাই যারা করছে তারা প্রথমে লুকিয়ে থাকার আড়াল খুঁজবে। একই জায়গায় পরপর দু'দিন তারা নিশ্চয়ই ছিনতাই করবে না। করাটা স্বাভাবিক নয়।

খানিকটা যাওয়ার পর রাস্তার দু'পাশে গাছ চোখে পড়ল। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় বোঝা গেল ওখানে লুকিয়ে থাকলে রাস্তা থেকে দেখা সম্ভব নয়। দূরে ব্রিজের আলো দেখা যাওয়ামাত্র অর্জুন গাড়িটাকে থামাতে বলল। ডানদিকে একটা কাঁচা রাস্তা নেমে গেছে। সে অবনীবাবুকে বলল, "গাড়িটাকে নীচে নিয়ে গিয়ে একটু অপেক্ষা করা যায় না?"

"কেন? ওহো, আপনি ভাবছেন ঠিক এখানেই ছিনতাই করবে ওরা। কী মশাই, জ্যোতিষী হলেন কবে থেকে?" অবনীবাবু হাসলেন।

"ছিনতাই করে ওরা চলে যায় কীসে?"

"কোনও ড্রাইভার বা গাড়ির প্যাসেঞ্জার সেটা দেখেনি। ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে বলে জানিয়েছে তারা।"

"ওরা নিশ্চয়ই হেঁটে আসবে না। আমরা এই আড়ালে থেকে লক্ষ করতে পারি কোনও সন্দেহজনক গাড়ি যাচ্ছে কি না!"

"তা পারি।"

অবনীবাবুর নির্দেশে গাড়ি নীচে নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রাখা হল। এই গাড়িতে ওরা দু'জন ছাড়া আরও তিনজন পুলিশ রয়েছে। এদের সঙ্গে কী অস্ত্র আছে অর্জুন জানে না। ছিনতাই যারা করছে তারা নিশ্চয়ই খালি হাতে আসে না।

গাড়ি থেকে নেমে ওরা এমন একটা আড়ালে দাঁড়াল, যেখানে রাস্তায় ছুটে যাওয়া গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ছে না। এখন রাত দশটা। হাইওয়েতে গাড়ি চলাচল কমে এসেছে। যারা যাচ্ছে তাদের গতি স্বাভাবিকের থেকে বেশি। অত রাত্রে যে ওরা আসবেই তার তো কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই সময় দূরে মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল।

॥ ৪ ॥

দুটো মোটরবাইককে তীব্র গতিতে ছুটে যেতে দেখল অর্জুন। হেডলাইটের আলোর পেছনে থাকায় চালকের মুখ দেখা যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রতিটি মোটরবাইকে দু'জন বসে ছিল। অর্জুন অবনীবাবুর দিকে তাকাল।

অবনীবাবু মিলিয়ে যাওয়া মোটরবাইকের আলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এত জোরে চালালে তো অ্যাক্সিডেন্ট হবেই।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি তখন বললেন, যারা ছিনতাই করছে তারা মুখে মুখোশ পরে থাকে। তাই তো?"

অবনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ। কেন বলুন তো?"

"আপনার ঠিক মনে আছে?"

"তাই তো বলেছিল। মুখ দেখতে পায়নি, ঢাকা ছিল।"

"মুখ তো কাপড় দিয়ে ঢাকা যেতে পারে, হেলমেটেও ঢাকা পড়ে।"

"হেলমেটে?" অবনীবাবু যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন।

জায়গাটা সুনসান। ওপাশে কিছু জোনাকি এলোমেলো উড়ছে। মানুষজনের চিহ্ন নেই এদিকে। কিন্তু মশা আছে। তারা সক্রিয় হয়ে উঠতেই সেপাইরা চড় মারতে লাগল নিজেদের শরীরে। অবনীবাবু বললেন, "হ্যাঁ, হতে পারে। আমার ঠিক পরিষ্কার মনে পড়ছে না। তা হেলমেট পরা থাকলে ওরা এসেছিল মোটরবাইকে চেপে। একটু আগে দুটো মোটরবাইককে চলে যেতে দেখলে? আমরা কি ওদের চেজ করব?"

"প্রথমত, এত পরে ধরতে পারা যাবে না। দ্বিতীয়ত, ওরাই যে ছিনতাই করছে তা প্রমাণ করবেন কী করে? চলুন, এখানে আর কতক্ষণ থাকা যায়?"

অবনীবাবু একমত হলেন। গাড়িটা রাস্তার ওপর উঠে আসার পর বললেন, "কয়েকবার এই তিনমাইল রাস্তাটা টহল দিয়ে যাই। অন্তত ওপরওয়ালাকে বলা যাবে।"

আধমাইলটাক যাওয়ার পর ওরা একটা মারুতি কারকে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। এর আগে যখন এই পথে এসেছে তখন মারুতিটা ছিল না। অবনীবাবু গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। হেডলাইট ঘোরাতেই দেখা গেল একটা লোক স্টিয়ারিং-এর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। পেছনেও একজন রয়েছে।

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে ওরা ছুটে গেল। যে গাড়ি চালাচ্ছিল তার জ্ঞান নেই। টর্চের আলোয় দেখা গেল কপালের একপাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। পেছনের সিটে যিনি বসে আছেন তাঁর মুখে টেপ লাগানো। হাত দুটো পেছনে বাঁধা। টর্চের আলোয় তাঁর বিস্ফারিত চোখ দেখা গেল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ভদ্রলোককে বন্ধনমুক্ত করতেই তিনি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

অবনীবাবু বললেন, "আরে আপনি? কী হয়েছে?"

"কী আর হবে? সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম মশাই। ডাকাতি। ডাকাতি হয়ে গেছে।"

ভদ্রলোকের নাম নবগোপাল ঘোষ। শহরের নামকরা কন্ট্রাক্টর। তাঁকে শান্ত হতে বলে অবনীবাবু ড্রাইভারকে নিজের গাড়িতে তুলে তখনই হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশরাও ওই গাড়িতে ফিরে গেল।

নবগোপালবাবু হঠাৎই ঝিমিয়ে গেলেন। দু' হাতে মুখ ঢেকে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেই অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, "ও মরে গেছে?"

"না। মাথায় আঘাত লেগেছে। কী হয়েছিল বলুন তো?"

"আমার সব নিয়ে গিয়েছে ওরা। দু'-দু'লক্ষ টাকা ব্রিফকেসে ছিল।"

"কী করে নিল?"

"এই হতচ্ছাড়া কেশব, আমার ড্রাইভার, এত জোরে গাড়ি চালায় যে নাড়িভুঁড়ি পেট ছেড়ে বেরিয়ে আসে। বার্নিশের মোড়ে ওকে ধমকাতে এমন আস্তে চালাতে লাগল যে, গোরুর গাড়িকেও হার মানায়। ও যদি আর একটু জোরে চালাতো তা হলে এই জায়গা আমরা অনেক আগেই পেরিয়ে যেতাম।"

"তারপর?" অবনীবাবু একটু অধৈর্য গলায় প্রশ্ন করলেন।

"ঠিক ওখানে আসামাত্র দেখলাম একটা কালো বেড়াল রাস্তা কেটে দিয়ে ওপাশে চলে গেল। চোখে আলো পড়ায় ওর চোখ ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কেশব সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিল। বেড়াল রাস্তা কাটলে গাড়ি না থামালে নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তার ওপর কালো বেড়াল! আরে, তুই যদি আর একটু জোরে চালাতিস তা হলে জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর তো বেড়ালটা রাস্তা পার হত। গাড়ি থামাতেই ওরা ছুটে এল দু'পাশ থেকে। কেশব বাধা দিতেই ওরা ওকে মারল।" নবগোপালবাবু বড় শ্বাস নিলেন।

"কী দিয়ে মারল?"

"দেখিনি। অন্ধকারে আমি তখন ব্রিফকেস আঁকড়ে বসে আছি।" নবগোপালবাবুর নাক দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বের হল, "তারপর আমাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ওই অবস্থা করে ব্রিফকেস নিয়ে ওরা চলে গেল। এ কী ভয়ঙ্কর অরাজকতা। উঃ।"

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক কত টাকা ছিল ওর মধ্যে?"

"দু' লক্ষ, টু লাখস!" নবগোপালবাবু মাথা নাড়লেন।

"ওদের কারও মুখ দেখেছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"মুখ? ইয়েস। না, না। দেখিনি। ঢাকা ছিল।"

"বাঙালি?"

"কী জানি? ইংরেজিতে কথা বলছিল। আমার কী হবে এখন?"

"আমি জলপাইগুড়ি থানার ও.সি। চলুন, আপনার গাড়িতে আপনাকে এখন একটু থানায় নিয়ে যাচ্ছি। একটা ডায়েরি করতে হবে আপনাকে।"

"পুলিশ? আমার পুলিশের ওপর কোনও আস্থা নেই।"

"ঠিক আছে, কিন্তু যা নিয়ম তা তো পালন করতে হবে। আর ইনি হচ্ছেন অর্জুন। পুলিশ নন। প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার।" অবনীবাবু অর্জুনকে দেখালেন।

হঠাৎ অর্জুনের হাত চেপে ধরলেন নবগোপালবাবু, "আমি ভাই তোমার কথা শুনেছি। তুমি টাকাটা উদ্ধার করে দাও, আমি তোমাকে টেন পার্সেন্ট কমিশন দেব। আমি এককথার মানুষ। হ্যাঁ।"

"আপনি বলছেন ডাকাতদের মুখ দেখতে পাননি। ওরা কারা তাই তো খুঁজে বের করা মুশকিল হবে। কীরকম বয়স বলে মনে হয়েছে?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল। নবগোপালবাবু তখনও ওর হাত ধরে রেখেছিলেন। প্রশ্ন শুনে মাথা নাড়লেন প্রবলভাবে, "তখন ওসব মাথায় ছিল না ভাই।"

"ওদের মাথায় হেলমেট ছিল? মনে করে দেখুন?"

"হেলমেট? ইয়েস। ছিল। হেলমেটে মুখ ঢাকা ছিল বলে চিনতে পারিনি। একজন টর্চ জ্বেলেছিল, তার আলো হেলমেটে পড়ায় চকচক করছিল সেটা।" তিনি বেশ জোরেই বললেন, "তাই মাথাগুলো গোল-গোল দেখাচ্ছিল।"

নবগোপালবাবুর গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন অবনীবাবু। ভদ্রলোক পেছনের আসনে বসে ক্রমাগত নাক দিয়ে শব্দ করে চলেছেন। থানায় পৌঁছে ওঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর ওঁকে যখন বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হল তখন রাত প্রায় বারোটা।

দু'জনে একা হওয়ার পর অবনীবাবু বললেন, "কী দুর্ভাগ্য বলুন। নাকের ডগার ওপর দিয়ে ডাকাতি করে গেল, অথচ কিছুই করতে পারলাম না।"

"এখন পর্যন্ত পারেননি, পারবেন না তা তো নয়।"

"দুর! একটাও ক্লু পাওয়া যাচ্ছে না।"

"না, যাচ্ছে। প্রথমত, একটা কালো বেড়াল, যে খুব ট্রেইন্ড। এই শহরে নিশ্চয়ই বেশি লোকের কাছে ট্রেইন্ড কালো বেড়াল নেই।"

"কালো বেড়াল?" অবনীবাবু হতভম্ব।

"হ্যাঁ। ওটা ঠিক সময়ে রাস্তা পার হয় বলে গাড়ি থেমে যায়।"

"আপনি বলছেন যারা ডাকাতি করছে তারাই বেড়ালটাকে ব্যবহার করছে?"

"তাই তো স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, মুখ হেলমেটে ঢাকা ছিল। তার মানে ওরা এসেছিল বাইকে চেপে। বাইকে চাপতে প্রৌঢ়রা তেমন পছন্দ করে না। তৃতীয়ত, ওরা কথা বলেছে ইংরেজিতে। সে ইংরেজি কতটা ঠিকঠাক তা নবগোপালবাবুর পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ধরে নিতে পারি একেবারে অশিক্ষিত ডাকাত ইংরেজিতে কথা বলবে না।" বলতে-বলতে অর্জুন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল, "একটা টেলিফোন করতে পারি?"

"নিশ্চয়ই।"

যন্ত্রটাকে টেনে নিয়ে নম্বর ঘোরালো অর্জুন। এত রাত্রে জেগে থাকার কথা নয়,

রিঙ হয়েই যাচ্ছে। তারপর ঘুম-ঘুম গলা কানে এল, "হ্যালো!"

"অর্জুন বলছি।"

"ও। এত রাত্রে? কী ব্যাপার?"

"বাধ্য হয়েই বিরক্ত করছি। আপনি যদিও বলেছেন কোনও অন্যায় করলে সমর্থন করবেন না, তবু মনে হল আপনাকে জানানো উচিত।"

"তুমি কোত্থেকে কথা বলছ?"

"থানা থেকে।"

"ও। বুঝতে পারছি। আইন আইনের পথে চলুক, এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই।" এ পি সাহেব টেলিফোন রেখে দিতেই অর্জুন একটা বাইকের আওয়াজ শুনতে পেল। বাইরে সেপাইয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি, তারপর প্রায় জোর করে যে দরজায় এসে দাঁড়াল তাকে এই সময়ে এখানে দেখার কথা চিন্তাই করেনি অর্জুন।

অবনীবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার? কী চাই আপনার?"

উত্তেজনা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সন্দীপ উত্তেজিত কিন্তু তাই বলে অর্জুনকে চিনতে পারছে না এখন? একবার তার দিকে চোখ বুলিয়ে অবনীবাবুর সামনে এগিয়ে গেল, "আপনি তো ও.সি, আপনার সাহায্য চাই।"

"কী ব্যাপারে?"

"আমার বেড়ালটাকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"কী?" অবনীবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "এত রাত্রে ইয়ার্কি মারতে এসেছেন?"

"মোটেই না। আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি মারার কী দরকার আমার? আমি থানায় এসেছি অভিযোগ জানাতে। এই বেড়ালটা সাধারণ বেড়াল নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, আমার প্রিয়। ওকে কেউ চুরি করেছে আমাদের বাড়ি থেকে।" সন্দীপ বলল।

অবনীবাবু হতাশায় কাঁধ নাচালেন, "দেখুন, এত রাত্রে আমি কোনও বেড়াল নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। আপনি প্রয়োজন মনে করলে ডায়েরি করে যেতে পারেন। বেড়ালের খোঁজ পেলে জানিয়ে দেওয়া হবে।" কথা শেষ করেই বেল টিপলেন তিনি। একজন সেপাই এগিয়ে আসতে তাকে বললেন, "এঁকে এস. আই. সাহেবের কাছে নিয়ে যাও, ডায়েরি করবেন।"

অর্জুন এগিয়ে গেল, "নমস্কার সন্দীপবাবু, আমাকে চিনতে পারছেন?"

সন্দীপ চোখ ছোট করল, "আপনি? এখানে?"

"ও.সি সাহেবের সঙ্গে একটু গল্প করছিলাম। আপনার সমস্যাটা আমি বুঝতে পারছি। বেড়ালটাকে কখন থেকে দেখতে পাচ্ছেন না?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

অবনীবাবু বাধা দিলেন, "আমি তো ওঁকে বললাম ডায়েরি করে যেতে।"

"সেটা নিশ্চয়ই উনি করবেন। কিন্তু ওঁর বেড়াল সাধারণ বেড়াল নয়। নিশ্চয়ই

pathagar.com

বিশেষ কিছু বিশেষত্ব আছে। উনি তো বললেন, বুদ্ধিমান বেড়াল। তাই আপনার উচিত ওঁর কথা একটু মন দিয়ে শোনা। সরি, উচিত শব্দটা ব্যবহার করা ঠিক হল না। কিন্তু ভেবে দেখুন, বাড়ির বেড়ালকে পাওয়া যাচ্ছে না বলে আমরা কি কেউ রাতদুপুরে থানায় ছুটে আসতাম?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

সন্দীপ মাথা নাড়ল, "ঠিক। এটাই আমি ওঁকে বোঝাতে চাইছিলাম।"

অবনীবাবু অর্জুনের দিকে তাকালেন, "বেশ।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "বেড়ালটাকে শেষবার কখন দেখা গেছে?"

"সন্ধেবেলায়। ও নিয়ম করে দিনে দু'বার বাগানে যায়। আজ পর্যন্ত ঘর নোংরা করেনি। আমিই নিয়ে যাই। কিন্তু আজ একটু তাড়া থাকায় মাকে বলেছিলাম বাগানে নিয়ে যেতে। বলে বেরিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। একটু আগে ওর খোঁজ করতে দেখলাম ও নেই।"

"আপনার মা কী বলছেন?"

"মা বলছেন বেড়ালটা নাকি বাগান থেকে সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমার ঘরে চলে গিয়েছিল। ও আমার ঘরেই থাকে।"

"তারপর?"

"অথচ ও যায়নি। মা ভুল দেখেছে অথবা ভেবে নিয়েছে।"

অবনীবাবু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "বেড়ালটা আপনার কাছে দামি?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই। পোষা প্রাণী তো, দামি হবেই।" সন্দীপ জবাব দিল।

"আপনি বলেছেন ও খুব বুদ্ধিমান ছিল। কীরকম?" অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি যা বলতাম, ও বুঝতে পারত। এমনকী যদি বলতাম সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আয়, ও মুখে করে নিয়ে আসত। কখনও বাগান ছাড়া বাড়ির বাইরে যেত না। আমি ওকে ফেরত চাই অফিসার।"

"কীরকম দেখতে ছিল?"

"কালো। একটু বেশি কালো। আমি ওকে চারদিন বয়সে একটা ভুটিয়ার কাছ থেকে এনেছিলাম। মনে হয় ও ভুটিয়া বেড়াল। গায়ের লোমগুলো ঘন আর সাধারণ বেড়ালের চেয়ে বড়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "অন্ধকারে ওর চোখ জ্বলে?"

ঝট করে ঘাড় ঘোরালো সন্দীপ, "ওই ধরনের যে-কোনও প্রাণীর চোখ অন্ধকারে জ্বলে। কিন্তু তাই বলে আমার বেড়াল মোটেই হিংস্র নয়।"

অবনীবাবুর নির্দেশে খাতা এল। সেখানে সন্দীপ তার নাম-ঠিকানা এবং অভিযোগ লিখল। খাতাটা এস. আইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে ডায়েরির জন্য পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন?"

"সন্দেহ? বেড়াল চুরি কেউ করবে বলে ভাবিনি। তবে একটা লোক দিনকয়েক

আগে এসেছিল। আমার বেড়ালটাকে দেখতে চাইছিল। লোকটার ভাবভঙ্গি ভাল লাগেনি বলে আমি তাকে পাত্তা দিইনি।"

"কোথায় থাকে সে?"

"আমি জানি না।"

"আচ্ছা সন্দীপবাবু, আজ সন্ধেবেলায় বাড়ি থেকে বেরোবার পর আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, কাদের সঙ্গে ছিলেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"তার সঙ্গে বেড়াল চুরির কী সম্পর্ক?"

"আপনার বলতে আপত্তি আছে?"

"হ্যাঁ, এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

অবনীবাবু বোধ হয় আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। বললেন, "আরে ভাই জলপাইগুড়ি শহরে তোমার বয়সী ছেলে সন্ধেবেলা এমন কী করতে পারো, যা বলতে অসুবিধে হচ্ছে?"

সন্দীপ এক মুহূর্ত ভাবল, "আমরা আড্ডা মারছিলাম।"

"কোথায়?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এটাও বলতে হবে?"

"আমি বুঝতে পারছি না, আপনি যদি কোনও অন্যায় না করে থাকেন তা হলে বলতে অসুবিধে হচ্ছে কেন?"

"আমি অন্যায় করেছি বলে মনে হচ্ছে আপনার?" সন্দীপ হঠাৎ রেগে গেল, "আপনি আমাকে অপমান করছেন।"

অবনীবাবু বললেন, "দেখুন ভাই, আমরা খুব ডিস্টার্বড হয়ে আছি। আজ সন্ধের পর তিস্তা ব্রিজের ওপাশে ডাকাতি হয়েছে। ড্রাইভার খুব ইনজিওরড। এর আগেও হচ্ছিল কিন্তু কেউ আহত হয়নি।"

"তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কোথায়?"

"আমি একবারও বলিনি সম্পর্ক আছে। যারা ডাকাতি করেছে তারা মোটরবাইকে চেপে গিয়েছিল। এই শহরেরই ছেলে।"

"কী করে বুঝলেন এই শহরের ছেলে?"

"অনুমান। আপনিও তো মোটরবাইকে এসেছেন।"

সন্দীপ হঠাৎ শব্দ করে হাসল, "আমি কোন পরিবারের ছেলে তা আপনি জানেন না। তা ছাড়া যদি ডাকাতি করে থাকি তা হলে ভুলেও থানায় আসতাম না!"

"সেটা ঠিক। আবার বেঠিকও হতে পারে। যাক গে, আপনি যেতে পারেন, যদি খবর পাই তা হলে বেড়ালটাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করব।"

অবনীবাবুর কথা শেষ হলে সন্দীপ সুবোধ বালকের মতো উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অর্জুন বলল, "আজ রাত্রে ঘুমের বারোটা বেজে গেল।"

"কেন?"

"ডাকাতরা একটা বেড়াল ব্যবহার করেছে গাড়ি থামাতে। সন্দীপের বেড়াল যদি ওরা চুরি করে নিয়ে যায়, তা হলে সন্দীপ নির্দোষ। আবার ডাকাতির পর যদি বেড়াল চুরি যায়, তা হলে ও এখানে আসবে কেন?"

"আপনি কী করে মনে করছেন দুটো বেড়াল একই।"

"হয়তো ভুল হচ্ছে। কিন্তু এমনও তো হতে পারে বেড়ালটা আদৌ চুরি যায়নি। সন্দীপ একটা বাহানা করে গেল।" অর্জুন বলল।

"উঠুন, বাড়ি যান। কাল সকালে ভাবা যাবে।"

"দাঁড়ান।" অর্জুন টেলিফোনের কাছে গেল। নাম্বার ঘুরিয়ে সাড়া পেতেই বলল, "মাসিমা, বেড়ালটাকে পাওয়া গিয়েছে?"

"পাওয়া যাবে কেন? খোকা যে বলল ওটাকে কোন তান্ত্রিকের কাছে রেখে এসেছে। কে বলছ বাবা?" সন্দীপের মা জিজ্ঞেস করল।

॥ ৫ ॥

সকালে ঘুম ভাঙামাত্র মনে পড়ল মেজরের কথা। কাল অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছিল অর্জুন। অবনীবাবু তাকে একা ছাড়েননি। সঙ্গে জিপ নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন। পুলিশের কিছু অফিসার অবনীবাবুর মতো ভদ্র, বিনয়ী এবং শিক্ষিত বলে মানুষ ভরসা পায়। অবনীবাবু চেয়েছিলেন কাল রাত্রেই সন্দীপদের বাড়িতে যেতে। সন্দীপ যে ওই ডাকাতির সঙ্গে সরাসরি জড়িত এটা ওঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু অর্জুন আপত্তি করেছিল। প্রমাণ হাতে না আসা পর্যন্ত সন্দীপকে গ্রেফতার করলে ভুল করা হবে। লুঠ করা টাকাগুলো নিশ্চয়ই সন্দীপ বাড়িতে রাখেনি। বেড়ালটাকেও সে উধাও করে দিয়েছে। জামিন পেতে তার কোনও অসুবিধে হবে না। কোনও সাক্ষীকে হাজির করানো যাবে না ওকে শনাক্ত করতে।

ডায়েরির সূত্র ধরে অবনীবাবু নিশ্চয়ই ওর বাড়িতে যেতে পারেন। কিন্তু রাতদুপুরে যাওয়াটা অত্যন্ত অশোভন বলে উনি আজ সকালে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

বেরোবার আগে মা বললেন, "হ্যাঁ রে, ওরা কি আজ দুপুরে এখানে খাবে?"

"বলতে পারছি না মা। যদি খেতে চায় তোমায় জানিয়ে দেব।"

"বেশি বেলা করিস না। অন্তত ঘণ্টা দুই আগে বলিস।"

অর্জুন হেসে ফেলল। মেজরকে রেঁধে খাওয়াতে ইচ্ছে করছে, অথচ মা সরাসরি বলতে পারছে না।

সার্কিট হাউসে গিয়ে অর্জুন জানতে পারল মেজর এবং গোরান স্যুলম্যান বেরিয়ে গেছেন। ওঁরা গিয়েছেন একটা রিকশায়। রিকশাওলার সঙ্গে নাকি সারাদিনের চুক্তি হয়েছে। চৌকিদার জানাল, বলে গেছেন দুপুরে খাবেন না।

জলপাইগুড়ি শহরে সারাদিন ঘুরে দেখার মতো কিছু নেই। অর্জুন একটু ক্ষুণ্ণ

হল এই ভেবে যে, মেজর তার জন্যে কোনও খবর রেখে যাননি। গতকাল ওঁরা সমস্ত জিনিসপত্র অমল সোমের বাড়িতে রেখে এসেছিলেন। কোনও কারণে যদি ওই বাড়িতে একবার ওঁদের যেতে হয় ভেবে অর্জুন বাইক ঘোরাল।

হাবু বাগান পরিষ্কার করছিল। অর্জুনকে দেখে দাঁত বের করে হেসে উঠে দাঁড়াল। অর্জুন হাত নেড়ে ইশারায় জিজ্ঞেস করল মেজর এসেছিলেন কিনা। এটা করতে গিয়ে তাকে দু'হাতে মেজরের ভুঁড়ি এবং গালে হাত বুলিয়ে দাড়ি দেখাতে হল।

হাবু সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে হ্যাঁ বলল। তারপর আঙুলের মুদ্রায় জানাল ওঁরা চলে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন জিজ্ঞেস করার কোনও অর্থ হয় না ভেবে অর্জুন গেটের দিকে ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু হাবু অঁ অঁ শব্দ করে পেছনে আসতে লাগল। অর্জুন অবাক হয়ে তাকাতে হাবু ইশারায় যা বোঝাতে চাইল তা প্রথমে বোধগম্য হল না। কেউ ওর ইশারায় না বুঝলে খুব চটে যায় হাবু, মুখের অভিব্যক্তি পালটে যায়। তখন থুতু ছিটোয় মুখ থেকে। একটু সরে ভাল করে বোঝার চেষ্টা করল অর্জুন। শেষ পর্যন্ত ধরতে পারল। কেউ শুয়ে আছে আর তার নীচে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, এইরকম বোঝাতে চাইছে হাবু।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেউ মারা গিয়েছে?"

হাবু মাথা নাড়ল, না। তারপর হাত নেড়ে বোঝাতে চাইল সেখানেই গেছেন ওঁরা। অর্জুন খুব অবাক হল, "শ্মশানে গেছেন?"

এবার খুশিতে উজ্জ্বল হল হাবু। ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল।

মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না অর্জুন। জলপাইগুড়িতে এসে মেজর কেন গোরানসাহেবকে নিয়ে শ্মশানে যাবেন? বোঝাই যাচ্ছে ওঁদের কথাবার্তা হাবু শুনতে পেয়েছে। ও ভুল করতেই পারে তবু শ্মশানটা দেখে এলেই হয়।

জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি শহরে যাওয়ার পথে ডান দিকে যে শ্মশানটা রয়েছে সেটা একসময় শহরের বাইরে বলে নির্জন ছিল। এখন শহর বাড়তে শুরু করার পর তার আশেপাশে বাড়িঘর হয়ে গেছে। পাশের যে সরু নদীটায় আগে জল থাকত সেটাও শুকিয়ে গেছে। বাইক থেকে নেমে শ্মশানে ঢুকল অর্জুন। এই সকালে শহরের কাউকে দাহ করতে আনা হয়নি বলে কোনও চিতা জ্বলছে না। মেজর বা গোরানসাহেবকে কোথাও দেখল না সে। শুধু কয়েকটা অকেজো মানুষ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে।

"বাবু, ডেডবডি আসবে নাকি?"

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দড়ি পাকানো চেহারার একটি প্রৌঢ় দাঁড়িয়ে আছে পেছনে। সে মাথা নাড়ল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, আজ সকালে রিকশায় দুই ভদ্রলোককে এখানে আসতে দেখেছেন? একজন খুব মোটা, গোঁফওয়ালা, আর দ্বিতীয়জন বিদেশি।"

"সাহেব?"

"হ্যাঁ। আমরা এককালে সাহেবই বলতাম।"

"এসেছিল। এই আমাকেই জিজ্ঞেস করল এই শ্মশানে কোনও সাধু আছে কিনা। এখানে সাধু থাকবে কী করে? ওদের বলে দিলাম অন্য শ্মশানের খোঁজ করতে।"

"কোথায় গেল ওরা?"

"দেবী চৌধুরানীর কালীমন্দিরের ওপাশে যে শ্মশান আছে, সেখানে চলে গেল। রিকশাওলাটা আজ ভাল কামাবে।" লোকটা হাসল।

"রিকশাওলাটাকে তুমি চেনো?"

"চিনব না? এখানে টান মারতে আসে। রিকশার হ্যান্ডেলে চাকা লাগিয়েছে, প্যাডল করলেই বনবন করে ঘোরে।" লোকটা বলল।

শ্মশান থেকে বেরিয়ে এল অর্জুন। হঠাৎ মেজর কেন সাধুর খোঁজে শ্মশানে ঘুরছেন? কাল রাত্রে তো এসব কথা বলেননি। আর শ্মশানে তো শুধু সাধুসন্ন্যাসীরাই থাকেন না, বাজে লোকেরও তো এটা আস্তানা। বিপদে পড়ার সম্ভাবনা কম নয়।

এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রাস্তা ছেড়ে খানিকটা দূরে যাওয়ার পর দ্বিতীয় শ্মশানটা দেখতে পেল অর্জুন। বাইক থামিয়ে বুঝতে পারল এখানে ওরা নেই। রাস্তা থেকেই জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এটি এককালে শ্মশান ছিল কিন্তু এখন শহরের লোকজন এখানে মৃতদেহ দাহ করাতে আসে না। মিছিমিছি না ঘুরে রাজবাড়ির সামনে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে বলে অর্জুন এগোতেই দূর থেকে রিকশাটা দেখতে পেল। খালি রিকশা ছুটে আসছে। গলা খুলে হিন্দি সিনেমার গান গাইছে রিকশাওলা। আর একটু কাছাকাছি হতে দেখা গেল রিকশার হ্যান্ডেলে রঙিন গোলাকার কিছু বনবন করে ঘুরছে। মাথায় কথাটা আসামাত্র অর্জুন বাইক থামিয়ে লোকটাকে থামতে বলে। ব্রেক কষলেও খানিকটা এগিয়ে গেল লোকটা। তারপর চিৎকার করে বলল, "আজকে আর রিকশা চালাব না বাবু, আপনি অন্য রিকশা দেখুন।"

অর্জুন বাইক ঘুরিয়ে রিকশার পাশে চলে এল, "অনেক রোজগার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ বাবু।" রিকশাওলা হাসল।

"ওদের দু'জনকে কোথায় ছেড়ে এলে?"

"আপনি—।"

"আমি ওদের বন্ধু।"

"অ। ওঁরা গাড়ি ভাড়া করে চলে গেলেন। আমাকে কন্ট্রাক্টের টাকা দিয়ে দিয়েছেন। আপনি তো এখানেই থাকেন, না?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ওঁরা কোথায় গিয়েছেন?"

"শ্মশান ঘুরতে। বার্নিশের ওখানে প্রথমে গিয়েছেন।"

অর্জুন দাঁড়াল না। তিস্তা ব্রিজ পার হয়ে বার্নিশে পৌঁছে খোঁজ করতে করতে

শ্মশানে চলে এল। এসেই বুঝল ওঁরা এখানে নেই, থাকলে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। এখানে শ্মশান মাঠের ওপর। ছন্নছাড়া। কিছু খবর পাওয়ার আশায় সে বাইক থেকে নামতেই গলা শুনতে পেল, "বাবু!"

অর্জুন গোরক্ষনাথকে এখানে আশা করেনি। গোরক্ষনাথ ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে। আজ ওর পরনে গেরুয়া লুঙ্গি, গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে বিশাল ঝোলা।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এখানে?"

"এই শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ানোটাই তো আমার কাজ। আপনার তো এসবে ঠিক আস্থা নেই, আপনি কীসের সন্ধানে এলেন?"

"বিদেশ থেকে দু'জন মানুষ এসেছেন। আমার বিশেষ পরিচিত। ওঁরাও শ্মশান ঘুরতে বেরিয়েছেন। ওঁদের খোঁজে এসেছি।"

"দু'জনের একজন কি সাহেব?"

"হ্যাঁ। এখানে এসেছিলেন ওঁরা?"

"আমি দেখিনি। একটু আগে শুনলাম, এখানে তান্ত্রিকের খোঁজ করছিলেন। তা বাবু, জলপাইগুড়ির শ্মশানে তো তান্ত্রিকরা নিয়মিত থাকেন না, হঠাৎ হঠাৎ আসেন।"

"ওঁরা কোথায় গিয়েছেন?"

"ধুকুয়ামারির শ্মশানে একজন সাধু আছেন, তাঁর কাছে গিয়েছেন বলে অনুমান করি। ধুকুয়ামারির কথা এখান থেকেই ওঁরা জেনেছেন।"

"সেটা এখান থেকে কতদূরে?"

"দূর আছে। আপনি যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

গোরক্ষনাথ অর্জুনের বাইকের দিকে তাকাল, "আমাকে যদি পেছনে বসতে দেন তা হলে সঙ্গে যেতে পারি। সাধুর কথা ক'দিন থেকে শুনছি, চোখে দেখে আসি।"

"বেশ তো।" অর্জুন বাইক থেকে নেমে দাঁড়াল। ওটাকে ঘুরিয়ে রাস্তার দিকে নিয়ে যেতে যেতে সে জিজ্ঞেস করল, "কাক, শকুন আর বেড়ালের খবর কী?"

"আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন বাবু?"

"আমি তো কিছুই করিনি, শুধু জানতে চাইছি ওদের পাওয়া গেল কিনা?"

"সহজে কি যায়? দুর্লভ বস্তু। উঠব?"

"হ্যাঁ।"

গোরক্ষনাথ উঠে বসতে অর্জুন বলল, "কালো বেড়াল, যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে, তাকে পেতে তো তেমন অসুবিধে নেই। এই শহরেই আছে।"

"থাকলেই তো হল না, কোথাও না কোথাও খুঁত থাকবেই। হয় চেহারায়, নয় ব্যবহারে। এই তো হয় মুশকিল।" গোরক্ষনাথ শক্ত করে হাতল ধরে বলল।

"ব্যবহারের খুঁত কীরকম?"

pathagar.net

"সে অনেক ব্যাপার। আমাদের চারপাশে অদৃশ্য হয়ে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, তাঁদের জব্দ করা তো সোজা কথা নয়! একটু খুঁত থাকলেই সব শেষ।"

অর্জুন বাইক চালু করল, "তা তো বটেই। কাক বা শকুনের ব্যাপারটা সত্যি কঠিন, কিন্তু ওই ধরনের বেড়াল তো গতকালই পাওয়া গিয়েছে, তাই না?"

মুখ না দেখতে পেলেও অর্জুন বুঝতে পারল গোরক্ষনাথ খুব অবাক হয়ে গিয়েছে। তার গলা বদলে গেল, "আপনি কী করে জানতে পারলেন?"

"দেখুন, কোনও সাধারণ মানুষ, কালো বেড়াল যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে তাকে বাড়িতে নিয়ে এসে পুষতে চাইবে না। কালো বেড়ালকে সবাই অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে ভাবে। তার ওপর যদি ওটা বাচ্চা না হয় তা হলে তো কথাই নেই।" অর্জুন বাইক চালাতে চালাতে বলছিল, "গত রাত্রে রেসকোর্সের কাছে একটা বাড়ি থেকে কালো বেড়াল চুরি গিয়েছে, যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে।"

"কী বলছেন বাবু, চুরি গিয়েছে?"

"হ্যাঁ। যাঁর বেড়াল তিনি ডায়েরি করেছেন থানায় এসে।"

"আপনার কি মনে হয় আমি ওটাকে চুরি করেছি?"

"আমি জানি না। তবে প্রয়োজন পড়লে তো মানুষ অনেক কিছু করে। সামনের রাস্তাটা দু'দিকে ভাগ হয়েছে, কোনদিকে যাব?"

"ডান হাতের রাস্তা। কিন্তু বাবু, আমি চুরি করিনি।"

"তা হলে শহরে আর-একজন মানুষ আছে, যার কালো বেড়াল প্রয়োজন।" অর্জুন বলল, "সন্দীপ মিথ্যে ডায়েরি করবে কেন?"

"সন্দীপবাবুই ডায়েরি করেছেন?"

"বাঃ, ওর সঙ্গে চেনাশোনা আছে?"

"না, ঠিক চিনি না।"

"মিথ্যে বলা কি ঠিক হচ্ছে? গোরক্ষনাথ, ভূতপ্রেত হয়তো তেমন কিছু করলে ভয় পেতে পারে, পুলিশ কিন্তু পাবে না।"

"পুলিশ আমাকে ধরবে?"

"সন্দীপের বেড়াল চুরি করলে নিশ্চয়ই ধরবে।"

"কিন্তু আমি চুরি করিনি। খবর পেয়ে ওই বাড়িতে গিয়েছিলাম। চাকরের কাছে বেড়ালটার যা বর্ণনা পেলাম তাতে মনে হল ওইরকম একটাকেই আমি খুঁজছি। একদিন সন্দীপবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি তো আমাকে প্রায় মারতে বাকি রেখেছিলেন। কোথায় থাকি, কী করি, জেনে নিয়ে তাড়িয়ে দিলেন।"

"তারপর?"

দু'পাশে তখন জঙ্গল শুরু হয়ে গিয়েছে। কীরকম স্যাঁতসেঁতে গন্ধ বাতাসে। গোরক্ষনাথ বলল, "কাল রাত্রে আমি অবাক। উনি, মানে সন্দীপবাবু আমার বাড়িতে আসবেন, আমি ভাবতে পারিনি। বললেন, আমি যেন কয়েকদিন বেড়ালটাকে আমার কাছে রেখে দেখি ও পোষ মানছে কিনা। দশদিন পরে এসে

খোঁজ নেবেন। আর বেড়ালটার কোনও ক্ষতি হলে উনি সহ্য করবেন না। বলুন, আমি কি চুরি করেছি?"

"সন্দীপ যে গিয়েছিল, আপনার সঙ্গে এসব কথা হয়েছে, তার কোনও সাক্ষী আছে?"

"সাক্ষী?" গোরক্ষনাথ যেন একটু ভাবল, তারপর বলল, "ওই বেড়ালটাই তো আমার কাছে আছে। আমার তো সংসার নেই, যে বুড়িটা দুটো রেঁধে দেয়, সে সব শুনেছে।"

বাঁক ঘুরতেই গাড়িটাকে দেখতে পেল। পুরনো অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ড্রাইভার পেছনের সিটে শুয়ে আছে। জঙ্গলে ঘেরা কিছুটা খোলা জমি যে শ্মশান, তা বুঝতে অসুবিধে হল না। ওপাশে দুটো টিনের বাসাওয়ালা ঘর দেখা যাচ্ছে। কিন্তু মেজরদের দেখতে পেল না অর্জুন।

"এখানে তেনারা আছেন।" গোরক্ষনাথ বাইক থেকে নেমে নাক টানল।

"কারা?"

"তেনারা। আমি ঘ্রাণ পাচ্ছি। হ্যাঁ, আছেন। ধুকুয়ামারির এই শ্মশানের নাম শুনেছিলাম। কিন্তু কখনও আসা হয়নি।" দুটো হাত মাথার ওপরে তুলে তিন-চারবার কাউকে নমস্কার জানাল গোরক্ষনাথ। অর্জুনের হাসি পাচ্ছিল। গোরক্ষনাথ এমনভাবে কথা বলল, যেন সত্যি ভূতপ্রেতরা এই শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বলল, "চলুন, একটু ঘুরে দেখা যাক। আর হ্যাঁ, সামনে যদি তেনাদের কেউ পড়েন তা হলে আমাকে সতর্ক করে দেবেন, যাতে ধাক্কা না লাগে।" অর্জুন পা বাড়াল।

পেছন পেছন আসছিল গোরক্ষনাথ, "আমি জানি আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, ঠাট্টা করছেন। কিন্তু আপনাকে আমি প্রমাণ দেবই।"

ওদের কথা শুনেই হয়তো একটা ঘর থেকে রোগা লিকলিকে এবং খাটো শরীরের মানুষটি বেরিয়ে এল। ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই, একটা হাফপ্যান্ট জাতীয় বস্তু পরনে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

অর্জুনের আগেই গোরক্ষনাথ জবাব দিল, "সাধুদর্শনে এসেছি ভাই।"

"কোত্থেকে আসা হচ্ছে?"

"জলপাইগুড়ি শহর থেকে।"

"এখন তার দর্শন পাবেন না।"

"একটু যদি অনুগ্রহ করেন, অনেকদূর থেকে এলাম—।"

"ওই যে গাড়ি দেখছেন, ওতে করে সেই আমেরিকা থেকে দু'জন এসেছেন। বাবা তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। শ্মশানে মড়া না এলে বাবা কাউকে দর্শন দেন না। মড়া নিয়ে আসুন, বাবাও দর্শন দেবেন।" কথা শেষ করে ঘুরে দাঁড়াল লোকটাও।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "যাঁরা ওই গাড়িতে এসেছেন তাঁরা কোথায়?"

লোকটা উলটোদিকের জঙ্গলটা হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। গোরক্ষনাথ বলল, "কী সর্বনাশ। মড়া পাই কোথায়?"

অর্জুন কোনও কথা না বলে সোজা এগিয়ে গেল। সরু পায়েচলা পথটায় পা দিতে মেজরের গলা শুনতে পেল। বেশ রেগে গিয়েছেন, "তুমি তো হে চাণক্যের যমজ ভাই, পাজির পাঝাড়া। আমাকে তুমি চেনো না? আফ্রিকার কতবড় শয়তানকে এক ঘুসিতে শুইয়ে দিয়েছি আর তুমি তো তার তুলনায় একটা আস্ত ছারপোকা। দাও, আসলি জিনিস চাই।"

অর্জুন কয়েক পা এগোতেই ওদের দেখতে পেল। একটা ডোবার পাশে পাথরের ওপর বসে আছেন মেজর। তাঁর সামনে দুটো বড় মাটির হাঁড়ি নিয়ে বসে আছে একজন বৃদ্ধ আদিবাসী। মেজরের ধমক খেয়ে হাঁড়ি থেকে তরল পদার্থ মাটির গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে ধরল সামনে। খপ করে সেটি নিয়ে মেজর একটু গলায় ঢাললেন। তারপর সোল্লাসে বলে উঠলেন, "গ্রেট। এই তো, এই জিনিস চাই। সক্রেটিস যদি তোমাকে পেত তা হলে কক্ষনো ছাড়ত না। আঃ!" পুরোটা গলায় চালান করে মাথা নাড়লেন মেজর।

"আপনি হাঁড়িয়া খাচ্ছেন?" অর্জুনের মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে এল।

মেজর মুখ ফেরালেন। চোখ ছোট করে দেখার চেষ্টা করলেন, "হু আর ইউ? কে তুমি? কোন সেন্ট?"

"আমি অর্জুন।"

"ও, তৃতীয় পাণ্ডব। তাই বলো। এসো এসো। বুঝলে, আমি পৃথিবীর কত জায়গায় গিয়েছি, গিয়ে সেখানকার সেরা জিনিস পান করেছি। কিন্তু এর মতো ভাল পানীয় কোথাও পাইনি। শুধু এই বস্তু ভালভাবে বোতলে ভরে রফতানি করলে তুমি টাকার পাহাড়ের ওপর শুয়ে থাকতে পারবে।"

"আমি আপনাকে সকাল থেকে খুঁজছি।"

"হোয়াই? আমি যে তোমার মাকে বলে এলাম দুপুরে খাব, তুমি খবর পাওনি?" মেজর চোখ বড় করলেন।

"আপনি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলেন?"

"ইয়েস। তারপর থেকে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছি গোরানের সঙ্গে। সে ব্যাটা গেল কোথায়?" মেজর উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে সফল হলেন।

এই সময় পাশের জঙ্গল থেকে গোরানসাহেব বেরিয়ে এলেন। তাঁর শার্ট ছিঁড়ে গেছে। ডান হাতে একটা পাখি ছটফট করছে। গোরক্ষনাথের দিকে গোরানসাহেব তাকাতেই সে শিউরে উঠল। অর্জুন শুনল, "বাবু, ইনি কে?"

"কেন?"

"দেখছেন না শকুন ধরে এনেছেন। বাবু, সাবধান।" গোরক্ষনাথ থরথর করে কাঁপছিল।

॥ ৬ ॥

মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, "এ হে হে। তুমি শেষপর্যন্ত একটা শকুন ধরে নিয়ে এলে!" বাক্যটি ইংরেজিতে বলা হয়েছিল। গোরানসাহেব হাসলেন। পাখিটাকে ওপরে তুলে দেখলেন, "আমি জানতাম না শকুনেরা এত ভিতু হয়। তারপর এ বেচারা খোঁড়া!"

"খোঁড়া? খোঁড়া শকুন?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"ইয়েস। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল বলে সহজে ধরতে পারলাম। এটার ডানায় বোধ হয় জোর কম।" গোরানসাহেব দু' চোখ ভরে শকুনটাকে দেখছিলেন।

"ছেড়ে দাও। ওটাকে ছেড়ে দাও।" মেজর চিৎকার করলেন।

"কেন? ওইভাবে চিৎকার করে ছেড়ে দিতে বলছ কেন?"

"কী করবে ওটা দিয়ে? শকুন পোষ মানে না।"

"পোষ মানে না?"

"হ্যাঁ। যে প্রাণীর চোখে পলক পড়ে না, সে কখনওই পোষ মানে না। শকুনের মাংস অত্যন্ত কুৎসিত, কেউ কখনও খেয়েছে বলে জানি না। তা ছাড়া এ-দেশে সবাই শকুনকে অমঙ্গলের পাখি বলে এড়িয়ে যায়।"

"অমঙ্গলের পাখি?"

"তোমার তো আমার চেয়ে ভাল জানা উচিত।"

অর্জুন এবং গোরক্ষনাথ চুপচাপ শুনছিল সংলাপগুলো। হঠাৎ গোরক্ষনাথ ফিসফিস করে বলল, "ওই শকুনটাকে যেন ছেড়ে না দেয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

গোরক্ষনাথ বলল, "দেখতে হবে জন্ম থেকে খোঁড়া কিনা!"

গোরানসাহেব মেজরের পাশে পৌঁছে গিয়েছিলেন, "এটাকে ঠিক ফরেস্ট বলা যায় না। সাধুটার ব্যাপারে কিছু খবর পেলে?" কথা বলার সময় ওঁর হাতে শকুনটা ছটফটিয়ে উঠতেই গোরক্ষনাথ চেঁচিয়ে উঠল, "ছেড়ে দেবেন না।"

গোরানসাহেব এবার গোরক্ষনাথের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, "এ কে?"

অর্জুন এগিয়ে গেল, "ওঁর নাম গোরক্ষনাথ।"

গোরক্ষনাথ দুই হাত কপালে তুলে নমস্কার করল।

মেজর বাংলায় বললেন, "এরকম নাম এখনও কেউ রাখে? উচ্চারণ করতে গোরানের দাঁত ভেঙে যাবে। তা বাবা গোরক্ষনাথ, তুমি কী করো?"

গোরক্ষনাথ হাত নামাল না কপাল থেকে, "আজ্ঞে, শান্তি স্বস্ত্যয়ন।"

"সেটা কী জিনিস?"

"আজ্ঞে, তেনারা যাতে মানুষের অপকার না করতে পারে তাই মন্ত্র পড়ে সব শুদ্ধ করে দিই। আমার গুরুর কাছ থেকে এসব শিক্ষা পাওয়া।"

"তেনারা মানে?"

"দুষ্ট আত্মা।"

"আচ্ছা!" মেজর গোরানসাহেবের দিকে ঘুরলেন। তাঁকে ইংরেজিতে গোরক্ষনাথের পরিচয়টা দিলেন। গোরানসাহেব পাখিটাকে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, "এটাকে তুমি চাও?" ইংরেজিতে প্রশ্নটা করা সত্ত্বেও বলার ভঙ্গিতে বুঝে নিয়ে গোরক্ষনাথ দ্রুত মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

গোরানসাহেব কিছুক্ষণ গোরক্ষনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দেখা গেল গোরক্ষনাথও চোখ সরাচ্ছে না। হঠাৎ সাহেবের ঠোঁটে অদ্ভুত একটা বাঁকা হাসি ফুটল। তিনি হাত বাড়ালেন, "নাও।"

গোরক্ষনাথ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে পাখিটাকে ধরল। ওর মাথা নীচের দিকে ঝুলছিল। হাতবদলের সময়ে সেটা তুলে ঠোকরাবার চেষ্টা করেও বিফল হল। ঝোলা থেকে একটা দড়ি বের করে প্রথমে এক হাতেই পাখির পা দুটো বেঁধে ফেলল গোরক্ষনাথ। তারপর মাটিতে শুইয়ে ঠোঁট দুটো শক্ত করে বেঁধে খোঁড়া পায়ের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ ধরে সেটাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে।

মেজর উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, "কী দেখছ ওরকম করে?"

"আজ্ঞে, দেখছি এর পা জন্ম থেকে খোঁড়া কিনা। ঠিক বুঝতে পারছি না। এই হয় মুশকিল। হয়তো জন্মাবার পরে চোট লেগে খোঁড়া হয়েছে, এখন কোনও টাটকা ঘা নেই, গোলমাল হয়ে যাবে।"

"কীসের গোলমাল?"

এই সময় হরিধ্বনি উঠল। বোঝা গেল শ্মশানে মৃতদেহ এসেছে। বেশ সাজ সাজ রব পড়ে গেল যেন। মেজর গোরানসাহেবকে বললেন, "তুমি খুব ভাগ্যবান। আজই ডেডবডি নিয়ে এসেছে সৎকার করার জন্যে।"

গোরানসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে ওই সাধুটার দেখা পাওয়া যাবে?"

"তাই তো বলেছে। চলো, ওদিকে যাই।" দু'পা হেঁটে আবার পেছন ফিরে তাকালেন মেজর, "এঃ, এতক্ষণ কী খেলাম হে! নেশার ন পর্যন্ত হয়নি। অথচ তখন কী স্বাদ লাগছিল। যাঃ, মেজাজটাই চলে গেল।"

অর্জুন এবার মেজরের মুখোমুখি, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

"কোন ব্যাপারের কথা জানতে চাইছ তা না জানলে কী করে বলব?"

"এই যে আপনারা শ্মশানে শ্মশানে ঘুরছেন, তার কারণটা কী?"

"তোমাকে বলিনি? আচ্ছা, পরে বলব। আজকাল সব কথা মনে থাকে না। কিন্তু এই লোকটি খুব ইন্টারেস্টিং। কী হে, কী বুঝলে?" প্রশ্নটা গোরক্ষনাথকে।

"ধরতে পারছি না বাবু। পরীক্ষা করতে হবে।"

"ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে? অর্থপেডিক ডাক্তার?"

"না বাবু। তার দরকার নেই। অন্ধকারে চোখ জ্বলে এমন কালো বেড়ালের সামনে নিয়ে গেলে সে ব্যাটা যদি চোখ বন্ধ করে তা হলেই কেল্লা ফতে।" পাখিটাকে নিয়ে গোরক্ষনাথ উঠে দাঁড়াল।

গোরানসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ও পাখিটাকে নিয়ে কী করবে? তুমি বললে শকুন পোষ মানে না, মাংস খাওয়া যায় না, তোমরা এটাকে অমঙ্গল বলে মনে করো। তা হলে এই লোকটা নিয়ে যাচ্ছে কেন?"

অর্জুন ইংরেজিতে জবাবটা দিল, "ওর ধারণা আমরা সাদা চোখে যা দেখতে পাই না, জন্ম থেকে খোঁড়া শকুন তা দেখতে পায়। তবে একা শকুন থাকলে হবে না, জন্ম থেকে কানা কাক আর কালো বেড়াল যার চোখ অন্ধকারে জ্বলে, তাদেরও সঙ্গে থাকতে হবে। এই তিনটে প্রাণী দিয়ে গোরক্ষনাথ প্রেতাত্মা তাড়ায়।"

মেজর হো হো করে হাসতে লাগলেন। তাঁর বিশাল ভুঁড়ি কাঁপতে লাগল। হাসতে হাসতে তিনি বেঁকে যাচ্ছিলেন। সেটা সামলে বললেন, "বিজ্ঞান, তোমার বারোটা বাজিয়ে এরা ছাড়বে। অবশ্য গোরানসাহেব যখন ড্রাকুলা আছে বলে বিশ্বাস করে তখন এদের দোষ কী?"

"কাল রাত্রে আপনিই কিন্তু বলেছিলেন, আপনার জ্ঞান শেষ কথা নয়।"

"বলেছিলাম। তবু মাঝে মাঝে যখন হজম করতে অসুবিধে হয় তখন প্রাণ খুলে হেসে নিই। যাকগে, চলো, সাধুর দর্শন পাওয়া যায় কিনা দেখি।"

মাঠের মধ্যে ইতিমধ্যেই চিতা সাজানোর কাজ চলছে। মৃতদেহটিকে একপাশে মাটির ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একজন যুবক তার পা ছুঁয়ে বসে আছে বিমর্ষ মুখে। যে লোকটি মেজরকে দিশি মদ বিক্রি করছিল এখন তার চারপাশে ভিড় জমে গেছে। সেই রোগা লোকটি এখন চিতা সাজানোর কাজটা তদারকি করছে।

ওরা হেঁটে এল মৃতদেহের পাশে। লোকটি প্রবীণ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। একটা বড় আঁচিল রয়েছে নাকের ওপর। খুব কষ্ট পেয়ে মারা গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। সাহেব দেখেই বোধ হয় শ্মশানযাত্রীদের দু'জন পাশে এসে দাঁড়াল।

একজন বলল, "কাল বিকেলেও গগনদা গল্প করেছে। সন্ধের পরে তেঁতুলতলায় গিয়েছিল। সেখানেই পড়ে যায় মাটিতে।"

"তেঁতুলতলা মানে?"

"আজ্ঞে, আমাদের গাঁয়ের উত্তর দিকে একটা তেঁতুলবন আছে। সূর্য ডুবে গেলে ওদিকে কেউ যেতে চায় না। বুঝতেই পারছেন। গগনদা যে কেন গেল!" লোকটা নিশ্বাস ফেলল।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের গ্রামটা কতদূরে?"

"এই তো। আট ক্রোশ হবে। গ্রামের নাম হতুমপুর।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"পুলিশ?"

"হ্যাঁ। এঁর মৃত্যুটা তো স্বাভাবিকভাবে হয়নি।"

"না বাবু। পুলিশ মানেই ঝামেলা। সকালে খবর দিলে বিকেলে আসবে। এসে ওঁকে নিয়ে গিয়ে থানায় ফেলে রাখবে। গাড়ি পেলে সদরে নিয়ে যাবে পরীক্ষা করতে। সেখান থেকে যখন ছাড়িয়ে আনব তখন পচে-গলে যা হবে তাতে

গগনদাকে আর চেনা যাবে না। মানুষটা ভাল ছিল, মরার পর অত কষ্ট দিয়ে লাভ কী? পুলিশকে খবর দিলে তো তারা এসে জীবন ফিরিয়ে দেবে না।"

"কিন্তু এই যে দাহ করতে এসেছেন, ডেড সার্টিফিকেট লাগবে না?"

"অসুখ হলে ওষুধ দেওয়ার ডাক্তার যেখানে নেই, সেখানে—।" লোকটি হাসল।

গোরানসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

মেজর তাঁকে ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিতেই তিনি উত্তেজিত হলেন, "ওদের বলো, আমরা ওই তেঁতুলতলায় যেতে চাই।"

"ঠিক আছে, এত ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। গ্রামের নাম তো জেনে নিয়েছি, যাওয়া যাবে। এখন এদের সবার মনখারাপ, সৎকারটা করতে দাও।" মেজর কথা শেষ করতেই রোগা লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "লাশটাকে চিতায় ওঠাও।"

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই তৎপর হল। হরিধ্বনি উঠল। গগনকে চিতায় শোওয়ানো হল।

রোগা লোকটা ছুটে গেল বন্ধ ঘরের সামনে। কী বলছে শোনা গেল না এত দূর থেকে। বলাবলির পর সে চিৎকার করল, "সরে যাও, চিতার সামনে থেকে সরে যাও। পরমপূজনীয় বাবা ত্রিকালজ্ঞনাথ এখন দর্শন দেবেন।"

দরজা খুলে গেল। দীর্ঘকায় একজন প্রৌঢ়, পরনে লাল কৌপীন, হাতে ত্রিশূল, সমস্ত শরীর ছাই-এ ঢাকা, মাথায় বিশাল জটা, ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা চিতার সামনে এসে দাঁড়ালেন। কয়েক সেকেন্ড চোখ বন্ধ করে থাকার পর আচমকা চিৎকার করে উঠলেন, "যাঃ। যাঃ। এখান থেকে দূর হ। যা করার তো করেছিস, এবার ওকে যেতে দে। মা, মাগো, এই অভাগাকে পার করে দাও মা।"

অর্জুনের পেছনে দাঁড়িয়ে গোরক্ষনাথ ফিসফিস করে বলল, "বৈতরণীর কথা বলছে। স্বর্গে যেতে হলে বৈতরণী পার হতে হয়। তিস্তার চেয়েও ভয়ঙ্কর নদী।"

এবার ত্রিশূল হাতে বাবা ত্রিকালজ্ঞনাথ চিতা-পরিক্রমা শুরু করলেন। মাঝে মাঝে শূন্যে ত্রিশূলটাকে এমনভাবে ঘোরাচ্ছেন, যেন কাউকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তারপর মৃতদেহের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, "দে, ওর শরীর মাটিতে মিশিয়ে দে।"

সঙ্গে-সঙ্গে হরিধ্বনি উঠল। সাধুবাবা হাঁটতে লাগলেন তাঁর ঘরের দিকে, পেছন পেছন সেই রোগা লোকটা। গোরান বললেন, "চলো, ওর সঙ্গে কথা বলা যাক।"

সাধুবাবা ঘরে ঢোকেননি। দরজার পাশে একটা কাঠের টুল এনে দিল রোগা লোকটা, তার ওপর বসে তিনবার মা ডাক ছাড়লেন। তারপর অর্জুনদের দিকে তাকিয়ে বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী চাই?"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকাতেই ওর একটু বদমায়েশি করার ইচ্ছে হল। অর্জুন বলল, "এঁরা আপনাকে দর্শন করতে আমেরিকা থেকে এসেছেন।"

"আমেরিকা! সেখানে আমার খবর পৌঁছে গেছে নাকি?"

"আপনি বাবা ত্রিকালজ্ঞনাথ। তিনকাল একসঙ্গে দেখতে পান। আমেরিকা তো বাড়ির কাছেই।" অর্জুন সবিনয়ে বলল।

গোরানসাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি প্রেতাত্মা দেখেছেন?"

সাধুবাবা সন্দেহের চোখে তাকালেন, "কী বলছে ও?"

মেজর বললেন, "আপনি তো এই শ্মশানে থাকেন। তাই সাহেব জানতে চাইছেন আপনার সঙ্গে পরলোকে যাঁরা থাকেন তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হয় কিনা?"

"আলবত হয়। একশোবার হয়। কিন্তু তাতে ওর কী এসে যাচ্ছে?"

"আজ্ঞে, এই সাহেব ওঁদের নিয়ে গবেষণা করেন।"

"কী শোনা?"

"আজ্ঞে, শোনা নয়, গবেষণা। পরীক্ষা।"

"ও মাস্টার।" খপ করে এক মুঠো মাটি তুললেন ত্রিকালজ্ঞনাথ, "কী আছে আমার হাতের মুঠোয়?" মুঠো বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে, মাটি।" মেজর জবাব দিলেন।

"বাঃ। তুমি যেভাবে দেখতে পেলে ঠিক সেইভাবেই আমি ওদের দেখতে পাই। যে লোকটা মরেছে তার আত্মা বেচারি চিতার পাশে ঘুরঘুর করছে। পুরনো আত্মারা ওকে দলে নেবে বলে এসেছে, কিন্তু যতক্ষণ না ওর শরীর ছাই হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ ওকে একা থাকতে হবে।" সাধুবাবা মুঠোর মাটি ছুঁড়ে দিলেন রোগা লোকটার গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, "আঃ, ওঃ, মারবেন না।"

"কেন ঢুকেছিস? ওকে ছেড়ে ওই জঙ্গলে গিয়ে দাঁড়া।" সাধুবাবা বলামাত্র রোগা লোকটি হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল। সাধুবাবা হাসলেন, "ব্যাটারা এত দুষ্টু, একটু সুযোগ পেলেই শরীরে ঢুকে পড়ে। প্রাকৃতিক কাজ করে হাত না ধুলে আর রক্ষে নেই। গলা খুলে বলো সবাই, মা, মা। মা ডাক শুনলে ওরা পালাবে।"

একমাত্র রোগা লোকটি কয়েকবার মা মা বলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘরে ঢুকে গেল। মেজর গোরানসাহেবকে বললেন, "ইনি ঘোস্ট দেখেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। কিছু যদি জিজ্ঞেস করার থাকে তো করতে পারো।"

গোরানসাহেব বললেন, "একটা প্রমাণ দিতে বলো।"

মেজর সেটা জানাতে ত্রিকালজ্ঞনাথ খেপে গেলেন, "কী? মাস্টার আমাকে পরীক্ষা করতে চাইছে? দেব বাণ মেরে, মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বের হবে। হুঁ।"

"আপনি রাগ করবেন না। উনি খ্রিস্টান সাহেব, সহজে বিশ্বাস করেন না।"

"কেন? একটু আগে আমি একটাকে ওর শরীর থেকে তাড়ালাম, দ্যাখোনি?"

গোরানসাহেবকে সেটা অনুবাদ করে শোনাতে তিনি বললেন, "ওটা তো অভিনয় হতে পারে। সত্যি-মিথ্যে বুঝব কী করে?"

মেজর অর্জুনের দিকে তাকালেন, "এ-কথা বাংলায় ওকে বলার সাহস হচ্ছে না হে।"

অর্জুন বলল, "আপনি একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন বাবা। উনি একে খ্রিস্টান, তার ওপর সাহেব। আপনি যেমন বাণ মারতে জানেন তা হিন্দুদের ওপর কাজ হলেও হতে পারে, কিন্তু সাহেবদের ওপর নয়।"

"কী করে সেটা বোঝা গেল?"

"আপনি নিশ্চয়ই জানেন সাহেবরা আমাদের দেশে দুশো বছর রাজত্ব করেছিল। তাদের তাড়াবার জন্যে কত আন্দোলন হয়েছিল। সে সময় আপনার মতো কয়েকজন সাধু সাহেবদের ক্ষতি করার জন্যে বাণ ছেড়েছিলেন। কোনও কাজ হয়নি।" অর্জুন চটপট বানিয়ে গল্পটা শোনাল।

দ্রুত মাথা দোলালেন ত্রিকালজ্ঞনাথ, "তার একটাই কারণ, ওরা ম্লেচ্ছ ভাষায় কথা বলে। মা, মাগো।" এই সময় রোগা লোকটা এক ছিলিম গাঁজা নিয়ে এসে ওঁর হাতে দিতেই তিনি আবার মা মাগো বলে টান দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে রোগা লোকটা হাত পাতল, "অনেক কথা হয়েছে। এবার বাবার সেবার জন্যে শ'খানেক টাকা ছাড়ুন।"

গোরানসাহেব ওর হাত বাড়ানো দেখে কিছুটা আন্দাজ করে মেজরকে বললেন, "বোধ হয় টাকা চাইছে, ওকে জিজ্ঞেস করুন, এদিকে কোনও ড্রাকুলা আছে নাকি! ঠিকঠাক খবর দিলে অনেক টাকা দেব।"

মেজর সেটা বাংলায় বুঝিয়ে বলতেই ত্রিকালজ্ঞনাথ চোখ কপালে তুললেন। লাল টকটকে চোখ। উদ্‌ভ্রান্তের মতো জিজ্ঞেস করলেন, "ড্রাকুলা? সেটা কী?"

"কিছু প্রেতাত্মা আছে যারা মানুষের শরীর ধারণ করে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে। রাত নামলেই তারা সক্রিয় হয়। রক্তচোবা বাদুড়ের মতো মানুষের গলায় দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে খায়। ওরা খুব ভয়ঙ্কর এবং নিষ্ঠুর। এদের ড্রাকুলা বলে।"

"শরীর পাবে কোথায়? নিজের শরীরটাকে তো আত্মীয়রা ছাই করে দেবে। অন্যের শরীরে ঢুকলে ঘুমিয়ে পড়লে বিপদ হতে পারে।"

"যাদের কবর দেওয়া হয়—।"

"অ। সেটা বলতে পারে হাসিমারার পীর ফকির আলি। ভাল লোক। খুব ধর্মবিশ্বাসী লোক।"

ওপাশে হরিধ্বনি হচ্ছিল বারংবার। অর্জুন দেখল চিতা দাউদাউ করে জ্বলছে। গগন নামের মানুষটির আত্মা নিজের জ্বলন্ত চিতা দেখে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাচ্ছে। হঠাৎ খেয়াল হল গোরক্ষনাথ আশপাশে নেই। ত্রিকালজ্ঞনাথের সঙ্গে কথা বলার সময় সে কি সঙ্গে আসেনি?

মেজর একটি একশো টাকার নোট দিলেন রোগা লোকটির হাতে। সে যে খুব খুশি হল না বোঝা গেল মুখ দেখে। ত্রিকালজ্ঞনাথ বললেন, "যাচাই করো।"

লোকটার যেন মনে পড়ে গেল, "হ্যাঁ। বাবার কাছে তো অনেক মানুষ আসে।

ক'দিন আগে দু'জন তিব্বতি এসেছিল। সব জানার পর খুশি হয়ে ওরা একটা জিনিস দিয়ে গিয়েছে। পছন্দ হলে আপনারা নিতে পারেন।"

অর্জুন জানতে চাইল, "কী জিনিস?"

রোগা লোকটা ঘরে ঢুকে এল। ফিরে এল তক্ষুনি, "এই যে।"

অর্জুন দেখল কালো কষ্টিপাথরের একটি মূর্তি। ভয়ঙ্কর দর্শন। এটি কার মূর্তি তা সে জানে না। গোরানসাহেব হাত বাড়িয়ে নিলেন। হঠাৎ তাঁর মুখে সেই হাসি ফুটে উঠল, যে হাসিটাকে অর্জুন অমল সোমের বাগানে দেখেছিল। শঙ্খচূড় সাপটাকে যখন কাক ঠোকরাচ্ছিল তখন গোরানসাহেবের মুখে এইরকম শিরশিরে হাসি ফুটে উঠেছিল।

মেজর বললেন, "বাপরে বাপ। কী ভয়ঙ্কর। কার মূর্তি?"

ত্রিকালজ্ঞনাথ বললেন, "কালভৈরব। এই মূর্তি সঙ্গে থাকলে কেউ তোর অনিষ্ট করতে পারবে না। হ্যাঁ।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন গোরানসাহেবকে, "নেবে?"

"নিশ্চয়ই। কত দাম?"

মেজর অনুবাদ করলেন। ত্রিকালজ্ঞনাথ বললেন, "যাঃ তোদের শস্তায় দিয়ে দিলাম। পাঁচ হাজার দিয়ে যা।"

অর্জুন চমকে উঠল, "পাঁচ হাজার?"

"দশ বিশ পঞ্চাশ যা চাইব পাবলিক তাই দেবে। এ হল কালভৈরব।"

"কিন্তু সরকার যদি জানতে পারে তা হলে বিপদে পড়ব। পুলিশ ধরবে।"

"পুলিশ? এটা কি পুলিশের বাবার সম্পত্তি? এদেশের জিনিসই নয়। এটা আমায় দিয়েছিল তিব্বতিরা। আমাকে পুলিশ দেখাচ্ছ তুমি?"

কোনও অনুরোধ শুনলেন না তিনি। অগত্যা গোরানসাহেব কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা গুনে দিয়ে দিল রোগা লোকটাকে।

গাড়ির কাছে ফেরার পথে অর্জুন ইংরেজিতে বলল, "ওরকম ভয়ঙ্কর মূর্তির জন্যে পাঁচ হাজার টাকা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না।"

গোরানসাহেব বললেন, "মূর্তিটার বিশেষত্ব আছে। এর দাম অনেক বেশি হতে পারে। আমি তিব্বতি তান্ত্রিকদের ওপর লেখা একটা বইয়ে মনে হচ্ছে এইরকম এক মূর্তির ছবি দেখেছি।"

"কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে কোনও মূর্তি বিদেশে নিয়ে যাওয়া বেআইনি।"

"সেটা আমি জানি না। তবে এটা তো ভারতবর্ষের কোনও মূর্তি নয়। যাকগে, এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।" গোরানসাহেব গাড়ির দরজা খুললেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথায় যাবে?"

"বাড়ি ফিরব। আপনারা?"

"দেখি গোরান কী বলে?" তিনি গোরানসাহেবকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, "ওই লোকটা কীভাবে মারা গেল তা জানতে চাই। জায়গাটা জেনে

নিয়েছ তো?"

"হুঁ। হুতুমপুর।" মেজর ঘুরে দাঁড়ালেন, "পড়েছি মোগলের হাতে—। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। বুঝলে!"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন দুপুর। সে বলল, "হুতুমপুরের ব্যাপারটা সন্ধের আগে গেলে জানা যাবে না। এখন জলপাইগুড়িতে ফিরে চলুন। বিকেলে আবার রওনা হবেন। এর মধ্যে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে নেবেন।"

মেজরসাহেবকে অনেক বলে রাজি করাতে পারলেন। ওদের গাড়িটা শহরের দিকে বেরিয়ে যেতেই গোরক্ষনাথের দেখা পাওয়া গেল। চোরের মতো এগিয়ে এসে বাইকের পেছনে উঠে বসল।

"কোথায় ছিলে এতক্ষণ।" বিরক্ত হল অর্জুন।

"যা সন্দেহ করেছিলাম তাই ঠিক। এ ব্যাটা সাধু নয়, ভণ্ড।"

"কী করে বুঝলে?"

"আপনারা যখন বাইরে কথা বলছিলেন তখন আমি পেছনের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম। চোরাই জিনিসে ভর্তি। এঃ, এখানে এসে কোনও লাভ হল না। আপনি তো শহরে ফিরে যাচ্ছেন?"

"হ্যাঁ। তবে প্রথমে আপনার বাড়িতে যাব।"

"কেন?"

"বেড়ালটাকে দেখতে।" অর্জুন বাইক চালালো।

pathagar.net

॥ ৭ ॥

জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির পাশ দিয়ে গোরক্ষনাথের দেখানো পথ ধরে এগিয়ে পিচের রাস্তা ছেড়ে প্রায় মেঠো পথে বাইক নামাল অর্জুন। কিছু গাছগাছালি রয়েছে, টিনের বাড়িটা ভাঙাচোরা, অনেককাল হাত পড়েনি।

বাইক থেকে নেমে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গোরক্ষনাথ বলল, "পেটের ব্যবস্থা করতে হিমশিম খাই, বাড়িটা যে পড়ে যায়নি এই ঢের। আসুন, আসুন।"

ভাঙা টিনের দরজা খুলে গোরক্ষনাথ অর্জুনের সঙ্গে একচিলতে উঠোনে ঢুকল। উঠোনের একপাশে একটা পিঁড়িতে যে মহিলা বসে আছেন তাঁর বয়স অনুমান করা মুশকিল। মাথায় শনের মতো সাদা কিছু চুল, মুখের চামড়ায় মোটা মোটা ভাঁজ। ওদের দেখে চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন তিনি।

"বেড়ালটাকে মাছ দিয়েছ?" গোরক্ষনাথ জিজ্ঞেস করল।

"দিয়েছি। খায়নি ওটা। বিদায় কর, বিদায় কর গোরক্ষ।"

গোরক্ষনাথ অর্জুনের দিকে তাকাল, "এই হয়েছে বিপদ। বড়লোকের বাড়িতে দামি মাছ খেয়ে খেয়ে ব্যাটা এমন মুখ করেছে, শস্তার মাছে মন ভরছে না। খাবে, খিদে যখন ছোবল মারবে তখন ওই মাছ গিলতে হবে ব্যাটাকে।"

এই সময় বুড়ি চিৎকার করে উঠল, "ওটা কী? অ্যাঁ, ওটা কী?"

গোরক্ষনাথ পাখিসুদ্ধু হাতটা ওপরে তুলল, "শকুন। খোঁড়া শকুন।"

"ছ্যা ছ্যা ছ্যা। যত অমঙ্গল বাড়িতে ঢোকাচ্ছে। আমি থাকব না, এখানে আর কিছুতেই থাকব না। কালো বেড়াল, খোঁড়া শকুন।" বুড়ি সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল।

গোরক্ষনাথ একটা বড় খাঁচা বের করল। তারপর শকুনের একটা পা থেকে দড়ি খুলে মাটিতে রাখতেই সেটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। দড়ির অন্য প্রান্ত একটা গাছের ডালে বেঁধে বলল, "এটার ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

উঠোনের ওপাশে একটা ছোট্ট ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে চিৎকার করল গোরক্ষনাথ, "এ কী, তুমি গোটাকয়েক মাছ খেয়েছ বলে মনে হচ্ছে?" অর্জুন দেখল, বুড়ি মুখ বন্ধ করে মাথা দোলাল অস্বীকারের ভঙ্গিতে।

গোরক্ষনাথ রান্নাকরা দুটো ছোট মাছ নিয়ে বাইরে এসে শকুনটার সামনে ফেলে দিতেই পাখিটা মুখ ঘুরিয়ে দেখল। ওর মুখ এখনও বাঁধা, গোরক্ষনাথ বাঁধন খুলে দিতেই বোঝা গেল শকুনটা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত। নিমেষেই মাছ দুটোকে গলায় পুরে দিল পাখিটা। এবার খাঁচাটাকে নিয়ে বড় ঘরটার ভেতর ঢুকল গোরক্ষনাথ। অর্জুন লক্ষ করল ঘরটির দরজা-জানলা ভাল করে বন্ধ করে রাখা আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই গোরক্ষনাথ বেরিয়ে এল। ওর হাতের খাঁচার ভেতর একটা কালো বেড়াল বসে আছে। এমন গাঢ় কালো রঙের বেড়াল কখনও দেখেনি অর্জুন। সে এগিয়ে গেল। এবং তখনই নজরে পড়ল বেড়ালের গলায় একটা কালো কাপড়ের বেল্ট লাগানো রয়েছে। লোমের রঙের সঙ্গে মিশে থাকায় দূর থেকে আলাদা করে বোঝা যায়নি। বেড়ালটা চোখ বন্ধ করে আছে, সম্ভবত অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকায় বাইরের আলো সহ্য করতে পারছে না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এই সেই বেড়াল?"

"হ্যাঁ বাবু। ওই বুড়িকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। সন্দীপবাবু গতকালই এটাকে আমার হাতে দিয়ে গেছেন। ভীষণ বদমাশ। দাঁড়ান, পরীক্ষা করি।" নিজের জামা খুলে খাঁচাটার ওপর চাপিয়ে দিল গোরক্ষনাথ। বেড়ালটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। দড়ি ধরে শকুনটাকে টানতেই ওটা খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাঁচার দিকে এগিয়ে আসছিল। একেবারে খাঁচার গায়ে নিয়ে আসার পর গোরক্ষনাথ জামাটাকে তুলে নিতেই বেড়ালটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাগী আওয়াজ গলা থেকে বের করল। ওর চোখ এই দিনের আলোতেও বোঝা গেল, জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে শকুনটা চোখ বন্ধ করল। তারপর ধীরে ধীরে পা মুড়ে মাটিতে বসে পড়ল। ওটা বসামাত্র বেড়ালটা শান্ত হয়ে গিয়ে চোখ বন্ধ করে পা মুড়ে বসল।

হঠাৎ গোরক্ষনাথ দু'হাত তুলে নাচতে লাগল, "মিল গিয়া। দুটো পেয়ে গেছি। খোঁড়া শকুন আর কালো বেড়াল।" খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছিল সে।

বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিল অর্জুন। পরস্পরকে দেখামাত্র এই প্রাণীদুটো এমন

আচরণ করল কেন? বেড়ালটার রেগে যাওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু তারপরে এই যে সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী ভাব, এটার কারণ কী? শকুনটা যে সেই চোখ বন্ধ করেছে, আর খুলছে না।

অর্জুন হেসে জিজ্ঞেস করল, "এবার আপনার কানা কাক দরকার?"

"হ্যাঁ বাবু।" গোরক্ষনাথ গাছগাছালির দিকে তাকাল। সেখানে এখন কোনও কাক নেই। বলল, "দেখি এদের টানে সে ব্যাটা যদি এখানে এসে পড়ে—।"

অর্জুন বলল, "একটা অনুরোধ করছি। আজ সন্ধেবেলায় বাড়িতে থাকবেন।"

"সন্ধেবেলায়? কেন বাবু?"

"আপনি যেমন কানা কাকের সন্ধান করছেন আমিও তেমন কিছু করছি। সেটা পেতে আপনার সাহায্য চাই।"

"ঠিক আছে বাবু, আমি থাকব।" গোরক্ষনাথ মাথা নাড়ল।

বাইকে বসে অর্জুনের মনে হল একবার মেজরের খবর নেওয়া দরকার। ওঁরা খাওয়াদাওয়া করছেন কোথায় সেটা জানা তার কর্তব্য। কিন্তু তার পরেই মনে হল মেজর তো একবারও ও-ব্যাপারে কথা বলে গেলেন না। সম্ভবত সঙ্গে নিয়ে আসা টিনফুড খেয়ে ওঁদের দিব্যি চলে যাচ্ছে।

বাড়িতে ফিরে এসে সে ফাঁপরে পড়ল। মা একগাদা রান্না করে বড় টিফিন ক্যারিয়ারে ভর্তি করে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। দুপুর শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ ছেলে বাড়িতে ফিরছে না দেখে পাড়ার একটি ছেলেকে দিয়ে সেই টিফিন ক্যারিয়ার সার্কিট হাউসে পাঠিয়ে দিয়েছেন মেজরের লাঞ্চের জন্যে। মা যে নিজে থেকেই ওঁদের জন্যে রান্নাবান্না করবেন তা অর্জুন জানত না। তাই যখন বকুনি শুনতে হল, সে চুপচাপ মেনে নিল। স্নান খাওয়া শেষ করে সে ছুটল সার্কিট হাউসে। এখন বেলা তিনটে। মেজর তাঁর ঘরে নেই। ওঁদের পাওয়া গেল ডাইনিং রুমে। সেখানে দু'জন মুখোমুখি বসে। মাঝখানে মায়ের পাঠানো টিফিন ক্যারিয়ারের বাটিগুলো সাজানো।

ওকে দেখামাত্র মেজর চিৎকার করলেন, "আমি জীবনে কখনও দু'বার লাঞ্চ করিনি। কিন্তু এরকম খাবার পেলে দুশোবার করতে আপত্তি নেই। ওঃ, কী দারুণ রান্না। ডু ইউ নো গোরান, একে বড়ি বলে। তোমার চোদ্দ পুরুষ আজ খুশি হবে, কারণ তুমি বড়ি খাচ্ছ।"

হঠাৎ গোরানসাহেব উঠে দাঁড়ালেন। উনি ভুলে গেলেন ওঁর ডান হাত এঁটো। সেই অবস্থায় অর্জুনের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "তুমি খুব ভাগ্যবান মানুষ। তোমাকে খুব হিংসে হচ্ছে আমার। তুমি এই রান্না রোজ খাও! আহা।"

গতকাল থেকে এই লোকটিকে অর্জুন গোমড়া হয়ে থাকতে দেখেছে। বরং কিছু কিছু সময়ে ওঁর অভিব্যক্তি দেখে ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এখন ওঁকে এরকম আবেগে আক্রান্ত দেখে বেশ মজা লাগল অর্জুনের। সে বলল, "আপনারা বাড়িয়ে বলছেন।"

ওঁরা এ-কথা মানতে রাজি নন। চেটেপুটে খাওয়ার পর মেজর বললেন, "এখন একটু না গড়িয়ে নিলে অপরাধ হবে ভাই। তুমি জানো, আজ কী করেছি?"

"কী?"

"ফিরে এসে এক টিন সার্ডিন মাছ আর পাউরুটি খেয়ে হুইস্কির বোতলটা খুলব খুলব করছি, এই সময় টিফিন ক্যারিয়ার এসে হাজির। ছোকরা বলল, তোমার মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুলে দেখতে গিয়ে যে চমৎকার গন্ধ নাকে এল, তাতে মনে হল না খেয়ে থাকা যাবে না। কিন্তু গোরান তখন বাথরুমে। হুইস্কি খেতে গিয়ে মনে হল অ্যালকোহল যদি জিভের বারোটা বাজিয়ে দেয় তা হলে রান্নার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হব। তাই তখন থেকে হুইস্কি না খেয়ে বসে ছিলাম। গোরান বের হলে ওকে বললাম, ও প্রথমে খেতে রাজি হচ্ছিল না। তারপর ওর সামনে যখন আমি খাওয়া আরম্ভ করলাম তখন একটু টেস্ট করছি বলে বসে বেশিরভাগটাই মেরে দিল। বুঝলে হে, নিরামিষ রান্না যদি এমন হয় তা হলে হুইস্কি খাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

অর্জুন হাসল, "তা হলে এখন থেকে নিরামিষ শুরু করুন।"

"আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই জলপাইগুড়িতে আমি তো সারাজীবন থাকতে পারব না। যাগ গে,-তোমার প্রোগ্রাম কী?"

"ওই যে গোরান রাত্রে হুতুমপুরে যাবে!"

গোরানসাহেব হাসলেন, "অর্জুন, তুমিও চলো না আমাদের সঙ্গে।"

অর্জুন একটু ভেবে নিল। তারপর বলল, "আপনারা যে উদ্দেশে যাচ্ছেন সেটার জন্যে রাত একটু গভীর হওয়া উচিত। হুতুমপুরে দশটা নাগাদ পৌঁছলে কোনও আপত্তি আছে? এখান থেকে ন'টায় বের হওয়া যাবে।"

মেজরের যে ঘুম আসছিল তা বোঝা গেল, "পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা না ঘুমোলে শরীর ঠিক—, বুঝতেই পারছ।"

মেজর ঘুমোতে চলে গেলে অর্জুন গোরানসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি এখন একটু বিশ্রাম নেবেন না?"

"না। আমি একটুও ক্লান্ত নই।"

"চলুন, নীচের লবিতে গিয়ে বসি।"

গোরানসাহেব আপত্তি করলেন না। এখন দ্রুত রোদ বদলাচ্ছে। পাশাপাশি বসার পর অর্জুন সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, "আপনি ভূতপ্রেত আছে বলে বিশ্বাস করেন?"

গোরানসাহেব বললেন, "ওয়েল, অবিশ্বাস করার জন্যে অনেকদিন ধরে খোঁজখবর নিয়ে যাচ্ছি, এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি।"

"কেন?"

"দ্যাখো, এই যে এত মানুষ প্রতিদিন মারা যায়, কোথায় যায়? তোমরা মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলো, ছাই হয়ে যায়। আমরা সমাধি দিই। মাটিতে মিশে যায়। কিন্তু

সেটা তো রক্তমাংসের শরীর। তার আত্মার কী হয়? যে মানুষটা দীর্ঘকাল পৃথিবীতে হেঁটেচলে বেড়ালো, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে তার সবকিছু শেষ হয়ে গেল? বিজ্ঞান মানছে না বটে, কিন্তু তোমাদের শাস্ত্রগুলো, আমাদের পৌরাণিক কাহিনী, ধর্মীয় গ্রন্থগুলোয় আত্মার উপস্থিতি স্বীকার করেছে অনেকবার। এসব যাঁরা লিখেছেন তাঁরা নির্বোধ মানুষ ছিলেন না। দেখবে, কোনও কোনও বয়স্ক মানুষ বলেন তাঁদের আত্মা দেখার অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু তাঁরা প্রমাণ দিতে পারেন না। আমি ওই প্রমাণটার খোঁজে আছি।" গোরানসাহেব গুছিয়ে কথাগুলো বললেন।

"আপনি এখানে এসেছেন ড্রাকুলার সন্ধানে। কিন্তু ড্রাকুলা কনসেপ্ট ভারতবর্ষে কখনও চালু হয়নি। আপনি কি ভুল জায়গায় আসেননি?"

"আমি জানি না। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমার হাতে একটা ডায়েরি এসেছিল। একজন স্কটিশ টি-প্ল্যান্টার সেই ডায়েরিতে লিখেছেন হঠাৎই তাঁর এলাকায় ড্রাকুলার আবির্ভাব হয়েছে। প্রায় রাত্রেই মানুষকে আক্রমণ করে তার গলায় দাঁত বসিয়ে রক্তপান করছে। এই ডায়েরির কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। মাসখানেক আগে নিউ ইয়র্ক মিরর কাগজের এশিয়ান নিউজে একটা ছোট্ট খবর ছাপা হয়েছিল। মানুষের শরীর থেকে রক্ত চুষে নিয়ে যাচ্ছে ভ্যাম্পায়ার জাতীয় প্রাণী। যে এলাকায় এটা হয়েছে, মিলিয়ে দেখলাম সেটা ওই স্কটিশ টি-প্ল্যান্টার্সের এলাকা।"

"সে কী! এরকম কোনও খবর আমি এখানকার কাগজে পড়িনি।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। এমন ঘটনা ঘটলে নিশ্চয়ই হইচই পড়ে যেত।"

"তা হলে দুটো ব্যাপার হতে পারে। কেউ ভুল খবর পাঠিয়েছে অথবা তোমাদের এখানকার কাগজগুলো খবরটা পায়নি। যাই হোক, আমি জায়গাটায় কিছুদিন থাকতে চাই।"

"আপনি এর আগে কোনও ড্রাকুলা দেখেছেন?"

"না। ড্রাকুলা আছে খবর পেয়ে স্পেনের একটি গ্রামে পৌঁছেছিলাম। যে বাড়িতে ড্রাকুলা বাস করত বলে লোকে ভাবত সেটা একটা পোড়ো বাড়ি। কোনও মালিক ছিল না। আমি পৌঁছবার একদিন আগে সরকারি লোকজন বাড়িটাকে ভেঙে মাঠ করে দিয়েছিল। জিজ্ঞেস করে জেনেছিলাম ওই বাড়ির একটা ঘরে কফিনে কঙ্কাল ছিল। গ্রামের লোকজন পেট্রল ঢেলে আগুনে ছাই করে দিয়েছে।"

"একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?"

"অনায়াসে।"

"গতকাল আপনি ওই বিষধর শঙ্খচূড়কে খালি হাতে কী করে ধরলেন?"

"সাপ যখন আক্রমণ করে তখন ভয়ঙ্কর হয়। কিন্তু যেই আত্মরক্ষা করার কথা ভাবে তখনই বোকামি আরম্ভ করে। তা ছাড়া—।" কথা শেষ করে হঠাৎ

আকাশের দিকে মুখ করে থেমে গেলেন গোরানসাহেব।

"সাপের ওপর আপনার বেশ রাগ আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ। আমি এখনও মনে করি সাপ শয়তানের সঙ্গী। কোনও সাপকে মারতে পারলেই আমি তার মাথা কেটে ফেলি।"

"কেন?"

"কারণ মাথা কেটে ফেললে আর কোনও ভয় থাকবে না।"

"সেই কাটা মাথা কি আপনি সঞ্চয় করেন?"

"কে বলল তোমাকে?"

"আমার অনুমান।"

"হ্যাঁ। আমার বাড়িতে বেশ কয়েকটা জারে সাপের বিভিন্ন ধরনের মাথা ওষুধে ডুবিয়ে রাখা আছে। যেখানেই যাই সাপ পেলে মাথা কেটে প্লাস্টিক বাক্সে ঢুকিয়ে ওষুধে ভিজিয়ে রাখি ওই জারগুলোর জন্যে। যাক গে, তুমি আজ কী করছ? প্রোগ্রাম কী?"

"সন্ধেবেলায় একটা কাজ আছে। বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না।"

"ঠিক আছে। আমরা ন'টা নাগাদ এখান থেকে বের হব। ও হ্যাঁ, এর জন্যে কি পুলিশের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে?"

"পুলিশকে জানিয়ে যাওয়াই ভাল। আমি আপনাদের হয়ে ওটা জানিয়ে দেব।" অর্জুন উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই সার্কিট হাউসের লনের নুড়ির ওপর একটা ছোট সাপকে এঁকেবেঁকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে গোরানসাহেব সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখ চকচক করে উঠল। অর্জুন লক্ষ করল ওঁর মুখ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ঝট করে একটা পাথর কুড়িয়ে বৃদ্ধ ছুড়লেন সাপটাকে লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। সাপটা দ্রুত চোখের আড়ালে চলে যেতেই গোরানসাহেবের মুখে হতাশা ফুটে উঠল।

অর্জুন আর কথা না বাড়িয়ে বাইকে উঠে বসল। এই সাপ নির্বিষ, হেলে সাপ। তবু গোরানসাহেব হিংস্র হয়ে উঠেছিলেন। সাপ দেখলে এই ভদ্রলোক আর স্থির থাকতে পারেন না। মানুষের স্বভাব কত বিচিত্র ধরনের।

সোজা থানায় চলে এল অর্জুন। অবনীবাবু তাঁর চেয়ারে ছিলেন। ঘরে ঢুকতেই বললেন, "কোথায় ছিলেন মশাই, সারাদিন দেখা নেই।"

"কেন? কী ব্যাপার?" অর্জুন চেয়ারে বসল।

"আর বলবেন না। এমন ধড়িবাজ ছেলে, কোনও ক্লু পাওয়া গেল না।"

"সন্দীপের কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ, আজ সকালে গিয়েছিলাম তদন্ত করার নাম করে। ওঁর মা সত্যি খুব ভালমানুষ। ছেলের জন্যে চিন্তায় আছেন তা বোঝা গেল। কিন্তু অনেক প্রশ্ন করেও ছেলের মুখ থেকে কথা বের করতে পারলাম না। মাকে জিজ্ঞেস করলাম বেড়ালটার কথা। তিনি বললেন ওটা ছেলের ঘরেই বন্দি থাকত। রুই মাছের পেটি রান্না হত

বেড়ালটার জন্যে। ভাবুন।"

"ওর বন্ধুদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। স্রেফ বলে দিল, আমার বেড়াল চুরি গিয়েছে আর তার সঙ্গে আমার বন্ধুদের কোনও সম্পর্ক নেই। আমি কার সঙ্গে মিশছি সেটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। বুঝুন।"

অর্জুন ঘড়ি দেখল। সন্ধে হয়ে আসছে। সে বলল, "আপনাকে একটু উঠতে হবে। বেশিদূরে যাব না।"

"আবার কী হল? আটটা নাগাদ এস. পি. সাহেব ডেকেছেন। তাঁকে কৈফিয়ত দিতে যেতে হবে ভাই।"

"দেবেন। কিন্তু আপনি নিশ্চয়ই হাইওয়েতে ডাকাতির সমাধান চান।"

"একশোবার। চলুন আমি রেডি।"

জিপে উঠে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমাকে কোনও প্রশ্ন না করেই চলে এলেন যে! সময়টা তো অকারণে নষ্ট হতে পারে।"

"পারে। তবে সারাদিন যখন আপনার দেখা পাইনি তখন একটা কিছু না জেনে বলবেন বলে মনে হয় না।" অবনীবাবু হাসলেন।

রাস্তায় আলো জ্বলে উঠতেই ওরা গোরক্ষনাথের বাড়িতে পৌঁছে গেল। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে কী ব্যাপার? আসামি এখানে আছে নাকি? আগে বলবেন তো, ফোর্স নিয়ে আসতাম।"

"না, না। আসামি নেই।" সে জিপ থেকে নেমে ভাঙা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল, "গোরক্ষনাথবাবু, ও গোরক্ষনাথবাবু।"

ভেতর থেকে সেই বুড়ি চেঁচিয়ে বলল, "যজমান ডেকে নিয়ে গিয়েছে, এক্ষুনি ফিরে আসবে। দাঁড়াতে বলেছে।"

"উনি কি কানা কাক পেয়েছেন?"

"মর, মর। সন্ধেবেলায় যত্তসব অকথা কুকথা।" বুড়ি চেঁচাল।

অবনীবাবুকে গল্পটা শোনানো শেষ করা মাত্রই গোরক্ষনাথ এসে গেল। অর্জুনদের দেখে দুটো হাত মাথার ওপর তুলে বলল, "অপরাধ মার্জনা করে দেবেন বাবু। আপনাকে কথা দিয়েছি তাই যেতে চাইনি। কিন্তু এমন করে ধরল। বলল, বুড়ি মা আমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন।"

"আপনার যজমান।"

"ওই আর কি! বাড়ির ঝিটাকে ধরেছে। ধরে আর ছাড়ে। আমাকে গিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন করতে হবে। কিন্তু এখনও তো কানা কাক পেলাম না। তিন মাথা এক না হলে তাকে তাড়ানো মুশকিল হবে।"

"ঠিক আছে। এখন আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।"

"আমাকে? কোথায়?"

অবনীবাবু বললেন, "সন্দীপ ডায়েরি করেছে তার বেড়াল চুরি গিয়েছে। তুমি

অর্জুনকে বলেছ সে নিজে এসে তোমাকে দিয়ে গেছে। বেড়ালটাকে তোমার হেফাজতে পাওয়া গেলে আমার উচিত তোমাকে অ্যারেস্ট করা। তারপর তুমি প্রমাণ করো সন্দীপ মিথ্যে বলেছে।"

"আপনি বিশ্বাস করুন—।" ককিয়ে উঠল গোরক্ষনাথ।

"সেটা করব তুমি যদি বেড়ালটাকে নিয়ে আমার গাড়িতে ওঠো।"

"থানায় নিয়ে যাবেন?" কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল লোকটা।

"না। থানায় নয়।"

তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে বাঁকের মুখে গাড়ি দাঁড় করালেন অবনীবাবু। এখন চারপাশে ঘন অন্ধকার। জিপের পেছনে বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে গোরক্ষনাথ চুপচাপ বসে আছে। অর্জুন দেখল অন্ধকারে ওটার চোখ জ্বলছে।

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই জায়গাটা চলবে?"

"ঠিক আছে। গাড়িটাকে ওই জঙ্গলের আড়ালে নিয়ে যান।"

ওরা নেমে দাঁড়াতে ড্রাইভার নির্দেশ পালন করল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "এটাকে কোলে নিলে কামড়াবে?"

"বোধ হয়। কাল থেকে ভাব করেছি বলে আমাকে কিছু বলছে না।"

অর্জুন বলল, "অবনীবাবু, আপনি রাস্তার ওপাশের গাছের আড়ালে চলে যান। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

গোরক্ষনাথকে নিয়ে রাস্তার উলটো দিকে চলে যেতেই হুসহাস গাড়ি বেরিয়ে গেল। অর্জুন গোরক্ষনাথকে বলল, "বেড়ালটার গলার কাপড়ের বেল্টের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে ফেলুন তো।"

"দড়ি! দড়ি কোথায় পাব?"

"আপনার ঝোলায় দড়ি থাকা উচিত।"

ঝোলা খুঁজে হাতকতক লম্বা দড়ি বের করে বেড়ালটার গলায় আটকানো কাপড়ের বেল্টের সঙ্গে ওটা বেঁধে মাটিতে নামিয়ে গোরক্ষনাথ উঠে দাঁড়াতেই দড়ির প্রান্ত অর্জুন নিয়ে নিল।

"কী করবেন বাবু?"

"ওপারে যান। ওখানে থানার বড়বাবুর পাশে এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াবেন যাতে কোনও গাড়ি থেকে আপনাকে না দেখা যায়।"

গোরক্ষনাথ আদেশ পালন করলে অবনীবাবুর চিৎকার ভেসে এল, "ওকে!"

ঠিক তখনই একটা অ্যাম্বাসাডার গাড়ি বার্নিশের দিক থেকে ছুটে আসছিল। হেডলাইট দেখা যাচ্ছে। গাড়িটাকে দেখামাত্র বেড়ালটা রাস্তার ওপাশে যাওয়ার জন্যে এগোতেই দড়িতে টান পড়ল। অর্জুন দড়ি ছেড়ে দিতে ওটা তীরের মতো রাস্তার মাঝখানে চলে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে ব্রেক করে গাড়িটা দাঁড়িয়ে

গেল। বেড়ালটা ক্রুদ্ধ চোখে একবার তাকিয়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে গোরক্ষনাথের সামনে দাঁড়িয়ে ফ্যাঁচ শব্দ করল। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে গাড়িটা চলে যেতেই ওরা আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। অবনীবাবু বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ অর্জুন।"

॥ ৮ ॥

থানায় বসে যখন কথা হচ্ছিল তখন রাত আটটা। একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গেল তাতে সবচেয়ে অবাক হয়েছে গোরক্ষনাথ। বাইরের ঘরে সে বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে বসে রয়েছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে অবনীবাবু বললেন, "এখন কথা হচ্ছে, বেড়ালটাকে এমনভাবে ট্রেইন্ড কী করে করা হল? ওটা এক ছুটে রাস্তা পার হয়নি। মাঝখানে দাঁড়িয়ে রাগী চোখে গাড়িটাকে দেখেছিল। অর্থাৎ ড্রাইভার যদি ছুটন্ত বেড়ালকে ভালভাবে না দেখতে পায়, দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখবেই। সন্দীপের পক্ষে কি এই ট্রেনিং দেওয়া সম্ভব? আমার তো মনে হয় না।"

"কিন্তু ওটা তো ট্রেনিং পেয়েছে।"

"ঠিকই। এখন আমার পক্ষে সন্দীপকে অ্যারেস্ট করতে অসুবিধে নেই। ওর বাড়িতে না গিয়ে ওকেই থানায় আসতে বলি।"

"না। সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না।"

"কেন?"

"সন্দীপ যদি বলে তার যে বেড়ালটা হারিয়েছে সেটা এটা নয়, তা হলে আপনি কী করবেন? ও যদি বলে গোরক্ষনাথকে কোনওদিন দ্যাখেনি, তা হলে?"

"বুঝতে পেরেছি। বেড়ালটাকে নিয়ে ওর বাড়ির সামনে গেলেই সমস্যাটার সমাধান হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু তা তো হল, এই মামলায় বেড়ালটা একটা বড় ভূমিকা নিচ্ছে। যতদিন বিচারক ওকে না দেখছেন ততদিন ওর দেখাশোনা কে করবে?"

"থানায় রাখা সম্ভব নয়। এখানে তো প্রচুর বেড়াল ঘোরে।"

"ঘোরে। কিন্তু এ-ব্যাটা যদি পালায়, তা হলে?"

"এখন যার কাছে আছে, তার কাছেই রাখুন।"

"হুম।" অবনীবাবু একটু ভাবলেন। তারপর মুখটা অর্জুনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এসে নিচু গলায় বললেন, "ওটাকে তো গোরক্ষনাথ কাজে লাগাবে।"

"কাজে মানে?"

"আরে! ওই যে প্রেতাত্মাদের সঙ্গে সংযোগ করবে। শকুন, বেড়াল, কাক। ওইসব করতে গিয়ে যদি বেড়ালটা কোনও বদ আত্মার হাতে মারা যায়?"

হেসে ফেলল অর্জুন, "আপনি এসব বিশ্বাস করেন নাকি?"

"না না। বিশ্বাস নিশ্চয়ই করি না। তবে শুনতে শুনতে কীরকম একটা অবস্থা হয়। মিথ্যে কথা লক্ষবার শুনতে শুনতে মনে হয় সত্যি কথা। তেমন আর কি!"

"আপনি গোরক্ষনাথকে ডাকুন। ও হ্যাঁ, আর একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচিত দুই ভদ্রলোক এসেছেন আমেরিকা থেকে—।"

"জানি। সার্কিট হাউসে রেখেছেন তাঁদের।"

"হ্যাঁ। ওঁরা আজ রাত্রে একটু হুতুমপুরে যেতে চান।"

"হুতুমপুর? সেটা কোথায়?"

"আপনার এলাকার মধ্যে পড়ে না। বার্নিশ পেরিয়ে খুব ভেতরে একটা প্রায় গণ্ডগ্রাম।"

"এত রাত্রে সেখানে কেন যাবেন ওঁরা?"

"ভূত দেখতে।"

"কী দেখতে? পাগল নাকি?"

"ওঁদের একজনের অভিযান করাটাই নেশা, অন্যজন ভূত-প্রেত-ড্রাকুলা নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। কিছুই হবে না, তবু হুতুমপুর যে থানার আওতায় পড়ে তাদের যদি একটু জানিয়ে রাখা যায়—।" অর্জুন কথা শেষ করল না।

অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, "সাহেবরা যদি এসব নিয়ে মেতে থাকে তা হলে এ-দেশের অশিক্ষিত মানুষদের দোষ দিয়ে কী হবে। হুতুমপুর বললেন, তাই তো?"

অর্জুন মাথা নাড়তে তিনি একটা কাগজে কিছু লিখে রাখলেন।

গোরক্ষনাথ এসে দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, তার কোলে বেড়ালটা।

অবনীবাবু বললেন, "বুঝতেই পারছ, তোমার কোলে যিনি আছেন তিনি একটি চিজ। ড্রাইভারদের মনে ভয় ঢুকিয়ে গাড়ি থামাতে বাধ্য করতেন। ডাকাতদের সঙ্গে ওঁকেও তো জেলে পুরতে হবে।"

"না বাবু, এ অবলা জীব, একে যেমন শেখানো হয়েছে, করেছে?"

"সে-কথা ঠিক। তুমি এই বেড়ালটার দায়িত্ব নিতে পারবে?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"যদি এটা পালিয়ে বা মরে যায় তা হলে তুমি দায়ী থাকবে?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"যখনই বলব তখনই বেড়ালটাকে নিয়ে হাজির হবে, তাই তো?"

"যা বলবেন তাই করব।"

"কিন্তু যে জন্যে তোমার বেড়ালটাকে দরকার তার যদি গড়বড় হয়?"

"বুঝতে পারলাম না বাবু।"

"ওই প্রেতাত্মারা যদি ওর ঘাড় মটকায়?"

"পারবে না বাবু। শকুন আর কাক ওকে আগলে রাখবে। বললেন যখন তখন বলি, তেনাদের সবচেয়ে বেশি রাগ শকুনের ওপর। তারপর কানা কাক। ওই দুটোকে তেনারা আগে মারতে চাইবেন। কিন্তু এই তিনজন একসঙ্গে থাকলে কিছুতেই পেরে উঠবেন না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"ঠিক আছে, আমার সঙ্গে এক জায়গায় চলো। ফিরে এসে খাতায় সই করে

ওটাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে। একটু বাইরে গিয়ে বোসো।”

গোরক্ষনাথ চলে গেলে অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি যাবেন?”

“কোথায়?” অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

“আমি এখনই সন্দীপের বাড়িতে যাব। বেড়ালটাকে বাড়ির গেটের সামনে ছেড়ে দিলে ওটা নিশ্চয়ই ভেতরে ঢুকবে। ব্যস, আমার কাজ সহজ হয়ে যাবে।”

“সন্দীপের তিন বন্ধুর হদিস নেবেন। আমার মনে হয় ডাকাতির টাকা সন্দীপ তার নিজের বাড়িতে রাখেনি। ওটা ওর বন্ধুদের বাড়িতেই পেয়ে যাবেন। আমার মনে হয় আপনার এই অভিযানে আমার থাকা উচিত নয়। পরে ফোন করে জেনে নেব।” অর্জুন পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল, “হুতুমপুরের ব্যাপারটা ভুলে যাবেন না যেন।”

থানার সামনে যে এস.টি.ডি বুথ রয়েছে সেখান থেকে মাকে ফোন করল অর্জুন। থানা থেকেই করতে পারত, তখন মনে ছিল না।

মা জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার রে?”

“আমার ফিরতে একটু রাত হবে। তুমি শুয়ে পড়ো।”

“তুই কোত্থেকে বলছিস?”

“থানার সামনে থেকে।”

“এক্ষুনি বাড়ি চলে আয়।”

“কেন?”

“ওঁরা এসেছেন।” মা গলা নামালেন।

“কারা?”

“ওই যে, আমেরিকা থেকে যাঁরা এসেছেন।”

দুটো টাকা ছেলেটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে অর্জুন বাড়ির দিকে রওনা হল। মেজর এবং গোরানসাহেব তার বাড়িতে? হঠাৎ! ওঁরা কেউ বলেননি যে যাবেন।

দরজা খোলাই ছিল। মেজরের উঁচু গলা গলি থেকেই শোনা যাচ্ছিল। খুব প্রশংসা করছেন তিনি। অর্জুন ঘরে ঢুকতেই মা বললেন, “আয়।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় ঘুরে বেড়াও বলো তো?”

অর্জুন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, “আপনারা আসবেন বলেননি তো!”

মেজর বললেন বাংলায়, “আরে। ওই টিফিন ক্যারিয়ার কি সার্কিট হাউসে পড়ে থাকবে? বাড়িতে তো কেউ দশটা ওই জিনিস রাখে না। যদি প্রয়োজন হয় তা হলে তোমার মা কী করবেন?”

“বোঝ! ওঁরা ওটা ফেরত দিতে এসেছেন।” মা বললেন।

“কতক্ষণ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“আধঘণ্টা হয়ে গেল।” মেজর বললেন।

গোরানসাহেব চুপচাপ শুনছিলেন। বাংলায় কথা হলে তিনি যে কিছুই বঝতে পারছেন না তা কিন্তু বুঝতে দিচ্ছেন না। এখন ওঁর মুখে সেই বীভৎস অভিব্যক্তি

নেই। বেশ শান্তমুখে বসে আছেন এখন।

অর্জুন ঘড়ি দেখল, "আপনারা গাড়িটাকে কখন আসতে বলেছেন?"

"এসে গেছে। তাতে চড়েই তোমাদের এখানে এলাম। বড় রাস্তায় রাখতে বলেছি, গলিতে ঢোকাইনি। আমরা তো ট্রেন ধরতে যাচ্ছি না।" কথাগুলো বলে মায়ের দিকে তাকালেন মেজর। মা হেসে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

গোরানসাহেব এবার কথা বললেন, "আজকে যদি তেমন কিছু না ঘটে তা হলে আমার মনে হয় কালই রওনা হওয়া ভাল।"

"ঠিক।" মেজর মাথা নাড়লেন, "অর্জুন, এখান থেকে হাসিমারায় যেতে কতক্ষণ লাগবে?"

"রাস্তা ভাল নয়। অন্তত আড়াই-তিন ঘণ্টা ধরে নিতে পারেন।"

"বাঃ। তা হলে আমরা বেলা বারোটা নাগাদ রওনা হতে পারি।"

কথাবার্তা ইংরেজিতে হচ্ছিল। গোরানসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কালকে ওখানে গিয়ে কোনও হোটেল বা গেস্ট হাউসে নিশ্চয়ই ওঠা যাবে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। ওদিকে হোটেল আছে ফুন্টশলিং-এ। হাসিমারার আধঘণ্টা দূরে। শহরটা ভুটানের বর্ডারে। কিন্তু ডাকবাংলো আছে, ফরেস্ট বাংলো পাবেন। মনে হয় খালি পাওয়া যাবে।"

গোরানসাহেব বললেন, "না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, আমাদের সঙ্গে টেন্ট আছে। আশা করি টেন্টে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে না।"

"আমার?" অবাক হল অর্জুন।

"হ্যাঁ। মেজর বলেছেন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। তাই তো?"

"এটা তো বলার দরকার পড়ে না। উত্তরবাংলায় অভিযান করব আর তুমি সঙ্গে থাকবে না এটা আমি ভাবতেই পারি না।" মেজর হাসলেন।

এই সময় মা একটা ট্রে হাতে ঢুকলেন। তাতে বড়-বড় চিনেমাটির বাটিতে গাঢ় পায়েস থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। পায়েসের বুকে কিশমিশ ফুলে উঠেছে। মেজর চিৎকার করে উঠলেন, "গ্র্যান্ডি!"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। মায়ের সঙ্গে মেজরের কথা হয়েছে এবং তার ফলে হল এই পায়েস। মেজর তখন গোরানসাহেবকে নিয়ে পড়েছেন, "এটাকে বলে পায়েস। অমৃত। তোমাদের দেশে এ-জিনিস পাবে না। এর চেয়ে ভাল ডিনার আমি আর কিছুই আশা করতে পারি না।"

মা বললেন, "তোরা অনেকদূরে যাবি। ফিরতে রাত হলে তো খাবি না। তাই একটু পায়েস করে দিলাম। নলেন গুড় বাড়িতে ছিল—। কেমন হয়েছে কে জানে!"

মেজর এবং গোরানসাহেব একসঙ্গে প্রশংসা শুরু করলেন। ব্যাপারটা এমন পর্যায়ে গেল যে, মা লজ্জা পেয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বেরোবার সময় মা জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা কতদূরে যাচ্ছিস?"

"হুতুমপুর।" অর্জুন জবাব দিল।

"সে আবার কোথায়?"

"এখান থেকে ঘণ্টাখানেক।"

"কারও সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিস?"

"হ্যাঁ।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। গোরানসাহেব যাদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তাদের কথা শুনলে মা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করবেন। জীবনে আর কখনও মেজরদের রেঁধে কিছু খাওয়াবেন না। বাঙালি মায়েরা এখনও বিশ্বাস করেন তেনাদের সঙ্গে মজা করা ঠিক নয়। কখন কী হয়ে যাবে কিছুই বলা যায় না।

অর্জুন ড্রাইভারের পাশে বসে ছিল। হাইওয়ের দিকে যেতে-যেতে ড্রাইভার বলল, "এত রাত্রে আপনারা যেতে চাইলেন, আমি টাকার লোভে না বললাম না। কিন্তু—।"

"কি-কিন্তু?" মেজর পেছন থেকে খেঁকিয়ে উঠলেন।

"খুব ডাকাতি হচ্ছে সার। হাইওয়েতে এখন ডাকাতি লেগেই আছে।"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ, হয়েছে। কিন্তু এখন আর হবে না।"

"আপনি কী বলছেন সার? কাল রাত্রেও হয়েছে।"

"বললাম তো, আর হবে না।"

"আপনি শোনেননি বোধ হয়। একটা বেড়াল এসে রাস্তা কাটে, গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়, আর তখনই ডাকাতরা ঝাঁপিয়ে পড়ে।" ড্রাইভার জোর করে বোঝাবেই।

"পড়লে পড়বে। আমাদের সঙ্গে আছেটা কী যে, ডাকাতি করবে।"

মেজর প্রসঙ্গটা থামাতে চাইলেন, "তা ছাড়া আমাকে তুমি ডাকাত দেখিও না। জীবনে কত ডাকাত দেখলাম। সেবার সাহারার বুটে টেন্ট খাটিয়ে বসে সবে হুইস্কিতে চুমুক মেরেছি, সঙ্গে-সঙ্গে উটের পিঠে চেপে কালিবান ডাকাতরা এসে হাজির।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী বললেন কথাটা? তালিবান, না কালিবান?"

"কালিবান। তালিবানরা আফগানিস্তানে, কালিবান সাহারায়। গুলিয়ে ফেলো না। একা, বুঝলে, স্রেফ একা এই হুইস্কির বোতল হাতে নিয়ে এমন বক্তৃতা দিলাম যে, ব্যাটারা হাত পেতে বসে পড়ল। সবাইকে হুইস্কি খাওয়াতে খুশি হয়ে চলে গেল। আমাকে ডাকাত দেখাতে এসেছ?"

মেজরের কথা শেষ হতেই অর্জুন বলল, "তোমার ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। যারা ডাকাতি করছিল তারা একটু আগে ধরা পড়েছে।"

"আমাদের শহরে?"

"হ্যাঁ। রেসকোর্স পাড়ার সন্দীপকে চেনো?"

"আই বাপ! অত বড়লোকের ছেলে ডাকাতি করে?"

"ওকে তুমি চেনো?"

"চিনব না? আমাদের পাড়ার কাবুল ওর জিগরি দোস্ত। কাবুলটা খুব ভাল

বাইক চালাত। দু'বছর আগে অ্যাক্সিডেন্টে ওর পা দুটো উড়ে যায়। ওর কাছেই যায় সন্দীপ। ছেলেবেলার বন্ধু বলেই এখনও টান আছে।"

"কোন পাড়া তোমাদের?"

"আদরপাড়া।" ড্রাইভার মাথা নাড়ল, "আমি ভাবতেই পারছি না।"

পেছন থেকে মেজর বললেন, "পৃথিবীতে থাকার মজা এটাই। যা ভাবতে প্যারবে না তাই ঘটতে দেখবে। কত দেখলাম।"

ড্রাইভার আর কথা বাড়াল না। গাড়ি তিস্তা ব্রিজে উঠল। দু'পাশে ঘন অন্ধকার। শুধু ব্রিজের আলোগুলো জ্বলছে। এখন এই হাইওয়েতে গাড়ি খুব কমে গিয়েছে। মাঝে মাঝে লাইন দিয়ে ট্রাক যাচ্ছে।

বার্নিশের মোড়ে এসে দুটো পান-বিড়ির দোকান খোলা পেল ওরা। হুতুমপুরের কথা জিজ্ঞেস করতেই রাস্তার হদিস পাওয়া গেল। বাইপাস ধরে আর একটু এগিয়ে গেলে ডান দিকে মাটির পথ ধরে দুই ক্রোশ যেতে হবে। অর্জুন জানে এই দুই ক্রোশের কথা স্রেফ আন্দাজে বলল লোকটা।

শেষপর্যন্ত মাটির রাস্তাটা চোখে পড়তেই গাড়িটাকে ডান দিকে ঘোরাতে বলল অর্জুন। নির্জন রাস্তার একপাশে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি দেখে জিপ থেকে নেমে এলেন দু'জন পুলিশের পোশাক পরা মানুষ। হাত নেড়ে থামতে বললেন। ড্রাইভার গাড়ি থামালে একজন সাব ইনস্পেক্টর এগিয়ে এলেন পাশে।

"আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

"জলপাইগুড়ি।" অর্জুন উত্তর দিল।

"হুতুমপুরে যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাদের নামটা জানতে পারি?"

"আমি অর্জুন।"

"নমস্কার সার। এস. পি. সাহেবের কাছ থেকে ফোন এসেছে। আপনারা আমাদের গাড়িটাকে ফলো করুন।"

"কেন? আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?"

"আপনাদের সঙ্গে থাকতে বলেছেন এস.পি. সাহেব।"

"আরে না না। আমরা ওখানে যাচ্ছি এই কথাটাই শুধু জানাতে বলেছিলাম লোকাল থানাকে, এসকর্ট চাইনি।"

"ও। কিন্তু ওখানকার কোনও মানুষকে কি আপনারা চেনেন?"

"না। আমরা গ্রামে ঢুকব না। গ্রামের পাশে তেঁতুলবন আছে, সেখানে যাব।"

"তেঁতুলবন? ডেঞ্জারাস জায়গা সার। দিনের বেলাতেই কেউ যায় না সেখানে।"

"এঁরা তাই যেতে চান।"

"মুশকিলে পড়লাম।" অফিসার চিন্তিত হলেন।

pathagar.net

"কেন?"

"রাতবিরেতে আপনাদের ডাকাত বলে ভুল করে গ্রামের লোক যদি হামলা করে? অবশ্য তেঁতুলবনে গেলে ওরা জানতে পারবে না।"

"এক কাজ করুন। আপনার জিপ এখানে থাক। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। তেমন হলে গ্রামের লোকদের বোঝাতে পারবেন।"

"আমি? না না। এই রামরতন, এদিকে এসো। সাহেবদের সঙ্গে যাও।"

রামরতনের কানে সম্ভবত তেঁতুলতলার কথা পৌঁছেছিল। সে বলল, "সার, আমার মনে হয় আপনার যাওয়াই ভাল। আমার বাঁ পায়ে খুব ব্যথা।"

"এতক্ষণ তো ব্যথার কথা শুনিনি, অমনি ব্যথা হয়ে গেল?"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তেঁতুলতলার কথা শুনে ভয় পাচ্ছেন কেন?"

"ভয়? ভয় ঠিক নয়। ঠিক আছে, চলুন।"

অতএব অফিসার গাড়িতে উঠলেন। উঠে মেজরদের দিকে তাকিয়ে অন্ধকারেই নমস্কার করলেন, "নমস্কার সার। আমার নাম উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়।"

অর্জুন বলল, "সর্বনাশ।"

"আর বলবেন না। মা আমার সর্বনাশ করে গেছেন। অত বিখ্যাত একজন মানুষের নামে কেউ নাম রাখে?"

"কোনও অন্যায় করেননি তিনি," মেজর বললেন, "সার আশুতোষ, সুভাষচন্দ্র, বিধান রায়ের নামে যদি নাম রাখা যায় তা হলে উত্তমকুমারেও দোষ নেই। তা উত্তমকুমারবাবু, তেঁতুলবন কতখানি জায়গা নিয়ে বলুন তো?"

"প্রায় সিকি মাইল। ভয়ঙ্কর জায়গা সার, দিনের বেলায় গা ছমছম করে।"

॥ ৯ ॥

জায়গাটা যে ভয়ঙ্কর এবং দিনের বেলাতেই যখন সেটা টের পাওয়া যায় তখন রাত্রে তার চেহারা কীরকম হবে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল অর্জুন। কিন্তু উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন। গাড়ি থামলে ওঁর গলা পাওয়া গেল, "আপনারা কিছু শুনতে পাচ্ছেন সার?"

শোনা যাচ্ছিল। দূরে কোথাও কোনও প্রাণী যেন আর্তনাদ করছে। মেজর গোরানসাহেবকে ব্যাপারটা বললে তিনি ইন্টারেস্টিং বলে মাথা দোলালেন।

উত্তমকুমার বললেন, "সার, আমার কথা শুনুন। দূর থেকে এমন ইন্টারেস্টিং বলা সহজ। কিন্তু আমি পুলিশ অফিসার হিসেবে যেখানে যেতে সাহস পাচ্ছি না, সেখানে আপনারা কেন ঝুঁকি নিচ্ছেন?"

"ঠিক আছে। আপনি হতুমপুরে চলুন। সেখানেই থেকে যাবেন। আমরা তেঁতুলতলা থেকে ঘুরে আসছি। আপনি ওরকম একটা নামের মালিক হয়েও এত

ভয় পান?” মেজর বেশ ধমকে উঠলেন।

গাড়িটা যত এগোচ্ছিল তত শব্দটা বাড়ছিল। অন্ধকার হলেও দূরের আকাশের একটা দিক যে কালো হয়ে আছে তা বোঝা যাচ্ছিল। পুলিশ অফিসার উত্তমকুমার বললেন, “সোজা গেলে ক’মিনিটের মধ্যেই হুতুমপুর গ্রাম। দেখুন, একটাও আলো জ্বলছে না। সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে। আর বাঁ দিকে এগোলেই তেঁতুলবন।”

গোরানসাহেব ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন, “কাঁদছে কে?”

“স্পিরিট সার। ভিলেজ পিপ্‌ল টোল্ড মি সার।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি দেখেছেন?”

“না সার। আমি দেখতে চাই না। দেখুন কান্নাটা এখন স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।” উত্তমকুমার অর্জুনের শরীরের ঘনিষ্ঠ হলেন। মেজরের নির্দেশে তেঁতুলবনের দিকে গাড়ি ঘুরল। মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর ড্রাইভার জানাল যে, সামনে কোনও রাস্তা নেই, জমিও বেশ উঁচু-নিচু, গাড়ি এগোবে না।

মেজর এবং গোরানসাহেব নেমে দাঁড়াতে অর্জুন বলল, “নামুন মশাই।”

উত্তমকুমার অদ্ভুত একটা শব্দ করে বললেন, “বেশ চলুন। আমি সঙ্গে না গেলে তো পরে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবেই, তা হলে সেটা আগেই যাক।”

মেজর এবং গোরানসাহেব তৈরি হয়ে এসেছেন। ব্যাগ থেকে লম্বা এবং শক্তিশালী টর্চ বের করে ওঁরা এগোলেন। এবড়োখেবড়ো জমি ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত ওঁরা জঙ্গলের ধারে পৌঁছে গেলেন। সামনে লম্বা লম্বা তেঁতুলগাছ গায়ে গা লাগিয়ে রয়েছে। এতখানি জায়গা জুড়ে কী করে শুধুই তেঁতুলগাছের জঙ্গল জন্মালো, তা নিয়ে নিশ্চয়ই গবেষণা করা যায়। গাছগুলোর নীচে লম্বা লম্বা ঘাস আর লতাপাতার জঙ্গল।

মেজর উত্তমকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন, “এই জঙ্গলের জিওগ্রাফি সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনার কোনও আইডিয়া নেই?”

“না সার। অনেক লম্বা, দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। ওই শুনুন।”

অর্জুন খেয়াল করেনি ওরা জঙ্গলের কাছে আসামাত্র ওই কান্না থেমে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে হঠাৎ সেই কান্না যেন জঙ্গলময় ছড়িয়ে পড়ল।

মেজর বললেন, “এই জঙ্গলে শকুন ছাড়া অন্য কোনও পাখি থাকে বলে মনে হয় না। এগুলো শকুনের বাচ্চার চিৎকার। পাশ দিয়ে হাঁটা যাক, পথ একটা না একটা থাকবেই। চলুন।”

প্রথমে গোরানসাহেব হাঁটছিলেন। তাঁর টর্চের লম্বা লম্বা আলো জঙ্গলের শরীরে পথ খুঁজছিল। ওঁর পেছনেই মেজর। উত্তমকুমার দ্রুত অর্জুনের সামনে চলে এলেন। নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা, এঁরা এই জঙ্গলে কী খুঁজছেন?”

"প্রেতাত্মা। ড্রাকুলা হলে খুব ভাল হয়।"

"সর্বনাশ।"

"ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এঁরা এ-ব্যাপারে খুব এক্সপার্ট।"

"কী বলছেন আপনি? বড় বড় ওঝারাও এখানে ঢুকতে চায় না। বছরখানেক আগে দুটো দাগি আসামি এই জঙ্গলে এসে লুকিয়ে ছিল। তিনদিন বাদে খুব শকুন উড়ছে দেখে গ্রামের লোক আমাদের খবর দেয়। দিনদুপুরে দু'জন ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে দশজনের ফোর্স এসে পচা ডেডবডি উদ্ধার করে। তার অর্ধেকটাই শকুনের পেটে চলে গিয়েছিল বলে পোস্টমর্টেম করতে পাঠানো যায়নি। লোকে বলে ওই দুটো দাগির আত্মাই নাকি এখানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদে," উত্তমকুমার বললেন।

"অসম্ভব নয়। এখানকার ওরিজিন্যাল আত্মারা বোধ হয় ওদের থাকতে দিচ্ছে না।"

"হতে পারে। গ্রামের লোকরা এই কথাই বলে।"

দেখা গেল গোরানসাহেব দাঁড়িয়ে আলোর ইশারা করছেন। তাঁর সামনেই একটা পায়েচলা পথ। ওঁরা সেই পথে ঢুকলেন। পথটা হাঁটার পক্ষে মোটেই আরামের নয়। তেঁতুলগাছের যেসব ডাল নীচে নেমে এসেছে তার ছোঁয়া লাগামাত্র কাঁটা ফুটছিল। ওই কাঁটা এত শক্ত এবং ধারালো যে, উত্তমকুমার বারংবার উঃ আঃ করছিলেন। দেখা গেল, শুধু তেঁতুল নয়, কুলগাছও সঙ্গে মিশে আছে।

বাইরে থেকে যতটা ঘন দেখাচ্ছিল, খানিকটা ভেতরে আসার পর তেমন মনে হল না। মানুষের অস্তিত্ব টের পেয়েই বোধ হয় শকুনের বাচ্চাগুলো তাদের কান্না থামিয়েছে। অর্জুন মেজরের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "কোনদিকে যাবেন?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

গোরানসাহেব ইংরেজিতে বললেন, "ওই জায়গাটা বেশ পরিষ্কার। চলো, ওখানে গিয়ে আমরা অপেক্ষা করি। শকুনের বাচ্চাগুলো যখন আমাদের কথা টের পেয়ে গেছে তখন তাঁরা কেউ থাকলে জানতেই পারবেন।" বলতে বলতে তিনি শক্ত হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ঘুরতে লাগল। অর্জুন অবাক হয়ে ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে মুখ ফেরাতে দেখতে পেল অন্ধকারে একটা কিছু নড়ছে। মেজরও সেটা বুঝতে পেরে টর্চ জ্বালতেই সাপটাকে দেখা গেল। অন্তত হাতপাঁচেক লম্বা, মোটা, কালো হলুদ রঙের সাপটা মাটি থেকে সোজা হয়ে ফণা তুলে দাঁড়াবার সময় চকিতে ঘটনাটা ঘটে গেল। ওরকম বিদ্যুতের মতো বৃদ্ধ গোরানসাহেব যে ছুটে গিয়ে ওর গলা টিপে ধরতে পারেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। বাঁ হাতে টর্চ আর ডান হাতে ভারী সাপটাকে তুলে মাটিতে আছাড় মারছিলেন গোরানসাহেব। তারপর টর্চ এগিয়ে দিলেন অর্জুনের দিকে। অর্জুন সেটাকে ঘুরিয়ে ওঁর ওপর আলো ফেলতেই বাঁ হাতে একটা ছুরি বের করলেন ব্যাগ থেকে। ডান হাতের মুঠোয় ধরা সাপটার মাথার নীচে ছুরি চালাতেই শরীরটা দু'টুকরো হয়ে গেল। শরীরটা মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল। একটা চওড়া

ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে মাথাটাকে ভাল করে মুড়ে ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন গোরানসাহেব। এই কর্মটি অবাক হয়ে দেখছিলেন উত্তমকুমার। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "উনি কে?"

অর্জুন বলল, "একজন গবেষক।"

"অ্যাঁ! সাপের মাথা নিয়ে গবেষণা করেন নাকি?"

"বোধ হয়।"

"সাঙ্ঘাতিক। ওরকম বিষাক্ত সাপকে কীভাবে ধরলেন!"

অর্জুন গোরানসাহেবের ওপর থেকে টর্চের আলো সরায়নি। ওঁর মুখে যে বিকৃতি এসেছিল, ঠোঁটে যে বীভৎস হাসিটা ফুটেছিল তা একটু একটু করে স্বাভাবিক হয়ে যেতে সে আলো নেভাল।

গোরানসাহেব মেজরের পাশে এসে দাঁড়ালেন, "আমার মনে হয় এবার ফিরে গেলেই ভাল হবে। এখানে থাকা মানে সময় নষ্ট করা।"

"হঠাৎ?"

"যেখানে এই সাপ থাকে সেখানে ড্রাকুলা থাকতে পারে না।"

"গোরান, তোমাকে অনেকবার বলেছি এদেশের কেউ ড্রাকুলার নাম বইয়ের বাইরে শোনেনি। ড্রাকুলার কথা অশিক্ষিত মানুষেরাও জানে না। এরা বিশ্বাস করে ভূত, প্রেত, আত্মায়।"

"ওঃ নো। এরা মনে করে বাজে আত্মা মানুষের শরীরে ঢুকে তাকে দিয়ে খারাপ কাজ করায়। আমি কি ভুল বলছি?" গোরানসাহেব প্রতিবাদ করলেন।

"হ্যাঁ। তা করে। কিন্তু সেই মানুষ দিনেও জেগে থাকে, ঘুমোয় না। আর সাপের সঙ্গে প্রেতাত্মার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু সাপ আছে বলে তারা এই বন থেকে চলে যাবে কেন?" বিরক্ত হলেন মেজর।

"দুটো সমান শক্তিশালী শত্রু সাধারণত এক জায়গায় থাকে না।"

মেজর হাসলেন, "শুনেছি সাপ শয়তানের বন্ধু, তুমি শত্রু বলছ কেন?"

"শয়তান ড্রাকুলা নয়। প্রেতাত্মা নয়। সে ঈশ্বরের শত্রু।"

তর্কটা থেমে গেল, কারণ দূরে গাড়ির এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। ওরা নেমে আসার পরে ড্রাইভার গাড়িতেই থেকে গিয়েছিল। ভয় পেয়ে সে গাড়ি নিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছে না তো?

উত্তমকুমার কান পেতে শুনে বললেন, "না সার। এটা আপনাদের গাড়ির আওয়াজ নয়।"

"তা হলে আপনার জিপটা চলে এসেছে। আমাদের ড্রাইভার মোটা টাকা ভাড়া হিসেবে পাবে, সে না বলে চলে যাবে না।" অর্জুন বলল।

"না সার। আমার জিপ নয়। এটা একটা ম্যাটাডোরের আওয়াজ। এত রাত্রে হুতুমপুরে ম্যাটাডোর এল কেন?"

আওয়াজটা ওদের বাঁ দিকের কোথাও থেমে গেল। অর্জুন মনে করার চেষ্টা

করল। ওরা এখানে এসেছে ডান দিক থেকে। অর্থাৎ ওদের গাড়ি রয়েছে ডান দিকে। যদি কেউ এখন গাড়ি নিয়ে আসে তা হলে সে আগের গাড়িটাকে দেখতে পায়নি।

মেজর বললেন, "গাড়ির আওয়াজ যখন, তখন মানুষ আসছে। এই যে অফিসার, আপনি বলেছিলেন দিনের বেলাতেই এখানে কেউ আসে না, ভূতপ্রেত নিশ্চয়ই গাড়ি নিয়ে এখানে আসবে না!"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।" অফিসার ধন্দে পড়লেন।

অর্জুন বলল, "এখন কেউ কথা না বললে ভাল হয়।"

আলো নিভিয়ে ওরা চারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ক্রমশ জঙ্গলের শব্দগুলো জোরালো হতে লাগল। এতক্ষণ আলো এবং কথাবার্তার কারণে এই শব্দগুলো যেন মিইয়ে গিয়েছিল। একটু পরে রাতের জঙ্গলের শব্দমালা এত প্রবল হয়ে উঠল যে, কোনটা পাখির ডাক কোনটা ডালপাতা নড়ার শব্দ, তা অর্জুন আলাদা করতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল এখন যে-কোনও মুহূর্তে যে-কোনও গাছ থেকেই কেউ একজন নেমে আসবে। যে নামবে সে প্রেতাত্মা ছাড়া অন্য কিছু হলে মানানসই হবে না।

হঠাৎ অন্যরকমের শব্দ কানে এল। কিছু যেন পড়ে গেল। পরপর দুটো। এবং তখনই জঙ্গলের শব্দ আচমকা থেমে গেল। একটু পরে গাড়ির আওয়াজ উঠল। সেটা যে দূরে চলে যাচ্ছে তা বুঝতে পেরে অর্জুন বলল, "ওদিকটায় চলুন।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?"

"শব্দটা কেন হল দেখতে হবে।"

গোরানসাহেবই উদ্যোগী হলেন। বেশ কিছুক্ষণ কুলগাছের ডাল থাকলে এগনো যাচ্ছে না। তেঁতুলগাছ আর কুলগাছের অবস্থান এত ঘনিষ্ঠ কী করে হল, তা কে জানে! ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর গোরানসাহেব চিৎকার করে উঠলেন। ওরা কোনওরকমে তাঁর কাছে পৌঁছে চমকে উঠল। দুটো পূর্ণ বয়সের মানুষের শরীর চিত হয়ে পড়ে আছে মাটিতে। দু'জনের ঊর্ধ্বাঙ্গে কিছু নেই।

মেজর বসে পড়লেন পাশে। পরীক্ষা করে বললেন, "ডেড।"

অর্জুন বলল, "দেখুন তো, কোথাও ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা। এটা মার্ডার কেস।"

উত্তমকুমার বললেন, "কী করে বুঝলেন? এই জঙ্গলে—।"

"দুর মশাই।" অর্জুন রেগে গেল, "শুনলেন গাড়ির আওয়াজ, কিছু ফেলার শব্দ। যারা ওদের খুন করেছে তারা ডেডবডি দুটোকে এখানে ফেলে গেল, কারণ ওরা জানে এখানে পাওয়া গেলে লোকে বা আপনারা বিশ্বাস করবেন ভূতে মেরেছে। আর যখন পাবেন তখন শকুন অর্ধেক খেয়ে ফেলবে।"

উত্তমকুমার যেন ঝাঁকুনি খেলেন। দ্রুত গিয়ে মানুষদুটোর শরীর টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। তারপর দু'জনেরই ডান হাতের কবজির ওপরে সামান্য ক্ষতচিহ্ন আবিষ্কার করলেন। গোরানসাহেব বললেন, "এই দু'জনের শরীরে একফোঁটা রক্ত নেই।"

মেজর চমকে উঠলেন, "তার মানে?"

"মনে হয় সমস্ত রক্ত শরীর থেকে বের করে নেওয়া হয়েছে।"

"কেন?" উত্তমকুমার জিজ্ঞেস করলেন?

"জানি না। তবে পোস্টমর্টেম করলে আপনারা জানতে পারবেন।"

উত্তমকুমার উঠে দাঁড়ালেন, "কিন্তু এদের এখান থেকে নিয়ে যাব কী করে? এই জঙ্গলে কেউ সহজে ঢুকতে চায় না।"

"আমরা এখানে অপেক্ষা করছি। আপনি আমাদের গাড়ি নিয়ে ফিরে গিয়ে আপনার জিপ আর সেপাইদের নিয়ে আসুন।"

"আপনারা এখানে একা থাকবেন?" উত্তমকুমার ইতস্তত করলেন।

অর্জুন হেসে ফেলল, "চলুন, আপনার সঙ্গে আমি যাচ্ছি।"

গাড়িতে উঠে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আমরা যে পথ দিয়ে এখানে এসেছি সেই পথ ছাড়া এই হুতুমপুরে পৌঁছবার অন্য কোনও পথ আছে?"

"হ্যাঁ। ধুপগুড়ি দিয়ে একটা পথ আছে।"

"তা হলে ওই পথ দিয়ে গাড়ি নিয়ে এলে আপনার জিপের লোকজন দেখতে পাবে না। তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার সঙ্গে অয়্যারলেস বা ওয়াকিটকি নেই?"

"না।"

অর্জুন বুঝল, যে গাড়িটা মৃতদেহ ফেলে গেছে তাকে ধরবার কোনও সুযোগ নেই। শরীর থেকে রক্ত বের করে নিয়ে যাদের মেরে ফেলা হয়েছে তাদের অপরাধ কী? সেই রক্ত নিয়ে কী করছে ওরা? চোখের সামনে যদি ঘটনাটা ঘটত, তা হলে গ্রামের লোক বিশ্বাস করত কোনও প্রেতাত্মা এই লোকদুটোর রক্ত চুষে নিয়েছে। এইভাবেই বোধ হয় ড্রাকুলার জন্ম হয়েছিল।

পুলিশের জিপে মৃতদেহ তুলে দিয়ে ওরা যখন শহরের দিকে ফিরে আসছিল তখন মেজর বললেন, "ভোর হচ্ছে, এখন কি আর ঘুম আসবে?"

অর্জুন হাসল, "গেলেন আত্মা খুঁজতে, পেলেন মৃতদেহ।"

মেজর বললেন, "ভাগ্যিস গিয়েছিলাম। নইলে এই দুটো মৃতদেহ পচে গলে জঙ্গলে পড়ে থাকত শকুনের খাদ্য হয়ে।"

ওরা যখন শহরে পৌঁছল তখন আলো ফুটেছে। অর্জুন বলল, "থানার সামনে আমাকে নামিয়ে দিন। খবরটা দিয়ে যাই। অবশ্য এখন অবনীবাবু নিশ্চয়ই ঘুমোচ্ছেন। তবু—।"

"অবনীবাবু কে?" মেজর জানতে চাইলেন।

"থানার বড়বাবু।"

থানার সামনে পৌঁছে অর্জুন অবাক! এই ভোরে অবনীবাবু চিন্তিত মুখে থানার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

॥ ১০ ॥

অবনীবাবু অবাক হয়ে তাকালেন, "আরে! এখন এ সময়ে?"

অর্জুন বলল, "প্রশ্নটা তো আমারই করার কথা। আপনি তো জানেন আমরা ভূত দেখতে গিয়েছিলাম। সারারাত ধরে সেটা দেখে এলাম। আপনি মনে হচ্ছে রাত্রে ঘুমোননি!"

"আমার কথা বলছি। আগে বলুন, সত্যি সেসব দেখলেন নাকি?" অবনীবাবু কৌতূহলী।

"দুটো ডেডবডি দেখেছি। সমস্ত শরীরে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। কেউ মেরে রক্ত চুষে নিয়ে মাঝরাত্রে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে গেল।"

"সে কী? ফেলে দিয়ে গেল মানে আপনাদের চোখের সামনে কাজটা করল?"

"চোখের সামনে ঠিক নয়। গভীর জঙ্গলের একপাশে কাণ্ডটা করল। ছুটে গিয়ে ধরার কোনও সুযোগ ছিল না। সঙ্গে একজন অফিসার ছিলেন। তিনি ডেডবডি দুটোকে থানায় নিয়ে গেছেন। পোস্টমর্টেম করতে পাঠাবেন। এবার যদি লোক দুটোর আত্মা ভূত হয়ে ওই জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তো বেড়াতে পারে।"

"কোন অফিসার ছিল আপনাদের সঙ্গে?"

"শ্রীযুক্ত উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়।"

"ওঃ। ওয়ার্থলেস। কোনও কর্মের নয় লোকটা।"

"যে কর্মের নয় তার পুলিশে চাকরি থাকে কী করে?"

"এ-প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারব না।"

"আপনি জেগে আছেন কেন?"

"চলুন, রাস্তার ওপারের চায়ের দোকানটা খুলছে, চা খেতে খেতে কথা বলি।" অবনীবাবু এগোলেন। অর্জুন নেমে আসার পর মেজরদের গাড়ি আর দাঁড়ায়নি। এখনও রাস্তা সুনসান। জলপাইগুড়ির ঘুম ভাঙতে একটু দেরি। রিকশাগুলো পথে নামেনি।

চায়ের দোকানদার থানার বড়বাবুকে দেখে তৎপর হল। চায়ে চুমুক দিয়ে অর্জুন বলল, "আঃ।"

"প্রথম চা বেশ ভাল করে।" অবনীবাবু চুমুক দিয়ে বললেন, "কাল মাঝরাত পর্যন্ত সন্দীপ এবং ওর বন্ধুদের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছি। কিন্তু কোনও প্রমাণ পাইনি। এস. পি. সাহেবের অনুমতি নিয়েছিলাম। কিছু না পাওয়ার পর ভদ্রলোক আমাকে এমন ভাষায় তিরস্কার করলেন যে, লজ্জায় মরে যাচ্ছি। সন্দেহ হওয়ায় আমরা যে-কোনও বাড়িতে তল্লাশি করতে পারি কিন্তু—।" অবনীবাবুর মন যে ভাল নেই তা বোঝা গেল।

"আপনি কী খুঁজতে গিয়েছিলেন?"

"এতদিন ধরে যেসব টাকা ওরা লুঠ করছিল তা নিশ্চয়ই ওদের হেফাজতে

পাওয়া যাবে বলে ভেবেছিলাম। অল্পবয়সী ছেলেরা অত টাকা কোত্থেকে পেল এই কৈফিয়ত দিতে পারত না। থানায় এনে চাপ দিলে ভেঙে পড়ত। কিন্তু হিসেবে কিছু মিলল না।”

“ওরা কিছু বলেছে?”

“হ্যাঁ। আজ ওরা কোর্টে যেতে পারে।” অবনীবাবু নিশ্বাস ফেললেন, “হয়তো এর জন্যে খুব বাজে জায়গায় ট্রান্সফার করে দেবে ওপরওয়ালা। কী করা যাবে!”

চায়ের দোকানদার দাম নিচ্ছিল না। অবনীবাবু জোর করে দিতে সে নমস্কার করল।

অর্জুন বলল, “আমার মনে হচ্ছে একটা রাস্তা আছে।”

“রাস্তা?”

“হ্যাঁ। অবশ্য একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা না নিয়ে কোনও উপায় নেই। আপনার থানায় এখন ক'জন সেপাই আছে?”

“কেন?”

“একটু আদরপাড়ায় চলুন।”

“আদরপাড়া? খোলসা করে বলুন মশাই। আমার মাথা কাজ করছে না।”

থানার দিকে যেতে যেতে অর্জুন অবনীবাবুকে ব্যাপারটা বলতে লাগল।

দু'জন লাঠিধারী সেপাই পেছনে বসে ছিল, অবনীবাবু জিপ চালাচ্ছিলেন। পাশে অর্জুন। জিপটা চলে এল আদরপাড়ায়। এখন দু-একজন রাস্তায়। এই ভোরে পুলিশের জিপ দেখে তারা অবাক হয়ে তাকাল। অবনীবাবু বললেন, “জিজ্ঞেস না করলে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে না।”

অর্জুন বলল, “জিজ্ঞেস করলেই ভিড় বাড়বে। দাঁড়ান।”

জিপটা দাঁড়াল। এক ভদ্রলোক মর্নিং ওয়াকে যাচ্ছিলেন। অর্জুন জিপ থেকে নেমে বলল, “শুনুন, আপনি এ-পাড়ায় থাকেন?”

“হ্যাঁ।” ভদ্রলোক পুলিশের জিপ দেখে থমকে গেলেন।

“আমরা একটু সমস্যায় পড়েছি। একজন ডাক্তারের কলকাতা থেকে এ পাড়ায় আসার কথা। ওঁর আত্মীয় বামাচরণ দত্তের বাড়িতে উঠবেন। বাড়িটা কোথায় বলবেন?”

“বামাচরণ দত্ত!” ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, “না তো।”

ওপাশে দু'জন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারা এগিয়ে এল “বামাচরণ দত্ত? কী করেন?”

“ব্যবসা।”

“না। চিনতে পারছি না। আর কিছু বলেছে?”

অর্জুন মনে করার ভান করল, “হ্যাঁ। উনি কয়েকটি অর্থোপেডিক পেশেন্টকে দেখবেন। তার মধ্যে বামাচরণবাবুর পাশের বাড়ির একটি ছেলে আছে। কী নাম

যেন, কাবুল, হ্যাঁ কাবুল।”

তিনজনে একটু আলোচনা করে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, “কাবুল নামের একটি ছেলে আছে। প্রতিবন্ধী। সে থাকে সোজা গিয়ে বাঁ দিকের মোড়ে লাল বাড়িতে। কিন্তু তার আশপাশে বামাচরণ দত্ত বলে কেউ থাকে বলে মনে হয় না। আপনারা একটু বেলায় আসুন। পাড়ার মুদির দোকানে খোঁজ করলে জানতে পারবেন।”

“অশেষ ধন্যবাদ।” অর্জুন গাড়িতে ওঠায় ওঁরা যে-যার মতন চলে গেলেন।

অবনীবাবু অবাক হয়ে বললেন, “আশ্চর্য অভিনয় করলেন তো!”

অর্জুন বলল, “সোজা চলুন। বাঁ দিকের মোড়ে লাল বাড়ি কাবুলদের। বাড়ির সামনে গাড়ি রাখার দরকার নেই। আগে কোথাও পার্ক করুন। হেঁটেই যাওয়া যাবে।”

বাড়িটা চিনতে অসুবিধে হল না। বেল বাজালেন অবনীবাবু। দ্বিতীয়বারের পর একটি কাজের লোক দরজা খুলল। অবনীবাবু বললেন, “কাবুল আছে?”

“হ্যাঁ। ঘুমোচ্ছে।”

“ওঁর বাবা বাড়িতে থাকলে ডেকে দাও।”

কাবুলের বাবা মধ্যবয়সী মানুষ। লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়েই বিছানা থেকে উঠে এলেন, “কী ব্যাপার? কী চাই?”

অবনীবাবু বললেন, “আমি থানার অফিসার-ইন-চার্জ।”

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গেলেন, “ও। কী ব্যাপার? মানে!”

“আমরা আপনার ছেলে কাবুলের সঙ্গে কথা বলতে চাই।”

“কেন বলুন তো?”

“ওর বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে।”

“অভিযোগ? সে কী? আপনি কি জানেন দু’বছর আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করায় ওর দুটো পা কেটে বাদ দিতে হয়েছে?”

“আমরা জানি। আপনার উত্তেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমরা রুটিন কিছু প্রশ্ন করে চলে যাব। ওকে ঘুম থেকে তুলুন।”

“কিন্তু ওর পক্ষে তো নীচে নামা সম্ভব নয়।”

“তা হলে আমরাই ওর কাছে যাচ্ছি। বুঝতেই পারছি আপনাদের খুব অসুবিধায় ফেলছি কিন্তু ওর সঙ্গে কথা না বলে চলে যেতে পারছি না।” অবনীবাবু হাসলেন, “চলুন।”

ভদ্রলোককে অনুসরণ করে দোতলায় এল ওরা। ঘরের দরজা খোলা। পরদা ঝুলছে। বাইরে থেকে ভদ্রলোক ডাকলেন, “কাবুল!”

“বলো।” সঙ্গে-সঙ্গে সাড়া এল।

“তোমার মুখ ধোয়া হয়ে গিয়েছে?”

“হ্যাঁ।”

"দু'জন ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন?"

"কে? কারা?"

কাবুলের বাবা জবাব দেওয়ার আগে অবনীবাবু পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। বছর বাইশের এক যুবক হুইল চেয়ারে বসে আছে। সামনে খোলা জানলা। ভোরের রোদ পড়ছে ঘরে। কাবুল অবাক হয়ে তাকাল, "কী চাই?"

অবনীবাবু বললেন, "তোমার নাম তো কাবুল। আমি থানা থেকে আসছি।"

কাবুল অবনীবাবুকে দেখল। তারপর অর্জুনের দিকে তাকাল। হঠাৎ তার মুখের চেহারা বদলাল। বলল, "আপনি তো অর্জুন।"

অর্জুন কোনও কথা বলল না। অবনীবাবু বললেন, "তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে। তোমার কোন-কোন বন্ধুর সঙ্গে এখনও যোগাযোগ রয়েছে?"

"সবার সঙ্গেই আছে। ওরা আসে। ফোন করে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "তুমি এখন খুব বই পড়ো?"

ওর বাবা জবাবটা দিলেন, "চিরদিনই পড়ে। ফার্স্ট ডিভিশন ওর বাঁধা ছিল। ওই মোটরবাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে—।" ভদ্রলোক কথা শেষ করতে পারল না।

অবনীবাবু বললেন, "এখন তো কত আধুনিক সরঞ্জাম বেরিয়েছে, প্রতিবন্ধীরা প্রায় স্বাভাবিক মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারে—।"

কাবুলের বাবা বলল, "সেগুলোর সাহায্য ও নিতে চায় না। আমেরিকায় একটা অপারেশন করে মূল হাড়ের সঙ্গে এমনভাবে জুড়ে দেয় যে, কোনও পার্থক্য বোঝা যায় না। কিন্তু আমার পক্ষে তো ওখানে নিয়ে গিয়ে এই চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। প্রচুর খরচ।"

কাবুলের মুখ শক্ত হয়ে গেল, "বাবা। আমি কি তোমাকে খরচটা করতে বলেছি?"

"না বলিসনি। কিন্তু সেই আশায় তো আছিস।"

"সেটা আমি বুঝে নেব।" কাবুল মুখ ফেরাল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "সন্দীপ তো তোমার বেস্ট বন্ধু।"

"কেন?"

"ও তোমার কাছে শেষ কবে এসেছিল?"

"পরশু সন্ধের পর।" কাবুলের বাবা বলল, "খুব ভালবাসে ওকে।"

অবনীবাবু অর্জুনের দিকে তাকালেন। তারপর কয়েক-পা এগিয়ে গিয়ে কাবুলের পাশে দাঁড়ালেন, "তোমার বন্ধুরা কি তোমাকে সাহায্য করবে বলেছে?"

কাবুল চটপট বলল, "নিশ্চয়ই। ওরা আমার জেনুইন বন্ধু।"

"খুব ভাল কথা।" অর্জুন বলল, "ওদের তুমি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করেছ কীভাবে ওরা টাকা রোজগার করছে? অত টাকা ওরা কোথায় পাচ্ছে?"

"আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওরা উত্তর দেয়নি।"

pathagar.net

"তোমার মনে কোনও সন্দেহ হয়নি?" অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"না। ওরা সবাই বড়লোক। ব্যবসা শুরু করেছে বলেছে।" হঠাৎ কাবুলের যেন খেয়াল হল, "এসব কথা আপনারা কী করে জানলেন?"

"কেন?" অবনীবাবু হাসলেন।

"ওরা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিল।"

"কিন্তু কাবুল, টাকাটা যদি সৎপথে ওরা উপার্জন করে এবং তোমার উপকারের জন্যে খরচ করে, তা হলে খবরটা চেপে যাবে কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি জানি না।"

"টাকাগুলো কোথায়?"

একটু ইতস্তত করে কাবুল জবাব দিল, "আমার কাছেই আছে।"

অবনীবাবু বললেন, "তুমি বললে কেন ওরা গোপন করেছে তা জানো না। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। কিন্তু তোমার উচিত কারণটা জানা।"

"বেশ। জিজ্ঞেস করব।"

অবনীবাবু কাবুলের বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ঘরে ফোন আছে?"

উত্তরটা দিল কাবুলই। হাত দিয়ে হুইলচেয়ার ঘুরিয়ে সেল্‌ফ থেকে কর্ডলেস রিসিভার টেনে বের করল। অর্জুন চটপট এগিয়ে গেল। "টেলিফোনে বেশি কথা বলার দরকার নেই। তুমি শুধু বলবে ও যেন এখনই এখানে আসে। কথা আছে। জরুরি। ব্যস। সন্দীপকে ফোন করছ তো?"

কাবুল মাথা নাড়ল। ডায়াল করে সন্দীপকে চাইল। তারপর বলল, "অ্যাই সন্দীপ, তোর সঙ্গে খুব জরুরি কথা আছে। একটু আসতে পারবি? হ্যাঁ, এখনই। আচ্ছা।" যন্ত্রটাকে বন্ধ করে বলল, "ও আসছে।"

অবনীবাবু পাশের দরজাটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ঘরে কে থাকে?"

"কেউ না। খালি।" কাবুলের বাবার গলার স্বর পালটে গিয়েছে, "এসব কথা আমি জানিই না। তুই তো কখনও আমাকে বলিসনি যে তোর বন্ধুরা তোকে টাকা দিয়ে যাচ্ছে। কত টাকা দিয়েছে এ পর্যন্ত।"

"ওরা নিষেধ করেছিল।"

"কত টাকা দিয়েছে?"

একটু ভাবল কাবুল। তারপর সেল্‌ফ থেকে একটা ডায়েরি বের করে পাতা ওলটাল, "তিন লক্ষ সত্তর হাজার।"

"অ্যাঁ! অ্যাত্ত টাকা!" চিৎকার করে বললেন কাবুলের বাবা, "এই ঘরে তুই এত টাকা রেখেছিস জানতে পারলে যে কোনওদিন ডাকাতি হয়ে যাবে।"

"কেউ জানত না, তোমরা না বললে কেউ জানবে না।" কাবুল বলল, "আর দু' লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা জমলেই আমি আমেরিকায় যেতে পারব। মোট ছ'লক্ষ টাকা লাগবে ওই অপারেশনটা করাতে।" চোখ বন্ধ করে বলছিল কাবুল। যেন

স্বপ্নটা সত্যি হতে যাচ্ছে, এমন আলো ওর মুখে।

মিনিট পনেরো যেতে-না-যেতেই সন্দীপ পৌঁছে গেল। সঙ্গে আর একটি ছেলে। অর্জুনরা তখন পাশের ঘরে বসে রয়েছে। মাঝখানে পরদাটার আড়াল।

"কী ব্যাপার? কী হল?" সন্দীপের গলা।

"বোস।" কাবুল বলল।

"তাড়াতাড়ি বল।" আর-একটি গলা শোনা গেল, "কাল রাত্রে পুলিশ খুব ঝামেলা করেছে। আজ উকিলের সঙ্গে কথা বলে কোর্টে যেতে হবে। যা বলার তাড়াতাড়ি বল।"

"পুলিশ তোদের সঙ্গে ঝামেলা করেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ও অন্য ব্যাপার।" সন্দীপ বলল, "চটপট বল কাবুল।"

"তোরা আমাকে যে টাকা দিয়েছিস তা কোথায় পেয়েছিস?"

"হঠাৎ এ-কথা?" সন্দীপের গলায় সন্দেহ।

"তোরা আমাকে বলেছিস কাউকে না বলতে। কেন?"

"কেন আবার। সবাই জানলে নানান কথা বলবে, তাই।"

"তাতে কী এসে যায়। তোরা আমার উপকার করছিস এটা তো ভাল কথা। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। এখনই আমেরিকায় যেতে চাই।"

"দুর। এখনও অনেক টাকা জোগাড় করতে হবে।"

"বাবাকে বললে ধার করেও কিছু জোগাড় করতে পারবে।"

"না। এখনই তোর কোথাও যাওয়া চলবে না।" সন্দীপের গলা।

"কেন?"

"বলছি যা, তা তোকে শুনতে হবে।"

"তোদের কথা আমার ভাল লাগছে না।"

"দ্যাখ, টাকাটা আমাদের, তোকে রাখতে দিয়েছি, এটা ভুলে যাস না।"

"কিন্তু টাকাটা তোরা কীভাবে পাচ্ছিস?"

"সেটা জেনে তোর কী লাভ? আমরা চুরি করি আর ডাকাতি করি, তোর তো টাকাটা পেলেই হল। ফালতু ডেকে আনলি।"

"না। যদি অন্যায় করে টাকাটা নিয়ে আসিস, তা হলে আমার দরকার নেই। অন্যায়ের টাকায় আমার পা সারালে সারাজীবন অপরাধী হয়ে থাকব।"

সন্দীপ বলল, "মনে হচ্ছে কেউ তোর ব্রেন ওয়াশ করেছে।"

কাবুল জবাব দিল না। সন্দীপ জিজ্ঞেস করল, "আজকালের মধ্যে তুই বাইরের কার সঙ্গে কথা বলেছিস। কাবুল, জবাব দে।"

"আমার কিছু বলার নেই। তুই শুধু বল, এটা ব্যবসা করে সৎপথে উপার্জনের টাকা। বল।"

দ্বিতীয় গলা বলল, "টাকাটা নিয়ে চল সন্দীপ।"

"হ্যাঁ। সেটাই উচিত। কাবু, টাকাগুলো দে।"

"কেন?"

"তোর কাছে রাখা আর ঠিক নয়। যখন ছ'লক্ষ হবে তখন তোর কাছে আসব। দিয়ে দে। ওই সুটকেসে আছে, তাই তো?"

"তোরা টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছিস?" চিৎকার করে উঠল কাবুল।

অর্জুন ইশারা করতেই অবনীবাবু দ্রুত পরদা সরালেন।। সুটকেস থেকে বড়-বড় খাম বের করছে সন্দীপ। তার পাশে একটি ছেলে।

অবনীবাবু কথা বললেন, "সন্দীপ।"

সন্দীপ যেন ভূত দেখল। ওর হাত থেকে খামগুলো পড়ে গেল।

অবনীবাবু বললেন, "আশা করি তুমি সুবোধ বালকের মতো থানায় যাবে!"

সন্দীপ ঘুরে দাঁড়াল কাবুলের দিকে। তারপর হিংস্র বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ওর ওপর। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে তাকে আটকে দিতেই সে চিৎকার করে উঠল, "তুই তা হলে বেইমানি করলি কাবুল। তুই যাতে হাঁটতে পারিস তাই এত টাকা এনে দিয়েছি আর তুই পুলিশকে লুকিয়ে রেখে আমাদের ডেকে আনলি। বেইমান, বিশ্বাসঘাতক।"

boiRboi.net

অর্জুন থানায় ঢুকল না। অবনীবাবু এখন উত্তেজিত। খুশিও। সন্দীপ এবং তার বন্ধু ছাড়াও কাবুলকেও হুইলচেয়ারে বসিয়ে থানায় এনেছেন তিনি। গাড়ি বেরিয়ে গেল সন্দীপদের অন্য বন্ধুদের তুলে আনতে। অর্জুনের খারাপ লাগছিল কাবুলের জন্যে। বেচারার স্বপ্ন আর সত্যি হবে না। কিন্তু সত্যি কি সন্দীপরা ওর উপকারের জন্যে ডাকাতি করছিল? বন্ধুকে ভাল করার জন্যে? এর উত্তর এখনই পাওয়া যাবে না। এখন বাড়িতে গিয়ে ঘুমোতে হবে। লম্বা ঘুম। দুপুরেই মেজরদের সঙ্গে যেতে হবে ডুয়ার্সে। গোরানসাহেব এখনও বিশ্বাস করেন ওই অঞ্চলে ড্রাকুলা আছে। দেখা যাক!

॥ ১১ ॥

দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছিল অর্জুন, মা ঘুম ভাঙালেন, "তখন থেকে লোকটা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওর সঙ্গে কথা বলে স্নানখাওয়া করে নিয়ে না হয় আবার ঘুমিয়ে পড়।"

সারারাত জেগে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েও অর্জুনের ঘোর কাটছিল না। জিজ্ঞেস করল, "কে লোক? নাম কিছু বলেছে?"

"হ্যাঁ, গোরক্ষনাথ।"

অর্জুন মায়ের দিকে তাকাল, মা বললেন, "লোকটা যেন কীরকম!"

অর্জুন ধড়মড়িয়ে উঠে বাথরুমে চলে গেল। একটু ভদ্রস্থ হয়ে যখন বাইরের ঘরের দিকে এগোল তখন মা জিজ্ঞেস করল, "চা দেব?"

"হ্যাঁ।" অর্জুন দেখল এখন বারোটা বাজে।

দরজা খুলতেই গোরক্ষনাথকে দেখতে পেল সে। তাকে দেখে ডান হাত মুঠো করে কপালে ছুঁইয়ে নমস্কারের ভঙ্গি করল সে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"একটু কথা ছিল।" চারপাশে তাকাল গোরক্ষনাথ।

"আসুন।"

গোরক্ষনাথ ভেতরে এসে সন্তর্পণে বসল। অর্জুন তাকাল।

গোরক্ষনাথ বলল, "সন্দীপবাবুদের পুলিশ ধরেছে, ডাকাতি করত ওরা। মুশকিল হল আমাকেও ওরা জড়িয়ে ফেলবে ওই মামলায়।"

"কেন? আপনি ওসব করতেন নাকি?"

"না, না।" প্রবল আপত্তি জানাল গোরক্ষনাথ, "ওসব করার কথা চিন্তাও করতে পারি না। সেকেন্ড অফিসার বললেন, ডাকাতির মাল যার কাছে পাওয়া যায় তাকে যেমন শাস্তি দেওয়া হয়, তেমনি যার সাহায্যে ডাকাতি করা হয় তাকে যে হেফাজতে রাখে তাকেও ধরা হয়। আপনি বলুন, আমি কি জেনেশুনে বেড়ালটাকে আমার কাছে রেখেছি! ওরকম বড়লোকি বেড়ালকে এক মাস রাখলে আমি ফতুর হয়ে যাব।"

অর্জুন বলল, "আপনি অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলেন?"

"উনি নাকি সারারাত জেগে ছিলেন তাই এখন ঘুমোচ্ছেন, দেখা পাইনি।"

"তা হলে নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনার কোনও ভয় নেই।"

"আপনি একটু দেখুন বাবু। ওই বেড়ালটাকে আমি থানায় ফেরত দিতে গিয়েছিলাম, ওনারা বললেন, না। বলেছেন, আমার সঙ্গে ওটাকে আদালতে তুলবেন। তবে একটা কথা বাবু, বেড়ালটা দেখতে পায়।" হঠাৎ মুখচোখ পালটে গেল গোরক্ষনাথের।

এই সময় মা চা দিয়ে গেলেন, সঙ্গে বিস্কুট।

মা চলে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "দেখতে পায় মানে?"

"তেনাদের। কাল রাত্রে আমি প্রমাণ পেয়েছি।"

"কীরকম?"

"খাঁচার মধ্যে যেন লড়াই করছিল বেড়ালটা। একা একা।"

হঠাৎ মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল অর্জুনের। সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে আপনার কাজকর্ম এখন কীরকম? খুব চাপ?"

"চাপ কোথায় বাবু? আগের দিন কি আছে? বেঁচে থাকার এত সমস্যা যে, মানুষের সময় কোথায় তেনাদের নিয়ে ভাবার? দিন পনেরো পরে রায়কত পাড়ায় একটা যজ্ঞ করতে হবে। কেন বাবু?"

"চা খাব।"

মায়ের আপত্তি ছিল স্নানখাওয়া না সেরে বেরনোতে, কিন্তু তাঁকে বোঝাল, মেজরের সঙ্গে একবার দেখা করে আসা উচিত। ওরা বাড়ি থেকে বেরোতেই হাবুকে দেখতে পেল। হন্তদন্ত হয়ে আসছে। হাবু ইশারায় যা বোঝাল তাতে অর্জুন বুঝল এখন সার্কিট হাউসে যাওয়ার দরকার নেই। মেজর এবং গোরানসাহেব অমল সোমের বাড়িতে চলে এসেছেন এবং তাকে খবর পাঠিয়েছেন।

ওদের আগে আগে হাবু যাচ্ছিল। গোরক্ষনাথের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তাকে জোর করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। নেহাত পুলিশের ঝামেলায় সে পড়েছে, নইলে সে কখনওই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে আসত না।

অমল সোমের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছিলেন মেজর। তাঁর লক্ষ যার দিকে সেটি যে একটা কাক, তা বুঝে হেসে ফেলল অর্জুন। কাছে গিয়ে বলল, "আপনি একটা কাককে ওভাবে ধমকাচ্ছেন?"

"আরে বিস্তর কাক দেখেছি কিন্তু এমন পাজির পাঝাড়া কাক কখনও দেখিনি। সেই কখন থেকে এসেছি তখন থেকে সমানে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কানের পোকা বের করে ফেলল। ব্যাটা ইঁদুর, ধর্মের গাধা!"

অর্জুন মজা পেল, "ধর্মের গাধা কী প্রাণী?"

"কেন? কাশীতে যদি ধর্মের ষাঁড় থাকতে পারে তা হলে জলপাইগুড়িতে ধর্মের গাধা থাকবে না কেন? দেখছ, এখনও থামছে না হাঁড়িচাচাটা।" মেজর বারান্দা থেকে নেমে একটা ছোট পাথর কুড়িয়ে নিয়ে কার্নিসে বসা কাকটার দিকে তাক করতে লাগলেন। হঠাৎ ছুটে এল গোরক্ষনাথ, "মারবেন না, মারবেন না। একটু দাঁড়ান, ভাল করে দেখি।"

"এ আবার কী? কাকের জন্যে দরদ উথলে উঠল? ওহে, কাক হল এমন চিজ, যে কখনও পোষ মানে না। হ্যাঁ।" মেজর বললেন।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল গোরক্ষনাথ। দুটো হাত মাথার ওপর তুলে নাচতে লাগল "পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি" বলে। এবং চিৎকার কানে যাওয়ামাত্র কাকটা চুপ করে একদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখার চেষ্টা করতে লাগল।

"এ এমন চিংড়ির মতো লাফাচ্ছে কেন হে অর্জুন?" মেজর অবাক!

গোরক্ষনাথ ছুটে এল অর্জুনের সামনে, "বাবু, যে করেই হোক ওটাকে ধরতে হবে। ওই দেখুন ওর এক চোখ কানা। ডান দিকটা দিয়ে দেখতে পায় না বলে ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁ দিকটা দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে।"

"কানা কাক?" অর্জুনের মনে পড়ে গেল। খোঁড়া শকুন, কালো বেড়াল সংগ্রহে এসে গেছে কিন্তু গোরক্ষনাথ এখনও কানা কাক খুঁজে পায়নি।

মেজরকে ব্যাপারটা বোঝাতে হল। প্রথমে তিনি বললেন, "যতসব গ্যাঁজাখোরের কাণ্ড।" তারপর বললেন, "একে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমেরিকাতেও এখন দিন দিন গেঁজেল বেড়ে যাচ্ছে। যাকগে, কাকটাকে ধরতে চাও?"

গোরক্ষনাথ সবেগে মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ বাবু।"

"তা হলে ভাত নিয়ে এসো। ভাত ছড়ালে যেমন কাকের অভাব হয় না তেমনই কাক ধরতেও সুবিধে হয়। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ইগমি নামের একটি উপজাতি থাকে। খুব কম লোকই তাদের দেখা পায়। আমি ওদের কাছ থেকে পাখিধরা শিখেছিলাম।"

আফ্রিকা একটি বিশাল মহাদেশ। তার কিছুটা নাকি এখনও অনাবিষ্কৃত, সেখানে ইগমি নামের উপজাতি থাকতেই পারে। সন্দেহ প্রকাশ করে কোনও লাভ নেই। হাবুকে বলে কিছুটা শুকনো ভাত জোগাড় করা হল।

কিন্তু মেজর যে কায়দাটা করল তা পশ্চিমবাংলার শিশুরাও জানে। একটা বড় ঝুড়ি খাড়া করে দড়ি দিয়ে বাঁধা হল। ভাত রাখা হল ঝুড়ির সামনে। দড়িটা লম্বা। সেটার প্রান্ত ধরে মেজর আড়ালে চলে গেলেন। কাকটা অনেকক্ষণ একচোখে যাচাই করল। কোনও কাককে অতক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকতে দেখেনি অর্জুন। শেষ পর্যন্ত লোভ প্রবল হওয়াতে কাকটা উঁচু কার্নিস থেকে নেমে এল ঝুড়ির সামনে। এক পা দু' পা করে ভাতের কাছে পৌঁছে গিয়ে খপ করে কিছুটা তুলে লাফিয়ে সরে এল ঝুড়ির আওতা থেকে। ঝুড়ি পড়ল না, কোনও বিপদ ঘটল না দেখে বোধহয় কাকটার সাহস বাড়ল। এগিয়ে গিয়ে গপগপ করে ভাত খেতেই মেজরের দড়ির টানে ঝুড়িটা পড়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল গোরক্ষনাথ। কাকটা ধরা পড়ে গেছে।

গোরানসাহেব কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন কেউ টের পায়নি। এবার তিনি এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন ব্যাপারটা কী? অর্জুন তাঁকে গোরক্ষনাথের সাধনার জন্যে যেসব সামগ্রীর প্রয়োজন, সেটা ব্যাখ্যা করল। সঙ্গে-সঙ্গে চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল গোরানসাহেবের। ঝুড়ির পাশে উবু হয়ে বসে লক্ষ করছিল গোরক্ষনাথ, তিনি তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, "তুমি সত্যি বলছ?"

গোরক্ষনাথ মুখ তুলে সাহেবকে দেখে দু' হাত নাড়ল, "নো ইংরেজি।"

মেজর বাংলায় অনুবাদ করলে সে দ্রুত মাথা নাড়ল, "ইয়েস ইয়েস।"

"দেন হি উইল গো উইদ আস।"

মেজরের কাছে বাংলা শুনে গোরক্ষনাথের মুখ চুপসে গেল, "আমাকে ছেড়ে দিন সাহেব। এত কষ্টে কাকটাকে পেয়েছি, এখন এখানে আমার ডিম্যান্ড বেড়ে যাবে।"

"কত টাকা রোজগার করো দিনে?"

"প্রতিদিন তো হয় না। তেমন খদ্দের পেলে সেটা হয়।"

গোরক্ষনাথ অর্জুনের দিকে তাকাল, "ও বাবু, ওঁদের একটু বুঝিয়ে বলুন না!"

অর্জুন বলল, "কিন্তু গোরক্ষনাথ, আপনার এখানে থেকে কোনও লাভ হবে না।"

"কেন?"

পুলিশ তো বেড়ালটাকে নিয়ে যাবে। আর একটা বেড়াল জোগাড় না করা পর্যন্ত! তার চেয়ে এঁরা যা বলছে শুনুন। পুলিশের চোখের সামনে থেকে চলে গেলে তারাও হয়তো আপনাকে ভুলে যাবে। ক'দিন বাদে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ফিরে আসবেন।"

অর্জুনের কথাটা বোধহয় মনে ধরল গোরক্ষনাথের। তারপর একটু ভেবে বলল, "আমার মুশকিল হল ওই বুড়িটাকে নিয়ে। আমি চলে গেলে কে ওকে দেখবে? কে ওর বাজার করে এনে দেবে? আচ্ছা, কদ্দূর যেতে হবে?"

"হাসিমারার কাছে।"

"অ। ঠিক আছে, পাড়ার একটা ছেলেকে বলে দেখি। কিছু পয়সা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে যেতে হবে।"

গোরানসাহেব বুঝলেন গোরক্ষনাথ খুশি হয়েছে। উনি সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে গোরক্ষনাথের হাতে গুঁজে দিলেন। এবার অর্জুন এগিয়ে এল ঝুড়িটার দিকে, "কিন্তু গোরক্ষনাথ, মানলাম এই কাকটা কানা। কিন্তু আপনি বলেছিলেন ওকে জন্মাতে হবে কানা হয়ে। এই কাকটা যে সেই শ্রেণীর তা বুঝলেন কী করে?"

"দাঁড়ান, দেখাচ্ছি।" গোরক্ষনাথ তার জামাটা খুলে ফেলল। ডান হাত জামার ভেতর ঢুকিয়ে ঝুড়িটাকে সামান্য তুলে খানিকটা চেষ্টার পর কাকটাকে ধরে ফেলল। তারপর ঝুড়ি সরিয়ে ওটা বের করতে কাকটা আর্তনাদ শুরু করল। বাঁ হাতে ওর মুখ চেপে ধরে কানা চোখটাকে অর্জুনের সামনে নিয়ে এল সে, "দেখুন বাবু, চোখটা একদম সাদা। কোনও খোঁচা খেয়ে কানা হলে আশেপাশের জায়গা ফুলে থাকত। চোখের মণিও অন্যরকম দেখাত। এ একেবারে আমার জন্যই এখানে বসে অপেক্ষা করছিল। তা হলে আমি যাই?"

অর্জুন মেজরকে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কী ঠিক করলেন? আজই যাবেন, না কাল ভোরে রওনা হবেন?"

মেজর গোরানসাহেবকে প্রশ্নটা করতে তিনি বললেন, "এখানে খামোকা সময় নষ্ট করে কী লাভ?"

অর্জুন জানাল, "কিন্তু তৈরি হয়ে হাসিমারায় পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। বরং শহরে থেকে আর একটু প্রস্তুতি নিয়ে গেলে ভাল হয়।"

সেই সিদ্ধান্ত হল। গোরক্ষনাথ তার সাধনার সামগ্রী নিয়ে সকাল সাতটার সময় জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।

গোরক্ষনাথ চলে গেলে অর্জুন মালপত্রগুলো ভাল করে দেখল। মেজর এখান থেকেই চাল ডাল নুন কিনে নিয়ে যেতে চান। যদি জঙ্গলের গভীরে থাকতে হয় টেন্ট পেতে, তখন দরকার হবে। অর্জুন জানতে চাইল, "রাঁধবে কে?"

"কেন? আমি কি মরে গেছি? বছর তিনেক আগে উত্তরমেরুর একটা ইগলুতে বসে সিল দ্য মাকুরিয়ান রান্না করেছিলাম। ওঃ, তোমাকে কী বলব অর্জুন, তাই

খেতে এত এস্কিমো জড়ো হয়েছিল যে, ইগ্‌লুতে বসে ঘামতে হয়েছিল আমাকে। মনে হয়েছিল ফ্যান থাকলে ভাল হত।" মেজর স্বর্গীয় হাসি হাসলেন, যেটা তাঁর গোঁফদাড়ির জঙ্গল ছাপিয়েও দেখা গেল।

"ঘামতে হয়েছিল কেন? বেশি ঝাল দিয়ে ফেলেছিলেন?"

"দুর। একটা বড় ইগ্‌লুতে কুড়িজন কোনওমতে আঁটতে পারে, সেখানে একশোজন ঢুকে পড়লে শরীরের গরমেই ভেতরটা তেতে উঠবে। ঘাম তো হবেই।"

"কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে সিল মাছ তো পাবেন না?"

"উঃ, জঙ্গলে গিয়ে আমি তোমাকে রাইস দ্য হেন খাওয়াব।"

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। যত জিনিস যাবে তা একটা গাড়িতে আঁটবে না। বড় সুমো গাড়ির ছাদে চড়ালে একরকম ম্যানেজ হতে পারে। ওঁরা অর্জুনকে দায়িত্ব দিলেন তার ব্যবস্থা করতে। তা ছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার মধ্যে হলেও এস. পি. সাহেবের বিশেষ অনুমতি নিতে হবে।

মেজর এবং গোরান আজ কৌটোর খাবার খাবেন। অতএব অর্জুন বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরে স্নান-খাওয়া শেষ করল। বাইরে যাওয়ার কথা বললে আগে মায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে যেত। এখন শুধু বলেন, "তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

কদমতলার মোড়ে একটা সুমো গাড়ি পাওয়া গেল। ওখানেই প্রাইভেট ট্যাক্সিগুলো খদ্দেরের আশায় দাঁড়িয়ে থাকে। সুমো গাড়ির ড্রাইভারের নাম বটা। টাকাপয়সার কথা হয়ে যাওয়ার পর বটা বলল, "দাদা, আপনাকে আমি চিনি। আপনি তো জলপাইগুড়ির গর্ব। আমাকে একটা ব্যাপারে মাপ করতে হবে। সন্ধের পর যদি গাড়ি না চালাই তখন আমার খোঁজ করবেন না।"

"কেন?"

"এই এমনি।"

অর্জুন বুঝল লোকটা তখন নেশা করবে। সে বলল, "যদি তোমাকে রাতের জন্যে একেবারে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে যা ইচ্ছে করো, নইলে নয়।" কথা হল, বটা ভোর ছ'টায় তার গাড়ি নিয়ে অর্জুনের বাড়িতে চলে আসবে। আর সুমোর ওপরে একটা ক্যারিয়ার লাগিয়ে নেবে আজই।

বিকেলে থানায় এল অর্জুন। অবনীবাবুর চেয়ারে যে ভদ্রলোক বসে আছেন তাঁর সঙ্গে এখনও আলাপ হয়নি ওর। এস. পি. সাহেব নতুন এসেছেন। অবনীবাবুর উলটোদিকে বসে ছিলেন। অর্জুনকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আসুন, আসুন। সার ইনি অর্জুন, এঁর কথা আপনাকে বলছিলাম।"

এস.পি. সাহেবও উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে বললেন, "অনেক, অনেক ধন্যবাদ। আপনার সাহায্য ছাড়া এত বড় ক্রিমিনালদের ধরা একটু কঠিন হত।"

অর্জুন বলল, "আমার মনে হয় এরা বড় ক্রিমিনাল নয়। কিন্তু কাজটা যে ঠিক

করেনি এতে সন্দেহ নেই। যা হোক, আমি আপনার কাছে যাচ্ছিলাম, এখানে দেখা পেয়ে ভাল হল।"

"বলুন।"

"আমরা আগামীকাল হাসিমারার দিকে যাচ্ছি। আমার সঙ্গে একজন বাঙালি এবং একজন ইংরেজভাষী আমেরিকান আছেন। ওঁরা ওদিকের জঙ্গলে কয়েকদিন থাকতে চান। এ ব্যাপারে কোনও অসুবিধে হলে যাতে লোকাল থানা সাহায্য করে তাই অনুরোধ করছি।" অর্জুন বলল।

"নিশ্চয়ই। আমি জানিয়ে দেব। কিন্তু ফরেস্টে থাকতে হলে আপনাকে ডিএফও-র সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

"ও। নিশ্চয়ই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।"

অবনীবাবু বললেন, "আজ ওদের আমরা কোর্টে তুলেছিলাম। ওদের আত্মীয়রা বেলের জন্যে এসেছিল, একমাত্র সন্দীপের জন্যে কেউ আসেনি। কিন্তু আরও তদন্তের জন্যে কোর্ট ওদের কাউকেই বেল দেয়নি।"

অর্জুনের মনে পড়ে গেল, "আচ্ছা, গোরক্ষনাথকে কবে লাগবে আপনার?"

"ও ওই বেড়ালটার ব্যাপার! ওকে লাগবে কেস ওঠার সময়। দেরি আছে।"

"গোরক্ষনাথ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।"

"সে কী? ওখানে ভূতপ্রেতের ব্যাপার আছে নাকি?"

"তার চেয়ে একটু ভয়ঙ্কর। ড্রাকুলা।" অর্জুন হেসে বেরিয়ে এল।

ঠিক সকাল ছ'টায় বটা গাড়ি নিয়ে এল। অর্জুন তৈরি ছিল। গতকাল সন্ধেবেলায় সে ডিএফও সাহেবের সঙ্গে দেখা করে লিখিত অনুমতি নিয়ে এসেছে। তিনি তাঁর দফতরকে জানিয়ে দেবেন বলেছেন। মেজর এবং গোরানসাহেবকে তুলে সে চলে এল সুমো নিয়ে অমল সোমের বাড়িতে। কাল বিকেলে মেজর এত বাজার করেছেন যে বটার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। গাড়ির ছাদে মালপত্র তুলে ত্রিপল দিয়ে বেঁধেও যা উদ্বৃত্ত রইল তা পেছনের সিটে রাখতে হল।

সুমো দেখে গোরানসাহেব খুশি। মেজরও। তিনি বললেন, "আফ্রিকার জঙ্গলে আমি যে গাড়ি ব্যবহার করতাম সেগুলো হল ব্রিটিশ জিপ। খুব শক্তপোক্ত।" পাম্প থেকে গাড়ির ট্যাঙ্ক ভর্তি করে নিয়ে ওরা শহর ছেড়ে যাওয়ার মুখে রাজবাড়ির সামনে দাঁড়াল। সেই ভোরে তিন-তিনটে খাঁচা আর একটা বড় ব্যাগ নিয়ে গোরক্ষনাথ দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুন বলল, "উঠে আসুন।"

খাঁচাগুলো তুলে পেছনের সিটে বসে গোরক্ষনাথ বলল, "কাল রাত্রে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম বাবু। এই তিনটে না থাকলে...!"

"কেন, কী হয়েছিল?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"তেনাদের কেউ পথ ভুল করে চলে এসেছিলেন।" গোরক্ষনাথ বলল।

তিস্তা ব্রিজ ছাড়িয়ে সুমো ডুয়ার্সে ঢুকল। দু'পাশে ধানের মাঠ, চওড়া হাইওয়ে, তখনও রোদ কড়া না হওয়ায় বাতাসে ঠাণ্ডা আমেজ, পেছনের খাঁচায় বসে কাকটা কা কা করে উঠল। মেজর দু'হাতে কান ঢাকলেন, "ওঃ, হাঁড়িচাচাটার মুখ বাঁধা যায় না?"

গাড়ি দোমহনি পেরিয়ে বাইপাস ধরল, চারপাশের সবুজের দিকে তাকিয়ে গোরানসাহেব বললেন, "বিউটিফুল।" অর্জুনের মনে পড়ল, সে যখন আমেরিকায় গিয়ে হাইওয়ে ধরে কোথাও গিয়েছিল তখন দু'পাশে একই দৃশ্য দেখেছে, কোথাও দৃশ্যান্তর হয়নি। ফলে একটু বাদেই একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল।

ধূপগুড়ি থেকে বাঁক নিয়ে ওরা রাস্তা সংক্ষেপ করল। ধূপগুড়িতে মেজর ব্রেকফাস্ট করতে চাইলেন। দুটো করে ডিম আর হাতে-গড়া রুটি। এর বেশি অন্য কিছু খেলে নাকি ওঁদের পেট খারাপ হতে পারে। সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে জলের বোতল রয়েছে। এঁরা দু'জনেই বাইরের জল খান না। অর্জুন গরম গরম পুরি এবং তরকারি খেল। সঙ্গে জিলিপি। গোরক্ষনাথও তাই। ওদের খাওয়া জুলজুল করে দেখছিলেন মেজর। তারপর বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এসব আমিও ছেলেবেলায় খেতাম।"

"এখন অসুবিধে হচ্ছে কেন?"

"বড়লোকের বাড়ির কুকুরকে দেখেছ? বাছাই করা খাবার ছাড়া খায় না। মাছ বা মাংস কাঁটা বা হাড় বাদ দিয়ে তাদের মুখের সামনে তুলে ধরা হয়। ইনজেকশন, ওষুধ নিয়মিত খাইয়ে তাজা রাখা হয়। গরমের সময় ঠাণ্ডা ঘর, আবার ঠাণ্ডার সময়ে গায়ে কম্বল চাপিয়ে দেওয়া হয়। আর এইসব করে ওদের স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তির বারোটা বেজে যায়। রাস্তার কুকুর বা বাড়ির নেড়ি কুকুর যা খেয়ে সহজে হজম করে ফেলে, ওরা তা খেলে মরে যাবে। আমিও তাই হয়ে গেছি বলতে পারো। তেলেভাজা কিছু দেখলেই সন্দেহ করি!" মেজর বললেন।

নিজের সঙ্গে একটি নেড়ি কুকুরের তুলনা ভাল লাগার কথা নয়, তবু অর্জুনের মনে হল মেজর তো তাকে আহত করার জন্যে উপমাটা দেননি। এই কথাগুলোর মধ্যে তিনি নিজেকে নিয়েও ঠাট্টা করেছেন। ইচ্ছে করলেই এখন সব কিছু খেতে পারেন না।

ওরা যখন মাদারিহাটে পৌঁছল তখন প্রায় এগারোটা বাজে। ইতিমধ্যে গোরানসাহেব দু'বার ম্যাপ দেখেছেন। ডুয়ার্সের এই অঞ্চলের বিশদ বিবরণ ছাপা ম্যাপ কী করে আমেরিকায় পাওয়া যায় তা কে জানে! নিজের দেশের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে ওরা যত খোঁজখবর রাখে তার এক শতাংশও আমরা নিজেদের দেশ সম্পর্কে রাখি না।

মোড়ের মাথায় এসে গাড়ি থামিয়ে গোরানসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "ম্যাপে বলছে, ডান দিক ধরে কিছুটা গেলেই হলং নামের জঙ্গল পড়বে। রাইট?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "জঙ্গলটার নাম হলং কিনা জানি না। তবে ওখানে হলং ফরেস্ট বাংলো আছে। আপনি কি ওখানে যেতে চান?"

"ফরেস্ট বাংলোতে টুরিস্টরা থাকবে, হ্যাঁ, ইয়েস, নাম বলছে জলদাপাড়া।"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ। খুব বিখ্যাত ফরেস্ট। গণ্ডার দেখা যায়।"

গোরানসাহেব বললেন, "আমরা ওদিকে যাব না। এখানে কোনও হোটেল আছে?"

গাড়ি একটু এগোতেই বাজার এলাকা এসে গেল। সেখানে ওরা গাড়ি থেকে নেমে একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। গোরক্ষনাথ নামল না। সে তার ব্যাগ থেকে খাবার বের করে পাখি দুটো আর বেড়ালটাকে খাওয়াতে লাগল।

তিন গ্লাস চা নিয়ে বসে দোকানদারের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা গেল এখানে কোনও হোটেল নেই। জলদাপাড়ার জঙ্গলের ভেতরে যেমন হলং বাংলো আছে তেমনি জঙ্গলের বাইরে মাদারিহাট টুরিস্ট লজটি এত বড় যে, এখানে আর হোটেল ব্যবসা করার কথা কেউ ভাবেনি। হোটেল আছে হাসিমারায়, ফুন্টশলিঙে।

দু'জন ভদ্রলোক চা খাচ্ছিলেন আর ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন। তাঁদের একজন উঠে এলেন, "আপনারা কোত্থেকে আসছেন?"

মেজর জবাব দিলেন, "আপাতত জলপাইগুড়ি থেকে আসছি ভাই। ও ওখানে থাকে। ওর নাম অর্জুন। তুমি যেন নিজেকে কী বলো?"

অর্জুন বলল, "থাক না।"

ভদ্রলোক বললেন, "অর্জুন! কিছু মনে করবেন না, আপনি কি সেই সত্যসন্ধানী?"

মেজর লুফে নিলেন শব্দটা, "ইয়েস, ইয়েস! সত্যসন্ধানী!"

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে দিলেন, "আরে ভাই, আপনার গল্প খুব শুনেছি। আপনি তো আমেরিকায় গিয়ে রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন। আপনার জন্যে আমরা গর্বিত। তা ছাড়া আপনার গুরু মিস্টার অমল সোমের সঙ্গে আমার একসময় পরিচয় ছিল। খুব ভাল লাগছে।"

"আপনার পরিচয়টা—?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"আমি সামান্য লোক। ব্যবসা করে খাই। আলিপুরদুয়ারে থাকি। তবে এখানে, মাইল কুড়ি দূরে একটি বাড়ি কিনেছি ঝোঁকের মাথায়। একজন ব্রিটিশ বাড়িটা বানিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর ভদ্রলোক এক চা বাগানের মালিককে সেটা বিক্রি করে দেন। ওঁরা কিছুদিন ব্যবহার করে প্রায় পোড়ো বাড়ির মতো ফেলে রেখেছিলেন। জলের দামে পেয়ে গেলাম বলে নিয়ে নিলাম। আমার নাম লোকনাথ দত্ত।"

এই নামের কোনও লোকের কথা অমল সোমের কাছে শুনেছে বলে মনে পড়ল না অর্জুনের। তবে ভদ্রলোক বেশ মিশুকে, এটা বোঝা গেল।

চায়ের দাম দিতে যাচ্ছিল অর্জুন, লোকনাথ বাধা দিলেন। নিজে দাম মিটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা এদিকে কেন? বেড়াতে?"

"একরকম তাই। ওঁরা এসেছেন আমেরিকা থেকে। জঙ্গলে থাকতে চান কিন্তু ফরেস্ট বাংলোতে নয়।" অর্জুন জানাল।

"তাই নাকি? কিন্তু এদিকের জঙ্গল এখন নিরাপদ নয়।"

"কেন?" মেজর জানতে চাইলেন, "ম্যান ইটার আছে নাকি?"

"জন্তু-জানোয়ার নিশ্চয়ই আছে, তবে তারা মানুষখেকো নয়। প্রায়ই একটা না একটা মানুষের ডেডবডি পাওয়া যাচ্ছে, যার শরীরে রক্ত নেই।"

মেজর চট করে গোরানসাহেবের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে খবরটা ইংরেজিতে পরিবেশন করলেন। গোরান কৌতূহলী হয়ে লোকনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, "লোকগুলোর শরীরে কোনও দাগ আছে? বিশেষ করে গলার পাশে?"

"আমি দেখিনি। লোকাল থানার অফিসার বলতে পারবে। যাক গে, আপনারা ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারেন। জঙ্গলের গায়ে বাড়ি। মুশকিল হল ওখানে কোনও কাজের লোক থাকতে চায় না। অনেক চেষ্টা করেছি, সবাই থাকতে ভয় পায়।"

"কেন?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"পাণ্ডববর্জিত জায়গা তো! অন্তত দশ মাইলের মধ্যে লোকজন নেই। আমার স্ত্রী তো খুব বকাবকি করেছেন ওরকম জায়গায় বাড়ি কিনেছি বলে। তা জঙ্গলে থাকবেন কী করে? তাঁবু আছে? তাঁবুতে থাকলেও নিজের হাতে সব করতে হবে। আমার ওখানে বিছানাপত্র সব পাবেন। কিচেন আছে। গ্যাস রেখে দিয়েছি। দরকার হলে রান্না করে নিতে পারবেন। নইলে গাড়ি পাঠিয়ে খাবার আনিয়ে নেবেন। ক'দিনের প্রোগ্রাম আপনাদের?" লোকনাথ জানতে চাইলেন।

"খুব বেশি হলে দিনসাতেক।"

"তা হলে চলুন।" দ্বিতীয় ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছিলেন পাশে। লোকনাথ তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, "আমার বন্ধু। প্রদীপ পান্ডে।"

ভদ্রলোক নমস্কার করলেন। লোকনাথ বললেন, "চলুন আপনারা। ড্রাইভারকে বলুন আমার গাড়িকে ফলো করতে।"

সুমোতে উঠে ড্রাইভারকে নির্দেশ দিয়ে মেজর বললেন, "এই জিনিসটা আমার জীবনে অনেকবার হয়েছে। চিনি জোগান চিন্তামণি। একবার কালাহারি মরুভূমিতে আমাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। রাত তখন তিনটে। দিনে বিশ্রাম, রাত্রে চলতে হত। আর ঘণ্টাদেড়েক বাদে সূর্য উঠবে। তখন আর গাড়িতে বসে থাকা যাবে না। কী করা যায়? সঙ্গীরা মতলব বের করল। গাড়ির নীচে বালি সরিয়ে গর্ত করল। বলল, সারাদিন সেখানে শুয়ে থাকবে। মাথার ওপর গাড়ি

থাকায় তার ছায়া পাওয়া যাবে। ব্যাপারটা আমার পছন্দ হল না। তখনও অন্ধকার রয়েছে। একটা টর্চ নিয়ে বাঁ দিক ধরে কিছুটা এগোলাম। যাতে পথ চিনে ফিরে আসতে পারি তার চিহ্ন রেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ শব্দ কানে এল। একটা ক্যারাভান আসছে। অনেক উট। তাদের সর্দার আমায় দেখে অবাক! ওদের ভাষায় বিপদের কথা জানালাম। ভাগ্য ভাল, ওদের দলে একজন মোটর মেকানিক ছিল। তাকে নিয়ে গাড়ির কাছে ফিরে এলাম প্রায় আধমাইল পথ হেঁটে। সে এসে দশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি চালু করে দিল। এখন কথা হল, আমি যদি আধমাইল না হেঁটে যেতাম তা হলে ওই ক্যারাভান আমাদের চোখের আড়াল দিয়ে বেরিয়ে যেত। ওরাও আমাদের দেখতে পেত না। কাকতালীয় ব্যাপার, কিন্তু আমার জীবনে এটা প্রায়ই হয়।"

অর্জুনের মনে হল এই গল্প প্রায় বিশ্বাসযোগ্য। মেজরের অনেক গল্প যেমন মেনে নেওয়া যায় না তেমন এটা নয়। সুমো গাড়ি তখন আবার হাইওয়েতে উঠেছে। দু'পাশে এখন জঙ্গল। ঝিঁঝি ডাকছে। সামনে একটা ব্রিজ পড়বে। তারপর বাঁ দিকে খানিকটা গেলে পার্বতী বরুয়ার বাড়ি, যেখানে তিনি হাতি নিয়ে থাকেন। এসব জায়গা দিয়ে সে অনেকবার গিয়েছে। সুভাষিণী চা বাগানে যখন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন, তখন বেশি যাওয়া হত। ভানুদা এখন আর সুভাষিণীতে নেই। তিনি চলে গিয়েছেন বানারহাটের কাছে রেডব্যাঙ্ক বাগানে। অনেকদিন দেখা হয়নি হাসিখুশি মানুষটার সঙ্গে।

রাস্তার পাশে একটা ধাবা। লোকনাথের গাড়িটা দাঁড়িয়ে যেতে বটা সুমোকে তার পাশে নিয়ে গেল। লোকনাথ চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, "লাঞ্চ করবেন?"

মেজর জবাব দিলেন, "না। সঙ্গে আছে।"

গাড়ি আবার চলল। একটা মেঠো পথ ডান দিকের জঙ্গল ভেদ করে চলে গিয়েছে। কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ জঙ্গল শেষ হয়ে নদীর শুকনো বুক চোখের সামনে চলে এল। একফোঁটা জল নেই কোথাও। বালি আর নুড়ির ওপর দিয়ে নদীটা পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকল ওরা।

গোরানসাহেব বললেন, "অদ্ভুত পথ তো! যখন নদী জলে ভরে যায় তখন কী করে যায়?"

মেজর বললেন, "নিশ্চয়ই অন্য কোনও ঘুরপথ আছে।"

এখানকার জঙ্গল বেশ ঘন এবং বুনো। ভেতরে সূর্যের আলো তেমন করে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছে না। অদ্ভুত আওয়াজ ভেসে আসছে জঙ্গল থেকে। পথ শেষ হল জঙ্গলের ঠিক বাইরে, যেখান থেকে পাহাড় হাত বাড়াবেই। ডুয়ার্সের এই অঞ্চলের পাহাড় বেশি উঁচু নয়। আর তখনই ওরা বাড়িটাকে দেখতে পেল। তারের বাউন্ডারি দেওয়া একতলা বিশাল বাড়ি। লোহার গেট খুলে সোজা বাড়ির সামনে চলে এসে গাড়ি দুটো থামল।

গাড়ি থেকে নামার পর লোকনাথ বললেন, "এই বাড়ি এখন আমার। বুঝতেই পারছেন এতদূরে কোনও লোক একা থাকতে চাইবে না। ফলে তালা ঝুলিয়ে রাখতে হয়েছে। দূরত্বের জন্যেই বোধহয় দরজা-জানলা এখনও চুরি হয়নি। ভেতরটা পরিষ্কার করা আছে। এই নিন চাবি। ঠিক সাতদিনের মাথায় সকাল-সকাল আমি চলে আসব। যদি তার আগে চলে যেতে চান তা হলে মাদারিহাটের যে চায়ের দোকানে আমাদের আলাপ হল, তার মালিকের কাছে চাবিটা রেখে যাবেন। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। অনেকটা দূরে যেতে হবে।"

ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে লোহার গেট বন্ধ করে গেলেন। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র চারপাশ অন্যরকম হয়ে গেল। বাউন্ডারির বাইরে জঙ্গলের শুরু। সেখান থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে। সম্ভবত একদল বাঁদর বাঁদরামি করছে। এই দুপুরেও গাছের ছায়া ঢেকে রেখেছে বাড়িটাকে।

অর্জুন তালা খুলল। বিরাট বসার ঘর। ফায়ার প্লেসও রয়েছে। পুরনো দিনের সব আসবাব। পর্দা নেই ভেতরের দরজায়, কিন্তু জানলায় রয়েছে। গোটা চারেক বড় বেডরুম। কিচেনটা বিশাল। দুটো বাথরুম এবং টয়লেট। জেনারেটার আছে। আছে পাম্পও। সেগুলো চালিয়ে ওপরের ট্যাঙ্কে জল তোলার ব্যবস্থা করল অর্জুন।

মেজর বললেন, "তোফা ব্যবস্থা।"

গোরানসাহেব বললেন, "গুড।"

জিনিসপত্র নামাতে হবে। ওরা বাড়ির বাইরে এসে দেখল বটা আর গোরক্ষনাথ সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। হঠাৎ গোরানসাহেব এগিয়ে গেলেন। বারান্দার পাশে একটা থামের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে কিছু লেখা আছে। অর্জুন আর মেজর গোরানসাহেবের পাশে গিয়ে দেখল, মিস্টার আর্নল্ড স্টিভেনসন। নাইনটিন থার্টি। অর্থাৎ এই বাড়ির বয়স সত্তর বছর। বাড়িটা বানিয়েছিলেন স্টিভেনসন সাহেব। তিনি কবে জন্মেছিলেন বা মারা গিয়েছিলেন, তা জানা যাচ্ছে না।

গোরানসাহেব দু'-দু'বার নামটা উচ্চারণ করলেন।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার পর ঠিক হল ওরা তিনজন তিনটে বেডরুমে থাকবে। গোরক্ষনাথ আর বটা পেছনের দিকের বেডরুমটা ব্যবহার করবে। সেই ঘর দেখে বটা খুব খুশি। দু-দুটো খাটে বিছানা পাতা আছে। শুধু সে অর্জুনের কাছে এসে নিচু গলায় বলল, "সব ভাল সার, শুধু ওই শকুন, কাকের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হবে, এটা ভাল লাগছে না।"

"ওরা খাঁচায় থাকবে ওদের মতো, তোমার কী!" অর্জুন উড়িয়ে দিল। মেজর তাঁর বিখ্যাত পাইপ বের করলেন। এ-যাত্রায় ওঁকে ধূমপান করতে দেখেছে বলে মনে পড়ল না অর্জুনের। তাঁকে জ্বালাতে দেখে গোরানসাহেব বিরক্ত হলেন। ওঁরা

বসে ছিলেন ড্রইংরুমে। অর্জুন বলল, "এখন খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়।"

মেজর বললেন, "ব্যবস্থার তো কিছু নেই, করাই আছে।"

"কীরকম?"

"দারুন সার্ডিন মাছের কৌটো আছে আর সঙ্গে পাউরুটি।"

"সে কী! আপনি বলেছিলেন রান্না করবেন!" অর্জুন মনে করিয়ে দিল।

"সেটা অন্য সময়ে করা যাবে। এখন কৌটো খাও।"

অর্জুন রেগে গেল খুব। বলল, "সহ্য হবে না জিভে।"

"মানে?" মেজর বললেন, "আরে আগে খেয়ে দ্যাখো। ডাক্তাররা সেন্ট পার্সেন্ট হাইজেনিক বলে সার্টিফাই করেছেন।"

"আপনি বলেছিলেন নেড়ি কুকুর যা খায় তা বড়লোকের কুকুর খেলে মরে যাবে। আবার ঠিক উলটোটাও হয়। বড়লোকের কুকুরকে যে নির্বিষ খাবার দেওয়া হয় তা নেড়ি কুকুরের সামনে ধরলে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।"

"ব্যাপারটা কীরকম হল?"

"কেন?"

"মনে হচ্ছে তুমি আমাকে কথাটা ফিরিয়ে দিলে!"

অর্জুন হেসে ফেলল, "দেখুন, বিদেশে যখন গিয়েছিলাম তখন কেউ আমাকে কন্টিনেন্টাল ফুড খাওয়ালে বার্লির কথা মনে পড়ত। মনে হত আমার পেট খারাপ হয়েছে বলে খাচ্ছি। দেখি, অন্য চেষ্টা করি।"

চার নম্বর ঘরটায় গেল অর্জুন। বটা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে বিড়ি টানছে। গোরক্ষনাথ ইতিমধ্যে লাল লুঙ্গি পরে বাবু হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে পড়েছে। তার সামনে তিনটে খাঁচার প্রাণী, তিনটে চুপচাপ রয়েছে। এখন বোধহয় কোনও পুজো করছে গোরক্ষনাথ। বটা তাকে দেখে লাফিয়ে উঠল।

অর্জুন তাকে বলল, " বটা, রাঁধতে পারো?"

"সেদ্ধ যা খাবেন, করে দিতে পারি।"

"তা হলে ভাত, আলু আর ডিমসেদ্ধ করে ফেলো চটপট।"

"সঙ্গে একটু ডাল, আলুভাজা আর কাঁচা মরিচ।"

"পারবে?"

"খুউব। কিন্তু ক'জনের জন্যে?"

"তিনজনের জন্যে। ওই সাহেবরা কৌটোর খাবার খাবে।"

অর্জুন নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। লম্বা দেওয়াল, বড় ছাদ। ছাদে একটু ফাটল ধরেছে। এই ঘরে কোনও আসবাব নেই, এই খাট ছাড়া। তার সুটকেসটাকেও মাটিতে রাখতে হয়েছে। জল পড়ার শব্দ হল। তারপরেই পাম্প বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় বটাই কাজটা করল। ওকে নিয়ে এসে ভাল হয়েছে।

কিন্তু গোরানসাহেব ঠিক কী চাইছেন, তা বোঝা যাচ্ছে না। এখানে বসে থাকলে

ড্রাকুলার দেখা উনি পাবেন কী করে? লোকনাথ বললেন এখানে রক্তহীন মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে। ওটাকে ড্রাকুলার কাণ্ড বলে মনে করেন নাকি গোরানসাহেব? তবে স্টিভেনসন সাহেবের বাড়িতে ঢোকার পর মনে হচ্ছে এরকম জায়গায় ড্রাকুলাবাবু এলেও আসতে পারেন। সে জানলার দিকে তাকাল। তারের ওপাশে কাঠের পাল্লা। ঘর গরম হচ্ছে। অর্জুন জানলা খুলে দিতেই জঙ্গলটাকে দেখতে পেল। হাওয়া ঢুকছে এখন।

বটা এসে জানাল, খাবার রেডি। অর্জুন উঠে ডাইনিংরুমে গিয়ে দেখল ভাত ডিমসেদ্ধ আলুভাজা আর ডাল তৈরি। সে ড্রইংরুমে ফিরে গিয়ে দেখল মেজর আর গোরানসাহেব কৌটো আর পাঁউরুটি নিয়ে এদিকে আসছিলেন। ওঁরা ডাইনিং টেবিলে সাজানো খাবার দেখে অবাক হলেন। মেজর গম্ভীর মুখে কৌটো খুলে ফেললেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "ডিমসেদ্ধ ভাত দিয়ে মেখে খাবেন নাকি?"

মেজর জবাব দিলেন না। গোরানসাহেব একটা প্লেটে সামান্য ভাত তুলে নিয়ে কৌটোর সার্ডিন মাছ তাতে উপুড় করে দিলেন। তেল দেওয়া মাছটা দিয়ে ভাত মেখে চামচ দিয়ে খেতে লাগলেন।

সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মেজর বললেন, "রোমে যখন থাকব তখন রোমানদের মতো ব্যবহার করব। আমাকে দুটি ভাত আর ডিমসেদ্ধ দাও হে।"

॥ ১৩ ॥

বাড়ির সামনের লনে যে বেঞ্চিটা স্থায়ীভাবে রয়েছে তার বয়স প্রায় বাড়িটার মতন হলেও এখনও মজবুত রয়েছে। অর্জুন সেখানে বসে ছিল।

এখন বিকেল। রোদ রয়েছে বাড়ির পেছনে। এদিকটায় ছায়া ঘন হয়েছে। সামনের জঙ্গলে পাখিরা গলা খুলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর সেই আদিম দিনে যখন প্রাণ গলা পেয়েছিল সেদিন থেকেই বোধ হয় সূর্যের আলো নিভে যাওয়ার সময় অজানা আতঙ্কে এমনি চেঁচামেচি শুরু হয়েছিল। দিন মানেই চারপাশ চোখের সামনে, রাত মানে সমস্ত নিরাপত্তা উধাও। জঙ্গলের আর-এক প্রান্তে এই যে নিঝুম অঞ্চলে স্টিভেনসন সাহেব বাড়ি বানিয়েছিলেন, তার সৌন্দর্য সারাদিন ধরে প্রশংসা পাবে কিন্তু রাত্রে তিনি কী করতেন সত্তর বছর আগে?

"হ্যালো, মাই বয়।" মেজরের গলা পেয়ে পেছন ফিরে তাকাল অর্জুন। ইতিমধ্যে তিনি পোশাক পালটেছেন। এখন তাঁর পরনে বারমুডা এবং গেঞ্জি। এগিয়ে আসতে আসতে বারমুডার পকেট থেকে পাইপ বের করে একটু দাঁড়িয়ে তামাক জ্বালালেন। কাছে এসে বললেন, "ফ্যান্টাস্টিক। কী জায়গা! আঃ পাখিগুলো চেঁচাচ্ছে কেন?"

"সন্ধে হয়ে আসছে, তাই। আপনি তরল থেকে ধোঁয়ায় চলে গেলেন?"

"নো! আজ একাদশী। দিনের বেলায় আমি ড্রিঙ্ক করি না। শুকনো থাকি। আঃ, এরকম জায়গায় সারাটা জীবন চুপচাপ কাটিয়ে দেওয়া যায়! তাই না?"

"আমি পারতাম না। কথা বলার লোক নেই, খাবার ফুরিয়ে গেলে এনে দেওয়ার কেউ নেই। পাগল হয়ে যেতাম। কিন্তু আপনার সাহেববন্ধু তো কথাই বলছেন না। তাঁর ড্রাকুলা কোন অঞ্চলে থাকে, কীভাবে সেখানে গিয়ে আলাপ করে আসা যাবে, সেটা না জানলে অস্বস্তি হচ্ছে।" অর্জুন বলল।

মেজরের দাড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে ধোঁয়া বের হল, "আমাদের বাল্যকালে একটা বাংলা ছবি দেখেছিলাম। তাতে সংলাপ ছিল, 'কৌতূহল থাকা ভাল, তবে তার সীমারেখা থাকা উচিত।' আহা! দারুণ কথা। তোমার দেখছি একটু ধৈর্য কম। জলপাইগুড়িতে থাকলে তুমি এই সুন্দর জায়গাটাকে দেখতে পেতে না। তাই না?"

এই সময় গোরানসাহেবকে দেখা গেল। গেট খুলে ভেতরে আসছেন। তিনি যে কখন বাড়ির বাইরে গিয়েছেন তা অর্জুন জানে না। কাছে এসে বললেন, "এই জায়গাটা ভাল নয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে আসার সময় আমার অস্বস্তি হচ্ছিল।"

"অস্বস্তি? কীরকম?" মেজর জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। ওয়েট!" হঠাৎ সোজা হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে অর্জুন দেখল একটা বিরাট সাপ ধীরে ধীরে জঙ্গলের ভেতর থেকে এগিয়ে আসছে লনের দিকে। লম্বায় অন্তত বারো ফুট এবং বেশ মোটা আর কুচকুচে কালো। সাপটা এখনও খানিকটা দূরে।

মেজর চাপা গলায় বললেন, "কিং কোবরা!"

গোরানসাহেবের গলা হিসহিসে শোনাল, "নো। ইটস কুইন।"

অর্জুন দেখল গোরানসাহেবের মুখের চেহারা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। অমলদার বাড়ির বাগানে সাপটাকে ধরার সময় এইরকম মুখ হয়েছিল। তিনি এক পা এগিয়ে যেতেই মেজর ওঁর হাত ধরে টানলেন, "ডোন্ট।"

"লেট মি গো মেজর।"

"না। ওটা কী করে, কোথায় যায়, তা আমাদের দেখা উচিত।"

"বাট, বাট, আই মাস্ট কিল হার। কুইন কোবরার হেড আমার কালেকশানে নেই। লিভ মি প্লিজ।" মেজরের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছিলেন গোরানসাহেব। কিন্তু মেজর ওঁকে ছাড়লেন না। সাপটা ওঁদের দিকে এল না। সে যেন বেড়াতে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে লনের একপাশ ধরে বাড়িটার পেছনদিকে যেতে লাগল।

শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন গোরানসাহেব। তাঁর মুখ-চোখ স্বাভাবিক হয়ে এল। ওরা তিনজনই ধীরে ধীরে সাপটাকে অনুসরণ করতে লাগল। বাড়িটার পেছনদিকের খোলা জমিতে ওরা প্রথম এল। বুনো ঝোপঝাড় ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। লোকনাথ এই বাড়ি আর লনের সংস্কার করেছেন কিন্তু পেছনদিকে বোধ

হয় নজর দেননি। হঠাৎ গোরানসাহেব হাত বাড়িয়ে ইশারায় ওদের থামতে বললেন। জমিটার একপাশে কয়েক হাত দূরত্বে উঁচু উঁচু ঢিবির মতো কিছু রয়েছে। সাপটা তার একটার পাশে গিয়ে স্বচ্ছন্দে ভেতরে চলে যেতে লাগল সরসর করে। কিছুক্ষণ বাদে তাকে আর দেখা গেল না। গোরানসাহেব বললেন, "ওইখানে ওর বাসা।"

কথাগুলো ইংরেজিতে বলায় গোরানসাহেব মাথা নাড়লেন। তারপর এগিয়ে গেলেন। ওরা সন্তর্পণে অনুসরণ করল। কাছে যাওয়ার পর বোঝা গেল যেগুলোকে ঢিবি বলে মনে হচ্ছিল সেগুলো একসময় সমাধিবেদি ছিল। অর্থাৎ গত সত্তর বছরের কোনও একসময়ে এ-বাড়ির তিনটি মানুষ মারা যাওয়ার পর এখানেই তাঁদের কবর দেওয়া হয়েছিল। যে বেদির তলায় সাপটা ঢুকেছিল তার ওপরের মাটি সরিয়ে সরিয়ে গোরানসাহেব লেখাটা আবিষ্কার করলেন, আর্নল্ড স্টিভেনসন। বর্ন 1870, এক্সপায়ার্ড 3 June 1938.

বাকি দুটো সমাধিবেদিতে হয়তো কিছু লেখা ছিল কিন্তু এখন সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেদির ওপরের অংশের অনেকটাই নেই।

ওরা ফিরে এল। লনে ফিরতেই বটাকে দেখা গেল একটা ট্রের ওপর চায়ের কাপ নিয়ে আসতে। গোরানসাহেব কাপ তুলে থ্যাঙ্কস বললেন। মেজর বললেন, "না হে, এ সময় চা খেলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে।" অর্জুন কাপ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "গোরক্ষনাথ কোথায়?"

বটা বলল, "আসন পেতে বসে ধ্যান করছে।"

"ওকে একটু এখানে আসতে বল তো!"

বটা চলে গেলে গোরানসাহেব বললেন, "এই স্টিভেনসন লোকটা তা হলে এখানেই মারা গিয়েছিল। ও তখন এখানে পাকাপাকি থাকত, না আসা-যাওয়া করত, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বাকি দু'জন কারা?"

মেজর বললেন, "ওঁর আত্মীয়স্বজন।"

"তা হলে তারা ওর আগে মারা গিয়েছিল। ওই সমাধিবেদি দুটো একটু বেশি পুরনো বলে মনে হল। কিন্তু স্টিভেনসন লোকটার শরীর বিশাল ছিল।"

মেজর বললেন, "তা তো বটেই। নইলে এখানে অত বছর আগে থাকার হিম্মত হত না। সাহসী মানুষ। কিন্তু কী করে বোঝা গেল শরীর বিশাল ছিল?"

"সমাধিবেদির আয়তন দেখে। আর ওই বড় সাপটা সেই কারণে ওটাকেই নিজের জায়গা বলে বেছে নিয়েছে।" গোরানসাহেব কথা শেষ করতেই গোরক্ষনাথ এগিয়ে এল, "আদেশ করুন বাবু।"

ওইভাবে কথা বলায় একটু অবাক হল অর্জুন। কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে সে জিজ্ঞেস করল, "এখানে আপনার কেমন লাগছে গোরক্ষনাথ?"

"সারাদিন ধরে বড়গুরুকে ডেকে গেলাম। নিজের কথা ভাবিনি।"

"বড়গুরু?"

"আমার গুরুর গুরু। ত্রিকাল দেখতে পেতেন।"

"তোমার সঙ্গী তিনটে কী করছে?"

"ওরা ঘুমোচ্ছে।" হঠাৎ ওপরদিকে নাক তুলে কিছু শোঁকার চেষ্টা করল গোরক্ষনাথ, "এই জায়গাটা ভাল নয় বাবু। কীসের যেন গন্ধ পাচ্ছি!"

"কীসের? কই, আমরা তো পাচ্ছি না!"

নাক টানতে টানতে যেন গন্ধের পিছু নিয়ে গোরক্ষনাথকে এগোতে দেখে অর্জুন তার সঙ্গী হল। গোরক্ষনাথ বাড়িটার পাশ দিয়ে পেছনের জমিতে চলে এসে মাথা নাড়ল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"কেমন আঁশটে, স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। এখান থেকেই গন্ধটা উঠছে।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। এই লোকটির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই তার মনে হয়েছিল, আসলে সরল মানুষ, কিন্তু কিছু অন্ধ বিশ্বাস সম্বল করে নির্বোধ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রোজগার করে। কিন্তু এখন ও হেঁটে এল সাপটা যে পথে এসেছিল সেই জায়গা দিয়ে। তা হলে ও কি সাপের গন্ধ পেয়েছে? প্রশ্নটা করল অর্জুন।

"সাপ? কী জানি? এর আগে অনেক সাপ দেখেছি কিন্তু তাদের গায়ের গন্ধ তো পাইনি বাবু। কী সাপ? আপনি দেখেছেন?"

"খুব বড় কোবরা। কুচকুচে কালো।"

"তা হলে বাস্তুসাপ। তা তেনারা তো একা থাকেন না। জোড়া আছে।"

"তাদের শরীর থেকে গন্ধ বের হয়?"

"এ-কথা কখনও শুনিনি বাবু। তা তিনি কোথায় গেলেন?"

"ওই সমাধিবেদির নীচে গর্ত আছে, সেখানে ঢুকেছে।"

গোরক্ষনাথ এক পা এগিয়ে গেল, "আই বাপ, এ তো কবর। বাস্তুসাপ তো কবরের ভেতরে কখনও ঢুকবে না। না বাবু, এই জায়গাটা আমার ভাল লাগছে না।"

"কিন্তু কেন ভাল লাগছে না। সাপের ভয় পাচ্ছ?"

গোরক্ষনাথ অর্জুনের দিকে তাকাল, "বিষধর সাপকে কে না ভয় পায় বাবু! তবে এই জায়গাটা ভাল নয়। এখানে আসার কিছুক্ষণ পর থেকে কাকটা একবারও ডাকেনি।"

অর্জুন হেসে বলল, "চলো, এদিকটায় না থাকাই ভাল, অন্ধকার হয়ে আসছে।"

এখানে সন্ধে বলে কোনও সময়কে চিহ্নিত করা গেল না। দিন শেষ হলেই ঝুপ করে রাত নেমে গেল। এমন নিকষ কালো রাত অর্জুন কখনও দেখেনি। বটা জেনারেটার চালু করায় ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। তার ফলে আর-এক বিপদ। জঙ্গলের যাবতীয় পতঙ্গ ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বাড়িটার ওপর। মেজরের খুব ইচ্ছে ছিল বারান্দায় বসে জঙ্গুলে অন্ধকার উপভোগ করার। কিন্তু পোকার হাত

থেকে বাঁচতে ভেতরে এসে সব জানলা-দরজা বন্ধ করতে হল। এখন জানলার শার্সিতে শব্দ হচ্ছে। মাঝে-মাঝেই বড় বড় পোকা আছড়ে পড়ছে সেখানে। আলোর কাছে আসতে চায়। গোরানসাহেবের নির্দেশে শুধু রান্নাঘর ছাড়া সব আলো নিভিয়ে দেওয়ার পর শব্দটা কমে গেল। তিনি তাঁর ঝোলা থেকে ব্যাটারিচালিত একটা বাল্‌ব বের করলেন, যার মৃদু আলোয় ঘর পরিষ্কার দেখাবে। অর্জুন উঠে রান্নাঘরে চলে এল। সেখানে এখন গোরক্ষনাথ আর বটা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রান্নার আয়োজনে লেগেছে। তাকে দেখে বটা বলল, "আপনারা কখন খাবেন? আটটার মধ্যে খেয়ে নেওয়াই ভাল।"

"কেন?"

"তা হলে আমরা ছুটি পাই।" বটা হাসল।

আটটা বাজতে অনেক দেরি আছে। অর্জুন মাথা নাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে গোরক্ষনাথদের ঘরে উঁকি মারতেই অন্ধকারে লাল দুটো চোখ দেখতে পেল। চোখ দুটো জ্বলছে। সে আলো জ্বালতেই বেড়ালটা মুখ ফিরিয়ে নিল খাঁচায় বসে। শকুনটা বিরক্ত হয়ে বিশ্রী শব্দ করল, শুধু কাকটা চুপচাপ রইল। আলো নিভিয়ে দিয়ে অর্জুন বাইরের ঘরে এসে দেখল মেজর মদ্যপান শুরু করেছেন। বেশ স্ফূর্তি এসে গিয়েছে ওঁর হাবভাবে। অর্জুনকে দেখে বললেন, "এইরকম পরিবেশে দু-তিনটে গান হলে মন্দ হয় না। তুমি গান জানো?"

"না।" অর্জুন মাথা নাড়ল, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন না?"

॥ ১৪ ॥

"কী বলছ? গান শুনিয়েই তো ক্যানিবলদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছিলাম।" মেজর উঠে দাঁড়িয়ে মদের বোতলটাকে গিটার বানিয়ে পা ছুড়তে লাগলেন, "একটা বিরাট কাঁকড়া, তার বিশাল দুটো দাড়া, সে দিনের বেলায় ঘুমোয়, রাতে এক পায়ে খাড়া। ও হো, হো হো।"

গোরানসাহেব একটা বড় কাগজের ওপর চোখ রেখে মগ্ন ছিলেন। এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "ওঃ মেজর। প্লিজ।"

"ভাল লাগল না? বেরসিকদের ভাল লাগবে কেন!" মেজর বসে পড়লেন।

গোরানসাহেব বললেন, "আমার অনুমান যদি ভুল না হয় আমরা প্রায় কাছাকাছি জায়গায় চলে এসেছি। ও নিশ্চয়ই কাছাকাছি দশ-বারো মাইলের মধ্যে রয়েছে।"

"মাই গড! ড্রাকুলা এত কাছে?"

"ইয়েস। অতএব আমাদের এখন থেকে সতর্ক হতে হবে। আজ রাত্রে চাঁদ উঠবে ঠিক দুটোয়। তাড়াতাড়ি ডিনার করে শুয়ে পড়ো সবাই। আমি তোমাদের দুটোর সময় ডেকে দেব। তারপর আমরা বেরোব।"

"বেরোব মানে?" মেজরের গলার স্বর বদলে গেল।

"যার জন্যে এসেছি সে তো যেচে এখানে এসে দেখা করে যাবে না! তাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।" গোরানসাহেব বললেন, "এখানে ভোর হয় পাঁচটায়। আমরা যদি আড়াইটের সময় বের হই তা হলে মাত্র আড়াই ঘণ্টা সময় হাতে থাকবে। রোজ একটা করে দিক আমরা খুঁজব। ঠিক আছে?"

মেজর বলল, "গোরক্ষনাথ আর ড্রাইভারও নিশ্চয়ই সঙ্গে যাবে।"

অর্জুন বলল, "ড্রাইভার কেন যাবে? ও তো ওই কাজের জন্যে আসেনি। এখানে এসে রান্না করে দিচ্ছে, খাবার সার্ভ করছে, এই তো অনেক, ও এসেছে গাড়ি চালাতে। তা ছাড়া মনে হয় ওই সময় ও কোথাও যাওয়ার অবস্থায় থাকবে না।"

"কেন? খুব ঘুমোয় বুঝি?" মেজর তাকালেন।

"না। আমরা ডিনার করে নিলে ও একটু নেশা করবে।"

"নেশা? মাই গড। আমি মদ খাই কিন্তু কখনও নেশা করি না। এটা খুব খারাপ কথা শোনালে হে! ওইটুকুনি ছেলে নেশা করে নিজেকে শেষ করে ফেলবে?" মেজর আফসোস করার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

অর্জুন গোরানসাহেবকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যে খুঁজতে যাবেন বললেন, কিন্তু কীভাবে খুঁজবেন? চারপাশে জঙ্গল, শুধু পাহাড়ের দিকটা খোলা। আমি শুনেছি ড্রাকুলা সারাদিন ঘুমোয়, অন্ধকার নামলেই বেরিয়ে পড়ে। তখন তাকে খুঁজে পাবেন কী করে?"

"সে যদি এখানে থাকে তা হলে আমাদের কষ্ট করতে হবে না, দেখতে পেলে সে নিজেই দেখা দেবে। কিন্তু আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।"

"কারণ?"

"আমরা সেইভাবে তৈরি হয়ে বেরোব না!"

অর্জুন হাসল। তার খুব মজা লাগছিল। কিন্তু সেটা গোপন করে সে জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার গোরান, আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন ড্রাকুলা বলে কিছু আছে?"

গোরানসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, "তুমি যদি ভগবানে বিশ্বাস করো তা হলে তোমাকে শয়তানের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে।"

দরজায় শব্দ হতেই ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের। বাইরে গোরানসাহেবের গলা, তৈরি হতে বলছেন। বিছানা থেকে নামতে মোটেই ইচ্ছে করছিল না কিন্তু নামতে হল। ঘরে অন্ধকার কিন্তু বাইরের পৃথিবীটা ততটা নয়। কাচের জানলায় চলে এল অর্জুন। পাতলা, খুব পাতলা সরের মতো জ্যোৎস্না নেতিয়ে আছে লনে, জঙ্গলে। অর্থাৎ গোরানসাহেবের হিসেবমতো চাঁদ উঠেছে। কীরকম গা ছমছম করে উঠল অর্জুনের।

তৈরি হয়ে বসার ঘরে আসতেই গোরক্ষনাথকে দেখতে পেল সে। তিন-তিনটে খাঁচা একটা লম্বা লাঠিতে বাঁধছে সে। মেজর ঢুকলেন একেবারে অভিযাত্রীর পোশাক পরে, "গুড মর্নিং এভরিবডি। কপালে কী আছে জানি না। ওহে গোরখ্নাথ।"

"গোরক্ষনাথ।" অর্জুন সংশোধন করে দিল।

"আই সি। গোরক্ষনাথ, আমরা বুঝবার আগে তোমার এই প্রাণিগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে তেমন কেউ সামনে আছেন কিনা!"

গোরক্ষনাথ মাথা নাড়ল, "হ্যাঁ সাহেব। তেনাদের কেউ রাত্রে এখানে এসেছিলেন। তিনজনেই সেটা টের পেয়েছিল।"

"ড্রাকুলা এই বাংলোয় এসেছিল?" মেজর অবাক!

"নাম তো জানি না। তবে তিনি আমাদের কোনও ক্ষতি করতে চাননি। এরা আছে বুঝে বাইরে থেকেই চলে গেছেন।" গোরক্ষনাথ বাঁধা শেষ করে হাতজোড় করে চোখ বন্ধ করে কোনও মন্ত্র নিঃশব্দে বলে যেতে থাকল। তার ঠোঁট নড়ছিল।

গোরানসাহেব এলেন তৈরি হয়ে। তাঁর হাতে চারটে ক্রুশ। সেগুলো চেনে আটকানো। নিজের হাতে প্রত্যেকের গলায় সেই চেন পরিয়ে দিয়ে বললেন, "ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করবেন। এখন, চলো বেরিয়ে পড়ি।"

মেজর বললেন, "ওই ড্রাইভারটি একা পড়ে থাকবে এখানে? ওকে ডাকা যাক, যদি সঙ্গে যেতে চায় চলুক, নইলে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিক।"

গোরক্ষনাথ বলল, "তার নেশা এখন ভাঙবে না সাহেব। নেশাগ্রস্ত মানুষকে তেনারা কখনওই দর্শন দেন না। খুব অপছন্দ করেন তেনারা।"

ওরা বারান্দায় বেরিয়ে এল। গোরক্ষনাথ লাঠিটাকে কাঁধে তুলে নেওয়ায় খাঁচাগুলো তাতে ঝুলছিল। কাকটা নড়াচড়ায় বিরক্ত হয়ে দু'বার ডাকল। এখন চারদিক ঝাপসা কিন্তু সামনের পথটা দেখা যাচ্ছে।

গোরানসাহেব বললেন, "আজ আমরা জঙ্গলের দিকে না গিয়ে পাহাড়ের দিকে যাব। ওদিকটায় হাঁটতে সুবিধে হবে।" তিনি টর্চ জ্বালতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রথমে গোরানসাহেব, তারপরে মেজর, অর্জুন এবং সবশেষে গোরক্ষনাথ হেঁটে চলেছিল। বড় রাস্তা ছেড়ে খোলা মাঠে চলে এল ওরা। মাঠ, কিন্তু মাঝে-মাঝেই বুনো ঝোপ রয়েছে। হঠাৎ একটা রাতের পাখি চিৎকার করে উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে। অর্জুন পেছন ফিরে দেখল বাংলোটাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

মেজর বললেন, "আমরা বোধ হয় ভুল করছি। এখানে কোনও পোড়োবাড়ি নেই যেখানে তিনি থাকতে পারেন। খোলা মাঠে দিনের বেলায় তিনি ঘুমিয়ে থাকবেন কী করে? ওই পাহাড়টায় যদি তাঁর বাসস্থান হয় তা হলে অতদূরে আমরা ভোর হওয়ার আগে পৌঁছতে পারব না।"

এই সময় শকুনটা ডানা ঝাপটাতে লাগল আচমকা। বেড়ালটার লেজ ফুলে

উঠল আর কাকটা তারস্বরে চিৎকার করে উঠল। গোরক্ষনাথ বলল, "তিনি এসেছেন!"

চাপা গলায় বাক্যটি অনুবাদ করলেন মেজর, যাতে গোরানসাহেব বুঝতে পারেন। তিনটে খাঁচা তিনপাশে রেখে মাঝখানে দাঁড়িয়ে গোরক্ষনাথ মুখে অদ্ভুত আওয়াজ তুলছে। হেই হেই হেই। প্রতিটি শব্দ বলার সময় শরীর এক-একদিকে বাঁকিয়ে ঝাঁকাচ্ছিল। অনেকটাই নাচের ভঙ্গি। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল তিনটে প্রাণীর চেহারা বদলে গেছে। বেড়ালটা পিঠ উঁচু করে প্রায় গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শব্দ করছে। শকুনটা দুই ডানা খাঁচার মধ্যে যতটা সম্ভব ছড়াতে পারে ছড়িয়ে বের হওয়ার জন্যে ছটফট করছে। আর কানা কাকটা প্রবল আক্রোশে জালের তার ঠোঁট দিয়ে কামড়ে ধরে ছেঁড়ার চেষ্টা করে চলেছে।

কিন্তু সামনে কোথাও কেউ নেই। হঠাৎ গোরানসাহেব এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে। মেজর তাঁকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে গোরানসাহেব চিৎকার করলেন, "আই নো ইউ আর হিয়ার। আর্নল্ড, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

রাতের আকাশ সেই চিৎকার দ্রুত লুফে নিল, ফিরিয়ে দিল না।

আর্নল্ড? আর্নল্ড স্টিভেনসন? যিনি ওই বাংলোর পেছনের কবরের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন সেই উনিশশো আটত্রিশ সাল থেকে? এই বাবট্টি বছরেও তাঁর আত্মার কোনও হিল্লে হয়নি? হঠাৎ অর্জুনের চোখে পড়ল, গোরানসাহেবের ঠিক পেছনে, মাত্র হাত তিনেক তফাতে কিছু একটা ঘাসের ওপর দিয়ে সরসর করে চলে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে গোরানসাহেবকে ডাকতেই তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। আর তখনই ওপাশের গাছের ডাল থেকে প্রচণ্ড বেগে নেমে এল রাতের পাখিটা। তার চেহারা ভাল করে বোঝার আগেই সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিল দু'ফুট লম্বা সাপটাকে, নিয়ে আবার গাছের ডালে ফিরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গেল খাঁচার প্রাণিগুলো। একেবারে শান্ত এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে বেশ ক্লান্ত। অর্জুন বুঝল, ওই সাপটা এই খাঁচাগুলোর কাছাকাছি চলে আসায় এরা এমন আতঙ্কিত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

মেজর খেঁকিয়ে উঠলেন, "তিনি এসেছেন। কী যে বলো তার ঠিক নেই। একটা সাপকে দেখে তোমার বন্ধুরা এমন কাজ করল। ওদের চেয়ে ওই প্যাঁচাটা অনেক সাহসী।"

গোরক্ষনাথ মাথা নাড়ল, "না সাহেব। আমি ভুল বলিনি। সাপ তো এখানে চারপাশে ঘুরছে। কই তাদের দেখে তো এরা চিৎকার করছে না। ওই দেখুন তিনি নেই।" সে গাছের ডালটার দিকে আঙুল তুলল, যেখানে পাখিটা বসে ছিল।

মেজর হাসলেন, "তুমি একটা প্যাঁচাকে তিনি বলে চালাতে চাইছ?"

গোরক্ষনাথ তীব্র প্রতিবাদে মাথা নাড়ল, "না সাহেব, আপনি যদি প্যাঁচা দেখে

থাকেন তা হলে তিনি ওই রূপ ধরে এসেছিলেন।"

গোরানসাহেব কথাবার্তার বিষয় জানতে চাইলে মেজর সেটা ইংরেজিতে শুনিয়ে দিলেন। গোরানসাহেব একটু ভেবে বললেন, "এই লোকটি যা বলছে সেটা সত্যি কিনা তার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যেতে পারে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কীভাবে?"

"প্যাঁচা শিকার ধরেছে তার খাদ্য হিসেবে। সে কিছুতেই সাপটাকে ছাড়বে না। চলো, ওই গাছটার নীচে গিয়ে দেখি সাপটা ওখানে পড়ে আছে কিনা।" গোরানসাহেব টর্চ জ্বাললেন।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "তার মানে ওটি যদি তিনি হন তা হলে সাপটাকে ছেড়ে দেবেন, কারণ ওঁর খাবারের দরকার নেই। সেক্ষেত্রে সাপটা গাছের নীচে পড়ে যাওয়ার পর আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে কেন? কখন পালিয়ে গিয়েছে।"

গোরানসাহেব কথাটা কানে না তোলায় অর্জুন এবং শেষ পর্যন্ত মেজর ওঁর সঙ্গী হন। গোরক্ষনাথ দাঁড়িয়ে রইল তার খাঁচাগুলো নিয়ে। জঙ্গলের কাছে পৌঁছতে বেশ কিছু বুনো ঝোপ সরাতে হল। গোরানসাহেব মুখে শব্দ করছিলেন এগোবার সময়, যাতে সাপটাপ থাকলে সরে যায়। শেষ পর্যন্ত গাছটার নীচে পৌঁছে গেল ওরা। টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মরা পাতার ওপর সেটাকে স্থির করে রাখলেন গোরানসাহেব। দু'ফুট লম্বা সাপটা সেখানে প্রায় গোল হয়ে পড়ে আছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে গোরানসাহেব বাঁ হাতে সাপের লেজ ধরে ওপরে তুলে ডান হাতে ওর শরীরে আলো ফেলে কয়েক সেকেন্ড দেখে চিৎকার করে বললেন, "মেজর, এই সাপটার শরীরে একফোঁটাও রক্ত নেই।"

সাপটাকে সামনে নিয়ে এলেন গোরানসাহেব। ওর গলার ঠিক নীচটা আধখানা হয়ে ঝুলছে। সাপটাকে জঙ্গলে ছুড়ে ফেললেন তিনি।

মেজর ফিরে যাওয়ার সময় জিজ্ঞেস করলেন, "এই শ্রেণীর সাপের মাথা বোধ হয় তোমার সংগ্রহে আছে, তাই না?"

"না। নেই। এবং এটাকে আমার সংগ্রহে রাখার কোনও বাসনা নেই।"

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে গোরানসাহেব স্বাভাবিক গলায় বললেন, "অর্জুন, আমি নিশ্চিত যে, ঠিক জায়গায় পৌঁছেছি।"

খোলা আকাশে তখন চাঁদ সরে গেছে অনেকটা। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কীরকম?"

"ব্যাখ্যা করতে হলে আমাকে আর একটা কি দুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে।"

অর্জুন বলল, "আপনার ধারণাকে আমি আঘাত করতে চাই না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে অবাস্তব বলে মনে হচ্ছে।"

"কেন?" গোরানসাহেব তাকালেন।

"আপনি আমেরিকায় বসে আবিষ্কার করলেন, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলে

ড্রাকুলা রয়েছে। কী করে আবিষ্কার করলেন?"

"তিনটে চিঠি পড়ে। নাইনটিন ফর্টি ওয়ানে জন লিঙ্কন নামে এক টি-প্ল্যান্টার তাঁর লন্ডনের বন্ধুকে চিঠিগুলো লিখেছিলেন। কাল সকালে তোমাকে আমার ডায়েরি দেখাতে পারি, যা দেখলে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে কেন আমি নিশ্চিত যে, ঠিক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছি।" গোরানসাহেব বললেন।

মেজর বললেন, "তা ঠিক আছে। কিন্তু রাতের জঙ্গুলে জায়গায় আর কত এভাবে আমরা তাকে খুঁজে বেড়াবো। আমরা মানুষ, আমাদের দেখলে তো তার নিজেরই চলে আসার কথা। তাই না?"

গোরানসাহেবের কানে যেন কথাগুলো ঢুকল না। গোরক্ষনাথের গলা শোনা গেল, "বাবু, এখানে তেনাদের কেউ এখন নেই।"

অর্জুন এগিয়ে গিয়ে দেখল প্রাণী তিনটে শান্ত হয়ে বসে আছে।

॥ ১৫ ॥

ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। গোরানসাহেব শিক্ষিত, পণ্ডিত মানুষ, তিনি বলেছেন এখানে ড্রাকুলা এসেছিল। গোরক্ষনাথ অশিক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, তার কথায় কান দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই, সে ওই কথা বলতেই পারে। কিন্তু বেড়াল কাক শকুন এমন অদ্ভুত আচরণ করবে কেন? অতদূরে বুকে-হাঁটা সাপটাকে কানা কাক দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার করবে, এটাও তো ভাবা যায় না।

হঠাৎ হাওয়া বইতে লাগল। ওরা মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখল সেটা যেন ঝড়ের চেহারা নিল। ঝড় হচ্ছে অথচ আকাশে একফোঁটাও মেঘ নেই। পাশে এসে দাঁড়িয়ে মেজর বললেন, "হচ্ছেটা কী?"

সামনের জঙ্গলটা এখন অস্থির। গাছগুলো প্রবলবেগে ডালপালা নেড়ে চলেছে। কয়েক সেকেন্ড এইরকম চলার পর আচমকা প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেল। হঠাৎ গোরানসাহেব চিৎকার করলেন, "লুক।"

অর্জুন দেখল একঝাঁক বাদুড়জাতীয় প্রাণী গাছগুলো থেকে উড়ে আসছে। ওদের উড়ে আসার ভঙ্গিটা খুব হিংস্র। গোরানসাহেব টর্চের আলো ফেলতে চাইলেন ওদের ওপরে। গোরক্ষনাথ তৎক্ষণাৎ লাঠিসুদ্ধ খাঁচাগুলোকে ওপরে তুলে নিল। নিতেই কাক বেড়াল এমনকী শকুনটাও চিৎকার শুরু করে দিল। নীচের দিকে শোঁ শোঁ করে নেমে আসা বাদুড়গুলো ঢেউয়ের মতো ওপরে উঠে গিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যেতেই গোরক্ষনাথের পোষ্যরা শান্ত হল। মেজর তাকিয়ে ছিলেন পাহাড়ের দিকে, বললেন, "চশমাটা পালটাতে হবে। মনে হচ্ছে পাওয়ার বেড়েছে।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কেন?"

"বাদুড়গুলো আচমকা ঝাপসা হয়ে গেল, দেখতে পেলাম না।"

চাঁদ ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের ওপাশে। হঠাৎ জ্যোৎস্না চলে যাওয়ায় অন্ধকার ঘন হয়ে গেছে বেশ। গোরানসাহেব বললেন, "এবার ফিরে যাওয়া যাক। প্রথমদিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।"

মেজর খুব খুশি হলেন। পকেট থেকে একটা নিব্ বের করে খানিকটা তরল পদার্থ গলায় ঢেলে বললেন, "ফেরা যাক। এখনই ভোর হবে। তোমরা নিশ্চয়ই বাংলোয় ফিরে গিয়ে বিছানায় উঠে বসবে কিন্তু আমি এই জঙ্গলের ভোরটাকে লনে বসে এনজয় করব। আন্ডারস্ট্যান্ড?"

কেউ জবাব দিল না। গোরানসাহেবের টর্চের আলো ওদের পথ দেখাচ্ছিল। একটু একটু করে অন্ধকার পাতলা হয়ে আসছে। এবার বাংলোর পেছনটাকে দেখতে পেল ওরা। ছায়া ছায়া, অস্পষ্ট। হঠাৎ অর্জুন দাঁড়িয়ে গেল। সে কি ঠিক দেখছে? কোনও মানুষের ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা নয়। কিন্তু লম্বা গাউন পরা কেউ কি ওখানে দাঁড়িয়ে! সে মেজরের হাত ধরে দাঁড় করালো, "দেখুন তো, বাংলোর পেছনে কাউকে চোখে পড়ে কিনা?"

মেজর দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহুঁ, না। অবশ্য আমার এই চশমাটাকে পালটাতে হবে। তবু বলছি, না। ওখানে এখন কে যেতে পারে? আমাদের ড্রাইভারটা? ব্যাটার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ওখানে যাবে কেন? সাপের খবরটা কি জানে না বুদ্ধুটা?"

গোরানসাহেব দাঁড়িয়ে গেলেন, "কী হয়েছে?"

মেজর আবার হাঁটা শুরু করে তাঁর কাছে পৌঁছে অর্জুনের কল্পনার কথা বললেন। গোরানসাহেব অর্জুনের দিকে তাকালেন, "তুমি কি কোনও লম্বা ফিগার দেখেছ, যার পোশাক কালো? একটু বেঁকে দাঁড়ানো?"

অর্জুন বলল, "হ্যাঁ, যদিও আমি ঠিক নিশ্চিত নই!"

"আমিও দেখেছিলাম। কিন্তু পরে বুঝলাম ওটা একটা সরু গাছ। প্রচুর পাতা থাকায় এতদূর থেকে কালো পোশাক পরা মানুষের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। চলো।"

বাংলোয় পৌঁছবার আগেই ভোর হয়ে গেল। রোদ ওঠেনি, সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি কিন্তু তিনি আসছেন জানিয়ে চমৎকার এক আলোয় পৃথিবী আলোকিত হল। এখন অন্ধকার যা আছে তা গাছের পাতার আড়ালে।

বারান্দায় উঠে এসে দেখা গেল বসার ঘরের দরজাটা খোলা। মেজর বললেন, "সর্বনাশ। দরজা খোলা কেন? কেউ কি ঢুকেছিল?"

অর্জুন হেসে বলল, "পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা চোর এতদূরে জঙ্গলের মধ্যে চুরি করতে অন্তত রাত্রে আসবে না। হাওয়ায় খুলে গেছে। তখন ঝড় উঠেছিল!"

মেজর বললেন, "আমি চোরের কথা বলছি না। যার সন্ধানে আমরা এখানে এসেছি তিনি যদি ঘুমন্ত ড্রাইভারকে একা পেয়ে চলে আসেন?"

অর্জুন বসার ঘরে ঢুকল। ঘরের ভেতরে এখনও আলো ঢোকেনি। সে দ্রুত চলে গেল চার নম্বর ঘরের দরজায়। দেখল বটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়।

ওর শোয়ার ভঙ্গি দেখে ঘাবড়ে গেল অর্জুন। ধীরে-ধীরে বিছানার পাশে এসে সে ডাকল, "বটা, বটা!"

বটা কোনও সাড়া দিল না।

ইতিমধ্যে গোরক্ষনাথ এবং মেজর এসে দাঁড়িয়েছেন পাশে। মেজর চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ডেড?"

অর্জুন জবাব দিল না। মেজর বললেন, "গলার পাশে দাঁতের দাগ আছে কিনা ভাল করে দ্যাখো তো?"

কিন্তু সেটা দেখার আগেই গোরক্ষনাথ বটার পায়ের আঙুল ধরে ঝাঁকুনি দিল। "বটাবাবু! ও বটাবাবু?"

সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বটা। প্রথমে বুঝতে না পারলেও খুব তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বলল, "আপনারা ফিরে এসেছেন? যাক বাবা। খুব চিন্তা হচ্ছিল আপনাদের নিয়ে। কারও কোনও বিপদ হয়নি তো?"

হঠাৎ হো হো করে হাসতে লাগলেন মেজর, দু'হাতে ভুঁড়ি চেপে। হাসতে হাসতেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বটা অবাক হল, "কী ব্যাপার বাবু?"

"কিছু না। চা খাওয়াতে পারো?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে করে দিচ্ছি।" বটা বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল।

বাইরের বারান্দায় তখন মেজর গোরানসাহেবকে প্রবলবেগে হাত নেড়ে বোঝাচ্ছিলেন এই তল্লাটে দু-এক পিস ভূত থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু ড্রাকুলা নেই। তাঁর বক্তব্য, ড্রাকুলা থাকলে বটার ঘুম এ জীবনে ভাঙবে না। এতবড় খালি বাংলোয় ঘুমন্ত বটাকে পেয়েও যখন ড্রাকুলা তার রক্ত খেতে আসেনি তখন প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে তিনি এই অঞ্চলে নেই।

অর্জুন এসে কথাগুলো শুনল। গোরানসাহেব কোনও জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। মেজর অর্জুনকে বললেন, "একবার মাছ ধরতে গিয়েছিলাম কঙ্গোতে, ওখানে ব্ল্যাক লেক বলে বিশাল হ্রদ আছে। শুনেছিলাম, আমাদের কাতলা মাছের তিন ডবল সাইজের একটা মাছ, যাকে ওরা কুন্তা বলে, ওখানে পাওয়া যায়। ব্ল্যাক লেক লম্বায় মাইল পাঁচেক, চওড়ায় আধ মাইল। তিনদিন ধরে বোট নিয়ে ছিপ ফেলেছি কিন্তু কুন্তার দর্শন পাইনি। ওরা নাকি দল বেঁধে থাকে। পাঁচ মাইল লম্বা লেকের কোথায় তাঁরা থাকতেন জানি না। হাতে তিনদিনের বেশি সময় ছিল না বলে চলে আসতে হয়েছিল। এও দেখছি সেরকম। গোরান শুনেছে ডুয়ার্সের এইদিকে ড্রাকুলা আছে। আরে এইদিক বলতে কোনদিক? আমরা এখানে বসে আছি আর ড্রাকুলা হয়তো কোচবিহারে ঘুমোচ্ছে।"

গোরানসাহেব ফিরে এসে অর্জুনের পাশে চেয়ার টেনে বসলেন। ওঁর হাতে একটা মোটা ডায়েরি। তার পাতা ওলটাতে-ওলটাতে একটা জায়গায় থেমে মুখ তুললেন, "নাইনটিন ফর্টিওয়ানে ছয়মাসের মধ্যে লেখা হয়েছিল চিঠি তিনটে। আমি এখানে কপি করে রেখেছি। চিঠি লিখেছিলেন জন লিঙ্কন। প্রথম চিঠি,

'ডিয়ার বব, আশা করি ভাল আছ। আমি এখন ইন্ডিয়ার বেঙ্গল প্রভিন্সের নর্থে বিনাহাট চা-বাগানের ম্যানেজার। সুন্দর বাংলো, প্রচুর কাজের লোক, যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা আমার আছে। ইন্ডিয়া স্বাধীন হতে চাইছে কিন্তু আমার এখানে কোনও গোলমাল নেই। আমি এই চিঠি লিখছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। আমার আগে এই বাগানের ম্যানেজার ছিলেন উইলিয়াম রাইট। তাঁকে একদিন একটি জঙ্গলের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁর গলায় দাঁতের চিহ্ন ছিল। সেই চিহ্ন কোনও পশু করেনি। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার বলছেন তিনি নাকি জঙ্গলের গভীরে একটি বাংলোয় একা রাত কাটাতে গিয়েছিলেন। ওই বাংলোটি করেছিলেন একজন ব্রিটিশ টি-প্ল্যান্টার, যিনি কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবাচ্ছে। ভাল থেকো। শুভেচ্ছা নিও।—জন লিঙ্কন।'

"দ্বিতীয় চিঠি, 'ডিয়ার বব, তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই আবার লিখছি। মিস্টার রবার্টকে কোনও মানুষ খুন করেনি। যে ব্রিটিশ প্ল্যান্টারের বাংলোয় গিয়ে মিস্টার রাইট খুন হন, তাঁর মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়নি। ভদ্রলোক বিয়ে করেননি। ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে ওঁর দু'ভাই লন্ডন থেকে এসেছিলেন। ওই বাংলোয় রাত কাটাতে গিয়েছিলেন তাঁরা। পরের দিন দু'জনের মৃতদেহ রক্তশূন্য অবস্থায় পাওয়া যায়। তোমার কাছে অনুরোধ, লন্ডনের যেসব সংস্থা পরলোক নিয়ে গবেষণা করেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাগুলো জানাও। তাঁরা কী বলেন তা জানতে আমি খুব আগ্রহী। শুভেচ্ছা নিও।—জন।'

"তৃতীয় চিঠি, 'ডিয়ার বব, তোমার চিঠি পেয়েছি। মনে হচ্ছে তুমি আমার দ্বিতীয় চিঠিটি পাওয়ার আগেই এই চিঠি লিখেছ। যাহোক, আমি খুব চিন্তায় আছি। আমার চা-বাগান হাসিমারা নামক মোটামুটি পরিচিত ব্যবসাকেন্দ্রের কাছে। এখানকার চার্চের ফাদার আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন। ওই জঙ্গলের মধ্যে যে বাংলোটা আছে তার ধারেকাছে আমাকে যেতে নিষেধ করেছেন। বাংলোটা আমার বাগান থেকে অন্তত কুড়ি মাইল দূরে জঙ্গলের শেষে। অথচ সন্ধে হলেই মনে হয়, যাই গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসি। গতরাত্রে একটা ঘটনা ঘটল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল কোনও একটা শব্দে। দেখলাম আমার জানলার তারে একটা বাদুড় ঝুলছে। পোকামাকড় যাতে ঘরে না ঢুকতে পারে তাই তার লাগানো ছিল। এতবড় বাদুড় আমি কখনও দেখিনি। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের নীচ থেকে রিভলভার বের করে গুলি করলাম। বাদুড়টা নীচে পড়ে গেল। গুলির শব্দে কাজের লোকজন ছুটে এল। আলো জ্বেলে বাংলোর পাশে জানলার নীচটা খোঁজা হল। কিন্তু কোথাও বাদুড়টাকে পাওয়া গেল না। অথচ আমি নিজের চোখে দেখেছি ওর পেটে গুলি লেগেছিল। তুমি অবাক হবে শুনে, জানলার তারে একফোঁটাও রক্ত ছিল না। বুঝতেই পারছ, এসব কারণে আমি একটুও ভাল নেই। ছুটির দরখাস্ত করেছি। পেলেই দেশে চলে যাব কিছুদিনের জন্যে। শুভেচ্ছা নিও।— জন।'"

চিঠি পড়া শেষ করে গোরানসাহেব বললেন, "এই বাংলোটির কথাই জন লিঙ্কন তাঁর চিঠিতে লিখেছেন।"

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "জন নিশ্চয়ই ফিরে গিয়েছিলেন?"

"না। ওঁর বন্ধু চিঠিগুলো পরলোকচর্চার একটি সংস্থার কাছে জমা দিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর বন্ধু ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যায়।"

"ম্যালেরিয়া?"

"হ্যাঁ।" গোরানসাহেব উঠে দাঁড়ালেন, "অর্জুন, চলো, একটু ঘুরে আসি।"

লনে পায়চারি করতে করতে গোরানসাহেব আচমকা দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর চোখ স্থির। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হল?"

"তুমি প্যাঁচাটাকে উড়ে যেতে দেখলে?"

"না তো! এখন তো আলো ফুটে গেছে। এ-সময় প্যাঁচা উড়বে কেন?"

গোরানসাহেব দ্রুত বাড়ির পেছনদিকে চলে যেতে অর্জুন অনুসরণ করল। না, কোথাও কোনও প্যাঁচা নেই, কিন্তু স্টিভেনসনের কবরে ঢোকার গর্তটা কেউ সযত্নে বন্ধ করে দিয়েছে।

॥ ১৬ ॥

গোরানসাহেব বললেন, "অদ্ভুত ব্যাপার! এ-কাজটা কে করল?"

অর্জুনও অবাক হয়েছিল। বলল, "সাপের গর্তের মুখ বন্ধ করতে হলে সাহস থাকা দরকার। এখানে একমাত্র আপনি আর গোরক্ষনাথ সাপ সম্পর্কে সাহসী। কিন্তু আপনারা কেন এই কাজ করতে যাবেন? তা ছাড়া সন্ধের পরে কেউ তো বাংলোর বাইরে আসেনি।"

গোরানসাহেব রেগে গেলেন, "তুমি কি পাগল? আমি যদি নিজে এই কাজটি করি তা হলে জিজ্ঞেস করব কেন? না কি তুমি আমাকেও সন্দেহভাজনদের লিস্ট থেকে বাদ দিতে চাওনি?" প্রশ্নটা করেই দূরে কিছু লক্ষ করে ফিসফিসে গলায় বললেন, "সরে এসো অর্জুন, চটপট সরে এসো।"

গোরানসাহেব তৃতীয় কবরটির দিকে দৌড়ে যেতে অর্জুন অনুসরণ করল। এবং খানিকটা দূরত্বে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করতেই সাপটাকে দেখতে পেল। কাল সন্ধেবেলায় যে সাপটাকে তারা দেখেছিল, বোধ হয় সেটাই। খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে স্টিভেনসনের কবরের দিকে। এখন আরও দীর্ঘ দেখাচ্ছে ওর চেহারা। কবরের পাশে এসে সাপটা থমকে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কিছু খুঁজতে লাগল। পাশে কুঁজো হয়ে দাঁড়ানো গোরানসাহেবকে বলতে শুনল অর্জুন, "ঢোকার গর্তটা খুঁজছে।"

হঠাৎ ফোঁস-ফোঁস শব্দ প্রবল হল। সাপটা যে খুব রেগে গেছে, বোঝা যাচ্ছিল। আচমকা ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। এত লম্বা, মোটা সাপকে কখনও ফণা

তুলতে দ্যাখেনি অর্জুন। মুখ ফাঁক হওয়ায় সরু জিভ মাঝে-মাঝেই বেরিয়ে আসছে। সোজা হয়ে দাঁড়ানো ওর মাথা অর্জুনের উচ্চতার সমান হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় ও যদি কাউকে আক্রমণ করে তা হলে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব হবে।

হঠাৎ অর্জুন লক্ষ করল গোরানসাহেবের মুখের চেহারা বদলে যাচ্ছে। সাপ দেখলে ওঁর চোখমুখ যেরকম ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, এখন সেই অবস্থা। অর্জুন শক্ত হাতে ওঁর হাত ধরল। সেটা ছাড়াতে চেষ্টা করলেন গোরানসাহেব, "আমাকে যেতে দাও। ওকে আমার চাই। আমার সংগ্রহে ওর মাথাটাকে রাখব।"

"না।" চাপা গলায় বলল অর্জুন, "আপনি ওকে মারতে পারবেন না।"

হঠাৎ সাপটা নিচু হতে লাগল। এবং প্রবল শক্তিতে ওর মুখ দিয়ে নরম মাটির ওপর আঘাত করল। এক-দুই-তিনবার। তারপরেই ওর শরীরটা তরতর করে ভেতরে ঢুকে যেতে লাগল। তাই দেখে গোরানসাহেব দৌড়লেন, কিন্তু তিনি গর্তটার কাছে পৌঁছনোর আগেই সাপের শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল।

হতাশ হয়েও দমলেন না গোরানসাহেব, "অতবড় শরীরটা এত দ্রুত ভেতরে ঢুকল কী করে? না অর্জুন, এই কবর খুঁড়তে হবে।"

"সেটা কি ঠিক হবে?"

"মানে?"

"ওখানে আর্নল্ড স্টিভেনসনের শরীরকে সমাধি দেওয়া হয়েছে। কবরটি খুঁড়লে তাঁকে অসম্মান জানানো হবে না?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

"এত বছরে তাঁর শরীরটা নিশ্চয়ই মাটিতে মিশে গেছে। তা ছাড়া ওই সাপটা যদি তাঁর শরীরকে আস্তানা করে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর আত্মা শান্তি পাচ্ছে না।"

তখন কড়া রোদ। অথচ বেলা এগারোটা বাজে। গোরানসাহেব সবাইকে সতর্ক করে দিলেন সাপটার শক্তি সম্পর্কে। গোরক্ষনাথ তার তিনটে প্রাণীকে নিয়ে এল কবরের কাছে। বেচারারা ঘুমোচ্ছিল, ওখানে নিয়ে আসতেই প্রবল প্রতিবাদ শুরু করে দিল। কাক চেঁচাচ্ছে, শকুন পাখা ঝাপটে চলেছে, বেড়ালটা পিঠ উঁচু করে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস আওয়াজ তুলছে। গোরক্ষনাথ চটপট বলে উঠল, "এই জায়গাটা মোটেই ভাল নয় বাবু।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

"এখানে তেনাদের কেউ নিশ্চয়ই আছেন। নইলে এরা এমন কাণ্ড করবে না।"

মেজর হাসলেন, "তুমি অর্ধেক সাকসেসফুল গোরক্ষনাথ। এখানে প্রেতাত্মা আছে কিনা তা জানি না, তবে কবরে এককালে মৃত মানুষকে শোয়ানো হয়েছিল, এটা অন্তত তোমার প্রাণীরা জানিয়ে দিতে পেরেছে।"

গোরক্ষনাথ কবরের কাছে খাঁচা নিয়ে গিয়ে শকুনটার দরজা খুলে দিল। দেখা গেল খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পাখিটা বেরিয়ে এসে সাপের গর্তের মুখটায় চলে গেল। তারপর প্রবলবেগে গর্তের মুখ নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগল। গোরক্ষনাথ ওর পায়ে

বাঁধা দড়ি টেনে কোনওমতে ফিরিয়ে আনতে পারল খাঁচায়। তারপর ওদের তিনজনকে রেখে দিয়ে এল দূরে। এবং সেখানে রাখার পর প্রাণী তিনটে একটু-একটু করে শান্ত হয়ে গেল।

মেজর এবং গোরানসাহেব যেসব মালপত্র এনেছিলেন। তার ভেতর থেকে একটি শক্ত জাল বের করে আনা হয়েছে। মাটি খোঁড়ার জন্য বেলচা জাতীয় তিনটি স্টিলের যন্ত্র, লম্বা লাঠি আর এক বোতল অ্যাসিড। মেজর চাইছিলেন গর্তের ভেতরে বোতলটা উপুড় করে দিতে। তা হলে সাপটার আর বেঁচে থাকার কোনও সুযোগ থাকবে না। কিন্তু গোরানসাহেবের তাতে প্রবল আপত্তি। তিনি সাপটার মাথা আস্ত চান। অ্যাসিডে পুড়ে গেলে তাঁর কোনও কাজে লাগবে না।

অতএব গর্ত খুঁড়তে হবে এবং তার ফলে সাপটা নিশ্চয়ই আক্রমণ করবে। আর ওর রেগে যাওয়ার যে চেহারা অর্জুন দেখেছে তাতে স্পষ্ট, ওর মোকাবিলা করা বেশ শক্ত হবে। গোরানসাহেব বললেন, তিনি তৈরি থাকবেন। সাপটা ফণা তোলামাত্র তিনি তাকে জালবন্দি করবেন।

এই সময় বটা বলল, "বাবু একটা কথা বলব?"

অর্জুন তাকাল, "শুনেছি শনি-মঙ্গলবার বাস্তুসাপ মারতে নেই। ওটা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, আর একটা রাত অপেক্ষা করলে হত না?"

মেজর বললেন, "যদিও ব্যাপারটা কুসংস্কার তবু আমার প্রস্তাবটা খারাপ লাগছে না। ছেলেবেলায় আমার মায়ের মুখে এমন কথা শুনেছি।"

গোরানসাহেবকে ইংরেজিতে ব্যাপারটা বললেন মেজর।

গোরানসাহেব কাঁধ ঝাঁকালেন, "দু'হাজার সালে এসব কথার কোনও মানে আছে?"

মেজর বললেন, "নেই। তবে লোকাল মানুষের সেন্টিমেন্ট।"

অর্জুনের দিকে তাকালেন গোরানসাহেব, "তুমি কী বলো?"

অর্জুনের চোখের সামনে রাগী সাপটার ফণা-তোলা শরীর ভেসে উঠল। ভয়ঙ্কর অথচ কী সুন্দর! আর একটা দিনরাতের সুযোগে ও যদি এখান থেকে পালিয়ে যায় তা হলে তো সমস্যার সমাধান হয়। এই যে ওরা এখানে জড়ো হয়ে কথাবার্তা বলছে, সাপটা নিশ্চয়ই নিজের নিরাপত্তার কথা ভাবছে। আর সে-কারণেই ও ওর এই আশ্রয় ত্যাগ করতে পারে। অর্জুন হেসে বলল, "আজ আর কালের মধ্যে তো কোনও পার্থক্য আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"বেশ। তবে তাই হোক।" গোরানসাহেব অবশ্য খুশি না হয়েই বললেন।

দুপুরটা কেটে গেল ঘুমিয়ে। বিকেলে আবার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে কথাবার্তা। গোরানসাহেব বললেন, "আমার বিশ্বাস, আর কোথাও খুঁজে বেড়াবার দরকার নেই। এখানেই সে আছে। আমরা আজকের রাতটা জেগে থাকব।"

বটা ইতিমধ্যে বিষয়টা জেনে গিয়েছে। সে দূরে দাঁড়িয়ে শুনছিল, "বাবু,

আমাকেও কি জাগতে হবে?"

তার প্রশ্নের কেউ উত্তর দিল না।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কি বাংলোর ভেতরে বসে লক্ষ করব, না বাইরে গিয়ে দাঁড়াব?"

"প্রথমে আমরা ভেতরে থাকব। রাত বাড়লে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।" গোরানসাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, "আমি তখন থেকে লক্ষ করে যাচ্ছি, কিন্তু গতকাল যে সাপটাকে ওখান দিয়ে কবরের দিকে যেতে দেখেছি তাকে এখনও চোখে পড়ছে না। এর মানে ওটা ওর রুটিন নয়।"

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "আজ যাকে দেখেছি সে কি গতকালেরটা নয়?"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অর্জুন।" গোরানসাহেব বললেন।

সন্ধের সময় দেখা গেল আকাশে মেঘ জমছে আর জঙ্গলের গাছপাতা আচমকা স্থির হয়ে গেছে। একটা পাতাও নড়ছে না। মেজর বললেন, "সর্বনাশ!"

অর্জুন তাকাতে মেজর হিপ পকেট থেকে ছোট চ্যাপটা বস্তুটি বের করে ছিপি খুলে তরল পদার্থ গলায় ঢেলে বললেন, "নাইনটিন এইট্টি ওয়ান। প্রায় কুড়ি বছর আগের কথা। ফিজিতে গিয়েছিলাম লাল ঝিনুক দেখতে। আহা, সমুদ্রের নীচে যখন ওরা পাশাপাশি থাকে তখন চোখ জুড়িয়ে যায়। তা একদিন জঙ্গলে ছিলাম। দুপুরবেলা। আচমকা সূর্যের আলো নিভিয়ে দিল বিশাল বিশাল মেঘ। অমনই গাছের পাতাগুলো ওইরকম স্থির হয়ে গেল। তারপরেই টের পেলাম পায়ের তলায় যেন হইচই শুরু হয়ে গেছে। অথচ আমার জুতোর তলায় শুধু মাটি। একটু এগিয়ে দেখলাম তিনটে গর্ত দিয়ে পিলপিল করে বড়-বড় পিঁপড়ে পাগলের মতো বেরিয়ে আসছে। মাটির নীচে ওদের ছুটে চলার কম্পন আমার জুতো ভেদ করে পায়ে পৌঁছেছিল। আমার সঙ্গী বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। এখনই বৃষ্টি নামবে।' আমরা টেন্টে পৌঁছবার এক মিনিট পরে যে বৃষ্টিটা নামল, তা থেমেছিল সাতদিন পরে। সমুদ্রের জল বেড়ে গিয়েছিল সেই বৃষ্টিতে।"

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে নিল। তার মুখে হাসি দেখলে মেজর খুশি হবেন না।

বৃষ্টি নামল! তুমুল বৃষ্টি। অথচ সারাদিন মেঘ ছিল না। বৃষ্টি পড়ছে অথচ হাওয়া বইছে না। জেনারেটার চালিয়ে দিয়েছিল বটা। হঠাৎ সেটা শব্দ করে থেমে যেতেই পুরো বাড়ি অন্ধকার হয়ে গেল।

মেজর গলা তুলে বললেন, "সবাই এক ঘরে এসে বোসো। মোমবাতি কেউ একজন জ্বেলে দাও।"

দেওয়া হল। কেমন একটা গা-থমথমে আবহাওয়া হয়ে গেল। গোরানসাহেবকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। তিনি অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এভাবে বৃষ্টি শুরু হলে কি অনেকক্ষণ ধরে চলে?"

অর্জুন মাথা নাড়ল, "না। এখন বর্ষাকাল নয়। তখন পাঁচ-সাতদিনেও বৃষ্টি বন্ধ হয় না।" সে বলল, "এটা বেশিক্ষণ চলবে বলে মনে হয় না।"

বটা তাগাদা দিচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ডিনার করে নিলে ও নিষ্কৃতি পাবে। অতএব সবাই খেয়ে নিল। টিনের খাবার বাদ দিয়ে এখন বটার তৈরি খাবারেই সবাই খুশি। খাওয়া শেষ হলে গোরানসাহেবের ঘরে গেল অর্জুন আর মেজর। এখন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে বৃষ্টির সঙ্গে। তার আলোয় কাচের জানলার বাইরে পৃথিবীটাকে দেখা যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে অস্পষ্ট। এই ঘরটা থেকে বাড়ির পেছনের দিকটা দেখা যায়। বিদ্যুতের আলোয় কবর তিনটে যেন জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছিল।

॥ ১৭ ॥

রাত বাড়ছিল। হঠাৎ বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে আর একটা আওয়াজ কানে এল অর্জুনের। মেজর চেয়ারে বসে ঢুলছেন। কিন্তু গোরানসাহেব তাকালেন অর্জুনের দিকে। শব্দটা ক্রমশ বাড়ছে। গাড়ির আওয়াজ। গোরানসাহেব বললেন, "কেউ আসছে।"

ততক্ষণে অর্জুন বুঝতে পেরেছে আওয়াজটা একটা নয়, দুটো গাড়ির এঞ্জিনের। দুটো আওয়াজের ধরন আলাদা। তার মানে দু'রকমের গাড়ি আসছে। এই রাত্রে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এমন মারাত্মক বৃষ্টিতে দুটো গাড়ি এদিকে আসছে কেন, বুঝতে পারছিল না অর্জুন। যে ভদ্রলোক এই বাংলোটি কিনেছেন তিনি নিশ্চয়ই এমন সময়ে আসবেন না, তাঁর আসার কথা অনেক পরে।

অর্জুন বলল, "যারা আসছে তারা ভাল লোক নাও হতে পারে।"

"তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু ওরা থাকলে যে জন্যে এসেছি সেই কাজটায় বাধা হবেই।" গোরানসাহেবের কথা শেষ হতেই গাড়ির হেডলাইট দেখা গেল। আলোগুলো ঘুরে বাংলোর সামনে চলে এল। মেজর হকচকিয়ে সোজা হয়ে বসলেন, "কে, কে?"

অর্জুন দ্রুত উঠে ঘরের বাইরে চলে এল। মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে ও সোজা রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। রান্নাঘরের জানলা বন্ধ। কিন্তু সেখানে কোনও গ্রিল বা তারের জানলা নেই এটা সে দুপুরে দেখেছিল। জানলাটাকে খুলল সে। বাড়ির এপাশে কিছু গাছগাছড়া আছে। বৃষ্টি পড়ছে এখনও। বাইরে বেরুলেই ভিজতে হবে। হোক। অর্জুন জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসামাত্র ভিজতে শুরু করল। সে ধীরে ধীরে কার্নিসের নীচ দিয়ে সামনের দিকে এগোল।

বর্ষাতি-পরা চারটে লোক একটা মারুতি থেকে নেমে এল। বটার সুমোটাকে দেখে ওরা যে অবাক হয়ে গিয়েছে বোঝা যাচ্ছিল। টর্চ ফেলে ভেতরটা দেখল ওরা। তারপর ইশারা করল টর্চ জ্বেলে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের জিপ থেকে দুটো লোক নেমে এল। ওদের হাতে যে অস্ত্র রয়েছে তা বিদ্যুতের আলোয় বোঝা গেল।

দলবদ্ধভাবে ওরা বারান্দায় উঠে যেতেই অর্জুন আর তাদের দেখতে পেল না।

যারা অস্ত্র হাতে এত রাত্রে এখানে এসেছে তাদের মতলব ভাল হতে পারে না।

হঠাৎ চিৎকার শোনা গেল, "অ্যাই, ভেতরে কে? বেরিয়ে আয়।"

সঙ্গে সঙ্গে মেজরের গলা শুনল, "তুই কে? এতবড় আস্পর্ধা যে, আমাকে তুই বলছিস? মেরে দাঁত ভেঙে দেব শজারুর বাচ্চা!"

তারপর ধুপধাপ শব্দ হল। লোকটা চেঁচিয়ে বলল, "সবক'টাকে বেঁধে ফ্যাল। আমার আস্তানায় এসে জুটেছে আবার আমাকে গালাগাল? ক'টা আছে এখানে খুঁজে দ্যাখ সবাই।"

একটু বাদে উত্তর শোনা গেল অন্য গলায়, "চারজন। এদের একজন সাহেব। একজন সাদা চামড়া।"

অর্জুন নিঃসন্দেহ হল। এরা কেউ এই বাংলোর মালিক লোকনাথ দত্তের লোক নয়। লোকনাথ দত্ত তাদের এই বাংলোয় নিয়ে আসার সময় তো স্পষ্ট বলেছিলেন যে, তিনি সাতদিনের মাথায় আসবেন। নিশ্চয়ই এই লোকগুলো এখানে যাওয়া-আসা করে, যা লোকনাথ দত্ত জানেন না।

হঠাৎ বটার গলা শুনতে পেল অর্জুন, "আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কিছু জানি না। আমি গাড়ি চালাই, এঁরা আমার গাড়ি ভাড়া করে এখানে এনেছেন।"

"কোত্থেকে এসেছিস?"

"জলপাইগুড়ি। ওখানকার স্ট্যান্ডে গিয়ে বটা বললে সবাই চিনবে।"

"এই যে মিস্টার হোঁৎকা! এই সাহেব কে?"

কোনও জবাব শুনতে পেল না অর্জুন। সম্বোধনটা নিশ্চয়ই মেজরের উদ্দেশ্যে।

"কী হল? কানে যাচ্ছে না কথা?"

"ভদ্রভাবে কথা বলো ভাই। আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়।"

"শাবাশ। কেন এসেছ এখানে? এই বিদেশি কে?"

"আমরা এসেছি ড্রাকুলার সন্ধানে।"

"ড্রাকুলা?" লোকটা হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল।

"হ্যাঁ, যারা রক্ত চুষে মানুষকে মেরে ফেলে।"

"আচ্ছা! এই ব্যাপার! আমাদের খবরটা তোমরা পেলে কোথায়? তোমরা কি পুলিশের লোক? উত্তর দাও।"

"না। আমি আর ও আমেরিকা থেকে এসেছি। পাসপোর্ট দেখাতে পারি।"

"ওসব পকেটে রাখো। ব্যাপারটা যখন জেনেই গেছ তখন আর তোমাদের জ্যান্ত ছেড়ে দিতে পারি না।"

এই সময় আর একটি গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকটা বলল, "এদের হাত-পা বেঁধে ফ্যাল। বস আসছে মনে হচ্ছে।"

কার্নিসের নীচে দাঁড়িয়েও বৃষ্টির ছাঁট এড়াতে পারছিল না অর্জুন। হাওয়া নেই বলে শীত করছে না তেমন। অবশ্য বৃষ্টির তেজ এখন অনেক কমে গেছে। এদের হাত থেকে মেজরদের উদ্ধার করা কীভাবে সম্ভব, ভাবছিল অর্জুন। এই সময়

গাড়ির হেডলাইট বাংলোর ওপর পড়ল। অর্জুন দেখল গাড়িতে একজনই মানুষ, তিনিই ড্রাইভার।

দরজা খুলে চটপট বারান্দায় উঠে গেলেন তিনি। অর্জুন শুনতে পেল, "সব ঠিক আছে?"

"না, সার। এখানে এসে দেখি চারটে লোক বাংলো দখল করে আছে। ওদের ওই ঘরে হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছি। বলল, আমেরিকা থেকে এসেছে।"

"কেন? কেন এসেছে?"

"মুখে বলল ড্রাকুলার সন্ধানে। মনে হচ্ছে আমাদের ব্যাপারটা জেনে গিয়েছে।"

"গোয়েন্দা না পুলিশ?"

"বুঝতে পারছি না, তবে যা চেহারা আর বয়স, তাতে পুলিশে চাকরি হবে না।"

"জিপে ক'জন আছে?"

"ছ'জনকে এনেছি।"

"বাঃ, ছয় প্লাস চার। একে-একে নিয়ে এসো। আমি টেবিল রেডি করছি। কেউ একজন আমাকে সাহায্য করুক। গাড়িতে সব যন্ত্রপাতি আছে।"

"স্টক আছে সার!"

"আচ্ছা, ওদের সঙ্গে আর কেউ ছিল না তো?"

"চারজনকেই তো পেয়েছি।"

"যদি কেউ পালিয়ে গিয়ে থাকে পেছনের দরজা দিয়ে, নিশ্চয়ই বৃষ্টির মধ্যে বেশিদূর যেতে পারবে না। সাবধানের মার নেই। দেখে এসো।"

"ওকে সার।" বলে লোকটা বারান্দায় বেরিয়ে এসে চেঁচিয়ে বলল, "একটা একটা করে ওদের ভেতরে নিয়ে এসো। বাঃ, বৃষ্টি ধরে গেছে, আমি একটু পাক দিয়ে আসছি।"

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। এপাশে এলে লোকটা কি তাকে দেখতে পাবে? সে দ্রুত লন পেরিয়ে জঙ্গলের কাছে চলে যেতেই লোকটাকে দেখা গেল। টর্চ নিয়ে বেরিয়ে চারপাশে আলো ফেলছে। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার জন্যই বোধ হয় রাতের জঙ্গলে পোকামাকড় কম। পাতা থেকে জল পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা। অর্জুন দেখল লম্বা লোকটা আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বাংলোর পেছনদিকে যাচ্ছে। খোলা জানলাটায় তার টর্চের আলো পড়ল। আরও এগোল লোকটা। কবরের কাছে পৌঁছনোমাত্র লোকটা এমন আর্ত চিৎকার করে উঠল যে, অর্জুন কেঁপে উঠল আতঙ্কে।

লোকটা যে মাটিতে পড়ে গেল, এটুকু বুঝতে পারল অর্জুন। জ্বলন্ত টর্চ ওর হাত থেকে ছিটকে কিছুটা দূরে ঘাসের ওপর পড়েছে। তিনবার চেঁচিয়েছিল লোকটা, তারপর একদম চুপ করে গেল। চিৎকারটা বাংলোর ভেতরে পৌঁছেছিল। অর্জুন দেখল তিনজন লোক টর্চ নিয়ে দৌড়ে বাইরে এসে চারপাশে

আলো ফেলছে। অর্জুন জঙ্গলের আরও ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করতেই ঝুপ ঝুপ করে ওর শরীরের ওপর ভেজা কিছু পড়তে লাগল। ডান হাতে সেগুলোকে ঘাড় এবং মাথার ওপর থেকে সরাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু ওগুলো এমন আঁকড়ে আছে যে, সক্ষম হল না। জোঁক। জঙ্গলে জোঁক। এখন চুপচাপ ব্যথা না দিয়ে তার রক্ত খেয়ে যাবে। এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যে বাংলোয় ফিরে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। আবার সেটা করতে গেলে ওদের হাতে ধরা দিতে হবে। কিছুক্ষণ জোঁকগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

লোকগুলো এখন ডাকাডাকি করছে। "রাজুভাই, ও রাজুভাই, রাজুভাই।" কিন্তু কোনও সাড়া পাচ্ছে না। ওরা এবার বাংলোর পেছনদিকে যাচ্ছিল। আর তখনই ওদের টর্চের আলো মাটিতে পড়ে থাকা রাজুভাইকে আবিষ্কার করল। দৌড়ে কাছে গিয়ে ওরা কী দৃশ্য দেখল অর্জুন বুঝতে পারল না, কিন্তু ওখান থেকেই ওরা এমন হল্লা শুরু করল যে, বাংলোর ভেতর থেকে তিনজন মানুষ বেরিয়ে এল। এদের একজন বেশ প্রবীণ, সাদা দাড়ি আছে। মেঘ সরে যাওয়ায় আকাশ পরিষ্কার। লোকটাকে আবছা-আবছা যেটুকু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাতে বয়স্ক বলেই মনে হল অর্জুনের।

"কী হয়েছে?"

"রাজু মরে গিয়েছে। ওর শরীরটাকে কেউ দুমড়ে দিয়েছে।"

"কে করল?"

"জানি না সার। কোনও মানুষের পক্ষে এই কাজ এত তাড়াতাড়ি করা সম্ভব নয়। ওর মাথাটাও ঘুরে গেছে ভেঙে যাওয়ার পর।"

তিনটে লোক এগিয়ে যাচ্ছিল রাজুভাই-এর মৃতদেহ দেখতে। অর্জুন দেখল এই তার সুযোগ। বাংলোর সামনে এখন কেউ নেই। প্রথম গাড়িতে চারজন, জিপে দু'জন আর পরে একজন মানুষ এখানে এসেছে। মোট সাতজন। তার মধ্যে একজন মারা গেল। বাকি ছ'জন এখন বাংলোর পেছনে মৃতদেহকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৌড়ল।

বারান্দায় উঠেই সে দেখতে পেল বসার ঘরে টেবিলের ওপর একটি লোককে শুইয়ে রাখা হয়েছে। এই লোকটি কোত্থেকে এল? লোকটি যেন ঘুমোচ্ছে। পাশের দরজা বন্ধ। সেটা খুলতেই ও অন্ধকারে কিছুই দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কি এই ঘরে আছেন?"

মেজরের গলা পাওয়া গেল, "হুঁ। চটপট দড়ি খুলে দাও।"

"কেউ কথা বলবেন না প্লিজ।" অর্জুন প্রথমে গোরক্ষনাথকে পেল। তার বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, "আমার মাথা ঘাড় বুকে জোঁক পড়েছে। ছাড়িয়ে দিতে পারবে? জলদি!"

"বাবু অন্ধকারে কী করে দেখব? জোঁক? আপনি আমার শকুনের কাছে চলে

যান। ল্যাংড়া শকুন জোঁক খেতে ভালবাসে।”

শকুন? অর্জুনের মাথায় কিছু ঢুকল না। সে দৌড়ল। গোরক্ষনাথদের ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। শকুনের খাঁচাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সেটা একবার অবাক চোখে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল। খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে মাথাটা এগিয়ে নিয়ে গেল অর্জুন চোখ বন্ধ করে। আর তখনই অভাবনীয় ব্যাপারটা ঘটল। চটপট ঠোকর এসে পড়ছে মাথায়, ঘাড়ে, বুকে। শব্দ হচ্ছে কপাৎ কপাৎ করে। কিন্তু জোঁকগুলো সহজে চামড়া ছাড়তে চাইছিল না, রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে তারা। শকুনটাও যেন পাগল হয়ে গেল। শেষ জোঁকটাকে গেলার পর অদ্ভুত গলায় ডেকে উঠল পাখিটা। অর্জুনের হঠাৎ মনে হল পাখিটার ঋণ শোধ করা উচিত। সে হাত বাড়িয়ে ওর পায়ের দড়ি খোলার চেষ্টা করল। ভয় হচ্ছিল যদি শকুনটা তাকে ঠুকরে দেয় তা হলে এখানে ইনজেকশন নেওয়ারও উপায় নেই। কিন্তু শকুনটা চুপচাপ দেখে যেতে লাগল। ও বাঁধনমুক্ত হওয়ামাত্র ওড়ার চেষ্টা করল। খানিকটা দূরে গিয়ে বসে পড়ল অবশ্য। সম্ভবত খাঁচায় থাকার ফলে ওর ডানার জোর কমে গিয়েছে। শকুনটাকে উড়তে দেখে কাকটা চিৎকার শুরু করল। এই মধ্যরাতে কা কা ডাকটা আরও কর্কশ শোনাচ্ছিল।

বারান্দায় আবার মানুষের গলা পাওয়া গেল। অর্জুন ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে চলে এল। জানলাটা এখনও খোলা। সে শুনল প্রৌঢ় বলছে, “রাজু মারা গিয়েছে, ওর বউকে নিশ্চয়ই ক্ষতিপূরণ করে দেওয়া হবে।”

“কিন্তু ওকে যে মারল তাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।”

“কে মেরেছে?” প্রৌঢ়র গলা, “বুঝতে পারছ কোনও মানুষ ওকে মারেনি। ওর শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে গেছে যে, সে কখনওই মানুষ নয়।”

“যে কাজটা করেছে সে নিশ্চয়ই কাছাকাছি আছে। আমরা ওকে খুঁজে বের করব। ওকে শেষ না করে এখান থেকে যাব না।” লোকটা মরিয়া।

“ঠিক আছে। দু'জন বাইরে গিয়ে পাহারা দাও। বাকিরা আমাকে সাহায্য করো। বড় জারটা কোথায়? নিয়ে এসো কেউ।”

॥ ১৮ ॥

অর্জুন পা টিপে টিপে এগোল। টেবিলের ওপর শুয়ে থাকা লোকটার ঘাড়ের ওপর নলের মুখটা ঢুকিয়ে দিয়ে প্রৌঢ় ঘড়ি দেখল। নলের চেহারাটা পালটে গেল। প্রৌঢ় পাশে দাঁড়ানো তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, “যে চারজনকে আটকে রেখেছ তাদের শরীরে এই ইনজেকশনটা পুশ করে দাও এখনই। তা হলে চমৎকার ঘুমিয়ে থাকবে।”

একজন লোক ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে পাশের বন্ধ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই বাইরে থেকে চিৎকার ভেসে এল, “সাপ, সাপ!”

সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ়র পাশে দাঁড়ানো লোকদুটো বাইরে ছুটল। কিন্তু ফিরে এল তৎক্ষণাৎ, "ওদের দু'জনকেই একটা বিশাল সাপ ছোবল মেরেছে।"

"ওদের হাতে বন্দুক ছিল না?"

"ছিল কিন্তু ওরা মাটিতে পড়ে গিয়েছে।"

সঙ্গে সঙ্গে প্রৌঢ় পকেট থেকে রিভলভার বের করে বাইরে ছুটল। ওই দু'জন তার সঙ্গী হল। এই সময় পাশের ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল লোকটা। ওর হাতমুখ বাঁধা। কয়েক পা হেঁটে কাটা কলাগাছের মতো মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

অর্জুন ডাকল, "মেজর!"

"ইয়েস মাই বয়। এটা কিছুই নয়। একবার চিনে ...!"

"প্লিজ মেজর, গল্পটা পরে শুনব। এরা ভয়ঙ্কর লোক!" অর্জুন কথাগুলো বলতে বলতে দেখল গোরানসাহেব প্রায় দৌড়ে টেবিলের কাছে পৌঁছে শায়িত লোকটির গলা থেকে সিরিঞ্জ লাগানো নল খুলে ফেললেন। মোমবাতির আলোয় দেখা গেল ওর গলা থেকে রক্ত বের হচ্ছে গলগল করে। দ্রুত পকেট থেকে রুমাল বের করে সেখানে চেপে ধরে তিনি বলে উঠলেন, "আমাদের ফার্স্ট এড বক্সটা নিয়ে এসো মেজর, কুইক। নইলে একে বাঁচানো যাবে না।"

তখনই বাইরে গুলির আওয়াজ হল। পরপর দু'বার। অর্জুন দৌড়ে বারান্দায় গিয়ে দৃশ্যটা দেখতে পেল। লনের ওপর সাপটার মৃতদেহ পড়ে আছে। সেই বিশাল লম্বা সাপটা। প্রৌঢ় এবং তার দু'জন সঙ্গী বাংলোর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন।

"ওদের দ্যাখো, বেঁচে আছে কিনা।" প্রৌঢ় নির্দেশ দিল।

লোকদুটো এগিয়ে গেল লনের পাশে পড়ে থাকা দুটো শরীরের দিকে। ঝুঁকে পরীক্ষা করতে লাগল। অর্জুন বুঝতে পারল এবার ওরা ফিরে আসবে। সে দ্রুত ভেতরে ঢুকে দেখল ফার্স্ট এড বক্স থেকে তুলো ব্যান্ডেজ বের করে গোরানসাহেব লোকটির ক্ষত বাঁধছেন।

সে বলল, "ঝটপট আড়ালে চলুন। ওরা ফিরে আসছে আর ওদের সঙ্গে অস্ত্র আছে।"

ওরা আড়ালে আসামাত্র প্রৌঢ় ঘরে ঢুকল, "এ কী? নল খুলল কে? ব্যান্ডেজ করেছে দেখছি। কে করল? তোমরা সাবধান হও, এখানে অন্য লোক আছে।" প্রৌঢ় চিৎকার করে উঠল।

"সার দেখুন," পেছনে আসা লোকদু'জনের একজন চেঁচিয়ে উঠল। ওরা মেঝের ওপর পড়ে থাকা ইনজেকশন দিতে যাওয়া লোকটিকে দেখে ছুটে গেল। পরীক্ষা করে প্রৌঢ় বলল, "না, মারা যায়নি। অজ্ঞান হয়ে আছে। তোমরা ওই চারটে লোককে ভাল করে বাঁধোনি?"

"হ্যাঁ সার। শক্ত করে বেঁধেছিলাম।"

"তা হলে ওরা এর এই দশা করল কী করে? ওই ঘরে গিয়ে দ্যাখো তো?"

লোকদুটো একটু ইতস্তত করল। তারপর এগিয়ে গেল দরজার দিকে। উঁকিঝুঁকি মেরে বলল, "ভেতরে কেউ নেই সার।"

"ঠিক দেখেছ?"

"অন্ধকারে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।"

"টর্চ কোথায়?"

"সবক'টা টর্চ তো ওরা নিয়ে গিয়েছিল।"

"আঃ। সেগুলো তো মাটিতে পড়ে আছে। যাও, নিয়ে এসো।"

প্রথমজন দ্বিতীয়জনের দিকে তাকাল, "এই, চল আমার সঙ্গে।"

"তুই যা না!"

"আমি একা যাব না। চল।"

ওরা পা বাড়াতে প্রৌঢ় বলল, "দু'জনের যাওয়ার দরকার নেই। টর্চ আনতে দুটো মানুষ যাচ্ছে! সাহসী বীরপুরুষ! একজন এখানে থাকো। তুমি যাও।"

প্রথম লোকটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে অর্জুন রান্নাঘরে চলে এল। জানলা দিয়ে লাফিয়ে নীচে নামল। লনে কোনও টর্চ জ্বলছে না। যে দুটো লোক সাপের ছোবল খেয়ে মরেছে তারা বোধহয় শেষ মুহূর্তে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বাংলোর পেছনে রাজুভাই-এর হাত থেকে ছিটকে পড়া টর্চটা এখনও জ্বলছে। অর্জুন লোকটিকে সতর্ক পায়ে এদিকে আসতে দেখল। হঠাৎ হাওয়া বইল। জঙ্গলের গাছগুলো নড়তেই জমে থাকা বৃষ্টির জল ডালপাতা থেকে শব্দ করে ঝরতে লাগল। লোকটা হঠাৎ দৌড়তে লাগল। সম্ভবত ভয় পেয়ে গিয়েছিল আচমকা শব্দ হতে। যেই সে নিচু হল টর্চ তুলতে, অর্জুন ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওরে বাবা রে মা রে বলে চেঁচিয়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল লোকটা। মুখ থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বের হতে লাগল। অর্জুন টর্চটা তুলে নিল। নিয়ে চারপাশে আলো ফেলতেই স্টিভেনসনের কবরের কাছে কিছু একটার নড়াচড়া অনুভব করল। ও টর্চের আলো হাতে আর একটু এগোতেই দেখতে পেল কবরের নীচ থেকে একটা সাপ একটু একটু করে ওপরে উঠে আসছে। এটা কোন সাপ? যেটা বাইরের লনে পড়ে আছে সেটা কি আলাদা? তা হলে কি ওই কবরে দুটো সাপ থাকত? গোরানসাহেব অবশ্য এইরকম সন্দেহ করেছিলেন। অর্জুন দৌড়ল। জানলা দিয়ে ভেতরে গেলে অনেক কসরত করতে হবে। সে বারান্দায় উঠে এল। এখন ওরা দু'জন। বাকি দু'জন অজ্ঞান হয়ে আছে। দু'জনের সঙ্গে পাঁচজন সহজেই মোকাবিলা করতে পারে।

"হ্যান্ডস্ আপ!"

হুকুম শুনে হাত তুলতে তুলতে অর্জুন দেখল প্রৌঢ় দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

"তা হলে তুমিই এইসব করছ?"

"আপনি কে?" অর্জুন হাত তোলা অবস্থায় জিজ্ঞেস করল।

"আমি যেই হই তোমাদের কাউকে আমি জ্যান্ত ফিরে যেতে দেব না। এখন ভাল ছেলের মতো মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। চটপট। সাপ মেরেছি, তোমাকে মারতে একটুও অসুবিধে হবে না।" প্রৌঢ় চমকাল।

অর্জুন বাধ্য হল শুয়ে পড়তে। তৎক্ষণাৎ প্রৌঢ়র সঙ্গী এসে ওর হাত বেঁধে ফেলল। প্রৌঢ় নির্দেশ দিল, "ওকে গাড়িতে তোলো।"

"কেন ঝামেলা করছেন সার। জিপে এখনও অনেক লোক পড়ে আছে। আর একটাকে তোলার কী দরকার?" লোকটি যেন প্রার্থনা করল।

"ওটা এখনও আসছে না কেন?" প্রৌঢ় জানতে চাইল।

"কী করে আসবে? ও যে টর্চ আনতে গিয়েছিল সেটা এ নিয়ে এসেছে। সার, যদি বাঁচতে চান তো এখান থেকে পালান।"

"শাট আপ।" প্রৌঢ় ঘুরে বাংলোর দরজা টেনে বন্ধ করে দিলেন। লম্বা ছিটকিনি টেনে দিয়ে বললেন, "ভেতরে যারা আছে তারা ভেতরেই থাক।"

"সার, যে টর্চ আনতে গিয়েছিল সে আমার মাসতুতো ভাই। ওর কী হয়েছে না দেখে যেতে পারব না। একবার চলুন।"

প্রৌঢ় মাথা নাড়ল, "ওকে দরকার। তিনটে গাড়ি নিয়ে এসেছি। আমরা এখন দু'জন। চলে গেলে একটা গাড়িকে এখানে ফেলে যেতে হবে। নো। আমি চাই না কোনও প্রমাণ রেখে যেতে। চলো।" অর্জুনের আনা টর্চ তুলে নিল প্রৌঢ়।

ওরা এগোতেই অর্জুন উঠে বসল। ওর হাত পেছন মুড়ে বাঁধা কিন্তু পা বাঁধার কথা ভাবেনি ওরা। ও সেই অবস্থায় নেমে নামল। কী করে অন্তত একটা গাড়িকে খারাপ করে দেওয়া যায়!

হঠাৎ শুনল প্রৌঢ় চেঁচিয়ে উঠেছে, "ওটা কী?"

"সার, মনে হচ্ছে মানুষ। লম্বা রোগা মানুষ।"

"অত রোগা মানুষ হতে পারে না।"

"পারে সার। ওখানে একটা কবর আছে।"

"আমি বিশ্বাস করি না। তুমি টর্চের আলো ওটার ওপর ফ্যালো তো। হ্যাঁ।" প্রৌঢ় গুলি চালালেন। পরপর কয়েকটা।

লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, "পড়ে গেল সার, পড়ে গেছে।"

"এসো।" প্রৌঢ় এগিয়ে গেল লোকটিকে নিয়ে। তখনও গোঁ গোঁ করছে মাটিতে পড়ে থাকা লোকটা। কয়েকবার ডাকার পর সেটা বন্ধ হল। প্রৌঢ় বলল, "মুখে জল দিলেই ঠিক হয়ে যাবে। ওকে তুলে নিয়ে এসো।"

লোকটা তার মাসতুতো ভাইকে বগলের তলায় হাত ঢুকিয়ে তুলল। প্রৌঢ় ফিরে আসছিল দ্রুত। অর্জুনকে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে উঠল, "আচ্ছা! এই ব্যাপার। তা হলে তুমি মরো।"

রিভলভার উঁচিয়ে গুলি করল প্রৌঢ়। কিন্তু খট করে শব্দ হল, গুলির আওয়াজ হল না। প্রৌঢ় বলল, "মাই গড!" তারপর দৌড়ে গেল লনের ওপর পড়ে থাকা

মৃতদেহের পাশ থেকে বন্দুক তুলে আনতে। সেটাকে তুলে এদিকে ফিরতেই অর্জুন মাটিতে বসে পড়ল। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গাড়িতে লাগল। কাচ ভাঙল। কোনওরকমে গুঁড়ি মেরে অর্জুন গাড়ির পেছনে চলে আসতেই আবার গুলির আওয়াজ হল। আর তখনই একটা আর্তনাদ প্রবলভাবে বেরিয়ে এল প্রৌঢ়ের গলা থেকে। অর্জুন উঁকি মেরে দেখল প্রৌঢ় দু'হাতে তার মুখ থেকে কোনও কালো ছায়া সরাবার চেষ্টা করতে করতে মাটিতে পড়ে গেল। সমানে চিৎকার করে যাচ্ছিল প্রৌঢ়। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিতে-দিতেও সেটা থামছিল না। অর্জুন উঠে দাঁড়িয়েছিল। ভাইকে বয়ে নিয়ে আসা লোকটা তখন ওই দৃশ্য দেখে থরথর করে কাঁপছে। অর্জুন তাকে ডাকল, "বাঁধন খুলে দাও।"

ভোর হয়ে এল। মৃতদেহগুলোকে পাশাপাশি শুইয়ে রাখা হয়েছে। যারা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল তাদের বেঁধে রাখা হয়েছে। জিপের ভেতর থেকে আরও পাঁচজন মানুষকে এনে বাইরে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আর প্রৌঢ়র সমস্ত মুখে গোরানসাহেব ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়া সত্ত্বেও তা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। বটাকে পাঠানো হয়েছে হাসিমারা পুলিশ স্টেশনে খবর দিতে। প্রৌঢ় সমানে যন্ত্রণায় ককিয়ে যাচ্ছে।

অর্জুন বলল, "মিস্টার গোরান, এই হল আপনার ড্রাকুলা। ডুয়ার্সের সরল মানুষদের তুলে নিয়ে এসে এই লোকটা শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বের করে জঙ্গলে ফেলে দিত। সিরিঞ্জ ফোটাত ঘাড়ের পাশে। রক্ত বের করে সংরক্ষণ করার কায়দা ও জানে। আমরা এখনও বুঝতে পারছি না এই রক্ত ও ব্ল্যাকে বিক্রি করত না অন্য কিছুতে লাগাত।"

মেজর বললেন, "তবু আমি গোরানকে ধন্যবাদ দেব। ও যদি এই অভিযানে না আসত তা হলে ওই রক্তচোষা ড্রাকুলাটা আরও কত মানুষের সর্বনাশ করত। ভৌতিক ড্রাকুলা নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু মানুষই তো ড্রাকুলা হয়ে গেছে।"

গোরানসাহেব গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। এবার বললেন, "ভৌতিক ড্রাকুলা নেই এ-কথা আমি এখনও বিশ্বাস করি না।"

"আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আর্নল্ড স্টিভেনসনের কবরে দুটো বড় সাপ বাসা করে থাকত। কোনও ড্রাকুলা নয়।" অর্জুন বলল।

"ঠিকই। কিন্তু ওরা মারা যাওয়ার পর তুমি ওই লোকটার মুখে একটা কালো ছায়া দেখতে পেয়েছ। এই লোকটাও বলছে, সে দেখেছে ওদের নেতার মুখে ছায়াটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে আর ওটা এসেছে ওই কবর থেকে। ওই ছায়াই যে ওর চোখ তুলে নিয়েছে, মুখ ক্ষতবিক্ষত করেছে তা তোমরা জানো। অথচ আমরা বেরিয়ে এসে কেউ ওই ছায়াটাকে দেখতে পাইনি। তুমি এর ব্যাখ্যা করবে কীভাবে?" গোরানসাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

মেজর বললেন, "তা হলে স্বীকার করতে হয় স্টিভেনসনের ড্রাকুলা আমাদের

বাঁচিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া জন লিঙ্কন চিঠি লিখেছিল প্রায় ৬০ বছর আগে। সেই চিঠিতেও রক্ত চুষে নিয়ে মানুষকে মেরে ফেলার কথা ছিল অর্জুন। এই বুড়োটা নিশ্চয়ই তখন থেকে কারবার চালাচ্ছে না।"

অর্জুন কথা বলল না। লিঙ্কন সাহেব ভুল করতে পারেন, কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু এই কালো ছায়ার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

পুলিশ এল। সব কিছু লিখে নিয়ে অফিসার অর্জুনের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালেন। এই প্রৌঢ় একজন ডাক্তার। থাকেন ধূপগুড়ির কাছে। বিনা পয়সায় মানুষের চিকিৎসা করেন। ইনিই যে এই বীভৎস ঘটনার নায়ক তা পুলিশ কল্পনা করতে পারেনি। অর্জুনরা না এলে ব্যাপারটা আবিষ্কার করতে কতদিন সময় লাগত কে জানে! সবক'টা গাড়ি এবং মানুষদের তুলে নিয়ে পুলিশ যখন চলে গেল তখন মেজর বললেন, "গোরান, আমরাও তা হলে ফিরে যেতে পারি, কী বলো?"

গোরানসাহেব বললেন, "আমি আর একটা রাত এখানে থাকতে চাই।"

আপত্তি থাকা সত্ত্বেও সবাই রাজি হল। সাপদুটোকে পুড়িয়ে ফেলল বটা আর গোরক্ষনাথ। গোরক্ষনাথের মন খুব খারাপ। অর্জুন কেন তার খোঁড়া শকুনের বাঁধন খুলে দিল! বাংলোর কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

বিকেলবেলায় অর্জুন একাই বাংলোর সামনের রাস্তায় হাঁটছিল। এরকম জায়গায় অত বছর আগে স্টিভেনসন সাহেব বাংলো করেছিলেন। ভদ্রলোক সত্যি শৌখিন মানুষ ছিলেন। শৌখিন মানুষ কি ড্রাকুলা হতে পারে?

হঠাৎ অর্জুনের নজরে পড়ল পাশের গাছের নিচু ডালে একটা শকুন বসে আছে। অর্জুন দাঁড়াল। এটা গোরক্ষনাথের শকুন নয় তো? সে এগিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শকুনটা নড়ল না। দ্রুত গেটের কাছে ফিরে এসে সে চেঁচিয়ে গোরক্ষনাথকে ডাকতেই গোরক্ষনাথ বেরিয়ে এল। অর্জুনের কাছে খবরটা শুনে ছুটে গেল গোরক্ষনাথ। অর্জুন দেখল গোরক্ষনাথ হাত বাড়িয়ে শকুনটাকে সহজেই ধরে ফেলল। পালাবার কোনও চেষ্টাই করল না পাখিটা।

ওটাকে নিয়ে আসতে আসতে দাঁড়িয়ে পড়ল গোরক্ষনাথ। পাখিটাকে মুখের সামনে ধরে বিড়বিড় করতে লাগল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

"এত রক্ত লাগল কী করে এর মুখে, দু' পায়ের নখে। ইস। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কিছু শিকার করেছিল।"

কাল রাত্রে দেখা কালো ছায়ার রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল অর্জুনের কাছে।